বারো ঘর এক উঠোন

বারো ঘর এক উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দে'জ পাবলিশিং । ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

BARO GHAR EK UTHON

by

Jyotirindra Nandy

প্রকাশক ঃ
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ৭ চৈত্র, ১৩৬২

প্রচ্ছদ ঃ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক ঃ
সুনীল ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

অভিশপ্ত বারো ঘরের

বাসিন্দাদের—

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই—

নির্বাচিত গল্প

বারো ঘর এক উঠোন

এক

রুচি যা আশংকা করছিল।

'সেলাই-কল বিক্রি করা ছাড়া আমি আর উপায় দেখছি না।' বাইরে থেকে ঘরে এসে গায়ের জামা খুলতে খুলতে শিবনাথ বলল, 'সেলাইর মেশিন বড়, না অপমান বড়।

'কেউ দিলে না, আর পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারে এমন একজন বন্ধু নেই তোমার কলকাতা শহরে!' রুচি অবাক।

'ছিল, যবে দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলাম, রুচি! তা অতবড় আটতলা বাড়ির ব্যাঙ্কটাই যখন ডুবল, লোকের চোখে হারিয়ে গেল, আমি মাত্র দু'পদ দু'হাত ও একটি ক্ষুদ্র মস্তকবিশিষ্ট মানুষ হয়ে কি করে আর বন্ধুদের কাছে আদরের 'শিবু' বলে অনন্তকাল পরিচিত থাকব আশা কর। ক'দিন আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়। মুখে বিড়ি দেখেই অতনু সেদিন ধরে ফেলল আমি ডুবেছি, তা ছাড়া ডুববার সময় কেউ কেউ টাকার থলে বেঁধে ডোবে বলে যে একটা কানা-ঘুষা রকমের কথা আছে, আমি তার ধারে কাছে দিয়েও নেই! অতনু স্রেফ 'না' করে বসল, তার টানাটানি যাচ্ছে, এখন কাউকে ধার কর্জ দিতে পারছে না।

রুচি চুপ ক'রে রইল।

তার নিজের হাতে তৈরি সুন্দর লেস পরানো ঢাকনা দেওয়া সেলাই-কলটা দেখল একবার।

'বীরেন শালাকে কত চা সিগারেট খাইয়েছি, সে ব্যাটাও আজ কিছু দিলে না।' পাঞ্জাবি ছেড়ে খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল শিবনাথ। 'সবটা টাকা তুমিই যোগাড় করলে, এই সামান্য ক'টা টাকা আশা করেছিলাম, চেষ্টা-চরিত্র করলে আমি যোগাড় করতে পারব। কই,—হ'ল না, এখন দেখছি, আসলে মানুষ হিসেবে, অন্তরের দিক থেকে বিচার করলে মেয়েরা কিছুটা খাঁটি আছে, এ ওকে বিশ্বাস করার মাধুর্যটুকু হারায়নি। তোমার স্কুলের বন্ধুরা তোমায় ধার দিলে, আমাকে সবাই বুড়ো অঙুল দেখাচ্ছে। এক বছর হয়নি চাকরি গেছে, কিন্তু তাই বলে পঞ্চাশটা টাকা কেউ দিতে চাইছে না আমি ভাবতেও পারছি না। ওরা কি জানে না আমার স্ত্রীর এখনো কাজ আছে, না হলে ভাত খাচ্ছি কি করে, কি করে আজও বেঁচে আছি।'

আলস্যে হাই তুলতে তুলতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ কথাগুলো বলছিল। মঞ্জু এসে বাবার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিবনাথের পাঁচ বছরের দুহিতা।

'বাবা, আমরা নাকি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ, কে বললে তোকে একথা?' মেয়ের গালে আঙুলের টোকা দিয়ে শিবনাথ হাসে।

'পাশের ফ্ল্যাটের রেবার কাছে।' মঞ্জু হাসে।

রুচি বলল, 'জানাজানির বাকি আছে নাকি কিছু, মোহিতবাবু আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন। দু' মাসের বাড়িভাড়া বাকি রাখার পর তৃতীয় মাসে রেন্টকন্ট্রোল অফিসের হাঙ্গামা আছে বলে তিনি ভাড়াটে রাখেন না কখনো, সবাই জানে একথা।'

শিবনাথ বলল, 'আহা, আমরা যে দু' মাস ভাড়া দিতে পারিনি, কথাটা জানাজানি হল কি করে?'

'মোহিতবাবুই বলবেন, বলেছেন হয়তো। এটা আবার একটা খুব না-জানাজানির কথা কি। সবাই দেখেছে জেনেছে, শঙ্কর দত্ত লেনের বাড়ি ছেড়ে এসে এখানে উঠেও আমাদের চলছিল না। একশ' টাকার চাকরি দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকার একটা হাফ-ফ্ল্যাটের ভাড়া টানা যায় না। দেয়াল সিঁড়িগুলোর কাছে মানুষকে একথা শিখতে হয় না।'

রুচি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে দেখে শিবনাথ দুহিতাকে বুকের ওপর থেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম এর মধ্যে আবার একটা জুটে যাবে।

বাবার চাকরি নেই মঞ্জু এটা ভাল করে জেনেছে। এখানেও বাড়িভাড়া আটকা পড়েছে। বাবা ও মার মধ্যে এখন কিছুক্ষণ এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি চলবে, আবার একটু গোলমেলে হাওয়া বইতে পারে টের পেয়ে বুদ্ধিমতী মঞ্জু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যা ও এখন হামেশা করছে।

রুচি চুপ করে ছিল।

শিবনাথ আস্তে আস্তে বলল, 'এ-বাড়িতে কে যেন সেলাই-এর মেশিন কিনতে চেয়েছিল, তোমাদের মেয়েদের মধ্যে কে যেন একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড মেশিন খুঁজছেন শুনছিলাম?'

'মলিনার মা। ও, তুমি মলিনার মার কাছে আমাদের মেসিন বিক্রি করতে বলছ নাকি!' রুচি চমকে উঠল। রুচির তাকানো দেখে শিবনাথ পাংশু হয়ে গেল।

'না, এতকাল এক বাড়িতে থেকে এত ঘনিষ্ঠতার পর ওদের কাছে এসব বিক্রি করা চলে না।' কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে শিবনাথ বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তা ছাড়া একটা মূল্যবান জিনিস আমাদের মত লোকের পক্ষে, ধর, বলা যায় না, হুট্ করে তোমারও একদিন চাকরি গেল, ঘরে একটা সেলাই-কল থাকলে শায়া ব্লাউজ সেমিজ ফ্রক সেলাই করেও পেট চালাবার একটা উপায় থাকে। কিন্তু কি-ই বা আর রাখতে পারছি। সত্যি সর্বস্বান্ত হলাম।' একটু থেমে শিবনাথ বলল, 'অবশ্য সময়টা এখন একটু খারাপ যাচ্ছে, কিন্তু আবার হবে, আবার সব ফিরে পাব আমার বিশ্বাস আছে, রুচি।'

'বিশ্বাস থাকা ভাল,' রুচি বলল, 'এখন খাওয়ার পাট শেষ করে বিছানাটা, টুকিটাকি জিনিসগুলি বাঁধাছাদা করার ব্যবস্থা কর। দু' মাসের ভাড়া দিতে না পেরে সেলাই-এর মেশিনটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি মোহিতবাবুকে এভাবে বলে বুঝিয়ে ওটা একেবারে বিক্রি করে না দিয়ে এখনকার মত দেনা শোধ করে চল এবাড়ি ছেড়ে পালাই, না হলে আরো অনেক অপমান সইতে হবে।'

রুচি স্টোভে জল গরম করছিল। জল এইবার ফুটছে। কথা শেষ করে স্বামীর

দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ও যখন স্টোভ নিভিয়ে জলটা নামাতে ব্যস্ত, হাঁ করে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ ভাবে। অপমান। এবাড়ির আর কারা কিভাবে অপমান করতে পারে তাই সে চিন্তা করে। মোহিতবাবু, বাড়ির যিনি খোদ মালিক তিনি এখানে থাকেন না, ভবানীপুরে তাঁর প্রাসাদ। কিন্তু শিবনাথ সে-সব প্রশ্নের একটাও স্ত্রীকে করতে সাহস পেলে না। মোহিতবাবু দারোয়ান, দুধওয়ালা, ধোপা, মুদি, ঝি, কাগজওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ছোলাভাজা চানা-ভাজাওয়ালা একটা না একটা, একজন না একজন পাওনাদার তাগিদ দিতে এসে দরজার সামনের সিঁড়িতে দু'বেলা দাঁড়াচ্ছে, চেঁচামেচি করছে, আর উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দরজা থেকে তা দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে লোকে উঠতে দেখছে, নামবার সময় দেখে। কেউ কিছু না বললেও এই দেখা এবং তা থেকে কিছু একটা অনুমান করার মধ্যেও যথেষ্ট অপমান মেশানো আছে—জিজ্ঞেস করলে রুচি হয়তো উত্তর দেবে। তাই কিছু না বলে শিবনাথ চুপ করে রইল। আর এই নিয়ে যত বেশী কথা হচ্ছে তত ঝগড়া বাড়ছে, রুচি শিবনাথ দু'জনেই জানে।

তারপর দুপুরে এক সময় শিবনাথ সেলাই-কলটা চিরকালের মত ঘরের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল। একটা একটা করে এভাবে সব গেছে, যাচ্ছে। তাদের বিয়ের খাট, বড় ড্রেসিং টেবিল, রেডিও, শঙ্কর দত্ত লেনের বাড়ি থেকে এখানে আর টেনে আনা হয়নি। আর তখন এখানকার মত তাঁদের ক্যাস টাকার দরকার পড়েছিল। জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়েছে সব।

জিনিসপত্র বাঁধা দিতে বিক্রি করতে অবশ্য শিবনাথের জুড়ি নেই কেউ। এক একটা যাচ্ছে আর রুচির বুকের একখানা করে পাঁজর ভাঙছে।

তাই যা-হোক একটা দাম ধরে মেশিনটা যদি কারো কাছে শিবনাথ বিক্রি করে দিয়ে এসে বলে, 'মোহিতবাবুর কাছে রেখে এলাম। সুযোগমত ওর টাকা ওকে দিয়ে আমাদের জিনিস ফিরিয়ে আনব বলে এসেছি,' রুচি জানে ওটা কোনোদিন আর ঘরে ফিরে আসবে না। আজ পর্যন্ত কিছু এল না।

পরশু দু'খানা বড় কাঁসার থালা বিক্রি করা হয়েছে, আর বড় জামবাটিটা।

বিক্রি করে সেই টাকায় কয়লাওয়ালা ও মুদির দেনা শোধ করা হয়েছে।

শিবনাথ বলছিল, 'তা ছাড়া এত মালপত্র নিয়ে অত দূরের রাস্তা যেতে কী পরিমাণ টাকা খরচ হবে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এমনি তো এগুলো সারা বছর বাক্সে তোলা থাকে। বড় থালায় ছড়িয়ে সরু চালের ভাত আর রুই মাছের কালিয়া খাবার সুদিন আগামী পঞ্চাশ বছরেও আমাদের শ্রেণীর লোকের আসছে না এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, কি বড় জামবাটিতে করে দই ক্ষীর খাওয়া।'

কথা শেষ করে শিবনাথ স্ত্রীকে দেখছিল।

জিনিসগুলো বিক্রি করে দেওয়া তেমন যে একটা ক্ষতির বা দোষের কাজ হয়নি অন্তত এইটুকুন রুচিকে জানাতে পেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে শিবনাথ শেষে তার একটা চাকরির ইন্টারভিউর কথা তুলেছিল। নিশ্চয়ই হবে ওটা। এত লোক নেবে ফি বছর, একটা হিসেব করা আছে ওদের। অ্যান্ড ইট ইজ এ বিগ্ কনসার্ন—

বোগাস ফার্ম হলে বিশ্বাস করতাম না।'

মুশকিল এই যে, চাকরি খুঁজতে গিয়ে শিবনাথ সব সময় বোঝে না কোন্ কাজটা তার হবে, হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কোন্‌টা অনন্তকাল চেষ্টা করলেও হবে না।

মুশকিল, একটা ভাল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আফিসের ম্যানেজারি করার পর যা-তা চাকরির জন্যে যেখানে খুশি 'মাথা বিক্রি' করতে ও কান বাঁধা দিতে' শিবনাথ নারাজ।

'যখনকার অবস্থা যেমন তখন তেমন'—অন্তত খাওয়া-পরা কি থাকার বেলায় এই সত্য মেনে নিয়ে দিনকতক কষ্ট করতে রাজী, তাই বলে নিজের এফিশিয়েন্সি বা ইন্‌টেলেক্‌টকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দেব না। জিনিস যাচ্ছে আবার হবে। তা ছাড়া ধর, ওখানে যদি আমার হয়েই যায়। তাই বলে পৃথিবী অন্ধকার দেখে সাড়ে পাঁচশ'র চেয়ার থেকে একেবারে একশ' পঁচিশের চেয়ার টেনে নিয়ে হুট্ করে বসে পড়া সুইসাডের সামিল হবে। দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্ক ফিরে না আসুক, ভাল কনসার্নে অন্তত একটু ভদ্র-রকমের মাইনেয় না গেলে দিনের নাগাল আবার কি করে পাব একবারটি চিন্তা করে দেখ। বয়েস বাড়ছে কি কমছে? ঝুঁকি নিতাম না যদি তোমার চাকরি না থাকত।'

এক কথায় নিজের চেষ্টাগুলো যখন একটার পর একটা ব্যর্থ হচ্ছে, তখন রুচির চাকরির ওপর ভরসা করে শিবনাথ একটির পর একটি জিনিস বাইরে পাঠিয়েছে।

আজ সেলাই-কল দিয়ে এসে শিবনাথ অবশ্য বেশি কথা বলল না। কেননা রুচি অসম্ভব গম্ভীর হয়ে ছিল।

শিবনাথ বাজার থেকে ছিবড়ের দড়ি কিনে এনেছে।

দু'জনে হাত লাগিয়ে সব বাঁধাছাঁদা করবে এমনসময় রাজ্যের মহিলা এসে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। সবাই এ-বাড়ির।

তারা বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দা।

ওপরের ওরা এসেছে, নিচের ওরাও।

রুচি সমাদর করে সকলকে বসতে বলল।

মলিনার মা, সেবার মা, কুসুমের দিদি, চাণ্টুর বৌদি, শোভা, বকুল, বকুলের দিদি, মা ও মাসিমা।

সবাই একবার করে রুচিকে দেখল। আর দেখল ঘরময় ছড়ানো তোশক বালিশ মাদুর, ঘটি বাটি বালতি উনুন, শিল-নোড়া, জলের কুঁজো। ওপাশে এক জায়গায় গাদা-করা কিছু পুরোনো বই, খবর-কাগজ। দু'টো ব্রাকেট, ভাল ও ছেঁড়া দু'তিন জোড়া জুতো। রান্নাঘর থেকে এইমাত্র টেনে আনা হয়েছে একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি। তার মধ্যে কয়লা, ঘুঁটে, অনেকগুলো পুরোনো শিশিবোতল, ছোট একটা আরশি জুতোর ব্রাস, ফিনাইলের বোতল, ছেঁড়া গামছা ও একটা ছেঁড়া লুঙ্গি (রুচি ঘুঁটে ও কাঠ না থাকলে এ দুটো সময় সময় ছিঁড়ে কয়লা ধরাবার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে), আর ঘুঁটে ও কয়লার ঝুড়ির পাশে আড়াআড়ি করে শুইয়ে রাখা একটা ঝাঁটা, একটা ঝাড়ন, হাতা, খুন্তি, সাঁড়াশি, রেশনের থলে। আর একধারে চা-এর বাসন, শূন্যগর্ভ দু'টো কাচের বোয়ম। যেন একটা বোয়মে চিনি রাখা হ'ত আর একটায় ঘাসের ঘি

বা তৈল। এখনও খানিকটা তলায় লেগে আছে। কতকগুলো পিঁপড়ে মরে মিশে আছে সেই তৈল জাতীয় তরল পদার্থটুকুর মধ্যে।

'কোথায় যাচ্ছেন দিদি ?' ছড়ানো জিনিসগুলো থেকে এক সময় চোখ তুলে কুসুমের দিদি প্রশ্ন করল, শুনলাম ঘর ছেড়ে দিয়েছেন, আজই চললেন নাকি ?

রুচি চুপ করে ছিল।

'আহা, ক'টা মাস একসঙ্গে এক বাড়িতে ছিলুম। হুট্ করে একটা ঘরের লোক চলে গেলে সত্যি মনে বড় কষ্ট হয়। আবার কবে দেখা হবে। আর কোনোদিন হয়তো দেখাই হবে না।' কুসুমের দিদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সত্যি, এই শহরের এক একটা বাড়ির ভাড়াটেদের কথা ভাবলে আমার ট্রেনের যাত্রীর কথা কেবল মনে হয়। একসঙ্গে ক'দিন বাস করলুম, হাসলুম, গল্প করলুম, তারপর একদিন একটা পরিবার উঠে গেল। এ-জন্মে হয়তো আর ওদের সঙ্গে দেখা হ'ল না। কোথায় যাচ্ছেন, মঞ্জুর মা ?' 'বেলেঘাটা,' রুচি সেবার মার মুখের দিকে তাকাল না।

'বেলেঘাটা ?' বকুলের দিদি এক পা সরে এল। 'আমার বোনঝিরা বেলেঘাটায় আছে। এই তো সেদিন শুঁড়া ফার্স্ট লেনের ওধারে জায়গা কিনে নতুন বাড়ি করল তৃপ্তির বাবা। ওধারটায় কি ?'

রুচি গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। উনি জানেন। আমি এখনও ঘর দেখিনি। রাস্তার নামটাও জানি না।'

'না না, কোনদিন যখন জাননি, কি করে আর জানাবেন।' বকুলের মাসিমা বলল, 'তবে বেলেঘাটার সবাই ভাল নয়, কোনো কোনো দিকটা তো শুনছি ভয়ানক নোংরা, কাঁচা ড্রেন, ময়লা, মাছি, আর জলের কষ্ট।

রুচি চুপ করে রইল।

'আর মশা !' বকুলের দিদি বলল, 'তৃপ্তি ওরা তো সন্ধ্যা থেকে মশারির তলায় ঢোকে, আর দিনভর ঘরে পাখা ঘুরছে, তবু নাকি তিষ্ঠোতে পারে না।'

'মশা থাকবেই, শহর তো নয় শহরতলী। শহরের যত জঞ্জাল আর আবর্জনা ঠেলে ঠেলে ওদিকেই পাঠানো হচ্ছে, কাজেই—'

সেবার মা বলল, 'এদিকে কোথাও ঘর-টর বুঝি পেলেন না দিদি ?'

রুচি স্থির চোখে সেবার মাকে একবার দেখে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'ইচ্ছা করেই আমরা ওদিকে যাচ্ছি আমার ইস্কুল কাছে হয়, এখান থেকে দূর পড়ে। কষ্ট হচ্ছিল খুব।'

কেউ আর কথা বলল না হঠাৎ।

একটু পরে একটি মেয়ে বলল, 'তা অবশ্য ওদিকে ভাড়াও কম। শহরে ঘরের যা গলাকাটা ভাড়া হচ্ছে, দিন দিনই বাড়ি-ভাড়া চড়ছে শুনছি তো। একে জিনিসপত্রের এত দাম, তার ওপর যদি ঘর-ভাড়াও এমন—'

'হ্যাঁ,'—বকুলের বিধবা মাসিমা কৌটো থেকে দোক্তার মাজন তুলে নিয়ে দাঁতে ঘষতে ঘষতে বলল, 'মোটে ঘর পাওয়া যাচ্ছে না, তার ওপর পাকিস্তানীদের ভিড়, ভাড়া বাড়বে না তো কি ! একখানা ঘর পাওয়া কি মুখের কথা ?'

'ভাগ্যিস আমরা-রায়টের পরই এ বাড়িতে চলে এসেছিলুম।' বকুলের মা বলল, 'এখন এই বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের মত একটা ফ্ল্যাট,—পাওয়া তো যাচ্ছেই না, পাওয়া গেলেও ভাড়ার অঙ্ক শুনলে নাকি মূর্চ্ছা যেতে হয়, বলছিলেন সেদিন আমাদের কর্তা। তবু তো এদিক থেকে আমাদের মোহিতবাবু ভাল লোকই বলব। কী সুন্দর ঘর, জল কলের কত সুবিধে, সিঁড়ি বারান্দাগুলো কত চওড়া এ বাড়ির। ইচ্ছা করলে কি আর তিনি ভাড়া ডবল করতে পারেন না? করেন নি।'

রুচি চোখ তুলে শেষবারের মত মোহিতবাবুর ঘরখানা দেখছিল, প্রশস্ত বারান্দা, ওধারের চওড়া সিঁড়ি।

'যে বাড়িতে যাচ্ছেন সে বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে তো?' বকুল প্রশ্ন করতে রুচি চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল। এবং রুচির অপ্রসন্ন ভ্রূযুগল দেখে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিমতী মলিনার মা বলল, 'আহা, বলছেন নিজে তিনি এখন পর্যন্ত ঘর দেখেন নি, মঞ্জুর বাবা ঠিক করে এসেছে। তা ইলেকট্রিক থাকবে না তো কি। ভদ্রলোক কেউ আবার ইলেকট্রিক নেই এমন বাড়িতে থাকতে পারে নাকি।'

'আছে গো দিদি, আছে,' বকুলের দিদি প্রতিবাদের সুরে বলল, 'ইলেকট্রিক কেন: কল নেই এমন বাড়িও সেখানে আছে। রাস্তার পাইপ থেকে খাওয়ার, রান্নার জল তুলে আনছে বহু লোক, তৃপ্তি সেদিন বলে গেল।'

মলিনার মা হাঁ করে বকুলের দিদির কথা শুনছিল। সেবার মা বলল, 'সেগুলো তো শুনছি বস্তি। তা বস্তি তো এমন হবেই; এই মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের সুখ সেখানে আপনি পাবেন কি করে, তবে বস্তি যেমন আছে, ভদ্রলোকের বাড়িও আছে, সবাই কি আর আপনাদের তৃপ্তির বাবার মত টাকা খরচ করে বাড়ি তুলে আছে, জলের কল ইলেকট্রিক আলোর বহু বাড়ি আছে, আর ভদ্রলোকেরা সে-সব বাড়ি ভাড়া করে আছেন।'

যেন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বকুল খুক করে একটু হাসল।

রুচি তার চোখের দিকে তাকাতে বকুল তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শান্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

আড়চোখে একবার রুচি ও নিজের মেয়েকে দেখে বকুলের মা আস্তে আস্তে বলল, 'বস্তিই সেখানে বেশি, সেবার মা, আপনি বেলেঘাটা কোনদিন যান নি তো। মেথর মুচি বাস করে সেও বস্তি, আবার লেখাপড়া-জানা ভাল ভাল ঘরের লোকেরা পরিবার নিয়ে আছে, জল নেই, আলো নেই, টিনের বেড়া, ফুটো ছাদ, দিনরাত মশা-মাছি ভন ভন করছে—বস্তির অভাব নেই। বকুলের মত সেবার মত বড় বড় মেয়ে রাস্তার কলে জল আনতে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় এমন কেলেঙ্কারি।'

মধ্যস্থ হয়ে গম্ভীর গলায় এবার মলিনার মা বলল, 'তা হবে, হয়তো তাদের বাপ ভাইয়ের চাকরি নেই, কি আয় কমে গেছে। কম ভাড়ার বাড়িতে না থেকে করবে কি।'

আসল কথা সেখানেই, টাকার জোর না থাকলে কেবল কি থাকা? খাওয়ার কষ্ট করছে না মানুষ? এই শহরের মধ্যেই ভাল বাড়িতে থেকেও, খোঁজ নিয়ে দেখুন গে, অনেকের হয়তো কোনদিন হাঁড়ি চড়ে না, এমন অবস্থা যায়। ঈশ্বর না করুণ, কাল

আমাদের এমন অবস্থা হতে পারে, আপনার হতে পারে। জমিদারী নেই যখন, আজ তৃপ্তির বাবার চাকরি চলে গেলে কাল আমাকেও হয়তো, বেলেঘাটা তো কাছে, বেলঘরিয়ায় বা বালীখালে গিয়ে টিনের ঘরে আশ্রয় নিতে হবে না, তাই বা কে জানে।'

'থাক, আর বিনয় করতে হবে না দিদি।' ঠোঁট ঈষৎ বাঁকা করে বকুলের দিদি বলল, 'তৃপ্তির বাবা সেদিন স্যাকরা ডেকে মেয়ে-মা দুজনের জন্যে চারগাছা করে নতুন চুড়ি গড়তে দিয়েছে। সে-সব কথা আমাদের কানে আসে, চাকরি গেলে চারুবাবুর পরিবার উপোস করে থাকবে এসব কথা বাইরের রাস্তার লোককে বলো। শুনছি তো অলকা প্রেসের সবটা টাকাই ব্যাঙ্কে জমছে।'

অলকা, মানে তৃপ্তির মা, একটু লজ্জার ভান করে বলল, 'না ভাই না, যত শোনা যায় তা নয়, কাজকারবার খারাপ যাচ্ছে, প্রেসের অবস্থা আগের মতন নেই।'

'তা হাতি মরলেও লাখ টাকা' বকুল বলল।

অলকা বলল, 'তা তুমি আবার বড় কথা বলছ কি, তোমার বাবার ছোট্ট কাঠের কারবারটুকু তো শুনছি এখন ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে, শুনছি তো হিমাংশু রায় টালিগঞ্জে জায়গা দেখছেন। আর ভাড়া বাড়ি নয়। তা এক সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলাম মনে রেখে গৃহ-প্রবেশের দিন নেমন্তন্নটা করতে যেন ভুলো না।'

বকুল বলল, 'আচ্ছা, যবে হবে তবে হবে, আমাদের রুচি বৌদি চলে যাচ্ছেন খুব কষ্ট হচ্ছে, বৌদি এদিকে বেড়াতে টেড়াতে এলে এবাড়ি হয়ে যেও, না হলে কিন্তু তোমাকে আমরা সবাই মিলে রোজ ভীষণ গালমন্দ করব।'

'নিশ্চই আসব, কেন আসব না,' মলিন হেসে রুচি বলল, 'তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই।'

'মঞ্জুর বাবা এখন কি করছেন?' বোঝা গেল বেশ একটু ভেবে চিন্তে বকুলের মা প্রশ্নটা করছে।

'অর্ডার সাপ্লায়ার বিজনেস,' বলল রুচি।

'তা-ও একটা ব্যবসা বটে। হ্যাঁ, ব্যবসা ছাড়া এদিনে বাঁচা দায়, চাকরি একটা আমাদের ঠেকার জন্য রাখা, না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া—'

'এখন যাবার দিন এত সব টাকা-পয়সা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা না তোলাই ভাল, হয়তো এদের বেলাবেলি বেরিয়ে পড়তে হবে, অনেক দূরের পথ। চলো দিদি, আমরা যাই।' সেবার মা সকলকে মনে করিয়ে দিলে।

'হ্যাঁ, যেখানেই যাও ভাই, সুখে থেকো, এই ইচ্ছা, তুমি মাস্টারী করছ, মঞ্জুর বাবা অর্ডার সাপ্লায়ারের কাজ করছেন, মোটে একটা মেয়ে, তোমাদের ভয় কি? বেলেঘাটায় ভাল ভাল লোকও আছেন, এক-আধদিন বেড়াতে এসো।'

রুচি ঘাড় নাড়ল।

'রিক্সায় যাবেন বুঝি?' শোভা প্রশ্ন করল, 'মালপত্র?'

'ঠেলা, তা ছাড়া উপায় কি।' অভিজ্ঞা বকুলের মাসী জানিয়ে দেয়, 'একটা লরী ভাড়া করতে পারলেই সুবিধা হবে। 'মালপত্র সঙ্গে নিয়ে তোমরা একবারে ওখানে

পৌঁছে যেতে পারবে। রিক্সায়-বাসে যাওয়া অসুবিধা,—ঠেলার সঙ্গে যাচ্ছে কে ?

তাদের চলে যাওয়া নিয়ে যে এরা এতখানি ভাবছে রুচির বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ'ল না, সে নিজে বা শিবনাথ একেবারেই এখন পর্যন্ত ভেবে দেখেনি কেন, ভেবে রুচি অবাক হয়।

'একটা ব্যবস্থা করতে হবে,' গম্ভীর হয়ে রুচি বলল, 'জিনিস তো আর ফেলে যাব না।'

'তা যাই কর দিদি, যে রকম বাড়িতেই থাক, মেয়েটার ওপর সব সময় চোখ রাখবে। এখানে ছিল তকতকে ঝকঝকে সিঁড়ি, বারান্দা, ছাদ, সুন্দর বাঁধানো উঠোন, রাতদিন আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছে, ভয়ের কিছু ছিল না, না হোক সেখানকার সব ছেলেমেয়ে খারাপ। চোরডাকাতের ভয়টা নাকি বেশি শুনছি। ওর কানের রিং দুটো গিয়েই খুলে রেখো ভাই।'

বেশ একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা করে বকুলের মাসী বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আমিও সেকথা ভাবছিলাম, এখানে, এই শহরের ভিতরে এসব ছ্যাঁচড়া চোর থাকে না। তা ছাড়া এমন সুন্দর ভদ্রপাড়া আমাদের,—'

'তোমরা ভাবছ চোর-ডাকাত আমি ভাবছি ময়লা মাছি, শুনছি তো বেলেঘাটায় কলেরা-বসন্ত লেগেই আছে।' বকুলের মা বলল, 'শুধু মেয়েটাকে নয়, তোমরা দুজনেই গিয়ে টিকা নিয়ে ফেলো। আর জলটা ফুটিয়ে খেয়ো ভাই, পুকুর-পাতকুয়োর জল ব্যবহার করবে না।'

'আচ্ছা চলি বিদায়,' রুচির সমবয়সী বকুল, তৃপ্তি, শোভা, সেবা হেসে হাত তুলে।

বলল, 'আমরা সবাই একদিন দলবেঁধে আপনার বেলেঘাটার বাড়িতে গিয়ে হানা দেব। নতুন জায়গার সংসার দেখব।'

'নিশ্চই যাবে, আমি গিয়ে চিঠি দেব।'

অপসৃয়মানা প্রতিবেশিনীদের দিকে তাকিয়ে রুচি আস্তে আস্তে বলল ; তারপর এক সময় চুপ করে গেল।

সবাই বেরিয়ে যেতে শিবনাথ ঘরে ফিরে এল।

'এরা হ'ল সব স্নব। আমরা যে এদের সংস্পর্শ ছেড়ে যাচ্ছি, একদিক থেকে ভাল।'

রুচি শব্দ করল না।

শিবনাথ বলল, 'কম লেখাপড়া করে যুদ্ধের সময় বড় চাকরি বাগিয়ে ফেলেছিল, তাই আজ অত ফুটোনি। আর, ওসব প্রেস, কাঠের দোকান কিস্সু না, সবটাই ব্ল্যাক-মার্কেটিং। ব্ল্যাক-মার্কেট না করলে রোজ এত মাংস খাওয়া আর নিত্যনতুন শাড়ি গয়না পরা বেরিয়ে যেত। সুখের পায়রা সব। চাকা ঘুরবে দেখবে। শিগ্‌গির এদের সুখের নীড় ভাঙছে, থাকছে না কিছু।'

'কে থাকবে ?' রুচি প্রশ্ন না ক'রে পারল না।

'থাকব তুমি আমি, থাকবে ভালোবাসা। থাকবে যারা খুব বড়লোক, কয়েক কোটি টাকার মালিক,' আর থাকবে যারা একবারে নিঃস্ব, কিছুই নেই যাদের, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা হচ্ছে, মাঝামাঝিদের ঠাঁই নেই, এরা সেই দলের।'

যখন চাকরি করত শিবনাথ এত ভাল বক্তৃতা করতে পারত না।

'এই বেলা এগুলোতে হাত লাগাও।' রুচি বলল, 'তুমি বেকার নও, অর্ডার সাপ্লায়ের বিজনেস করছ বলে দিয়েছি।'

'খুব ভাল করেছ। কেন বলবে না, এরা মানুষ নাকি যে, সত্যি কথা সর্বদা বলতে হবে। তুমি যে বুদ্ধি করে বলেছ ইস্কুলটা কাছে ব'লে ওদিকে চলে যাচ্ছি, খুব ভাল করেছ।'

'যার নেই পুঁজিপাটা, সে যায় বেলেঘাটা।' দরজার পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা কলরবের স্রোত বয়ে গেল।

রুচি ও শিবনাথ চমকে উঠল।

'কে, কারা' ?—ফিসফিসিয়ে বলল শিবনাথ।

'কানু বুড়ো বাবলু। এ বাড়ির ইস্কুলে-পড়া ছেলের দল, রুচি বলল, 'কী শিক্ষা, কী ডিসিপ্লিন।' দুই কর্ণমূল ওর লাল। কলরব করতে করতে ছেলের দল বেরিয়ে গেল।

'কুকুরের বাচ্চা সব। ইতরের দল, আমরা অভাবে পড়ে বেলেঘাটায় যাচ্ছি, তোরা যাবি জেলে, ফাঁসির কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবি। যত চোর ব্লাক-মার্কেটিয়ার—'

গর্জন করছিল শিবনাথ। রুচি বলল, 'আস্তে। ওদের দোষ কি, বড়দের মুখে শুনেছে, তা ছাড়া গালমন্দ করে কি হবে—আমরা বেলেঘাটায় যাচ্ছি, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।'

'তা হলেও,—তা হোক, এই নিয়ে মকারি করার আছে কি।' বালিশ-তোশকের বাণ্ডিল তৈরি করতে করতে শিবনাথ বলল, 'ইচ্ছা করছিল, বাবলু আর ওটা কে? কানু।—দুই কান ধরে দুটোর মাথা আচ্ছা করে দেয়ালে ঠুকে দিই।'

'ফৌজদারী মামলায় পড়তে যে,' বিছানার বাণ্ডিলে দড়ির গিঁট পরাতে পরাতে রুচি বলল।

শিবনাথ চুপ।

'তা-ও এক রকম মন্দ ছিল না, বস্তির চেয়ে জেলখানা ভাল, কি বল?' যেন ঠাট্টা করল পরে রুচি শিবনাথকে। 'খাওয়াটা সেখানে ফ্রী।'

দুই

ইচ্ছা ছিল কেউ না জানে এভাবে এ-বাড়ি থেকে তারা সরে পড়বে। কিন্তু ইচ্ছা শোনে কে। ঠিক দুপুরবেলা 'সুদর্শন' এসে দর্শন দিলে দরজায়। এ-বাড়ির ধোপা। কোনদিনই সুদর্শন দুপুরে আসে না। আসে সন্ধ্যায়। ওপর ও নিচের আটটা ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে রঙ-বেরঙের শাড়ি, সায়া, ফ্রক, বেড-কভার, বাবুদের আধময়লা টাই, পেণ্টুলন, শার্ট, গেঞ্জি কুড়িয়ে রাত সাড়ে আটটায় সুদর্শন এসে উঁকি দিয়েছে রুচির ঘরের দরজায় মাইজীর কাপড়া যাবে কিনা ধোলাইয়ে জানতে। আজ আর সুদর্শনের হাতে ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি নেই। অসময়ে দরজায় এসে ওকে দাঁড়াতে

দেখে রুচির মুখ কালো হয়ে গেল। এ মাসে তার কিছুই যায়নি যদিও, গেল মাসে দু'খানা শাড়ি ধোয়ানো হয়েছিল সেই পয়সা এবং আগের কিছু পাওনা জমে আছে। ধোপার কথা একেবারে রুচির মনে ছিল না।

'আহা এমন অসময়ে তুই এলি!' শিবনাথ চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল। সুদর্শন দাঁত বার করে হাসল।

কাপড় নিতে আসেনি সে। এসেছে পাওনা উসুল করতে। 'বাবু কোথায় কুঠি ভাড়া করলেন?'

শিবনাথ সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রুচির দিকে তাকাল।

'কত পাওনা হয়েছে তোমার?' রুচি সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

'দো রুপেয়া ন' আনা।'

নিঃশব্দে কৌটো থেকে পয়সা তুলে সেটা ধোপার হাতে দিয়ে বলল, 'যাও' আজ আর কাপড় যাবে না।' কিন্তু দেখা গেল শিবনাথের চেহারা ততক্ষণে বদলে গেছে। বেশ প্রফুল্লভাব।

'কারোর পাওনা বাকি রেখে আমরা এখান থেকে যাব না, বুঝলি।' বেশ বড় গলা করে শিবনাথ সুদর্শনকে বলল, 'যাবি, বেলেঘাটা পর্যন্ত যেতে পারবি তোর গাধা চালিয়ে নিয়ে কাপড় আনতে? মাস তো তোকে দিয়েই সেখানে কাপড় ধোয়াব।'

'উঃ তুমি এখন কাপড় ধোয়াবার কথা ভাবছ।' রুচির রাগ বাড়ছিল।

লক্ষ্য করে শিবনাথ আর উচ্চবাচ্য করল না। হাতের কাজে মন দিলে।

বেগতিক দেখে সুদর্শন সরে পড়ল।

'ধোপা-নাপিত সবাইর কাছে ঠিকানাটা দিয়ে রাখ, তারপর সেখানে গিয়ে তোমার টিনের ঘর দেখে এসে এ-বাড়ির দিদিমণিদের ছোট-মা ও বড়-মা'দের কাছে সবিস্তারে সেগুলি বর্ণনা করুক।'

শিবনাথও সেটা পছন্দ করে না। বলল, 'ভুল হয়ে গেছে।'

রুচি বলল, 'নাও, এইবেলা শিশি-কৌটোগুলো ভাঙা সুটকেসটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা কর।'

শিবনাথ সুটকেসের ডালা তুলল।

শূন্য শিশি-বোতলগুলো বাক্সের মধ্যে ঢেলে বিছাতে বিছাতে রুচি বলল, 'বাবু-পাড়ার ধোপা-নাপিত বেলেঘাটার বস্তিতে যায় না তা-ও ঠিক, তবু তো কি দরকার ঠিকানা জানিয়ে।'

সব মোটামুটি ঠিকঠাক করে তারা যাত্রা করবে এমন সময় রণদামূর্তি হয়ে সামনের দরজায় এসে দাঁড়াল এ বাড়ির ঝি কামিনী; এইমাত্র খেয়ে উঠে পান চিবোচ্ছে। অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ। ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। দুই হাত কোমরে রেখে দ্রুত নিশ্বাস ফেলছে।

যেনএ-ঘরের লোক চলে যাচ্ছে কারো মুখে শুনে কামিনী ছুটে এসেছে ব্যস্ত হয়ে।

রুচির মুখ আবার অতর্কিতে কালো হয়ে গেল। কি ব্যাপার, না মঞ্জুর পরে মঞ্জুর যে ভাই কি বোনটি হবার কথা ছিল, তখন রুচি হাসপাতালে থাকতে দিনকতক

শিবনাথকে রেঁধে খাইয়েছিল কামিনী, সেই ক'টা টাকা, এক বছর আগেকার পাওনা।

হিসাব বহুদিন থেকে ঠিক হয়ে আছে। ও মোট সাত টাকা পাবে। দেয়নি, কেননা কামিনীও চায়নি তেমন জোর করে—রুচিদিদিমণির এদিকে অভাব যাচ্ছিল ব'লে। যেন এই পাওনাটুকুর মধ্যে একটু প্রীতির রং ছিল এবং এক মাস যেতে ওটা দু'জরেব মধ্যে প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল তখন।

এভাবে একটা বছর ঘুরেছে।

কিন্তু এখন সেটা কামিনীকে দিয়ে দিতে হবে। ওর দরকার।

'তুই কারোর কাছে বলিস না, আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, সামনে মাসে গিয়ে নিয়ে আসিস, ট্রাম বাসের পয়সা রাখ্।'

কামিনি রাজী হ'ল না।

রুচি মুশকিলে পড়ল।

কারণ হিসাব ক'রে রুচি দেখেছে এই টাকা থেকে সাত টাকা ঝি'কে দিয়ে দিলে পথের সব খরচ মিটিয়ে সেখানে তাদের যাওয়া হয় না।

'উঃ, সব ইতর-মাতালের জায়গা ওটা—সেখানে কি আমি মেয়েমানুষ যাব গুন্ডার ছোরা খেয়ে মরতে। বিশ বছরের ভেতর কামিনী মোক্তারামবাবু স্ট্রীট পার হয়ে কোথাও কারো বাড়িতে এক সন্ধ্যা পা ছোঁয়াতে গিয়েছে কি না জিজ্ঞেস কর এ বাড়ির বাবুদের, মা'দের। বেলেঘাটায় যাব মরতে সাত টাকার তাগিদ দিতে, ছোঃ!'

তাচ্ছিল্যভরে ঝি বলল, 'নাও, রেখে দিও ওটা তোমাদের সংসারে, আর মনে করো এ ক'টা দিন ঝি হয়ে ছিল না, তোমার সতীন হয়ে খেটে গিয়েছিল কামিনী।'

কামিনী রক্তিম ঠোঁট ফুলিয়ে হাসছিল।

রুচি কথা বলল না।

যেন পৌরুষে লাগল, উত্তেজিত হয়ে শিবনাথ স্ত্রীর দিকে তাকায়। 'এখান থেকেই তুমি ওর ওটা মিটিয়ে দাও, সাত টাকা আমরা রাস্তায় গিয়ে যা হোক করে ম্যানেজ করতে পারব।'

নানারকমের দেনা শোধ করে ও এ-মাসেরও পাঁচচিন খেয়ে রুচির ইস্কুলের মাইনের আর কুড়ি পঁচিশ টাকা হাতে অবশিষ্ট আছে। নিঃশব্দে সাতটি টাকা তুলে ও কামিনীর হাতে দিতে শিবনাথের চেহারার বিরক্তিভাবও চট্ করে কেটে গেল।

'বুঝলে কামিনী, আমরা কারোর টাকা মারি না। ভদ্রলোকের সন্তান! লেখা-পড়া শিখেছি।'

'তা কি আর জানি না গো দাদাবাবু।' ঠোঁট থেকে শ্লেষের হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় ঝি বলল, তুমি বি-এ পাশ, দিদিমণি বি-এ পাশ। এ-বাড়ির সবাই তো বলছে। তোমরা যদি আমার টাকা মারো তো মুখ্যুসুখ্যুরা করবে কি।'

'তাই বলছিলাম, তুমি যদি সেখানে না যেতে আমি নিজে এসে একদিন দিয়ে যেতাম। তোমার পাওনা টাকা, আমরা কি তা রাখতে পারি?' শিবনাথ প্রসন্ন গলায় হাসল।

কামিনি আরো নরম হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, 'গড়পার যেতে কি বেলগাছে,

টালায় কি দক্ষিণে ভবানীপুর কালীঘাটের দিকে ঘর-ভাড়া করলেও আমি একদিন সময় করে বেড়াতে যেতুম, গিয়ে দেখে আসতুম দিদিমণিকে মঞ্জুমামণিকে।' কিন্তু খালের ওপার বেলেঘাটা বড্ড বিশ্রী জায়গা। ধুলো আর রোদ, মোষের গাড়ি আর খেঁকি-কুকুর ছাড়া সেখানে রাস্তায় কিছু চোখে পড়ে না। এই মোক্তারামবাবু স্ট্রীটের অত নম্বর বাড়ির জনার্দন রায় একবার কি দরকারে সেখানে গিয়ে ফিরে এসে কামিনীকে সেদিন বলছিল। কামিনী তা সবিস্তারে শিবনাথের কাছে এখন বর্ণনা করল।

'না না, সাময়িকভাবে যাচ্ছি সেখানে, এদিকে সুবিধামত ঘর পেলে ফের আমরা চলে আসব।'

'তাই চলে এসো, সেখানে ছোটনোক ছাড়া ভদ্দরনোক থাকে না।' বলে কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর কেউ রইল না পথ রুখতে। সকলের পাওনা মিটিয়ে তবে ওরা মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে পারল।

'শেষ হুল ফুটিয়ে দিয়েছে কামিনী।' রুচি রাস্তায় শিবনাথকে কয়েকবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল। 'বাবুপাড়ার ঝি ক্যানেলের ওধারে পা ছোঁয়াবে না।'

শিবনাথ বলল, 'এই বাড়ির মানুষগুলোকে দেখেশুনেই ঝি-চাকরগুলো এমন আস্কারা পেয়েছে। বাইপ্রোডাক্ট। বেলেঘাটায় তোদের বাবুদের চেয়ে বড়বাবু নেই নাকি, তোদের চেও চার ডবল বেশী রোজগার করে এমন অনেক গুণী রূপসী ঝি আছে!'

'উঃ, ইচ্ছা করছিল আমার ওর চুলের ঝুঁটি ধরে মারি,—সতীন!' রুচি বলল।

'না না না।' ঠেলার পিছনে কতক্ষণ হাঁটবার পর এক সময় রিক্সায় রুচির পাশে এসে বসে শিবনাথ বলল, ও চীৎকার করে লোক জড়ো করে এমন মামলা দাঁড় করাতে পারতো যে, আমাদের দুজনকেই হয়ত কোর্টে যেতে হ'ত।'

আশ্চর্য, রাস্তায় যেমন খারাপ লাগছিল, একটু নিরিবিলিতে, ঘন ছায়ায় এসে সব কোলাহল ছাপিয়ে খালের জলের ছলছল শব্দটা খারাপ লাগল না; ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছিল। গাছের মাথায় পাখি ডাকছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে এক মুঠো তারা ঝকঝক করে উঠল হঠাৎ।

কামিনী, বকুল, বকুলের মুখরা মাসীর কথা আর মনে রইল না তাদের।

ঠিক বেলেঘাটা নয়। আর একটু দক্ষিণে।

লটবহর নিয়ে এক সময় খেয়া পার হতে হ'ল। একটু সময়ের জন্য নৌকায় ওঠা। মঞ্জু আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠল।

তারপর একটা গেঞ্জী কলের খটখট শব্দ, একটা করাত কলের ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজ অন্ধকার আর অফুরন্ত ঝিঁঝির ডাক শুনে এক থমথমে চীনা কারখানার পাশ কাটিয়ে ঘেঁটু ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আরও খানিকটা হাঁটা-পথ। রিক্সা যায় কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু রিক্সা কি মোটরগাড়ি চলতে পারে, এমন পথ এখন আর খোঁজাখুঁজি না করে মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তারা অগ্রসর হ'ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এই কুঠি।'

যারা মোট বইছিল, এই সময় তারা কলরব করে উঠল।

মাঠের রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। এক আলোকোজ্জ্বল সুন্দর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে ক্যারাভান দাঁড়ায়।

রুচি ঠিক বুঝতে পারল না।

'শিবনাথ বলল, আমাদের নতুন বাড়িঅলা এখানে থাকেন। এঁর কাছে দু'মাসের ভাড়া জমা রেখে রসিদ ও চাবি নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হবে।'

এখন রুচি বুঝতে পারল।

মালপত্রের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে রইল। শিবনাথ গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল।

চারিদিকে তাকিয়ে দূরে কাছে রুচি টিনের বেড়া টালির ছাউনি দেখতে পেল না। দেখল মাঠ, ফুলের বাগান, আর আম জাম ফলসা ও লিচু গাছের মত বড় বড় গাছ। গাছের তলা দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে পরিচ্ছন্ন লাল কাঁকরের পথ। অদূরে একটা গ্যারেজ দেখা গেল। আয়নার মত চকচক করছে সুন্দর একটা গাড়ি। ডাইনে বাঁয়ে পিছনে সামনে খুঁটির মাথায় এতগুলি ইলেট্রিক ডোম জ্বলছিল বলে অবশ্য রুচি বাড়ির প্রায় চারপাশের সবটা ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শিবনাথ বলল, 'চল।'

আবার অন্ধকার। বনবাদাড় ঘেঁসে সরু অসমান রাস্তা।

একটা বাঁশের সাঁকো পার হ'তে হ'ল।

ঝিঁঝির ডাক উত্তরোত্তর বাড়ল। জঙ্গল থেকে মশার ঝাঁক উড়ে এসে হাঁটা অবস্থায়ও চোখে-মুখে-পায়ে কামড় বসিয়ে দিতে লাগল। শিবনাথ বলল, 'আমাদের যখন মশারি আছে ভাবনা নেই।'

রুচি কথা বলল না। ভাবছিল দিনের বেলায়ও এখানে এমন মশায় কামড়ায় কিনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ত ঘর।' মুটেরা আবার হৈ-হৈ করে উঠল।

সরু অসমান রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা মুদিদোকান। একটা কেরোসিনের ডিবি জ্বলছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় মুদি ডাল-তেল-নুনের সঙ্গে বিস্কুট, বাতাসা, মুড়ি, কাগজ, পেন্সিল, সাবান, বার্লির টিন, দুধ, মাখনের কৌটো, চুলের ফিতা, তালপাতার পাখা, পান, সুপারী, চুন, এমন কি ছেলেদের ধারাপাত আর সহজ অঙ্কন অবধি দু'কপি করে রেখেছে। 'এই দোকানটা থাকাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে,' শিবনাথ বলল।

'ডিপার্টমেণ্ট্যাল স্টোর,' রুচি বলল, 'দুঃখের বিষয় কেরোসিনের ডিবি জ্বালাতে হচ্ছে। ইলেকট্রিক না থাকলে কত অসুবিধা।'

'না, ইলেকট্রিক এসে যাবে। এদিকটাতে যখন পরপর দুটো বস্তি বসে গেল, তখন নিজের স্বার্থেই রায়সাহেব জঙ্গল পর্যন্ত বিজলীবাতি টেনে আনবেন। আরো দু'চারখানা দোকান রাতারাতি না হলে এখানে চলবে কেন।'

রায়সাহেব তাদের নতুন বাড়িঅলা।

'তোমার রায়সাহেব বুঝি বিরাট বড়লোক ?' রুচি প্রশ্ন করল।

'বলে কি না বড়লোক!' শিবনাথ নাকের ভিতর শব্দ করে হাসল। 'একটা স'মিল আর একটা হোসিয়ারীর মালিক। দেখলে তো নিজের বাড়িখানা। গাড়ি ছাড়াও দু'টো ট্রাক আছে। রাতদিন গাছের গুঁড়ি আনছে বয়ে খাল থেকে, আর গাছের গুঁড়ি চিরে খাট-পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিলের তক্তা করে ট্রাক বোঝাই করে সেগুলো চালান দিচ্ছে কলকাতার বড় বড় মার্চেণ্টের কাছে। বিগ ফার্নিসার্স।

'এই সবটা জায়গাই কি ওর ?'

'নিশ্চয়ই এবং বস্তি দু'খানাও।' একটু থেমে শিবনাথ বলল, 'এ কি তোমার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়িঅলা। এক বাড়ির সাতখানা কোঠা নিয়ে জমিদারী। রায়সাহেবের ফিশারী আছে, রেসের ঘোড়া আছে দুটো শুনতে পেলাম।'

রুচি চুপ করে রইল।

তারা মুদি-দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মুটেরা মাথার বোঝা মাটিতে রেখে জিরোচ্ছে। কেননা রায়সাহেবের সরকার এসে তখনও পৌঁছয়নি। বস্তির কত নম্বর ঘর তাদের সরকার এসে আগে দেখিয়ে দিলে পরে দরজার তালা খুলে নতুন ভাড়াটেরা গৃহে প্রবেশ করবে। এই এখানকার নিয়ম।

ইতিমধ্যে ছোটোখাটো ভিড় জমেছে দোকানের সামনে। নতুন ভাড়াটে এসেছে পাড়ার লোক বুঝতে পারল। মুদি-দোকানের ঠিক পিছনে টালি-ছাওয়া টিনের বেড়ার সারি সারি ঘর দেখা যাচ্ছিল। কি ক'রে কোন গাছের মাথা ডিঙ্গিয়ে অনেক ডাল পাতার আড়াল ভেদ ক'রে রায় সাহেবের কুঠির ছাদে বসানো ইলেকট্রিক ডোমের এক আঁজলা আলো এসে ছিটকে পড়েছে টালির ছাদগুলোর ওপর টিনের বেড়ার গায়ে। কালো দাগ-ধরা টিন। তা বেড়া পুরোনো হলেও ছাদ নতুন টালি ঢেলে তৈরি হয়েছে বোঝা যায়।

শিবনাথ বলল, 'বলছিলাম তখন যাঁরা খুব বড়লোক তারা বাঁচবে আর খুব গরীব, মাঝামাঝি আছেন মানে তোমার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের হিমাংশুবাবু চারু-বাবুদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

রুচি কথা বলল না।

আর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল শিবনাথের। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। পকেটে বিড়ি ছিল। কিন্তু নতুন জায়গায় এতগুলি লোকের সামনে বিড়ি ধরাতে তার কেমন লাগছিল।

'নামে বস্তি। কিন্তু ভিতরের এ্যারেঞ্জমেণ্ট ভাল। আমি কাল তো এসে দেখে গেছি। এই ঘর-দুর্ভিক্ষের দিনে রায়সাহেব বাড়ি দু'খানা তৈরি করে দিয়ে আমাদের মত-লোকের উপকারই করেছেন বলতে পার। আঠারো টাকায় একখানা ঘর এদিনে খারাপ না।'

রুচি এখনো ঘর দেখেনি তাই চুপ করে রইল।

কে একজন এসে সামনে দাঁড়াল ব'লে শিবনাথ হঠাৎ মুখ বন্ধ করল।

রুচির বয়সী হবে। শিবনাথ অনুমান করল।

রুচির হাতে ঘড়ি নেই, ওর হাতে ঘড়ি। তাছাড়া বেশভূষায় মোটামুটি রকম মিল আছে।

মেয়েটি রুচির দিকে এগিয়ে এসে হেসে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ও আপনারা বুঝি নতুন ভাড়াটে!' রুচি কথা বলল না, শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'হ্যাঁ, আমিই কাল এসে বারো নম্বরের ঘর ভাড়া করে গেছি। আপনি কি ওই বাড়িতেই থাকেন? কাল কিন্তু দেখতে পাইনি।'

'দুপুর বেলায় বাড়ি থাকি না। এই সপ্তাহে থাকব না। ডে ডিউটি চলছে। ইনি আপনার স্ত্রী বুঝি, আর এই সন্তান?'

পলকে রুচি এবং পরে মঞ্জুকে দেখে শিবনাথ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

'আপনি কি—'

'হ্যাঁ, আমি উত্তরপাড়া হাসপাতালের নার্স। আমার নাম কমলা গাঙ্গুলী।'

'আমার নাম শিবনাথ দত্ত। ইনি শ্রীমতী সুরুচি দত্ত। কমলাক্ষী বালিকা বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড টিচার।'

ভাগ্যিস শিবনাথ কোথায় কাজ করে তৎক্ষণাৎ যে ও জিজ্ঞেস করল না। মেয়েটিকে রুচির ভাল লাগল। আলাপে ভদ্রতায় মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটের মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে হীন হয়, বরং রুচির শ্রদ্ধা হ'ল একজন স্কুল টিচারের চেয়ে বেশি ছাড়া তার মাইনেও কম না, তবু বস্তির সস্তা ঘরে আছেন। বেশি ঘরভাড়া দিয়ে আরামে থাকার ভাগ্য তার হ'ল না অর্থাৎ ঘর খুঁজে পাচ্ছেন না, নাকি আরামে বাস করার চেয়েও টাকার অন্য দরকার বেশি—কথাটা জিজ্ঞেস করতে রুচির সাহস হ'ল না।

'এসেছেন ভালই করেছেন,' কমলা বলল। 'ভাল মন্দ দুইই আছে, তবে টাকার অনুপাতে আজকালকার দিনের বিচারে ঘর নেহাত খারাপ না।'

হ্যাঁ, মোটামুটি রকম একখানা ঘরও শহরের ভিতর পাওয়া গেল না। যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে,' শিবনাথ বলল এবং আড়চোখে একবার রুচিকে দেখল। 'না পেয়ে অগত্যা এখানে আসতে হল।' কমলা চুপ করে ছিল। শিবনাথ আবার বলল, 'উঃ, উত্তরপাড়ায় তাহলে আপনাকে রোজ,—ট্রেনে যেতে হয় কি, না বাসে?'

'হ্যাঁ, বাস ট্রেন দু'টোই দিনে দু'তিন বার চাপতে হচ্ছে। কোন্ সকালে বেরিয়েছি, এই তো ফিরলাম।' ক্লান্তির ভঙ্গিতে কমলা ঈষৎ হেসে রুচির দিকে তাকাল। 'আপনারও আজ ধকল কম যাচ্ছে না। বাড়ি বদলানোর হ্যাঙ্গামা কি কম!'

সরকার এসে গেল। হাতে একটা চাবির ছড়া, একটা টর্চ। গায়ে ফতুয়া, পায়ে চটি, চোখে পুরু চশমা। নতুন ভাড়াটে দম্পতিকে সম্বোধন করার আগে মদন ঘোষ কমলার দিকে তাকাল। 'কখন ফিরলেন, মিস্ গাঙ্গুলী?'

মুখের বিড়িটা ফেলে দিল ঘোষ।

'এই মাত্র। কেন আমাকে খুঁজেছিলেন। নাকি?'

'আপনার ঘরের জানালার নতুন পাল্লা এসে গেছে। পারিজাতবাবু নিজে কারখানা থেকে কাঠ পছন্দ ক'রে তাঁর ছুতোর দিয়ে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। কাল তো আপনি জানালেন আমাকে কালই গিয়ে বাবুকে বললাম। দেখুন এর মধ্যে

হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, এক সকালের মধ্যেই যে জানালা তৈরি করিয়ে দেবেন আশা করিনি।'

'শত হোক বড়ঘরের ছেলে তো, আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক এসে এখানে তাঁর জমিতে বাসা বেঁধেছেন, আপনাদের সুখসুবিধা দেখবেন বৈকি।'

শিবনাথ রুচির কানে ফিসফিসিয়ে বলল, পারিজাতবাবু রায়সাহেবের বড় ছেলে। রায়সাহেব বুড়ো হয়েছেন। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে নড়েন না। ছেলেই কাঠের কারখানা গেঞ্জির ফ্যাক্টরী দেখছে, আর এই বস্তি।'

'তা পারিজাতবাবু আজ কোথায় গিয়েছিলেন? ওদিক দিয়ে আসছি তখন দেখলাম বৌ বাচ্চা দু'টো সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন। খুব সাজগোজ করা সবাই।' কমলা প্রশ্ন করল।

'সিনেমায় গিয়েছিলেন সব। কলকাতার লাইট হাউসে ভাল জাঙ্গল পিক্‌চার এসেছে। রাত্রে আজ কুঠিতে ফিরে খাওয়াদাওয়াও নেই, হোটেলে সারা হয়েছে বই দেখে ফেরার পথে।'

'যাকগে।' কমলা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। 'আপনার বাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন। এর বেশি, আমাদের আর কি করার আছে।' মদন ঘোষের চোখের দিকে তাকিয়ে কমলা অর্থব্যঞ্জক একটু হাসল। 'এত বড় লোকের আঠারো টাকা ঘরের ভাড়াটে আমরা।'

'ছি ছি!' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ঘোষ। 'তিনি আপনাদের সেই চোখেই দেখেন না। আপনি আছেন, রায় মশায়ের পরিবার আছেন, বিধুবাবু শেখরবাবুরা আছেন। সবাই তো ভাল ঘর না পেয়ে ঠেকে এখানে এসেছেন। তিনি তা খুব জানেন, সেই জন্যেই আমাকে দিনের মধ্যে দশবার ক'রে পাঠাচ্ছেন আট নম্বর বাড়ি দেখে আসতে কারোর কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি না।'

শিবনাথ রুচির কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়িঅলা নয়। ঢের বেশি শিক্ষিত, অনেক বেশী প্রগতিবান। এঁর সংস্রবে এসে আমরা খারাপ করিনি।'

সরকার বলল, 'আপনারা আর দাঁড়িয়ে কেন, চলুন। আপনাদের ঘর দেখিয়ে আমাকে এখুনি কলকাতায় যেতে হবে।'

'কেন?' কমলা প্রশ্ন করল।

মদন ঘোষ একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, 'বড় খোকাবাবুর পেটের ব্যথা হয়েছে। হোটেলে বোধ করি শুয়োরের মাংস ঠেসে খেয়েছিল। যেতে হবে আমাকে এই রাত ক'রে এখন সেই চৌরঙ্গির সাহেব পাড়ায় ওষুধের দোকানে।'

'কেন বেলেঘাটায় কোনো ডিসপেন্সারীতে কি পেটের অসুখের ওষুধ পাওয়া যায় না?' কমলা সরু গলায় বলল।

মদন ঘোষ ঠোট প্রসারিত করে অর্থব্যঞ্জক হাসি হাসল।

'পয়সা—দিদিমণি, পয়সার ওপর রায়সাহেব সবাইকে শুইয়ে রেখেছেন। শুধু ওষুধ! বৌদিমণির সেলাইয়ের ছুঁচ ভেঙ্গে গেলে নতুন ছুঁচ কিনতে আমাকে নিউ

মার্কেট ছুটতে হয়। অবশ্য রাহাখরচের বিলটাও তেমনি আমি ঠেসে করি। তাঁরা বিলাতী হোটেলে খান, আমিও ফেরার পথে খিদে পায় বলে শেয়ালদায় এসে বাস বদলানোর সময় রেস্টুরেন্টে মাংস পরোটা মারি। বাবু কিছু বলেন না বটে, মুখ টিপে হাসেন, হাসেন আর বিলে সই মেরে দেন। তারপর ঠাট্টা ক'রে বলেন, সরকার মশাই, আজ শনিবার, চলুন আরামবাগ থেকে ঘুরে আসিগে।'

'আরামবাগে কি ?' কমলা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল। মদন ঘোষ হেসে মাথা নাড়ল। 'সে আর বলব না, তা আর না-ই-বা শুনলেন। হে—হে।' সরকার এত জোরে হাসে যে, মুদি দোকানের সামনে দাঁড়ানো লোক দুটি হকচকিয়ে ওঠে।

'ও বুঝেছি, না না, সে আমি জানতে চাইনে, তা আমার জিজ্ঞাস্য নয়।' কমলা হঠাৎ লজ্জিত হয়েছে এমন ভান করাতে মদন ঘোষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে-পড়া হাসিটাকে ছোট করে ফেলতে চেষ্টা করে। যেন গুটিয়ে সবটাকেই দুই ঠোঁটের মধ্যে রাখবার চেষ্টা ক'রে পরে বলে, 'না না তেমন কিছু নয়, খুব যে একটা প্রাইভেট কিছু, বাস্তবিকই রায়সাহেবের ছেলেটি ভাল, পারিজাতবাবু পাকা জেণ্টেলম্যান। বলছিলাম, আমাদের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, আমি তাঁর কর্মচারী। আবার দরকার হলে একসঙ্গে ফুর্তি করতেও ডাকেন।'

কমলা বলল, 'আপনি ভাগ্যবান। আমরাও পরের চাকর। প্রভু-ভৃত্যের দূরত্ব অনেক।' যেন কথার অনুমোদন আদায়ের জন্য কমলা শিবনাথের দিকে তাকায়। শিবনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'একশ বার। কালচার্ড মনিব এমনি হয়।' বলে বেশ আত্মীয়তার ভঙ্গিতে মদন ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি হ্যাপি সরকার মশায়, এই বিষয়ে আমারও ওপিনিয়ন নিন।'

মদন ঘোষ প্রসন্ন দৃষ্টিতে নতুন ভাড়াটে দম্পতির দিকে তাকাল।

'আহা, আপনাদের দেরী করে দিচ্ছি! চলুন। আপনারই নাম তো শিবনাথ দত্ত ? বারো নম্বর ঘর। চলুন; আপনার মোটমাট ফ্যামিলির লোক সব এসে গেছে ?'

'হ্যাঁ,এই তো।' শিবনাথ ঘাড় নেড়ে রুচি, মঞ্জু ও মন্টে তিনটিকে দেখিয়ে দিলো।

'চলুন মিস গাঙ্গুলী আপনি তো ঘরে যাচ্ছেন।'

'চলুন।'

কমলা রুচির হাত ধরে অগ্রসর হ'ল।

মুদির দোকানে সামনেটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

দোকানের সামনের দাঁড়ানো একজন আর একজনকে বলল, 'আর এক বাবু এসেছেন টিনের ঘরে মশার কামড় খেতে। হা-হা।'

'কি করবে রে দাদা। দিনকাল বহুৎ খারাপ হয়ে গেছে। শুধু কি রিফুউজি আতর পাউডার এসেন্স মাখা ক'গণ্ডা মাইয়া-ছাইল্যা দেখবি তুই আয়। রাস্তায় লাইন দিয়েছে ঘড়া কলসি নিয়ে গাড়ির জল ধরতে।'

'কেন,' একজন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'রায়সাহেবের বাড়িতে তো কল বসেছে। অথচ ভাড়াটেদের ভাড়া বাড়েনি শুনলাম। এইজন্য পারিজাতবাবুর ওপর সবাই খুশী।'

'দিয়েছেন,' দ্বিতীয় লোক বলল, 'বারোটা ফ্যামিলির জন্য একটা পাইপ। সেই

পাইপ বিগড়াতে কতক্ষণ।'

'তাও বটে।' প্রথম ব্যক্তি অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়ল। 'বিগড়াতে কতক্ষণ।'

তিন

এই ধরনের বাড়িতে প্রথমটায় একটু চাপা ফিসফিসানি থাকে।

ফিসফিসানিগুলো এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়ায়। মানে পুরোনোদের মধ্যে একজন আর একজনকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'কোথা থেকে এলো ? কারা ? স্বামী-স্ত্রী মনে হচ্ছে। সঙ্গে একটি মেয়ে আছে। ভদ্রলোকের চাকরি নেই, না মাইনে কমেছে, নাকি শহরের বাড়িঅলার সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে উৎখাত হয়ে বস্তিতে এসেছে, সুবিধামতন ঘর পাচ্ছে না। ভাল বাসা পেলে কালই আবার ফুড়ুৎ—'

'তা বাপু এসেছে দেখা যাবে, যাক না দু'টো দিন। মোটে তো মোটঘাট নামালো।'

'বৌটা ভদ্রলোকের চেয়ে দেখতে সুন্দর। দ্যাখ্ তাকিয়ে। মেয়েটা মার চেহারা পায়নি।'

'না না, ভদ্রলোকও দেখতে বেশ ভাল। স্বাস্থ্যটিও ভাল।'

আট নম্বরের হিরণ বলল, 'এত রাত ক'রে নতুন ঘরে এল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে ?'

'কেন, বৌ-মানুষ, যদি তোলা উনুন সঙ্গে থাকে দু'টো ভাতে ভাত চাপিয়ে দেবে। কয়লা না থাকে আমাদের কারো কাছ থেকে চেয়ে নিক না। ফিরিয়ে দিলেই হ'ল।'

দশ নম্বরের কিরণের মন্তব্য শুনে হিরণ ঠোঁট টিপে হাসে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'মনে হয় না। দেখছিস না, মহিলা কেমন মুখখানা হাঁড়ির মতন ক'রে আছেন। হয়তো রাস্তায় ঝগড়া হয়েছে। জানত না সোয়ামী শেষটায় বস্তিতে এনে ঠেলে তুলবে। এখন দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম। এত রাতে রান্না করবে না ছাই!'

'যা বলেছিস।' কমলাও ঠোট টিপে হাসে, তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'বরং পুরুষটাকে একটু খুশিবাসি মনে হয়। হয়তো উদ্যোগ আয়োজন ক'রে কত্তাই রান্না চাপাবেন।'

'হুঁ', হিরণ সায় দেয়। 'দেখে মনে হয় তিনি ঘুঁটে দেওয়া স্বামীদের দলের।'

অর্থাৎ এই বাড়িতে এগারোটি পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবার এসে বাসা বাঁধলো। এদের কারো স্ত্রীর চাকরিতে সংসার চলে! টেলিফোনে, স্কুলে, হাস-পাতালে, ডেয়ারী ফার্মে। বেকার স্বামীরা, সংখ্যায় খুব বেশি নয় যদিও, দু'তিনটি, দুপুর বেলা ঘরে থেকে ছেলেমেয়ে দেখে, ঘরদরজা পরিষ্কার রাখে, ফাঁক পেলে কল থেকে ঘড়া ভরে জল নিয়ে আসে। স্ত্রীকে খেটেখুটে এসে যা'তে না এসব কাজে হাত দিতে হয়। এ-বাড়িতে যারা থাকে তাদের চাকর রাখবার ক্ষমতা থাকে না। আগের এক ভাড়াটের স্বামী নাকি দুপুর বেলায় বসে ঘুঁটে দিত অবশ্য বাড়ির ভিতরের উঠানে না, একটা পাঁচিলের গায়ে। তারপর থেকে এখানকার বেকার

স্বামীদের 'ঘ‍ুঁটে দেওয়া বর' নাম পড়েছে।

কমলা চাপা গলায় বলল, 'যাকগে লোকের ভাগ্য নিয়ে এসব সস্তা রসিকতায় কাজ নাই। তবু তো ওদের ঝি বৌ চাকরি করে খাওয়ায়, বাটনা বেটে, জল তুলেও মনে সান্ত্বনা থাকে। তোর আর আমার স্বামী আজ বেকার হ'লে কাল উনুন ধরানো বাটনা বাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বুঝতে পারিস ?'

বুঝতে পেরে হিরণ চুপ ক'রে থাকে। বিমল হালদারের বৌ আর অমল চাকলাদারের বৌ। চাকলাদার ও হালদার কোথায় দূরে ফ্যাক্টরির কাজে যখন বেরিয়ে যায়, দুজন, হিরণ ও কিরণ ভাবে তাদের কি দশা হবে। যেটুকুন লেখাপড়া জানে শহরে কি শহরতলীতে তাদের কেউ চাকরি দেবে না।

তাছাড়া, এ-বাড়ির আর পাঁচটি মেয়ের মতন হিরণ কিরণও তেমন চালাকচতুর, এমন নয়। হয়তো এতকাল পাড়াগাঁয়ে ছিল বলে দু'জনের স্বামী, যদি চাকরি করা তাদের দরকারও হয়, কিছুতেই বৌদের বাইরে যেতে দেবে না ধরে রেখেছিল।

দু'জনের স্বামীই কড়া। অমল ও বিমল চেষ্টা-চরিত্র ক'রে চাকরি জুটিয়েছে, প'চাত্তর টাকা মাইনেয় শহরে পাকা কোঠা পাবে কোথায়, পরিবার এনে তুলেছে পারিজাতবাবুর বস্তিতে। অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন, অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তারা দূর থেকে শুনেছিল।

দু' নম্বর ও ছ' নম্বর ঘরের ফিসফিসানি হয় প্রবীণা প্রবীণায়।

হীরুর মা ও প্রমথর দিদিমায়।

হীরুর মা আটা মাখছিল।

প্রমথর দিদিমা এসে হাত ঘুরিয়ে, অর্থাৎ কথার চেয়ে ইঙ্গিতের ওপর বেশি জোর দিয়ে বলল, 'তামা কাসা কিস্‌সু নেই। এলুমিনিয়মের ডেগচী আর কলাই করা লোহার থালা গ্লাস। একেবারে হাতকাটা জগন্নাথ হয়ে এসেছে বোন।'

'তা আমি একনজর দেখেই বুঝে নিয়েছি।' যেন আটা ডলতে গিয়ে মাথায় বেশি ঝাঁকুনি লাগছে সেই ভান ক'রে হীরুর মা প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। 'কত্তার মুখের আগুন তো দেখছি নিবছে না। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে সিগারেট ধরাচ্ছেন, বিবির পায়ে জুতো। আসলে ভিতরে মালমশলা নেই, বাইরের ফুটুনি দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে। জুতো সিগারেট ক'দিন। দাঁড়াও না, পারিজাতের গোয়ালে মাথা গলিয়েছ, খোলস খসতে দেরি হবে না।'

ছ' নম্বর আর বারো নম্বর ঘর দুটো ঠিক মুখোমুখি, কেননা বাড়িটা গোল। হীরুর মা'র রক থেকে শিবনাথের ঘরের ভিতর পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে।

আরো বেশি দেখা যাওয়ার কারণ, এইমাত্র ওরা ঘরে ঢুকেছে, পর্দা খাটানো হয়নি। জিনিসপত্র ছত্রখান ক'রে রাখা। এবং পর্দা কোনোদিনই খাটানো হবে না একথা সবাই জানে। এ-বাড়িতে কোনো ঘরে পর্দা নেই।

'আস্তে, দিদি আস্তে!' প্রমথর দিদিমা ফিস্‌ফিসিয়ে হীরুর মাকে সাবধান ক'রে দিলো।

হীরুর মা তা গ্রাহ্য করল না। বরং আটা ডলার ভান ক'রে মাথাটা আরো জোরে

নেড়ে নেড়ে প্রমথর দিদিমাকে বলল, 'জিনিসপত্র আবার রাতেও রকে ফেলে রেখো না। অই তো শুনলাম কাল ওদিকের কোন্ এক বস্তিতে নাকি আবার চুরি হয়ে গেছে। সেখানেও সব ভদ্দরলোক, ঠিক এ বাড়ির মতন। তা নিত্যি নতুন লোক আসছে, যাচ্ছে এসব বাড়িতে, এমন তো হবেই। তুমি কা'র কতটা জানো বলো।'

প্রমথর দিদিমা হিস্ হিস্ ক'রে বলল, 'আস্তে, বোন আস্তে।'

'তা এ-বাড়িতে কম ঘটনা হয়েছে নাকি।' তিন আর চার নম্বর পাশাপাশি দু'টো ঘরের মাঝের ছোট্ট চৌকোণ রকটায় ওপর ব'সে মৃদুমন্দ ভাষায় ও সম্ভব হ'লে হুঁকোর গুড়গুড় শব্দ দিয়ে কথাগুলোকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা ক'রে বিধুবাবু শেখরবাবুকে বললেন, 'সেই যে, এক ইয়ং ম্যান্ এলো আর এলো তার আপ-টু ডেট স্ত্রী। না, আমি বলছি সঙ্গতিটা বড় কথা নয়, অভাবটাই সব সময় খাটছে না, যার জন্যে শহরের বাইরে পারিজাতের সস্তামতন এই কামরাগুলো তে-রাত্তির খালিও থাকছে না।'

'যা বলেছ।' হুঁকোর গুড়গুড় শব্দটা প্রবলতর ক'রে তার আড়ালে থেকে শেখরবাবু মন্তব্য করলেন, 'ছি ছি, শেষটায় জানা গেল ইয়ে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে সেই কথা, সাত নম্বর কামরা ভাড়া ক'রে ছিল দু'টিতে।'

'না, আমার বক্তব্য, ক্রাইসিস ফ্রাস্ট্রেশনের যোগবিয়োগ কষে সমাজ-বিজ্ঞানীরা আধুনিক সমাজের যে চিত্রই আঁকুন, আমরা তো চোখের ওপর দেখছি আমাদের আধুনিক সমাজটা কি দাঁড়িয়েছে, কেমন এর চেহারা হচ্ছে দিন দিন,—রেসিডেন্সিয়্যাল হাউসের অভাব, দুর্ভিক্ষ, বেকারসমস্যা তো আছেই, এদিকে এই ডামাডোলের বাজারে ভাল মন্দ, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মিশে জগাখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই লোয়ার মিডল ক্লাস সোসাইটি। কার ভিতরে কি আছে, কেমন প্রকৃতি, বাইরে থেকে বোঝার আর উপায় নেই।'

'যা বলেছ।' হোমিওপ্যাথ শেখর বারো নম্বর ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। 'সেই যে, এক নম্বরে গেল বার খুলনা না রংপুরের একটা ফ্যামিলি এসেছিল,—ছি ছি, কী কেলেঙ্কারী ক'রে গেল শেষ পর্যন্ত—হ্যাঁ, অভাব আছেই, কিন্তু স্বভাবটাকে বাদ দিলে চলবে কেন। বাপ তো মোটামুটি রকম একটা চাকরি করত, অবশ্য পুষ্যি অনেক ছিল, বড় ফ্যামিলি, কিন্তু বড় ছেলেটা কী জঘন্য কাজ ক'রে গেল!'

রংপুরের পরিবারের দুষ্কৃতকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা মনে করে স্কুলমাস্টার বিধু মুখাবয়ব অতর্কিতে গম্ভীর ক'রে ফেলল। 'হবেই, এ বাড়িতে আড়াল ব'লে কিছু নেই। উঠোনে দাঁড়ালে সবগুলো ঘরের ভিতর দেখা যায়। এতগুলো পুরুষ স্ত্রী ছেলেমেয়ে। একটা পাতকুয়া, দেড়খানা পায়খানা। হামেশা এর ওর গায়ে ধাক্কা লাগছে।'

'আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি, সুবিধে পেলে এ-বাড়ি ছেড়ে দেব। এখানে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না।'

হোমিওপ্যাথ শেখরবাবুর গলার স্বর হুঁকোর শব্দকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে বিধু মাস্টার হিস্ হিস্ ক'রে উঠল। 'আস্তে, আস্তে, শুনবে যে!'

'একি আর গেরস্তবাড়ি বলা চলে, আমি বলব হোটেল। হোটেলবাড়ি বারোখানা কামরা। হ্যাঁ, এখানে সবাই মফস্বলের হোক, কোলকাতার হোক, যথেষ্ট শহুরে হাওয়া গায়ে মেখে বিপদে প'ড়ে এসে টিনের ঘরে বাসা বেঁধেছে। বা-বা! দেখছো তো, পাউডার সাবান এসেন্স-এর অভাব যাচ্ছে কখনো! কি সিনেমা দেখার, রেস্টুরেন্টে যাওয়ার! নামে বস্তি। কিন্তু কোনো কোনো ঘরে প্রগতির ঠেলা বড় শহরকে হার মানিয়ে দেয়।

'থাক থাক।' ঠান্ডা বিধুমাস্টার উত্তেজিত হোমিওপ্যাথকে শান্ত করে। 'তোমার প্র্যাক্‌টিস্ ভাল, পয়সা আমদানী হচ্ছে, ভাল জায়গায় চলে যাও। বিপদ তো আমার,—আমাদের। এতগুলি মুখ। এই আয়।'

এরা দু'জনেই বারো নম্বর ঘর দু'দিনও খালি প'ড়ে রইল না, আবার নতুন ভাড়াটে এসে গেল দেখে উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

জলের অভাব। জায়গার অভাব। চলাফেরার অসুবিধাই বা কি কম। একটি মানুষ চলে গেলে মনে হয়, অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হ'ল। একটি লোক বাড়লে মনে হয়, পরমায়ু আরো কয়েক ঘণ্টা কমল।

শুধু কি জল জায়গার অভাব!

মনের অপ্রশস্ততা হিংসা কলহ নিন্দা পরচর্চা কুৎসা কদর্য স্বভাব এ-বাড়ির বাতাস ভারী ক'রে রেখেছে। এখানকার মানুষ মানুষই নয়। একজন আর একজনেরটা চোখে দেখছে বলেই এ অবস্থা, পর্দা নেই বলেই এত বিপদ!

শিবনাথ ও রুচির আবির্ভাবের পর সন্ধ্যা থেকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে দুই বন্ধু এই সব আলোচনা করছিল। আর বারো নম্বর ঘরের জানালা দিয়ে দেখছিল শিবনাথ ও রুচি কি করছে।

রুচি সব ছেড়েছে, কিন্তু সেকেন্ডহ্যান্ড স্টোভটা আজও আঁকড়ে ধরে আছে। সেটাই এখন খুব বেশি কাজে লাগল।

শিবনাথ একটু ঝাড়পোঁছ ক'রে বিছানা করে মঞ্জুকে শুইয়ে দিল। বেচারার সেই কখন থেকে ঘুম পেয়েছে। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ব'লে রুচির কম দুঃখ হচ্ছিল না। মাঝখানে এসে রুচির কাজে সাহায্য ক'রে দিয়ে গেল কমলা এবং আরো কে দু' তিনটি মেয়ে। শিবনাথ বাইরে চলে গেল সিগারেট কিনতে। তার সিগারেট ফুরিয়েছিল অনেকক্ষণ।

রুচি রান্না করছিল। আর জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল অনেকগুলো মেয়েমুখ। অর্থাৎ তারা জানতে চাইছে, কোথা থেকে এল এই পরিবার, কি বৃত্তান্ত।

কেননা সকলের আগে এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল রুচি বি-এ পাস। এ বাড়ির আর কোনো মেয়ের এত শিক্ষা নেই। নবাগত বস্তিবাসিনী সম্পর্কে তাদের কৌতূহলটা তাই বেশি।

রুচি বলল, 'আপনারা ঘরের ভিতর আসুন। উনি বেরিয়ে গেছেন।'

তা ক'জনই বা এসে ভিতরে দাঁড়াবে। এইটুকুন ঘর। কমলা একজন একজন ক'রে সকলকে ভিতরে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলে। এর নাম সুনীতি, ডাক্তারবাবুর

মেয়ে, ভাল গান গাইতে পারে ; এর নাম মমতা, বিধুবাবুর মেয়ে, কবিতা লিখতে পারে ; এর নাম বেবি, নাচতে পারে।

'তোমার পুরো নাম কি বেবি বলো।' সুন্দর চেহারার মেয়েটির চিবুক ধরে আদর ক'রে কমলা বলল।

'আমার নাম বেবি গুপ্ত।'

'কোন স্কুলে পড় ?' রুচি প্রশ্ন করল।

'এখন পড়ি না, নাম কাটা গেছে। লরেটোতে পড়তুম।'

'কেন নাম কাটা গেল ?'

'বাবার চাকরি নেই।'

'কোথায় থাকতে, কোলকাতায় ?'

'পার্ক স্ট্রীট।'

'তোমার বাবা কি করতেন, কোথায় চাকরি করতেন ?'

'একটা বড় মার্চেণ্ট ফার্মে। বাবার চাকরি গেছে ব'লেই আমরা বস্তিতে এসে ঢুকেছি।' বলে মেয়েটি মুখ কালো করল।

'যাকগে।' কমলা বেবিকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে লম্বা বেণী-পরা আর একটি মেয়েকে ভিতরে টেনে এনে দাঁড় করালো। 'নাম অদিতি। আট নম্বর ঘরের। এর দাদা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে।—এর বাবা বাস-কণ্ডাক্টর, নাম মুকুল,—এটি পাঁচি, ওর বাবা মোড়ে ছোট্ট একটা সেলুন দিয়েছে, নাম,—তোমার নাম কি বলো ?'

'টেঁপী।'

'তোমার ?'

'ময়না।'

কমলা বলল, 'এর বাবা ফেরিওয়ালা। আগে বড়বাজারে ভাল ফলের কারবার ছিল, ফেল ক'রে এখানে এসে সাবান-টাবান বিক্রি করছে।'

আর আছেন একজন শিক্ষক এবং পাশের ঘরে থাকেন শেখর ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ। এই অঞ্চলে এসে তার হাতযশ হয়েছে। আগে ছিলেন পাকিস্তানে।

রুচি রান্না শেষ করে অন্য কাজে হাত দিতে তারা সরে গেল।

কমলাও বিদায় নিল।

'মশাই ! আমরাও রিফুইজী ছাড়া আর কিছু নয়।'

মুদির দোকানের সামনে বিছানো বেঞ্চিটা একরকম ফাঁকা ছিল ব'লে বিশ্রাম করতে শিবনাথ বসেছে। ওপাশে বসা এক ভদ্রলোক দেশলাইয়ের কাঠি জেলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, 'মশাই, কোথায় থাকতেন এর আগে ?'

'কোলকাতায়, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে।' ভয়ে ভয়ে বলল শিবনাথ। বলে চুপ ক'রে গেল।

'আবার চুপ ক'রে রইলেন কেন', ভদ্রলোক যেন বিরক্ত হয়ে বিড়িটা ঠোঁটের কাছে নিয়েও টানেন না। 'নানা স্ট্রীটের বাবুরা এই টিনের ঘরে এসে মাথা গুঁজেছে। লজ্জার কিছুই নেই, বলুন, কি সার্ভিসে ছিলেন ?'

শিবনাথ ঘাড় নেড়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানের সামনে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। অন্য খদ্দেররা চলে গেছে। দোকানে একটা বাক্সের ওপর ব'সে একটি লোক, শিবনাথ অনুমান করল, এরই দোকান। পুরু চশমা চোখে কেরোসিনের বাতির নিচে মাথা গুঁজে হিসাব লিখছে।

'কি বলো, বনমালী! এখানে এসে যদি পরিচয় মানে পূর্বের নামধাম চাকরি বলতে লজ্জা করে তো পরে বাকি কাজগুলোর লজ্জা ঢাকতে অনেক কাঁথা-কম্বল জড়াবার দরকার পড়বে যে, হে-হে ভুল বলেছি?'

বনমালী তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে এবং পুনঃ পুনঃ সেটি নেড়ে জানাল, 'না ভুল নয়। কে. গুপ্ত কখনো ভুল বলে না।'

'কে ইনি?' শিবনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এবার মুদির দিকে তাকায়।

'আপনি মুক্তরামবাবু স্ট্রীটে থাকতেন, উনি ছিলেন পার্ক স্ট্রীটে সাহেবের সঙ্গে ফ্লাট ভাড়া করে। দাস দাসী ছিল, আর্দালি ছিল, আর উঠতে বসতে গাড়ি।' বনমালীও একটা বিড়ি ধরায়। 'তা চাকরি গেলে ক'টি বাঙালীর ছেলে খাড়া থাকে,— কই আমার তো চোখে পড়ে না, আমি দেখিনি। এখন বুঝুন সেই কে. গুপ্তকে আজ আঠারো টাকার ঘর ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে মশাই; লজ্জার কিছুই নেই। সব সমান এখানে।'

শিবনাথ, যেন এইবার লজ্জা ভাঙল, এমনভাবে বেঞ্চির ওপাশে বসা ভদ্রলোকের দিকে আবার তাকাল।

'হাজার টাকার ওপর তার মাইনে ছিল।' বনমালী আরো পরিচয় দিলে কে. গুপ্তর। শিবনাথের প্রতিবেশী, প্রতিবেশী বা কেন, এক বাড়ির লোক। হয়তো তার পাশের ঘরেই এসে আজ শিবনাথ উঠেছে।

'বিলিতী মার্চেন্ট অফিস যখন ঠেলা দেয় আকাশে ওঠে। যখন পড়ে তখন কি ভাঙ্গে, কি যায় তার হিসাব থাকে না। কত মূল্যবান রত্ন রাস্তায় ড্রেনে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি যাচ্ছে। হ্যাঁ—এই গুপ্তের সই না হলে অত বড় অফিসটার পাঁচশ কর্মচারীর মাসের মাইনে আটকে থাকত। আজ তার সইয়ের এক পয়সা মূল্য নেই।' বনমালী থামল।

'থামলে কেন, বলো, বলে যাও বনমালী।' কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে না তাকিয়ে আবার একটা বিড়ি ধরায়। 'একটা সই দিয়ে পাঠানো হয়েছিল সন্ধ্যেবেলা। আধ পয়সার চা ধার দেয়নি বনমালী পোদ্দার কে. গুপ্তর মেয়েকে বিশ্বাস ক'রে। অথচ এমনি দু'জনে বন্ধুত্ব কম কি।'

কে. গুপ্তর কথা শুনে বনমালী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও কতক্ষণ চুপ থেকে নিজের হিসাব দেখতে লাগল।

শিবনাথ দু'জনকেই মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।

একটু পর বনমালী মুখ তুলে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কি করব রে দাদা, আধপয়সার এই ধরো, ফোঁড়নও ধার দিতে আরম্ভ করেছি কি কাল এই যে এখন নিরিবিলিতে বসে তোমাদের সঙ্গে গল্প করছি, আরাম পাচ্ছি, তাও পাব না।

দিনের বেলায় মাছির যন্ত্রণায় বসতে পারি না—রাত্রে ধারে ফোঁড়ন নেবার খদ্দেরের ঠেলায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ধারে বিক্রি বন্ধ করার কি একটা কারণ গুপ্ত! না হলে তুমি কত বড় লোক ছিলে সে কি আমি জানি না। তাই তো ভদ্রলোককে বলছিলাম। কি লোক কি হয়ে গেল।'

বনমালী অত্যধিক গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলায় কে. গুপ্ত আর কিছু বলল না। শিবনাথ, যথেষ্ট আলো না থাকা সত্ত্বেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নতুন প্রতিবেশীকে দেখছিল। 'যাকগে', একটু পর কে. গুপ্তর থমথমে গলার শব্দ শোনা গেল। পাশে শিবনাথ বসে ভ্রূক্ষেপ নেই। 'বাজে জিনিস নিয়ে তর্ক ক'রে আমি মাথা গরম করতে চাই না। পরশু ড্রাই ডে। যাহোক ক'রে একটা বোতল যোগাড় করার ব্যবস্থা করো। তারপর তুমি আধ পয়সার চা কি এক পয়সার নুন কাউকে ধার দেও না দেও বয়ে গেল।'

শিবনাথ বনমালীর দিকে তাকাতে বনমালী বোঝায়, 'না, লজ্জা করবার লুকোবার কিছু নেই, মশাই। এখানে সবাই সবারটা জানছে দেখছে, না-জানানো না দেখানো-টাই খারাপ। কিন্তু জানছি বলেই আর দশটা লোককে এ-পাড়ার যে চোখে দেখছি কে. গুপ্তকে সেই চোখে দেখি না, দেখতে বুকে বাজে। এখানে কি কোনো শালা জানে যে, এই এমন সময় হলে এই লোক বন্ধুবান্ধব নিয়ে চৌরঙ্গির হোটেল গরম ক'রে রাখত। দু'হাতে টাকা রোজগার করেছে, দু'হাতে খরচ করেছে, সে আর কথা কি। আজ পা ভেঙ্গে হাতি খানায় পড়েছে।'

'বলো থামলে কেন, বনমালী।'

'তার রোজ বিকেলের জলখাবার ছিল পাঁচ ছ' টাকা।' বনমালী শিবনাথকে শোনায়। 'আজ জলযোগ সেরেছে মুদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে দু'পয়সার তেলেভাজায়।'

'থামিস কেন বনমালী, বলে শুনিয়ে দে আমার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বন্ধুকে।' বলে কে. গুপ্ত হঠাৎ এমনভাবে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে গুজ্ গুজ্ করে হেসে উঠল যে শিবনাথ না হেসে পারল না।

'তাই প্রশ্ন করছিলাম মশাই, বড় যে সাধ ক'রে পারিজাতের চিড়িয়াখানায় এসে সপরিবারে প্রবেশ করেছেন, গত বছর ক'টা কলেরা কেস হয়েছিল এ-বাড়িতে তার খবর রাখেন? এ বাড়িতে যক্ষ্মারুগী আছে, আরো কতো কি খারাপ রোগ আছে। মানুষ? চোর বদমাশ গুণ্ডা পকেটমার লোফার ইনফর্মার পাগল—'

'থাক থাক।' বনমালী একটা হাত তুলে গুপ্তকে চুপ করতে বলল, এ-সব বলে আর কি হবে,—তা কি আর ইনি জানেন না। এতকাল মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে ছিমছাম নিরিবিলি কামরায় বৌ বাচ্চা নিয়ে সুখের রাজ্যে ছিলেন। এখানে বারোটা পরিবার। পাঁচটা লোক ভাল, সাতটা লোক ইতর বদমায়েশ থাকবেই।'

বনমালীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একজন এসে দাঁড়াল। গায়ে গেঞ্জি। হাতে হুঁকো।

'নমস্কার, ডাক্তারবাবু।'

বনমালীর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ মাথা নেড়ে আড় চোখে বেঞ্চিতে বসা কে. গুপ্ত ও

শিবনাথকে একবার দেখে আগন্তুক শেষটায় শিবনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। 'আপনি এই এলেন বুঝি !'

'হ্যাঁ।'

'ভাল, ভাল, মানুষ মানুষের সঙ্গ ভালবাসে, সমাজবদ্ধ জীব, এ আর অন্যায় কথা কি।' বলে শেখর ডাক্তার চোখ বুজে হুঁকোয় দুটো টান দিয়ে পরে গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করে, হাসল কি কাশল বোঝা গেল না, শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল 'আপনার মশারি ফশারি আছে তো ?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'আপনারা সবাই টিকা ফিকা নিয়েছেন তো ?'

'হ্যাঁ, আসবার আগে তিনজনেই আমরা টিকা নিয়ে এসেছি।' শিবনাথ ঢোক গিলল।

'সাবধান।' হুঁকোয় আবার দুটো টান দিয়ে ডাক্তার বলল, 'এ-বাড়ির কিছুই বিশ্বাস নেই। এখানে যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছি এটাই জগদম্বার কৃপা।'

কে. গুপ্ত নীরব।

বরং মনে হ'ল ডাক্তারের কথায় কান না দিয়ে আকাশের তারা দেখছিল। অদূরে একটা গাছের ডালে বাদুড়ের পাখার ঝট্‌পট্‌ শব্দ শোনা গেল। শেখর ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়াল বিধু মাস্টার। 'আপনি নতুন এলেন ?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'আর কোথাও ভাল ঘরটর পেলেন না বুঝি ?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

মাস্টার এবার ডাক্তারের দিকে তাকায়। 'অথচ দ্যাখো ডাক্তার, নিত্য ভাড়াটে জুটছে। একবেলা একটা ঘর তুমি খালি পড়ে থাকতে দেখছ না, কিন্তু কই, বাড়িতে পাতকুয়োটার সংস্কার করার কথাটা পারিজাত কানেই তুলছে না, সরকার শালাকে মাস শেষ হতে দিব্যি রসিদ বই দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভাড়াটা আদায় করতে। বলি আমরা কি মানুষ না, এতগুলি লোক ! একটা কল। এইরকম কাণ্ড কেউ দেখেছে কখনো ! ইলেকট্রিক আনবে আনবে করে আজ দু'বছর ঘোরাচ্ছে।'

'তোমরা বলতে জান না তাই আদায় করতে পার না। বলার মত ক'রে বললে পারিজাতের বাবার সাধ্য আছে বাড়তি পাইপ না বসিয়ে, কি আলো না আনিয়ে দেয় বাড়িতে। মাস মাস এতগুলি ভাড়ার টাকা পাচ্ছে। তা-ও আগাম। শেয়াল চরত রায়সাহেবের এই জমিতে শুনেছি ওয়ারের পরেও। এখানে ইমপ্রুভমেণ্ট ! পঞ্চাশ বছর বাকি। তা কিছু টিনটালি খরচ করে কোনো রকমে একটা খোঁয়াড় তৈরি করে দিয়ে পতিত জমি থেকে বেশ মোটা আয় হচ্ছে। করবে বৈকি একটার জায়গায় দুটো কল, আরো দুটো করে পায়খানা তৈরি করে দেবে, দিতে বাধ্য যদি আজ সব একজোট হয়ে ভাড়াটা বন্ধ করে দাও।'

ডাক্তারের এই কথায় মাস্টার একটু ক্ষুন্ন হল। 'যা হবার নয়, তা তুমি বলছ কি করে। বারো ঘরের মধ্যে তুমি আমার দুটি ঘর দেখাও একরকম ভাবে হাঁটে, কথা বলে, খায়, কি একরকম কাজ করে। তুমি ডাইনে চললে আমি বাঁয়ে চলবই। তুমি

যদি বল, জলের জন্য রেণ্ট বন্ধ কর, আর একজন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, না, তার আগে চাই লাইট। এটা, বস্তি হলেও ভদ্রলোকের বস্তি। এখানে লেখাপড়া করার রেওয়াজ আছে। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পড়ছে, ভাড়া বন্ধ করতে হয় আগে আলোর জন্য করব।'

বিধু মাস্টার চুপ করে রইল।

'এখানে সবাই ভাবছে আমার কথা সকলের আগে থাকবে এবং সবার ওপরে। সবাই মাতব্বর।'

কথাগুলো না আবার কাউকে প্রকাশ্যভাবে ডাক্তার বলতে শুরু করে, যার অর্থ কলহসৃষ্টি, এই বাড়ির কয়েক সহস্র কলহ বিধু মাস্টার দেখে এসেছে। তাই একটু ভীরু গলায় বলল, 'থাক গে। তুমি আমি চেঁচালে কি হবে। চল ওদিকটায় ঘুরে আসি। বাড়ি ঠাণ্ডা হতে রাত বারোটা।' বলতে বলতে হাত ধরাধরি ক'রে দু'জনে দোকানের সামনে থেকে সরে পড়ল।

চার

'এ দু'টো হল আসল বজ্জাত, বুঝলি বনমালি। আমি সব দেখি, দেখে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি কি হবে ব'লে। খামোকা কথা সৃষ্টি হবে কতকগুলো। কে ভাড়া দিচ্ছে কে দিচ্ছে না, কার দেবার ক্ষমতা কবে বন্ধ হবে—ওরা ভয়ানক টের পায়, ওরা এবং ওদের পরিবারে দু'টো। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত বোঝে কার আর্থিক ক্ষমতা কতটা। সারাদিন এই ক'রে ঘুরে বেড়ায়। ব্যস, তারপর সোজা চলে যায় পারিজাতের বাংলোয়। গিয়ে বলে আসে, অমুকের একটা রেণ্ট আটকে গেলে নোটিশ দিয়ে তুলে দেবেন। দু'বার চান্স নিতে গেলে ঠকতে হবে; কেননা, ঘরের মানুষগুলো ছাড়া এমন জিনিস নেই যে, সব বিক্রি করলেও দু'মাসের ভাড়া উঠবে, কাজেই।'

জায়গাটা অন্ধকার থাকলেও শিবনাথ, কেদার গুপ্তর চোখ দু'টো, চোখের ভিতর পর্যন্ত বেশ দেখতে পাচ্ছিল। পরনে ছেঁড়া মতন পায়জামা। গায়ে কমদামী একটি গরম কোট। অনেকদিন চুল কাটছে না, দাড়ি বড় হয়েছে গালের। 'আর বাকি যে ক'ঘর আছে, সেগুলোকে ছাগলও বলতে পারিস, মেদও বলা চলে। বৌগুলি কিন্তু দেখতে খুবসুরত। দু'টোই কাজে বেরিয়ে যায় সেই কাক-ভোরে, ঘরে ফেরে দুই দণ্ড রাত করে। একটা বুঝি স্টেট্ বাস-এর কণ্ডাক্টর। ছুটির দিন হলেই সেজে-গুজে বৌ নিয়ে কলকাতায় চলল মরদ সিনেমায়, রেস্টুরেণ্টে খেতে। সব করতে রাজী আছে ওরা, কিন্তু ছুটির দিন বৌকে নিয়ে বেড়ানো বন্ধ রেখে জল বাতি নর্দমা পায়খানা মশামাছি থুথু নিয়ে মিটিং করবে না। এই দায় বুড়োদের ওরা জানে, তাদের স্টপ করতে বললে স্টপ করবে, চলতে বললে চলবে। এর বেশি কিছু করবে না। কাজেই—

কেদার গুপ্ত খসখসে গলায় হাসল। শিবনাথ হেসে গুপ্তর কথা সমর্থন করল।

'কাজেই রাতদিন জল কল পায়খানা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে এই বুড়ো শালিক

দু'টো। এরাই এখানকার, মানে পারিজাতের বাবার চিড়িয়াখানার, পুরোনো জীব। হাজার অসুবিধা ভোগ করলেও বস্তি ছাড়বে না ; কেননা, অন্য জায়গায় গিয়ে এমন বিনি পয়সায় জল কল পায়খানা নিয়ে পলিটিক্স করতে পারবে না। একটু বয়স হলে মানুষ পলিটিক্স করতে চায়, ডাক্তার আর মাস্টার হ'ল তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। বস্তি এখন ওদের রাজনীতির এক নম্বর ফিল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হিসাবের খাতা থেকে বনমালী মাথা তুলল।

'কিন্তু হিসাব এখনো বাকি রয়ে গেল গুপ্ত। মাস্টার, ডাক্তার, বাস-কণ্ডাক্টর আর ফ্যাক্টরির দুই ছোকরাকে নিয়ে হ'ল পাঁচ ঘর। এক ঘরে তুমি আছ, এক ঘরে এসেছেন আজ এই ভদ্রলোক।' চিবুক নেড়ে ইঙ্গিতে শিবনাথকে দেখিয়ে বনমালী বলল, 'আর? পারিজাতকে গিয়ে সাহস করে দু'কথা শোনাতে পারে এমন আর আছে কেউ ?'

'পাঁচু ভাদুড়ী আছে এক ঘরে।'

'সেই সেলুনওলা ?'

কে. গুপ্ত মাথা নাড়ল।

'মানুষের ঘাড় চেঁছে ব্যাটা দু পয়সা করছে শুনলাম। অথচ বস্তিটা ছাড়ছে না তো,' বনমালী বলল।

'শালা এক নম্বরের খুনি, পয়সা করবে না কেন ?' কে. গুপ্ত বলল, 'আমি আর ওর দোকানে এখন চুল কাটতে যাই না।'

'কেন, ধারের খদ্দের নেয় না বুঝি পাঁচু ?'

'সেকথা হচ্ছে না। শালার ক্ষুরের ভয়ানক ধার। চুলের সঙ্গে ঘাড়ের মাংস তুলে ফেলে। নগদের কারবারেরও।'

'বলে কি ?' বনমালী অবাক হয়ে শোনে।

'চামার, এক নম্বরের চামার।' কে. গুপ্ত লম্বা চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমার চুল কি আর কাটা হবে না, হবে, কিন্তু সেদিন ন্যায্য পয়সা মিটিয়ে দেবার পরও শালা আমাকে ইনসাল্ট করল। কি না,—দোয়ানিটা খারাপ।'

'কি রকম ! তোমার সঙ্গে বুঝি আর বেশি পয়সা ছিল না ?' বনমালী প্রশ্ন করল, 'পাল্টে দিতে পারলে না ?'

কে. গুপ্ত মাথা নাড়ল।

একটু ভেবে বনমালী বলল, 'তারপর থেকে বুঝি আর চুল কাটছ না, দাড়ি কামাচ্ছ না। এদিকে আর একটাও সেলুন নেই বটে। হবে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।'

'নাঃ।' গুপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সেলুন ছাড়া ভদ্রলোক চুল কাটতে পারে !'

বনমালীও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আহা, কত বড় সেলুন ছিল, কত আড়ম্বর ক'রে চুল কাটতে, দাড়ি কামাতে পার্ক স্ট্রীটের সেলুন ডি'লুক্সে। সে সব কি আমি জানি না।'

কে. গুপ্ত বলল, 'থাক, অতীত ঘেঁটে লাভ নেই। কথা হচ্ছে পারিজাতকে গিয়ে দু'কথা বলা নিয়ে। উঁহু, ওই শালা ভয়ানক স্বার্থপর। কারুর জন্যে কিছু করবে না। নিজের সুখসুবিধা ছাড়া।'

'কেন বাড়িতে জল-কলের সুবিধা হলে সেটা ওরও তো পাওনা হ'ল। পাঁচু ভাদুড়ী বলে কি ?'

'জল-কলে ভাদুড়ীর দরকার নেই। সারাদিন থাকে সেলুনে। রাতে পড়ে থাকে বেশ্যাবাড়ি। পাঁচু ভাদুড়ীর এ-বাড়ির সুখসুবিধা ভোগের সময় কতটুকুন।'

'জুটেছে সব ভাল।' বনমালী শিবনাথের দিকে তাকাল। পারিজাতের চিঁড়িয়া-খানার যত সব চিঁড়িয়া। কিছু মনে করবেন না মশাই, বন্ধুলোক বলে গুপ্তকে ঠাট্টা করছি।' দাঁত বার করে মুদি হাসল।

'না আমার মনে করার কি আছে।' বেশ সতর্কভাবে কথাটা বলে শিবনাথ চুপ করল।

'থাক গে,' বনমালী বলল, 'আর,—কে আছে ভাড়াটে ?'

'বলাই। বড়বাজারে ওর ফলের দোকান ছিল। এখন কাপড়কাচা সাবান ফেরি করছে বেলেঘাটার রাস্তায়। ও নাকি কাল সারাদিন একটাও সাবান বিক্রি করতে পারেনি, আমার কাছে ব'সে তখন কান্নাকাটি করছিল। আর চালাতে পারছে না। এদিকে ঘরে মেয়ে বড় হয়ে আসছে। ডুবছে লোকটা। কাজেই হেন ভাড়াটের আর সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ কি। আমার মতই চুপচাপ পড়ে আছে কোণার দিকের একটা ঘর নিয়ে।'

'তাও বটে।' বনমালী ঘাড় নাড়ল। 'এরকম অবস্থার ভাড়াটের একটু চুপচাপ থাকাই ভাল।' কে. গুপ্ত আকাশের দিকে মুখ করে কি ভাবল।

'সে জন্যেই আমি এসে তোর দোকানের সামনে সারাদিন এই বোঁচটার উপর বসে থাকি বনমালী, যাতে না নিজের এই ক্রাইসিসের মধ্যে আবার ভাড়াটেদের স্ট্রাইক ফাইকের মামলায় জড়িয়ে গিয়ে একটা নতুন বিপদ ডেকে আনি।'

'তা কি আর আমি বুঝি না—সে ত চোখেই দেখেছি। যাকগে,—বলাইকে নিয়ে দশঘর ভাড়াটে হ'ল। বাকি দু ঘরে কে আছে ?'

যেন বনমালীর এবারে প্রশ্নে কে. গুপ্ত বেশি বিরক্ত হল।

'বাবা তুমি আছ সদরটি আগলে ব'সে। বাড়িতে কটা মাছি ঢুকছে, কোন্ মাছিটা কার পাতে বসছে, কে কি দিয়ে ভাত খেয়েছে, সব তুমি জান। নয় নম্বরের প্রীতি বীথি আর এক নম্বর ঘরের ভাড়াটে কমলা কি তোমার দোকানে জিনিসপত্র কিনতে আসে না ? এত বড়লোক হয়ে গেছে ওরা, ওদের সবকিছু এখন শহরের দোকান থেকে আসছে বুঝি !'

'অনেকটা তাই', বনমালী গম্ভীর হয়ে বলল, 'কমলা মাঝে মাঝে আসে।'

'করিস তো টেলিফোনে চাকরি দুই বোন। ঘরে পুষ্যি কত !'

'কমলার কোন পুষ্যি নেই।' বনমালী বলল, 'মাইরি নার্স আছে বেশ। কোন ডাক্তার ছোঁড়া নাকি বিয়ে করতে চাইছে। বিয়ে করবে না। বস্তির উন্নতি করবে। তাই এমন ভাল চাকরি করা সত্ত্বেও তোমাদের সঙ্গে সস্তাঘরের ভাড়াটে হয়ে আছে। হা-হা।'

'তোকে বলেছে নাকি ?' কে. গুপ্ত, নাকে হাসল। 'কি মশাই, আপনাকে বলেছে নাকি, এই মাত্র তো আপনার সঙ্গে আলাপ-সালাপ হ'ল দেখলাম। কার কথা হচ্ছে'

বুঝেছেন তো ?'

শিবনাথ সলজ্জ হেসে ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ, কমলা,—নার্স বুঝি ?'

'হোক, আমি বলব, শী ইজ নো বেটার দ্যান্ এ বেবুশ্যে'—

'এই গুপ্ত।' বনমালী ধমক দিল। 'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেন তোমার এত সব বাজে বকার প্রয়োজন। এক বাড়িতে, ধরতে গেলে এক চালার নিচেই আছ সবাই। বেশ তো, তিনি তো এসেছেনই এখানে, দু'দিন বাস করবেন। কে কি মালুম করার মতন চোখ আছে। নাও ওঠ, এইবেলা দোকানের দরজা বন্ধ করি। কি মশাই আপনি আসতে না আসতে গুপ্তর সাথী হয়ে পড়লেন নাকি ?'

শিবনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বনমালী মৃদু হাসল।

'না, এই।' শিবনাথ হঠাৎ ব্যস্ততার ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। 'বাড়ির ভিতরে খুব চেঁচামেচি, অনেক লোক, এখানে আপনার দোকানের সামনেটা এখন বেশ ফাঁকা। নিরিবিলিতে একটু বসেছিলাম।'

'না না না।' বনমালী বুঝল শিবনাথ অন্যরকম বুঝেছে। 'কেন বসবেন না, আপনারা দশজন ভদ্রলোক এখন এখানে বাস করতে আরম্ভ করেছেন দেখে সাহস করে আমিও দোকান করেছি। আসবেন, বসবেন বৈকি। বলছিলুম গুপ্তকে বড্ড বাজে বকে।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

কে. গুপ্ত বোঝা গেল বিড়ি খুঁজতে পকেট হাঁটকাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে বনমালী বলল, 'সেটার কি হ'ল, আর একটা কাজের যে খবর পেয়েছিলে। কোট-পেণ্টুলন প'রে সেদিন বেরোলে দেখলাম।'

বিড়ি পাওয়া গেল না। ব্যর্থ হয়ে হাত গুটোল কে. গুপ্ত। 'হয়নি। হয়নি বলেই তো তোমার পায়াভাঙা বেঞ্চিটার ওপর এসে আজো বসি, আর একটা বাংলা বোতলের জন্য তোমায় বাবা ডাকি।'

কথা শেষ ক'রে গুপ্ত চুপ করে রইল।

সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে বনমালী শিবনাথের দিকে তাকাল। 'গুপ্তর মতন এমন মন্দ বরাতের লোক আর দুটি দেখলাম না মশাই। কম সে কম, লাখ জায়গা থেকে চিঠি পেয়ে দেখা করতে ছুটে গেছে। হচ্ছে না, কোনোটায় সুবিধা করতে পারছে না। তাই বলছিলাম ভয়ানক সুখের চাকরি ছিল, আজ এই অবস্থা মাথা খারাপ হবে বৈকি। সেজন্যেই এত বাজে বকে।' কথা শেষ করে মুদি আড়চোখে গুপ্তকে দেখল।

কে. গুপ্তর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বেঞ্চি ছেড়ে ওঠারও লক্ষণ নেই। 'তুই আমায় সতী শেখাচ্ছিস, তুই আমায় মেয়েমানুষ চেনাচ্ছিস। বুঝলি বনমালী, আই হ্যাড্ গট্ এনাফ্। আমার অফিসে আঠারোটা মেয়ে ঢুকিয়েছিলাম। আমি তাদের চাকরি দিতাম এবং তা খেতেও পারতাম।'

'সে কি আর আমি জানি না, তুমি কতবড় একজন বড়বাবু ছিলে।' যেন একটু ভেবে বনমালী হেসে পরে প্রশ্ন করল, 'তা ডুবো জাহাজের কাপ্তান না হয় হাত-পা ভেঙে আমার দোকানের সামনে চিৎপটাং হয়ে পড়েছে, মেয়েগুলো এখন করছে কি ?' বনমালী মিটমিটি হাসল।

'সাঁতার দিয়েছে। ওরা ভাল সাঁতার কাটতে জানে বলে একটা অফিস ডুবতে থাকলে বেলাবেলি আর একটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দেয় ওদের আশ্রয়। তাই বলে কি আমাকে দেবে?' কে. গুপ্ত গলার একটা শব্দ করল। 'তাই বলি, যা জানিস না, যে লাইনে তুই নেই সেই লাইনের খবর তুই আমায় শেখাসনি। চুপ করে থাকবি।'

একবার থেমে গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকায়। 'দুনিয়া জুড়ে বেকার সমস্যা; কিন্তু যুবতী উপোস থাকছে, মুদি দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে গাছের পাতা গুনছে, এমন দেশের নাম কি আপনি খবর কাগজে দেখেন মশাই? তাছাড়া আমরা যখন হালে স্বাধীন হয়েছি, প্রথম প্রথম এদিকটায় ভদ্রতাটা একটু বেশী করবই। কি বলেন?'

ইঙ্গিতটা বনমালী বুঝল কি না শিবনাথ বুঝতে পারল না, নিজে বুঝে মৃদু হাসল।

কে. গুপ্ত বলল, "আই ক্যান ওয়েল ইমাজিন হাউ শী ম্যানেজেস। বুঝেছেন মশাই, ওর হাতে ঘড়ি, মাখন না মেখে পাঁউরুটি খায় না। একটু ফল দুধ ঘরে বসে টুপটাপ চুকচুক ক'রে বেশ চালাচ্ছে। আপনি একদিন উঁকি দিলে দেখতে পাবেন। আমি? ওর মতন মেয়েমানুষের ঘরে,—ও যদি আজ মরে গেছেও শুনি, উঁকি দেব না। উঁকি দেবার দরকার হয় না। বস্তির লোকের সব কিছু চাপা থাকে না। কে কি খাচ্ছে তা লুকোবার জো নেই। খারাপ জিনিস তো বেরোবেই, ভালটাও আপনি খেতে পারবেন না। প্রকাশ পাবে। মাছি? শালা বিধু মাস্টারের বারোটা, ভুবনের ঘরের এগারোটা, ফ্যাক্টরির দু' ঘরের আড়াইটে ক'রে ধরুন আর ওদিকটায় কারা থাকে? এইটুকুন বাড়িতে সবে হাঁটতে শিখেছে, কথা বলতে শিখেছে ত্রিশটা বাচ্চা মশাই। পিলপিল ক'রে রাতদিন এঘর-ওঘর করছে, আর এর রান্নার খবর এসে ওকে দিচ্ছে, ওর কি কি বাজার এল তাকে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তার লিষ্টি দিচ্ছে।'

'ভালই তো' বনমালী বলল, 'গরম মশলা দিয়ে রান্নার রেওয়াজ উঠে গেছে, এখন গন্ধে তরকারী বুঝবার উপায় নেই, কাচ্চাবাচ্চার কলরবে সেটা বোঝা গেল মন্দ কি?'

কে. গুপ্ত বনমালীর কথায় কান না দিয়ে শিবনাথের দিকে তাকাল। 'সুতরাং খবর আমাদের কানে আসছে। ফল মাখন দুধ ঘি ওবলটিন খেয়ে খেয়ে স্বাস্থ্যটা কেমন তাগড়াই করেছে লক্ষ্য করেছেন তো?'

শিবনাথ একটু আগে দেখা কমলাকে মনে করবার চেষ্টা করল।

বনমালী আর বাক্যব্যয় না ক'রে দোকানের আলো নিবিয়ে দরজায় তালা দিল।

'যা বললাম ভুলে যেও না', কে. গুপ্ত বলল।

বনমালী কথা বলল না।

বনমালী চলে যেতে কে. গুপ্ত গলা নামিয়ে শিবনাথকে বলল, 'ভাবছেন মুদির সঙ্গে কেন আমার এত বন্ধুত্ব? ভয়ানক কাজ দেয় ওকে দিয়ে মশাই। কাল বললে বিশ্বাস করবেন কি, ওর দোকান থেকে তেল নুন ডাল মশলা, বৌ বুদ্ধি ক'রে আমার পুরোনো ফ্লাস্কটা মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়ে ছটাক দেড়ছটাক ক'রে সবই তো নিয়ে গেল।'

শিবনাথ কে. গুপ্তের চোখের দিকে তাকায়। 'ঘরের জিনিস বাঁধা রাখে বুঝি বনমালী?'

'বাঁধা রাখে মানে। তাহ'লে ওর দোকানে যে পাড়ার লোকের ঘরের জিনিসপত্তরে এ্যাদ্দিনে পাহাড় জমত মশাই,—এত সব রাখতো বা সে কোথায়? কাজেই বার্টার সিস্টেম। ছাড়িয়ে আনা ফিরিয়ে পাওয়ার প্রশ্ন নেই। মন্দ নয়। বনমালী সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকের কাছে সব বিক্রি করে দেয়।'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

'আমার শালা সব গেছে,' কে. গুপ্ত বলল, 'ভাতের হাঁড়ি আর জলের ঘড়াটা ছাড়া। আর পরনের একখানা দু'খানা জামা-কাপড়। তা সেদিন ওয়াইফ ভেবে ভেবে শেষটায় যা হোক বার করতে পারল। মানে বেবির একজোড়া সায়া। বাক্সে তোলা ছিল। তা বেবি এখনো শায়া শাড়ি পরতেই আরম্ভ করেনি। জন্মদিনে কোন্ মাসী না পিসী ওকে উপহার দিয়েছিল। যাকগে। বনমালী শায়া রেখে দেশলাই সাবান এক বোতল কেরোসিন গিন্নির সুঁচসুতো আরো কি কি হাবিজাবী মিলিয়ে সুন্দর এতগুলো মনিহারী মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।' কে. গুপ্ত হাহা করে হাসল। 'আচ্ছা ব্যবসাদার। আর আপনি চাইলে না প্যাবেন কি ওর কাছে। বনমালী সব দিতে পারে আপনাকে, পাঁচফোড়ন থেকে আরম্ভ করে কন্ট্রোলের চাউল, ড্রাই ডে-এর মদ যত বোতল খুশি। ওর এইটুকুন দোকানই দোকান নয়। এটা কারবারের মুখ। শরীরটা এত বড় আর এত বেশি ছড়িয়ে আছে যে চট ক'রে বোঝা যায় না, মালুমই হয় না সাদা চোখে।'

শিবনাথ ঢোক গিলল। কি ভাবছিল সে।

'লোক খারাপ না।' কে. গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'পয়সার লোভ বেশি। তা পয়সার লোভে, বনমালীর বলতে গেলে 'ক' অক্ষর গো-মাংস, আমাদের শিক্ষিত মহাজনরা এদিনে কম মারাত্মক রকমের ব্যবসা করছে কি, কি বলেন?'

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'কি মশাই আপনি আমার কথায় বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন না।' যেন টের পেয়ে কে. গুপ্ত হঠাৎ চুপ করল।

'শুনছি বই কি।' শিবনাথ বলল, 'ক'টা বাজে?'

'ও আপনার বুঝি হাতঘড়ি নেই? আমারটাও শালা গেছে অনেকদিন। তা দশটা হবে। যান আপনি ঘরে যান, নতুন জায়গায় এসেছেন, আপনার স্ত্রী আবার ভাবছেন হয়তো আমায় বস্তিতে ঢুকিয়ে লোকটা পালাল কোথায়।' শিবনাথ এবার নাকে হাসবার চেষ্টা করল।

'আপনি বুঝি এখানে বসে থাকবেন?'

'আমি শালা চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে পড়ে আছি। বনমালীর দরজায় ধন্না দিয়ে আছি, কেননা কসাই হলেও ও আমার শুকনো দিনে গলাটা ভেজায়। প্রকৃত বন্ধু-লোক। তা ছাড়া, বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। ওই মশাই ডাক্তারনীর দরুন। হ্যাঁ, এই যে এখন এসেছিলেন রোগা টিঙটিঙে শেখর ডাক্তার হোমিওপ্যাথ। সবচেয়ে বেশী

ঝগড়াটে ডাক্তারনী আর সব চেয়ে চড়া ওর গলার আওয়াজ। উঃ মাথা ধরে যায় প্রভাতকণার চিৎকারে। তাই তো পালিয়ে এখানে চলে আসি মশাই, আপনার হয়তো শুনতে ভাল লাগবে, জানি না। আমার আয়ু অর্ধেক কমে গেছে ওর চিৎকার শুনেই।'

শিবনাথ বলল, 'আমি চলি।'

'না আপনি যান। আপনার ওয়াইফ ছেলেমানুষ।'

শিবনাথ বস্তির দিকে এগোতে এগোতে অনুমান করল কে. গুপ্তর বয়স কত, তাঁর স্ত্রী দেখতে কেমন, কত বয়স হবে। 'আপনার ওয়াইফ ছেলেমানুষ।' গুপ্তর কথাটা শিবনাথ মনে মনে আওড়ায়।

পাঁচ

তা নতুন নতুন ঘটনা তো ঘটবেই। বারোটা পরিবার। একটা দু'টো তিনটে ক'রে প্রায় সকলের সংসারেই ঘটনা ঘটছে রোজ, দিবারাত্র, চব্বিশ ঘণ্টা। কিছুই অঘটন না ঘটিয়ে সুখে পেটভরে ভাত খাবে, হাওয়া খাবে, গল্প করবে, সেই সোনার যুগ পৃথিবীতে কোনদিনই ছিল না। এখন এসব অঘটনকে লোকে বাড়াবাড়ি ক'রে দেখছে খামকা।

পরম নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা, শান্তি ও অনন্ত সুখ স্বর্গেই সম্ভব মাটির পৃথিবীতে নেই, থাকবেও না।

আর কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কত বড় ঘটনা হয়।

এক ঘরের ঘটনা তিন ঘরকে জড়িয়ে ধরে। যে রাত্রে রুচি এ বাড়িতে এল, সেই রাত্রেই ঘটল একটা।

শেখর ডাক্তারের ঘরে।

কি, না রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শেখর ডাক্তারের স্ত্রী প্রভাতকণা বড় মেয়ের মনের ইচ্ছাটা জানতে পারল। কি, না টেলিফোনে চাকরি করবার মতলব করেছে সুনীতি।

শুনেই প্রভাতকণা সাঁই সাঁই করে উঠল।

আর ডাক্তারনীর চীৎকার একবার আরম্ভ হলে থামতে চায় না। একটু আগে বলছিল কে. গুপ্ত। এ বাড়ির ছোট-বড় সবাই জানে।

সুনীতি গত বছর ম্যাট্রিক পাস করেছে। বিয়ের আলাপ এসে গেছে এর মধ্যে দু'তিনটা। এই জন্যও শেখর ডাক্তার একটু ব্যস্ত। একটু তাড়াতাড়ি চাইছিলেন জায়গাটা পালটাতে, যদি শহরের দিকে, টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ না হোক, অন্তত গড়পার বাগবাজারের দিকেও চলে যেতে পারতেন তো এসোসিয়েসনটা ভাল পেতেন, হয়তো পসারও জমত ভাল। রাজসাহী থেকে এসে রাজেন ঘোষাল, কি এক সূত্রে শেখর তরফদারের মামাতো ভাই, প্রায় দেড় বছরের প্রাক্টিসেই গাড়ি-বাড়ি করে ফেলল। বসেছিল দর্জিপাড়ায়। ঘিঞ্জি হলেও কত ভাল সে-সব জায়গা। কত বড় ঘরের মানুষ থাকে। এ কি আর এই বস্তি! ধুলো, মশা, মাছি, নর্দমার পচা গন্ধ শোঁকা মানুষ। এদের অসুখ হলেও পয়সা খরচ করতে চায় না। তা ছাড়া পয়সা নেই দলের

বেশিরভাগ। পয়সা এবং হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে, অন্তত ভাল জায়গা গিয়ে না বসা পর্যন্ত ভাল ছেলে পাওয়া যাবে না। বেলেঘাটায় ভাল ছেলে নেই, শেখর এবং প্রভাতকণা দুজনেই মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল।

সুনীতির বিয়ে। ও যাতে সুখে থাকে, এই ভাবনার মধ্যে হঠাৎ ওর টেলিফোনে ঢুকবার ইচ্ছাটা প্রভাতকণার কানে বেখাপ্পা ঠেকল। 'কেন, ওর কি রোজগারে ভাঁটা পড়েছে যে, তুই চাকরি করতে যাচ্ছিস। কে পরামর্শ দিয়েছে তোকে, কার কথায় নাচছিস আগে বল।' প্রভাতকণা প্রবলবেগে ধমক দিয়ে উঠল মেয়েকে। প্রভাতকণা অনেকটা আঁচ করে নিয়েছে। 'কে বলেছে বলো!' চক্ষু রক্তবর্ণ করল ডাক্তারের স্ত্রী। চোখের জল মুছে ভয়কাতুরে গলায় সুনীতি বলল, 'প্রীতি।'

ন'নম্বর ঘরের ভুবনবাবুর মেয়ে। প্রীতি বড়, বীথি ছোট, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির সবাই বলে ভুবনের মাছির ঝাঁক। ভুবন চৌধুরী আজ তিন বছর শয্যাশায়ী। বৌবাজারে কত সুন্দর বাড়িতে ছিল।

খাস রাধাবাজারে এক পারসীর ঘড়ির দোকানে চাকরি করত। ভাল ঘড়ি সারাতে পারে ভুবন। গ্যাসট্রিক আলসারে শেষ করে দিয়ে গেছে তার সব। চাকরি গেল, জমানো টাকা ছিল কিছু, তা-ও গেল। বীথির মা'র গয়নাগাটি বিক্রি হ'ল। এদিকে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল দেখতে দেখতে অনেকগুলো। কলকাতার বাড়িভাড়া চালাতে না পেরে চলে এসেছে এখানে। সস্তা ঘরে। তা উপোসে মরতে হ'ত সবাইকে, যদি বড় মেয়ে প্রীতি কোনরকমে ম্যাট্রিক পাস দিয়ে তাড়াতাড়ি টেলিফোনে ঢুকে না পড়ত।

'তাই বল, যত সব ছোটলোকের আড্ডা এই বাড়িতে, হুঁ, আমার মেয়ের মাথা খাবার জন্য তোমরা তৈয়ার। বলি, অ প্রীতির মা, প্রীতির মা ঘরে আছেন?' প্রভাতকণা লাফিয়ে উঠানে নেমে ন' নম্বর ঘরের দরজার কাছে ছুটে যায়।

কেরোসিনের ডিবি জেলে ঘরের মেঝেয় ব'সে প্রীতির মা একটা কাঁথা বিছিয়ে সবে সেলাই করতে বসেছে। বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এ সময়টায় তার একটু অবসর। প্রীতির ফিরতে এখনো দেরি। প্রীতির বাবা মেঝের একপাশে শুয়ে নিজের হাতেই বাতের তেল মালিশ করছে।

প্রভাতকণার চিৎকার শুনে প্রীতির মা উঠে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

'কি রকম আক্কেল শুনি আপনার মেয়ের। বলি আপনার কি শাসন নেই, ডাকচাপ নেই?'

'কেন, কি করেছে আমার মেয়ে?' প্রীতির মা প্রভাতকণার মূর্তি দেখে অবাক।

'কি কইরেছে, কি না কইরেছে!' প্রভাতকণা বিকৃতমুখে গর্জন ক'রে উঠল। 'আর একদিন শুনেছি প্রীতি ফোসলানি দিচ্ছে আমার মেয়েকে আপিসে ঢোকাতে, আপনি শাসন না করেন, আমি প্রীতির মাথার চুল টেনে ছিঁড়ব বলে রাখছি। যত সব বেলেল্লেপনা, যত সব বদমাশি।'

'আপনি আস্তে কথা বলুন, আপনি ভাল করে কথা বলুন।' প্রীতির মা চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। 'আমার মেয়ে কবে বলেছে, আপনার মেয়েকে আপিসে ঢুকতে,—আপনার অনুমতি ছাড়া মেয়ে আপিসে ঢুকবেই বা কেন।'

'চাইছে, প্রীতি চাইছে সুনীতিকে দলে টানতে। আমার জানতে বাকি নাই।' চোখ পাকিয়ে দু'হাত ঘুরিয়ে প্রভাতকণা নাটকীয় ভঙ্গিতে আরম্ভ করল: 'আপিসের কীর্তি শুনতে আমার বাকি আছে কিছু! দ্যাশে থাকতে বেবাক হুনছি, এখানে আইস্যা তো দেখছি। ক্যান্, আমার ভাতের হাঁড়িতে কি ঠাডা পড়ছে যে পেটের মাইয়্যাকে বেশ্যা বানামু।' যখন রাগ হয় দেশী উচ্চারণগুলো ডাক্তার-গিন্নীর জিহ্বায় খরখরে হয়ে উঠে।

রাগে, দুঃখে প্রীতির মা ঠকঠক করে কাঁপছিল। প্রভাতকণার চিৎকার শুনে অন্য সব ঘরের লোকেরাও এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। উঠানে রীতিমত ভিড়।

'আপনি এসব কি আবোল-তাবোল বকছেন। আপনাদের ইচ্ছা না থাকে, মেয়েকে কাজে দেবেন না, সে আলাদা কথা; কিন্তু বেশ্যা-ফেশ্যা এসব কি, এখানে আরো পাঁচটা ভদ্রপরিবার থাকে ভুলে যাচ্ছেন।' কমলার গলা।

''আ-রে আমার সব ভদ্দরলোক রে!' প্রভাতকণা গলার স্বরকে আরো বিকৃত ক'রে তুলল। 'ভদ্দরলোকের মাইয়াছাইল্যা ব্যাটাছেলের গতরে গতর লাগিয়ে খুব আপিস করুক। আমি দিমু না আমার মেয়েরে, ফর্সা কথা। তা আপনাকে এখানে ডাকল কে মোক্তারী করতে! আপনার গা অত জ্বলছে কেন?' কটমট করে প্রভাতকণা কমলার দিকে তাকায়। 'অ, আপনি যে আপিসের দলের মনে ছিল না, সেইজন্য প্রীতির হয়ে উকিলগিরি করছেন।'

'কে ইতর-ছোটলোক দশজন এখানে আছে জিজ্ঞেস করুন। আপনার মত এমন ছোটলোক মুখ এ বাড়িতে কারোর নেই।' কমলা সুযোগ বুঝে কথা বলতে ছাড়ল না।

'ছোটলোক তুই, তোরা।'

উঠোনের এধারে গণ্ডগোল পাকাতে আরম্ভ করেছে, দেখতে দেখতে ওধারে আর এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি। কি? না, প্রমথর দিদিমা নিজের চোখে দেখেছে বলাইর বৌকে আট নম্বর ঘরের কয়লা নিয়ে পালাতে। হিরণের নতুন আধ মণ কয়লা, সবে তো কাল বিকেলে কিনে আনা হ'ল। আর সবাই যা ক'রে অর্থাৎ শোবার ঘরের ভিতর একধারে যেভাবে হোক, জায়গা করে কয়লা-ঘুঁটে কি কাঠ ঠেসে ঠেসে না রেখে হিরণ কয়লাটা বাইরে বারান্দায় রেখেছিল এবং শেষ রাত্রে যখন প্রস্রাব করতে বেরোয়, তখন নাকি প্রমথর দিদিমা দেখে বলাইর বৌ দু'চাকা কয়লা তুলে কাপড়ের নিচে সেটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে নিজের ঘরের দিকে সরে পড়ছে। অন্ধকার রাত হলেও সাদা কালো জিনিসটা বেশ মালুম হচ্ছিল। 'আধ মণ কয়লা এখানে কে বললে? কিছুতেই আধ মণ হবে না। ক'বেলা আর রান্না হয়েছে। তাই তো বলি, কয়লাওলা এবার ওজনে কম দিলে নাকি! ভাবছি আর জগৎকে বকছি।' চিৎকার করছিল বিমল হালদার। ফ্যাক্টরীতে ওভারটাইম খেটে রাত সওয়া আটটায় সে ঘরে ফিরেছে। ফিরে হিরণের মুখে প্রমথর দিদিমার নিজ-চোখে দেখা কয়লা চুরির কাহিনী শুনে বিমল ভয়ানক চটে গেছে। 'যত সব হাড়হাভাতে এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছে। তাই তো বলি কয়লা থাকে না, ঘুঁটে থাকে না, কাঠ কিনে কুলোতে পারি না। যায় কোথায় এসব। এমন ধারা চুরি হতে থাকলে রাজার ধনই কি আর চোখে ঠেকে! যত সব চোর

ছোটলোক এসে বাসা বেঁধেছে এই বস্তিতে।'

'চোর ছোটলোক তুই, তোরা।' ঘরের ভিতর আর থাকতে না পেরে বলাই চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কেননা, বিমল তাকেই, তার পরিবারকে লক্ষ্য করেই এসব কথা বলছিল, এখন আর তা ঢাকা-চাপা নেই। বিকেলে কলতলায় সবাই যখন লাইন দিয়ে জল ধরতে দাঁড়িয়েছিল, তখন ময়নাকে মুখের ওপর হিরণ জেরা করছিল, তার মা কয়লা পেল কোথায়? রাত্রে হিরণের কয়লা চুরি করে নিয়ে গিয়ে তবে আজ ওরা উনুন ধরাতে পেরেছে। ড্যাবডেবে চোখে ময়না হিরণের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো হজম করেছে। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে মাকে বলেছে। নিত্য অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে বলাই বলাইর স্ত্রী এ বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি নীরব হয়ে গেছে। পাশের ঘরের লোকটির সঙ্গেও কথা বলতে তারা সঙ্কোচবোধ করে। পরনে কাপড় নেই, রাত্রে ঘরে আলো জ্বলে না, সপ্তাহে চারদিন উনুনে আগুন পড়ে না। এই হীনতাবোধ, এই অসহায়তার দরুন দিন থেকে দিন তারা মৃতপ্রায় হয়ে আছে। আজ সরাসরি চুরির কুৎসা তাদের ঘরে ছুঁড়ে মারতে তারা মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে। বলাই ঘরে না ফেরা তক ময়নার মা চুপ ছিল। বলাই সব শুনে গর্জন করে উঠেছে। 'বটে! সব কাঠ-কয়লাওলা রাজাবাদশা এসে জুটেছেন এখানে। ক'পয়া কামাচ্ছেন গালার কলে মজুরী খেটে, আমার কি জানা নেই—' ইত্যাদি।

বিমল ঘরে ফিরে সব শুনে তার চেয়েও জোর চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছে। 'আমি পুলিসে খবর দেব, বাড়িওয়ালার কাছে রিপোর্ট করব। চোর-ছ্যাঁচড়দের না তাড়ালে আমরা এবাড়ি কালই ছেড়ে দেব সব—'

'কত শালা এবাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাজপুরীতে গিয়ে ঠাঁই নিচ্ছে, আমার জানা আছে, —লম্বা কথা বলতে সব শালাকেই শুনি।'

'ছোটলোক, রাস্তার কুকুর, খেতে পায় না তবু কত বড় গলা, তুমি যাও না, গিয়ে ক'ঘা মুখে বসিয়ে দাও।' চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে ফিসফিসে গলায় হিরণ স্বামীকে তাতাচ্ছে। বিমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে দাঁতে দাঁত ঘসছে। সাহস পাচ্ছিল না রোগা টিঙটিঙে শরীর নিয়ে বিশালদেহ বলাইর সঙ্গে গিয়ে লড়ে। অনাহারে, অর্ধাহারে থেকেও মানুষের শরীর এত বড় থাকে কি ক'রে ভাবছিল সে; কিন্তু বিমল লক্ষ্য করেনি বলাইর কাঠামোটাই বড়, আসলে গায়ের মাংস ঝুলে পড়ছে, স্নায়ু ঢিলে হয়ে গেছে, কোটরগত চক্ষুদ্বয়, বিশীর্ণ গণ্ডদেশ।

'থাক বাবা, আর চেঁচিয়ে কাজ নেই।' চৌকাঠের ওধারে দাঁড়িয়ে ময়না বাবাকে ডাকছে, 'বনমালীকে অনেক ব'লে-কয়ে চার পয়সার মুড়ি ধারে আনতে পেরেছি, তুমি ওই দিয়ে জল খাও, সারাদিন আজ মুখে কিছু দাওনি।'

'কারখানায় কাজ ক'রে লাট ব'নে গেছেন, হুঁ, বাড়িওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবেন। কত শালার রিপোর্ট পারিজাত কানে তুলেছে, আর তার বিহিত করছে আমার জানা আছে—' একটা আধপোড়া বিড়ি তৃতীয়বার ধরাবার চেষ্টা করতে করতে রাগে আক্রোশে বলাই কাঁপছিল। আর ঘরের ভিতর দুঃখে অপমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলাইর স্ত্রী মনোরমা কাঁদছিল। কান্নার শব্দ ছাপিয়ে তার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা

যাচ্ছিল। 'আমরা গরীব বটে, কিন্তু আজ অবধি এবাড়ির কারো কুটোটা হাত দিয়ে ছুঁয়েছি, কেউ দেখেছে বলতে পারবে…'

ইতিমধ্যে শিবনাথ ঘরে ফেরে। সুরুচি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মঞ্জুর খাওয়া হয়ে গেছে। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সে নতুন আস্তানার বিচিত্র কলরব শুনছে। শিবনাথও একটু সময় কান পেতে শুনল। 'তোমার খুব খারাপ লাগছে রুচি?' শিবনাথ অল্প হেসে প্রশ্ন করল।

'লাগলেও উপায় কি।' রুচি সংক্ষেপে উত্তর করল। শিবনাথ আর কিছু বলতে সাহস পেলে না।

বলাই ও বিমলের ঘরের গোলমাল হয়তো তখন থেমে গেছে। প্রভাতকণা ও কমলার ঝগড়ায় একটু ভাঁটা পড়েছে, এমন সময় শোনা গেল আর এক দিকের হৈ-চৈ। কি? না হিরুর মা অর্থাৎ রমেশবাবুর স্ত্রী মুখ খুলে অমল চাকলাদারের বৌ কিরণকে যাচ্ছে-তাই গালাগালি করছে। কমলা কাল ওদের ঘর থেকে আধ সের আটা ধার নিয়েছিল, আজ সকালে ফিরিয়ে দেবার কথা, সকাল বিকাল সন্ধ্যা পার হয়ে রাত এখন ন'টা বাজতে চলল, কমলা আটা ফিরিয়ে দিল না। রমেশ-গিন্নী প্রথমটায় অসন্তুষ্ট, তারপর রেগে নিজের মনে গজগজ করতে করতে সারাটা বিকেল কাটিয়েছে। এখন সরাসরি কিরণের ঘরের দরজায় গিয়ে হানা দিতে ইতস্ততঃ করল না।

'বলি, যদি সময় মত জিনিস ফিরিয়ে না দিতে পার তো পরের কাছ থেকে হাত পাত কেন? মুখে আঙুল গুঁজে পড়ে থাকতে পার না?'

কিরণ অনুনয়ের কণ্ঠে বার বার বলছে, 'আজ উনি মাইনে পাননি মাসিমা, পাওয়ার কথা ছিল। মাইনে পেলে আপিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসে রেশন তুলতেন। কাল টাকা পাবেন, কাল রেশন এনে আপনার আটা ফিরিয়ে দেব।'

'যত সব হাভাতে এসে জুটেছে এখানে।' মল্লিকা অর্থাৎ রমেশবাবুর স্ত্রী ফোঁস করে উঠল। 'আমরাও রেশনের চাল-আটা খাই,—তাতেও কুলোয় না, চোরা বাজার থেকে ডবল দাম দিয়ে হপ্তার শেষে সের দু'সের করে কিনতে হচ্ছে—ভাবলাম সারা-দিনে যখন পেলাম না, সন্ধ্যাসন্ধে আটাটা ফেরত পাব! ওমা, এ কি কাণ্ড, আজ না কাল, বলি আমি কি সোয়ামীর বাচ্চার মুখে এখন উনুনের ছাই তুলে দেবো, অ্যাঁ, এদিকে আমার উনুনের কয়লা ধরে গন-গন করছে, ভাজা হ'ল, ডাল করলাম, এই দিই, এই দিচ্ছি ক'রে তিনি রাত দশটায় এসে এখন আমায় মহামন্ত্র শোনাচ্ছেন কাল দেব,—না বাপু, তুমি আর কারো কাছ থেকে আমার আটা ধার করে এনে দাও। ঘরে কি আর আমার চাল নেই, আছে,—আমি আর বাচ্চা দুটো না হয় খেলাম, কর্তার রাতে আটা ছাড়া আর কিছু হজম হয় না, তা আমরাই-বা, নতুন ছোলার ডালটা করলুম, রুটি না খেয়ে ভাত খাই কোন্ দুঃখে। এ বাড়ির রকমসকম দেখে আমার চোখে কড়া পড়েছে,—কারো কাছ থেকে সুপুরিটাও ধার করি না, এখন আমি আটা চাইতে পরের দরজায় যেতে পারব না। আমার আটা দাও। আটায় টান পড়েছে।'

কিরণ অসহায় চোখে মল্লিকাকে দেখছে। ঘরের ভিতর অমল মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে ভাবছে। তিনদিন আগে তাদের মাইনে হবার কথা ছিল। কিন্তু

কারখানায় স্ট্রাইক চলেছে বলে সেটি আটকে গেছে। অমলের হাত শূন্য। আজ দেব, কাল দেব, ক'রে দোকান থেকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ধারকর্জ ক'রে দু'দিন চালিয়েছে। কালও যে সে মাইনে পাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কালও রমেশের ঘরের আটা ফেরত দিতে পারা যাবে না, এই দুশ্চিন্তায় সে মরে যাচ্ছিল। এ-বাড়ির আর কেউ ধার কর্জ দেয় না। সবাই নাকি ঠেকে শিখেছে ; ধার দিয়ে সময় মত তা আদায় করা কঠিন। তবু নিরুপায় হয়ে কমলা শেষটায় রমেশ রায়ের স্ত্রী মল্লিকার কাছে আটা চেয়ে এনেছিল। কিন্তু এক সন্ধ্যা পার না হতে যে মল্লিকা এমন মারমুখী হয়ে তাদের দরজায় এসে হানা দেবে, কিরণ ও অমল বুঝতে পারেনি।

'বলো বৌ, এখন আমি কি করি ?' মল্লিকা ভদ্রতার মাথা খেয়ে কিরণের হাতে হ্যাঁচকা টান মারল। 'আমার কয়লা পুড়ে যাচ্ছে।'

ফাঁসির আসামীর মত দাঁড়িয়ে কিরণ। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিধু মাস্টারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে কিরণের দরজায়, এগারো নম্বরের ঘরের লোকেরা এসেছে, নিজেদের ঘরের গোলমাল থামতে প্রীতি, বীথি এসে উঁকি দিয়েছে আট নম্বরের ঘরের দরজায়। ব্যাপার কি ! মল্লিকা দু'হাত শূন্যে ঘুরিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'ভাল মানুষের মত এসে চাইতে ঘরের জিনিস বার ক'রে দিলাম, এখন সেটি আদায় করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এর বিচার তোমরা কর ভাই, উপকার করে আমি মহা ঠকেছি।' মল্লিকা একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাল। কিরণও তাকায়। কিন্তু সাহায্য বা সহানুভূতির প্রশ্রয় একটি চোখেও দেখতে পেল না। কারো মুখে হুঁ-হাঁ শব্দ নেই। বরং সকলের চেহারা দেখে মনে হ'ল এই ব্যাপারে কিরণই অপরাধী। কন্ট্রোলের দিনে ছটাক কাঁচ্চার ওজনে সবাই খাদ্য পায়। কাজেই ধারের আটা ফিরিয়ে না দিয়ে অমল চাকলাদারের বৌ খুব অন্যায় করেছে ! এমন সময় ভিড় ঠেলে হঠাৎ একজন এসে দাঁড়াল। বারো নম্বরের নতুন ভাড়াটে। রুচি। দূরে থেকে দাঁড়িয়ে সে সব শুনছিল। মল্লিকাকে বলল, 'আমার কিছু আটা আছে, এখন চালিয়ে দিচ্ছি, নিন।'

বীথি বলল, 'আপনারা এখানে নতুন এসেছেন, রেশন কার্ড করা হয়নি নিশ্চয়, ঘরের জিনিস ছেড়ে দিলে শেষটায় অসুবিধা হবে।'

এক সেকেণ্ড কি ভেবে রুচি বলল, 'তা একরকম চালিয়ে নেওয়া যাবে।'

বীথি নীরব।

পিছন থেকে কে একবার কেশে উঠল।

মল্লিকা গলা নামিয়ে বলল, 'আপনার কাছ থেকে নেওয়াটা তো বড় কথা নয় দিদি, আজ না হয় চালিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কাল যখন আপনার আটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আমাকে চোরাবাজারের ডবল দাম দিয়ে কিনে তবে তো সেটা শোধ করতে হবে। কি বলিস বীথি ?'

বীথি মাথা নাড়ল।

রুচি বলল, 'কাল আপনাকে দিতে হবে না। সোম-মঙ্গলবার রেশন এনে সেটা ফেরত দিলেও আমার অসুবিধা হবে না।'

'অই একই কথা।' মল্লিকা আবার গলা চড়া করল। 'আমার এক সের যতক্ষণ না ফিরে পাচ্ছি, আর একজনেরটা শোধ করতে হলে দেড়া দাম দিয়ে কিনে তা করতে হবে। তাছাড়া সোম-মঙ্গলবারও যে কিরণ আটা ফেরত দিতে পারবে আমার ভরসা হয় না।'

এতক্ষণ কিরণ আশ্বস্ত হয়ে রুচির দিকে তাকিয়েছিল। এবার মাটির দিকে তাকাল। মল্লিকা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে সরে পড়ল। গায়ে পড়ে কিরণের পক্ষ হয়ে নবাগতা রুচির এই উপকার করতে আসা রমেশ-গিন্নী ভাল চোখে দেখল না। যেন দাঁড়িয়ে কিরণকে আরো কতক্ষণ অপমান করার ইচ্ছা ছিল, সেটি হ'ল না দেখে বিরক্ত হয়ে মল্লিকা সরে গেল।

রুচিও আর সেখানে দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। প্রীতি, বীথি ও বিধু মাস্টারের ছেলেমেয়েরা মল্লিকার পিছু পিছু সরে পড়েছে। কিরণ একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলে। অমল চাকলাদারের ঘরে আজ আলোও জ্বলল না, উনুনেও আগুন পড়ল না।

ঝগড়াঝাঁটি কতক্ষণের জন্যে বন্ধ হলেও বাড়ির কলগুঞ্জন থামে না। একটু কান পাতলে শোনা যায় ঘরে ঘরে রান্নাবান্নার খাওয়াদাওয়ার শব্দ। শব্দ এবং নানা রকমের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শেখর ডাক্তারের ঘরে ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে, তার গন্ধ। বিধু মাস্টারের ঘরে এবেলা কাছিমের মাংস রান্না হচ্ছে, তার গন্ধ। হীরুর বাবা রমেশ রায় ফেরার পথে বেলেঘাটা পুলের ধার থেকে সস্তায় দু'টো কুমড়ো কিনে এনেছেন। রুটি দিয়ে খাবে ব'লে মল্লিকা ঘটা করে সেগুলি ভাজছে। কিরণের ওপর, তার চেয়েও বোধ করি রুচির ওপর রেগে গিয়ে জোরে জোরে খুন্তি নাড়ছে। কমলা এবেলা কয়লা ধরায়নি। স্টোভ জেলে পরটা ভাজছে। স্টোভের ভস্ ভস্ শব্দ এবং পরটা ভাজার ঘিয়ের গন্ধ সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। দালদা কি অন্য ভেজাল ঘি না, খাঁটি গাওয়া ঘি। এই ঘি কমলা কোথায় পায়, তা নিয়ে কারো কারো ঘরে আলোচনা হচ্ছে। প্রীতির মা'র ঘরে এবেলা বিশেষ কিছু হয়নি। বেগুনভাজা আর বিউলি ডাল। বিউলি ডাল সিদ্ধ হতে আরম্ভ করলে তার গন্ধটাও কম যায় না! প্রীতির মা ডাল ভেজে নেয় বলে গন্ধটা আরো বেশি কড়া হয়। বিমল হালদারের ঘরের রান্না হচ্ছে নতুন মুলো ও চিংড়ি মাছ দিয়ে চচ্চড়ি। মাছটা নরম। ফেরার পথে বৈঠকখানার বাজার থেকে সে একটু সস্তা দরে কিনে এনেছিল। পচা চিংড়ি মাছের গন্ধ বাড়ির অন্য সব গন্ধকে টেক্কা দিয়েছে এবং চিংড়িচচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে চড়া গলায় সে হিরণকে বলছিল, 'ওয়াণ্ডারফুল রান্না হয়েছে তোমার, মাছটা একেবারে ফ্রেস ছিল।' শুনে পাশের ঘরের অমল বিছানায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। অবশ্য অভুক্ত চাকলাদার দম্পতীকে শোনাতে বিমল তার স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করছিল না, তার লক্ষ্য ছিল বলাইর ঘর। তেমনি শেখর ডাক্তার ইলিশ মাছ খেতে খেতে মাছ ও রান্নার প্রচুর প্রশংসা করছিল গলা বড় ক'রে। বিধু মাস্টারের ছেলেমেয়েরা ঘরে মাংস পাক হচ্ছিল বলে আহ্লাদে প্রচণ্ড চিৎকার ও

দাপাদাপি শুরু করেছিল। আর শব্দ হচ্ছিল পাঁচু ভাদুড়ীর ঘরে। সন্ধ্যার পর খালপারের শুঁড়ীখানায় পুরো দু'পাঁইট সাবাড় ক'রে এইমাত্র ভাদুড়ী ঘরে ফিরে হৈ-হল্লা আরম্ভ করেছে, বৌকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। কাউকে বাজারে পাঠিয়ে ইলিশ মাছ কি মাংস আনিয়ে রান্না ক'রে রাখতে ক্ষতি ছিল কি ছোটলোকের মেয়ের! ঘরে কি পয়সা ছিল না, না পাঁচুর পয়সার কিছু অভাব আছে! মদ খেয়ে এসে সে শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবে কেন? এই ছিল তার বক্তব্য। শব্দ ও কোনরকম গন্ধ ছিল না বলাইর ঘরে, অমলের ঘরে। রুচির রান্না ও খাওয়া সকাল সকাল সারা হয়েছে বলে সে-ঘরও নীরব ছিল। আর নীরব ছিল রুচির পাশের ঘর। এগারো নম্বর ঘরে কেউ তখন উঁকি দিলে দেখতে পেত কে. গুপ্ত তখনো ঘরে ফেরেনি। স্ত্রী সুপ্রভা একটা সুজনি মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। ঘরের এক পাশে একটা ডিট্জ লন্ঠন জ্বলছে। আলোটা যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখা হয়েছে। আর সেই স্বল্প আলোয় ব'সে পনরো ষোল বছর বয়সের একটি ছেলে। কাগজ জ্বালিয়ে এলুমিনিয়মের কেটলিতে ক'রে জল গরম করছে। কে. গুপ্তর বড় ছেলে। নাম রুণু। মাথার চুল বড় হয়ে কপালে ঘাড়ে এসে পড়েছে। যেন কতকাল চুল কাটা হয়নি। গায়ে একটা ছেঁড়ামতন হাওয়াই শার্ট। হাফপ্যাণ্ট পরনে। কাগজের ধোঁয়ায় ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আছে। যেন কাগজটা ভিজা বলে ভাল জ্বলছে না। একবার নিভে যেতে হ্যারিকেনের চিমনি তুলে এক টুকরো কাগজ জেলে রুণু ফের জল গরম করছে। কেটলির ঢাকনা তুলে এক একবার আঙুল ডুবিয়ে দেখছে জল কতটা গরম হ'ল। কিন্তু যথেষ্ট গরম হয়নি বলে মুখে মৃদু বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে আবার কেটলির ঢাকনা বন্ধ ক'রে দিয়ে রুণু কাগজ জ্বালছে। বাড়িতে এক সন্ধ্যার মধ্যে তিন চারটে ঝগড়া হয়ে গেল। কিন্তু সুপ্রভা একবারও উঠে বাইরে যায়নি। কারা ঝগড়া করছে, কি নিয়ে কলহ সে-সব জানবার কি দেখবার এতটুকু আগ্রহ নেই তার। সেই বিকেল থেকে সুপ্রভার চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। ঘরে চা চিনি কি জল গরম করার কাঠ ঘুঁটে কিছুই ছিল না। চা খাবে না ঠিক করেছিল সুপ্রভা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণা দমন করতে না পেরে মেয়ে বেবিকে পাঠিয়েছিল বনমালীর দোকানে ধারে চা চিনি আনতে। দোকানের সামনে বাবাকে বসে থাকতে দেখে বেবি সাহস পায়নি সেখান থেকে ধারে কিছু আনতে। বেবি ফিরে এসেছিল। সুপ্রভা তাকে আবার পাঠিয়েছে, মোড়ে ক্ষিতীশের চায়ের দোকানে। ক্ষিতীশ এই বাড়ির রমেশ রায়ের ভাই। ছোটখাট একটা দোকান খুলেছে। সেখানে খুচরা চা চিনি বিক্রি হয় না। তৈরী চা বিক্রি হয়। কিন্তু দোকান বেশি রাত অবধি খোলা থাকে না। সন্ধ্যা-সন্ধি উনুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেবি একটা কাচের গ্লাস সঙ্গে নিয়ে গেছে। যদি পায় তৈরী চা নিয়ে আসবে, নয়তো ক্ষিতীশের দোকান থেকে চেয়ে এমনি একটু চা ও চিনি আনবে। যদি তৈরী চা এসে যায় তবে রুণুর গরম জলের দরকার পড়বে না। কিন্তু রুণু বলছে, তবু সে খানিকটা গরম জল ক'রে রাখবে। সুপ্রভার যতটা চায়ের দরকার গ্লাসে রেখে বাকি যেটুকু থাকবে তা-ই গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে রুণু সেটাকে পরিমাণে বাড়িয়ে একটু চা খাবে। ঠাণ্ডা পড়েছে, তারও আজ চা খেতে ইচ্ছে

হচ্ছে। বস্তুত পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতে সুপ্রভা রুণু বেবি সকলেই দু'বেলা চা খেত। এখানে এসে সে-সব বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল গুপ্ত সাহেব সকালে এক-কাপ চা খান। বিকেলে আর তাঁর চায়ের দরকার হয় না। বিকেলে পাঁচটার পর থেকে কিসের তৃষ্ণায় তিনি ছটফট করেন বেবি রুণুও টের পায়। সুপ্রভা তো বটেই।

রুণু কেটলীর জল পরীক্ষা করতে আর একবার ঢাকনা তুলল। কাগজ জ্বালাতে আবার হ্যারিকেনের চিমনি খুলল। অত্যধিক নাড়াচাড়ার দরুন আলোর শিখাটা কাঁপছে। সেই সঙ্গে উল্টোদিকের টিনের বেড়ায় রুণুর চুল বোঝাই প্রকাণ্ড মাথার ছায়াটা নাচছে। ঘরে টেবিল চেয়ার আলনা খাট ইত্যাদি কিছুই নেই। এ-বাড়িতে রমেশ রায় ও শেখর ডাক্তার, আর হ্যাঁ, কমলার ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে কাঠের জিনিস নেই। সুপ্রভা মেঝের ওপর একটা রাগ্ বিছিয়ে শুয়ে আছে। তার শিয়রের দিকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। বাক্সের ওপর কয়েকটা খালি টিন সাজানো। এককালে এই পরিবারে হরলিক্স, ওভ্যালটিন, বাটার, জ্যাম, জেলি প্রচুর আসত, টিনগুলো তার নিদর্শন। শূন্য টিনগুলো যে পার্ক স্ট্রীটের বাসা থেকে বিনা কারণে বয়ে আনা হয়েছে তাও নয়। দামী বোয়ম ও অন্যান্য পাত্র বিক্রি করে দেওয়ার পর সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস রাখবার জন্যে এখন এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। কে. গুপ্তর রুপোর বাটি গ্লাস চামচ তো বটেই, বেশির ভাগ কাঁসার বাসন-কোসনই বিক্রি করা হয়েছে। এখন একসঙ্গে রুণু, বেবি এবং গুপ্ত সাহেব যদি ভাত খেতে বসেন তবে থালা গ্লাসে কুলোয় না। আগে পরে খেতে হয়। আগে তারা টেবিল চেয়ারে বসে খেয়েছে। টেবিলে গোল হয়ে সুপ্রভা বসত, গুপ্ত সাহেব বসতেন, রুণু বসত, বেবি বসত। সকালবেলা অফিসে তাড়া থাকত বলে বেশির ভাগ রাত্রেই গুপ্ত সাহেব সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খেয়েছেন। সুপ্রভা নিজের হাতে বেবি ও রুণুকে কাঁটাচামচ ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল। কাঁটা-চামচ দূরে থাক, ঘরে এখন একটা সাধারণ চায়ের চামচও নেই। বেবিকে এখন চা করতে হলে অনেক অসুবিধেয় পড়তে হয়। কখনো খুন্তির ডাঁটা, কখনো বা গরম চায়ে আঙুল ডুবিয়ে বাটির দুধে চিনি মেশাতে হয়। ঘরের কাজকর্ম বেশির ভাগ এখন বেবিই করে। মাঝে মাঝে রুণু সাহায্য করে। সুপ্রভা এসব করেও না, দেখেও না। তা ছাড়া বেলায় বেলায় ভারি কিছু যে রান্না হয় তা-ও না। ভাতে ভাত ফুটানো কি ডাল সিদ্ধ করা বা রুটি করা। এসবের জন্যে সুপ্রভা আর উনুনের ধারে যায় না। অধিকাংশ সময়ই সুপ্রভার শুয়ে কাটে। তা ছাড়া কে. গুপ্তর অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই বলে এখন যত বেলায় খুশি যদি রান্না চাপানো হয় তাতে অসুবিধা হয় না। আর প্রত্যহ নিয়মিত রন্ধনোপযোগী খাদ্য-সম্ভার ঘরে না থাকলে কাজকর্মের যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এই সংসারেও সেটি বেশ ভালভাবে দেখা দিয়েছে। কদিন দেখা যায় হাঁড়িতে জল ফুটছে। টাকার অভাবে রেশন আনা হয়নি। রুণু গেছে ধারে কোথাও চাল আনতে। বেবি বনমালীর দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করছে কখন কে. গুপ্ত সামনের বেঞ্চিটা থেকে উঠে যাবে, আর ও গিয়ে বনমালীকে এটা ওটা ধার দিতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করবে। এমন নয় যে কে. গুপ্ত উঠে গেলে বনমালী বেবিকে

বেশি ধার দেবে। ইচ্ছা না থাকলে দেবেই না এবং অধিকাংশ সময় বেবিকে বিফল-মনোরথ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। তবু, এমনি, বিশেষ করে এ-বাড়ি আসার পর থেকে বাবার সামনে যেতেই যেন বেবির লজ্জা করে। যেন সে হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। গুপ্ত সাহেব অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকেন না বলে বেবি স্বস্তিবোধ করে। রুণুর মনের অবস্থাও অনেকটা তাই। আশ্চর্য, সুপ্রভারও মেজাজ ভাল থাকে স্বামী বাড়ি না থাকলে। বেকার পুরুষ সংসারে কত অবাঞ্ছিত কে. গুপ্ত তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মদ খাওয়ার জন্যে নয়। পাঁচু ভাদুড়ীও মদ খায়। কিন্তু গালিগালাজ না করলে ভাদুড়ীর-বৌ ভাদুড়ী যতক্ষণ বাড়িতে থাকে খুশিবাসি থাকে।

এবার রুণুর কেটলির জল ফুটতে আরম্ভ করে। সুপ্রভা একটা হাই তুলল। রুণু একবার উঠে বারান্দায় উঁকি দেয়। 'বেবি এল ?' সুপ্রভা প্রশ্ন করল। 'না।' চৌকাঠ থেকে ফিরে এসে রুণু বলল. ওটা ভয়ানক আড্ডাবাজ হয়ে গেছে, মা। যেখানে যায় এমন গল্প জমিয়ে বসে।' সুপ্রভা নীরব। রুণু বলল, 'ক্ষিতীশ এই বাড়ির লোক। জানাশোনা। তার সঙ্গে গল্প করুক ক্ষতি নেই, সেদিন আমি দেখলাম সেই কোথায় রাসমণির বাজারে পালেদের মুদির দোকানে বসে আড্ডা মারছে। মদন পালের ছেলে মোহনটার সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে।'

সুপ্রভা তথাপি নীরব। রুণু অনেকটা নিজের মনে বলতে লাগল, 'এসব জায়গা ভাল না। মদন পালের ছেলে মোহনটা এই বয়সেই বিয়ে করে ফেলেছে। ওদের কি। দেদার পয়সা। লেখাপড়া করারও দরকার নেই। ক্লাশ ফোর অবধি বোধ করি পড়েনি। হাতে তিনটে আংটি। আমার চেয়ে এক বছরের বেশি বড় হবে কি ? বিয়ে করে ফেলল। সিগ্রেট তো মুখে লেগেই আছে। সেদিন মোহনকে দেখলাম বাজারের একটা গলির মধ্যে ঢুকতে। গলিটা খারাপ আমি টের পেয়েছি।'

'আঃ, কি বকর বকর আরম্ভ করলি রুণু !' সুপ্রভা হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল। রুণু চুপ করল। বারান্দায় কার পায়ের শব্দ হয়। সুপ্রভা ও রুণু দুজনেই চকিতে কান খাড়া করে ধরে। শব্দ মিলিয়ে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে মার দিকে তাকিয়ে রুণু আস্তে আস্তে বলে, 'না, আমি বলছিলাম বেবিটা যেখানে সেখানে যার-তার দোকানে যাচ্ছে কেন ? ওর কি---'

বাধা দিয়ে বিরক্তকণ্ঠে সুপ্রভা বলল, 'ওর দোষ কি ? বনমালী আর ধারে কত জিনিস দেবে। সেদিন মদন পালের দোকান থেকে বেবি ধারে সরষে তেল নিয়ে এল। তোরা বসে বসে খাবি। একটা পয়সা আয় নেই। ধার-কর্জ করতে বেবিকে এখন যেখানে সেখানে যেতে হচ্ছে, আমি করব কি।'

রুণু চুপ ক'রে রইল। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে ওর পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। রুণু একটা অবাকই হ'ল মার কথা শুনে। এখানে এসে অবধি দুঃখ করছিল সুপ্রভা ছেলেমেয়ে দুটোর আর লেখাপড়া হ'ল না ব'লে। আজ হঠাৎ রুনুর কিছু করা-না করার কথায় সে ভীষণ চমকে উঠল। চমকে মার মুখের দিকে তাকিয়ে ফের কালিপড়া লণ্ঠনটার দিকে স্থির নিবিষ্ট চোখে চেয়ে রইল। ভাবল, কেবল কি বাবা কিছু করছে না বলে মার মনে দুঃখ, সংসারে এ অনটন! রুণু এখনই চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়ুক মার

এই ইচ্ছে ? 'মা !' মুখ তুলে রুণু আস্তে ডাকল। কিন্তু সুপ্রভা সাড়া দিলে না। রুণু টের পেল মা নিঃশব্দে কাঁদছে। মা অনেক সময় মুখ ভার করে থাকে, মন খারাপ করে থাকে। কিন্তু কাঁদতে সে এই প্রথম দেখল, দেখল না ঠিক, টের পেল। স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে কিশোর ভাবতে লাগল তবে তো তার আর বসে থাকা ঠিক না, যাহোক একটা কিছু চাকরি-বাকরি করে।...

'কে ?'

'আমি।' বলতে বলতে বেবি এসে ঘরে ঢুকল। হাতে কাচের প্লাসে ভর্তি চা। প্লাস গরম বলে বেবি ফ্রকের তলার দিকটা গুটিয়ে প্লাসের নিচে রেখে সেটা ধরে এনেছে।

'অনেক চা নিয়ে এলি।' চোখ বড় ক'রে রুণু বেবির মুখের দিকে তাকায়। বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে তার মুখের চেহারা একটু হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। বেবি শব্দ করল না। প্লাসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে কোঁচকানো ফ্রকটা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল। রুণুর ঠিক এক বছরের ছোট বেবি। তা ছাড়া বেশ বাড়ন্ত গড়ন। দেহের অনুপাতে ফ্রকটা ছোট-ছোট ঠেকছে। যেন আঁট জামা না পরে কাপড় পরলেই ওকে মানায়। এত বড় মেয়ে বেবির ফ্রক পরা নিয়ে এ বাড়িতে বেশ কথাবার্তা হয়ে গেছে। বিধু মাস্টারের স্ত্রী তো সেদিন সুপ্রভার মুখের উপর বলল, 'মেয়ের শরীরের গড়ন ফ্রকে আর লুকানো যাচ্ছে না দিদি,—এই বেলা শাড়িটাড়ি পরতে দিন।' সুপ্রভা কোন কথা বলেনি। বেবি এখন শাড়ি পরতে আরম্ভ করবে। এতকাল তার চিন্তায় ছিল না। ফ্রক পরে বেবি স্কুলে গেছে। বাড়িতেও ফ্রক পরেছে। সুপ্রভা বেবিকে লরেটোতে ভর্তি ক'রে দিয়েছিল। কেবল লরেটোর ছাত্রী ব'লে নয়, পার্ক ষ্ট্রীটে যতদিন কাটিয়ে এসেছে, বেবি কি তার চেয়ে বড় বাড়ন্ত শরীরের মেয়েদের কোনদিন শাড়ি পড়তে দেখেছে ব'লে সুপ্রভার মনে পড়ে না। কিন্তু এটা পার্ক ষ্ট্রীট নয়। এটা কুলিয়া-টেংরা!' কিন্তু মাস্টারের বৌ গম্ভীর গলায় বলছিল, 'তা ছাড়া বস্তিবাড়ি! পাঁচ রকমের লোকের বাস, দিদি। মেয়েছেলেকে একটু রেখেঢেকে চলতে শিখতে দেওয়া ভাল।' হয়তো অন্য সময় হলে অর্থাৎ আগের অবস্থা থাকলে সেদিনই রাগ ক'রে সুপ্রভা নিজে দোকানে গিয়ে মেয়ের জন্যে তিন জোড়া শাড়ি কিনে আনত। বিধু মাস্টারের বৌয়ের মুখ যাতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে-অবস্থা তো নেই, আঁট ফ্রকটার বদলে একটু বড় ঢিলেঢালা ক'রে আর একটা জামা বেবিকে তৈরী ক'রে দেওয়ার সঙ্গতি আজ সুপ্রভার নেই। নিজের অক্ষমতা এবং পাঁচজনের কথা ইত্যাদির দরুন সুপ্রভার সকল রাগ গিয়ে পড়ে মেয়ের ওপর। যেন বেবিকে দেখলেই সুপ্রভা বিরক্ত হয়ে ওঠে, আর তার বুকের ভিতর টনটন করতে থাকে। এই ক'মাসে বেবি যেন বেশি বড় হয়ে গেছে।

নিজের জন্যে একটুখানি একটা কাপে ঢেলে প্লাশের বাকি চা সুপ্রভা ছেলেকে দিয়ে দেয়।

'তুই একটু খাবি, বেবি ?' রুণু বোনকে প্রশ্ন করে। 'না, আমি ক্ষিতীশদার দোকান থেকে খেয়ে এসেছি।' বেবি রুণুর দিকে না তাকিয়ে মার দিকে তাকায়।

'পয়সার কথা কিছু বলল ক্ষিতীশ ?'

'না তো !' একটা ঢোক গিলল বেবি। 'বরং বলল, তোরা বাড়ির লোক। যখন ইচ্ছে চা নিয়ে যাস, খেয়ে যাস। পয়সার দরকার হলে আমি গিয়ে মাসিমাকে বলব।'

সুপ্রভা আর কিছু বলল না। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে চা খেতে লাগল।

'তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিল ক্ষিতীশদা।' বেবি ভাইয়ের দিকে তাকায়। 'সবাই আমার দোকানে আসে তোমার ভাইকে একদিন দেখলাম না।'

মুখের চাটুকু গিলে রুণু জিহবার একটা শব্দ করল। 'কুলিয়া-টেংরার রেস্টুরেণ্ট ! কত বড় দোকান ক্ষিতীশের। এসব দোকানে গিয়ে জানো মা, চা খেতে আমার এমন গা ঘিনঘিন করে।'

তা করা স্বাভাবিক। শহরে বড় বড় রেস্টুরেণ্ট দেখেছে ছেলেমেয়েরা। অবশ্য রুণু বা বেবিকে সুপ্রভা কোনোদিন একলা কোনো খাবারের বা চায়ের দোকানে পাঠায়নি। সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে কি সিনেমা দেখতে গেছে। ফেরার পথে গুপ্ত সাহেব ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বড় বড় রেস্টুরেণ্টে বসে খেতেন। চা খাওয়া শেষ হতে সুপ্রভা বাটিটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

'অ, তুই বসে বসে সেখানে চা-টা খেলি, তাই এত রাত হ'ল।' রুণু বেবির চোখের দিকে তাকায়।

'চা-টা নয়।' কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দেয় বেবি। 'এক কাপ চা শুধু, আর একটা বিস্কুট এখানকার বিস্কুট ভাল না—'

রুণু আর একটা কি প্রশ্ন করত, থেমে গেল। বাইরে বারান্দায় গুপ্তর গলার শব্দ শোনা গেল। ঢেকুর তুলছে। চা খেতে সুপ্রভা উঠে বসেছিল। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। রুণু মাথা গুঁজে পোড়া কাগজের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। যেন হাতের কাছে হঠাৎ কোন কাজ না পেয়ে বেবি বিমূঢ় ভীত চোখে দরজার দিকে তাকায়। কিন্তু বাবা তখনি ঘরে ঢোকে না। যেন বারান্দায় ছেঁড়া মোড়াটার ওপর বসে। অন্ধকারে ছেঁড়া মোড়ার ওপর বসে কে. গুপ্ত হপ্‌কিন্স আওড়াচ্ছিল ঃ give beauty back, beauty, beauty, beauty.

অন্য ঘরের বাসিন্দারা তখন ঘুমোয়নি। গড়গড়া টানতে টানতে শেখর ডাক্তার নিম্নকণ্ঠে স্ত্রীকে বলল, 'সাহেব আজ পুরো একটা পাঁইট ঢেলে এসেছে, মেজাজ খুলেছে। কবিতা আওড়াচ্ছে শোন।'

বিধু মাস্টারের বৌ স্বামীকে বলছিল ঃ পয়সা নেই, হাঁড়ি চড়ে না ঘরে, কিন্তু মিনসের গলা কোনদিন শুকনো থাকে না। আজ আবার কোথা থেকে খেয়ে এল।'

'এরা হ'ল উদ্যোগী লোক।' বিধুমাস্টার চাপা গলায় হেসে স্ত্রীর কথার জবাব দেয়। 'বনমালীর দোকান থেকে উঠে একলা খালের দিকে যাচ্ছিল তখন দেখলাম। শেষ অবধি কোনো মক্কেল জুটিয়েছে আর কি।'

'হাইলি এডুকেটেড। তা ছাড়া ভাল ঘরের ছেলে।' চাপা মৃদু গলায় শিবনাথ রুচিকে বলছিল। 'এই হ'ল ফ্রাশট্রেশান। করবার ইচ্ছা ছিল, ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিছুই হ'ল না ; শেষ পর্যন্ত সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হ'ল। তাই না ওর

এ-অবস্থা।'

'তোমার তো চাকরি নেই, গুপ্ত সাহেবের মত বেকার হলে। মনের দুঃখে মদ ধরবে নাকি।' রুচির ঠাট্টার সুর। 'পাশাপাশি ঘরে রয়েছ। ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ।'

'পাগল।' শিবনাথ পাশ ফিরে শোয়। 'মদ খাওয়ার লোক অন্যরকম, তাদের জাতই আলাদা।'

রুচি আবার কি বলতে যাচ্ছিল থেমে গেল। দশ নম্বর ঘরের পুরুষেরা গলা। 'একশ দিন বলেছি তোমায়। বদমায়েসটা যখন বারান্দায় বসে থাকে রাত্রে তুমি বাইরে যাবে না।'

'আমি কি জানতুম বেবির বাবা অন্ধকারে ওখানে ব'সে আছে।' স্বামীর কাছে ধমক খেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কিরণ। 'আমি তো রোজ বলি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দাও।'

'যখন ছাড়বার ঠিকই ছাড়ব। কিন্তু তোমার চলাফেরা সংশোধন কর।' বোয়ের ওপর ভয়ানক চটে গেছে অমল। রাগে অন্ধকার ঘরে তর্জন-গর্জন করছে। 'একশ দিন বলেছি রাত্রে বাইরে গিয়ে কাজ নেই। জায়গা ভাল না। একটা অতিরিক্ত হাঁড়ি পর্যন্ত কিনে আনলাম সেদিন। কিন্তু কথা মোটেই কানে ঢোকে না তোমার, কেমন?'

যেন কিরণ আর কিছু বলছে না। তার কান্নার ফোঁপানি শুধু শোনা যায়।

তিন নম্বর ঘরে স্ত্রীলোকের হাসির শব্দ শোনা গেল। বিধু মাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণির গলা। তা যত অনুচ্চ স্বরে কথা বলুক লক্ষ্মীমণির প্রত্যেকটি বচন বস্তির সব ঘরের বাসিন্দাই পরিষ্কার শুনতে পেল: 'খেতে দিতে পারিস না, পরনের কাপড় নেই, বৌয়ের শাসনের বহর দেখ। পুরুষ কেউ বারান্দায় উঠোনে থাকলে বোকে রাত্রে পায়খানায় প্রস্রাবখানায় যেতে দিতে আপত্তি, ফুটোনি কত!'

'ছোকরার খুঁতখুঁতে মন। এসব লোকের উচিত পরিবার নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া ক'রে থাকা।' লক্ষ্মীমণির স্বামী বিধু মাস্টারের উপদেশাত্মক মন্তব্য শোনা যায়।

'ফ্যালেট বাড়ি!' আর এক ঘরে বিকৃতস্বরে কে মন্তব্য করে: 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম। হপ্তার রেশন আসে না, ঘরভাড়া আটকে গেছে, সে-লোক কিনা আলাদা বাড়ি আলাদা ঘরে গিয়ে থাকবে বৌ নিয়ে, তবেই হয়েছে।'

রুচি বুঝতে পারল মন্তব্যটা রমেশ-গিন্নীর। একটু আগে আটা নিয়ে কিরণের সঙ্গে যিনি কোঁদল ক'রে এসেছেন। কিন্তু এত সব মন্তব্য শোনা সত্ত্বেও, রুচি অবাক হ'ল, অমল চুপ ক'রে থাকেনি। অনর্গল সে বোকে শাসাচ্ছে। 'এম-এ, বি-এ পাশ করিনি ব'লে কি বিউটি কথার মানে আমি বুঝি না, অ্যাঁ,—তোমায় দেখলেই ওই শালা এসব বলে কেন আমায় বোঝাতে পার! আরো দশটা মেয়েছেলে তো আছে এবাড়ি, কই আর কারো বেলা তো শালা এসব বলে না, কি বল, চুপ ক'রে আছ কেন, এ-প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পার তুমি, অ্যাঁ?'

স্ত্রীকণ্ঠ নীরব। কান্নার শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। এধারের বারান্দায় একলা অন্ধকারে ব'সে কে. গুপ্ত তখনো অবিশ্রাম হপ্‌কিন্স আওড়াচ্ছে: Beauty......

মশার কামড়, রাত্রির হিম, এঘর ওঘরের কটূক্তি, কিছুই তাকে নিবৃত্ত করছে না। সুপ্রভা সব দেখছে শুনছে, কিছু বলছে না। দারিদ্র্যের প্রথম অবস্থায় হিম ও শিশিরের ফোঁটাকে সে ভয় করত। কিন্তু যখন দেখলে সমুদ্রে তার শয্যা বিছানো হয়েছে তখন আর এসবে সে ভয় করে না। আগে স্বামীর যেটুকুন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তা বাড়ির বাইরে থেকে যেত, বাড়িতে এলে সেটা আর প্রকাশ পেত না। এখন ঘর বাইর সমান ক'রে ফেলেছে গুপ্ত। কেবল কি স্বামী, এতবড় মেয়ে বেবি ধারে দু'পয়সার নুন আনতে, একটু চা খেতে রাতদিন হন্যে কুকুরের মত এখানে ওখানে ঘুরছে দেখে সুপ্রভা চুপ করে আছে, চোখ বুজে আছে। হাল ভেঙ্গে গেলে নৌকা স্রোতের টানে ভেসে যায়, তলিয়ে যায়, এ তো জানা কথা। সুপ্রভা প্রতিবাদ করবে কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে ?

ছয়

'পাখি সব ক'রে রব রাতি পোহাইল নয়', শিশুদের কলরবে এখানে রাত্রি প্রভাত হয়। যে-ঘরের শিশুরা পেটপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছিল সকালে উঠে আবার খাবে বলে তারা চিৎকার করতে থাকে। যে-ঘরের শিশুরা রাত্রে অভুক্ত থেকেছিল, রাত ভোর না হতে তারা তো কাঁদবেই। আর সেই কান্না থামাবার জন্য চলে কিল চড় চোখরাঙানি। ঘরে ঘরে চিৎকার প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু খেয়ে ঘুমোক কি না খেয়ে রাত কাটাক, সকালে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাচ্চারা খাওয়ার কথা ভুলে থাকে তার একটা সুন্দর উপায় আবিষ্কার করেছে বিধুমাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি। হাজার রকমের ছড়া তার মুখস্থ। 'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে'; 'হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম'; গর্দভ সাইকেলে চড়ে বর্ধমান যায় ইত্যাদি হাল্কা ছড়া থেকে আরম্ভ করে আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর অথবা দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী প্রভৃতি গুরুগম্ভীর গান, কবিতা লক্ষ্মীমণির ছেলে-মেয়েরা সুন্দর গাইতে পারে, আবৃত্তি করতে পারে। লক্ষ্মীমণি আগে আগে বলে যায়, সন্তানেরা মাকে অনুসরণ করে। এমন কি যে শিশুটি কথা বলতে পারে না, সেটিও মার বুকের দুধ খাওয়া ভুলে গিয়ে ভাইবোনদের মতন আওড়ায় আ ট্রিম ট্রিম দিম দিম···তারপর একটু ফরসা হতেই লক্ষ্মীমণি শয্যাত্যাগ করে। বলতে কি এবাড়িতে সকলের আগে বিধু মাস্টারের স্ত্রী ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে উঠোনে নামে। ততক্ষণে ঝাঁটা হাতে মেথর এসে গেছে। এবং উঠোনে কেউ জল দিক না দিক তার জন্য অপেক্ষা না ক'রে দড়ি-বালতি নিয়ে লক্ষ্মীমণি পাতকুয়ার দিকে ছুটে যায়, তারপর বালতি বালতি জল এনে উঠোনে নর্দমায় ঢালতে থাকে আর চড়া গলায় মেথরকে হুকুম দেয় এ জায়গা সাফ কর, ওখানে শ্যাওলা জমেছে ভাল করে ঝাঁটা মার, উঁহু হল না, ময়লা রয়ে গেছে এধারটায়। জল ঢালতে লক্ষ্মীমণির এতটুকু আলস্য নেই। বরং এ-কাজে তার উৎসাহ বেশি। অথচ পালা করে সব ঘরের বৌ ঝি-র এক-দিন একদিন মেথর এলে বাড়ির উঠোনে নর্দমায় জল ঢালার কথা। কাল রমেশ

গিন্নীর জল ঢালার পালা ছিল। কিন্তু আলস্যবশত হোক কি পায়ে একটু বাতের জোর হয়েছিল বলে হোক তিনি বেলা না হওয়া তক শয্যা ছেড়ে উঠেন নি। তাই বলে উঠোন ধোয়ানো বাকি থাকে নি, লক্ষ্মীমণিই বালতি বালতি জল ঢেলে সে-কাজ করিয়েছে। আজ জল ঢালার পালা কমলার। কিন্তু কমলার ঘুম ভাঙছে না। মেথর এসে ডাকাডাকি করতে লক্ষ্মীমণির আর শুয়ে থাকা হয় না। অর্ধেক উঠোন ধোয়ানো হয়ে যাবার পর দোর খুলে বেরিয়ে আসে কমলা। হাতে টুথ ব্রাস, তোয়ালে সাবান। লক্ষ্মীমণি জল ঢালছে দেখে কমলার মুখখানা হাসিতে ভরে ওঠে, 'আহা, আমার উঠতে দেরি হয়ে গেল। দিদি আজও জল দিচ্ছেন।'

'তাতে কি।' সবগুলো দাঁত বার করে লক্ষ্মীমণি হাসে। 'আর একদিন ঢালবেন, আজই তো জল ঢালা শেষ হল না। আজ না হয় আমিই ধুইয়ে দিলাম।'

'সত্যি দিদির একাজে আলস্য নেই।' কমলা উঠোনে নেমে আসে। 'আজ সকালে আমার এখানে আপনার চা খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল।'

'আহা, একটুখানি জল ঢেলেছি কি না ঢেলেছি তো আবার,—বেশ, নেমন্তন্ন করেছেন যখন সেটা রক্ষা করবই। আমার এত গুমোর নেই। আমি সকলের ঘরেই যাই, সবার সাথে মিশি।'

'তা কি আমি জানি না, তা কি আর চোখে দেখছি না।' কমলা মুখে দাঁতন গুঁজল। 'আমি এক্ষুণি মুখ ধুয়ে এসে স্টোভ ধরাচ্ছি। চট্ করে জলটা ঢেলে দিয়ে আপনিও মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।'

'মতলববাজ, ভয়ানক ফাঁকিবাজ মেয়েটা।' শিবনাথ রুচির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় হাসে। রুচি বলে, সংসারের নিয়মই তাই। কৌশলে মানুষ মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এক কাপ চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করল, তার মানে আর একদিন জল ঢালার পালা এলে আবার বেলা করে শয্যা ত্যাগ করবে, তারপর উঠোন ধোয়ানো শেষ হলে দোর খুলে বেরিয়ে এসে হেসে বলবে, 'দিদি আহা, এ কি করছেন। যাকগে, আপনার সকালের চা-টা আমার এখানেই হবে।'

একটা চোখ বুজে শিবনাথ আরো জোরে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসে, 'যা বলেছ। তুমিও ঐ করবে। বাব্বাঃ, এত বড় উঠোনে বালতি বালতি জল ঢালতে হলে হয়েছে আর কি। তার চেয়ে যদি এক বাটি চা ঘুষ দিয়ে ডিউটিটা মাস্টারের বৌয়ের ঘাড়ে চাপাতে পার,—মন্দ কি।' রুচি কথা বলল না স্বামীর প্রস্তাবটা সে অনুমোদন করতে পারছে না। মুখের এমন ভান করে দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মীমণির জল ঢালা দেখতে লাগল। শিবনাথ ঘাড় বাড়িয়ে রুচির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল 'ছেলেমেয়ে হবে মহিলার।'

'হুঁ। রুচি মুখ না সরিয়ে উত্তর করল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

'সাত আট মাস এটা ওঁর। তার কম হবে না, কি বল?'

রুচি শিবনাথের কথার জবাব দিলে না।

শিবনাথ স্ত্রীর কানের কাছ থেকে মুখ না সরিয়ে গুজগুজ করে হাসল। 'সাংঘাতিক মেয়ে, বাবা! এ সময়েও এত জল ঢালতে পারে।'

'কি করবে, আর কেউ উঠোনে জল দেয় না দেখে ওকেই ঢালতে হচ্ছে, উপায় কি! উঠোন ধোয়ানো তো আর ফেলে রাখা যায় না।'

'আহা সে কথা হচ্ছে না।' শিবনাথ অবশ্য হাসি বন্ধ করল না। 'বলছিলাম এই অ্যাডভান্‌সড স্টেজে এমন পরিশ্রম সবাই করতে পারে না। এত বড় উঠোনে জল ঢালা কি মুখের কথা!'

রুচি নীরব।

'বস্তির মেয়েরা এসব কাজ খুব পারে। পুঁই মুলোর ঘণ্ট খেয়েও গায়ে কেমন জোর রাখে দ্যাখো।'

রুচি চোখ বড় ক'রে শিবনাথের দিকে ফিরে তাকাল। একটা বিস্ময়, একটা বেদনা সেই চোখে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা জিনিস ছিল রুচির তাকানোর মধ্যে। ভৎর্সনা। শিবনাথ সেটা ধরতে পারল কি। তখনো সে দাঁত বার ক'রে হাসছে। অগত্যা চোখের ধার কমিয়ে রুচিও বেশ একটু মোটা ক'রে হাসল। 'ভালই তো হ'ল। আস্তে আস্তে এখানে থেকে আমার গায়েও এমন জোর আসবে, এদের মত শক্তসমর্থ হয়ে উঠব।'

এবার শিবনাথ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'কিন্তু তাই ব'লে তুমি তো আর ছেলেমেয়ে পেটে ধরছ না। তুমি প্রমিজ করে বসে আছ ওই একটিই যথেষ্ট, আর না। কাজেই তোমার এ-অবস্থা আর হবার ভয় নেই।'

রুচি নীরব। স্থির চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তা ছাড়া এখানে এই বাড়িতে যে আমরা চিরকাল থাকতে এসেছি তা-ই বা তোমাকে কে বললে। বলছি তো আমার একটা সুবিধা হলেই—'

'লক্ষ্মীমণির স্বামীও ছ'বছর ধরে চেষ্টা করছে এখান থেকে নড়তে। পারেনি।' অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় কথাটা বলে রুচি শয্যাত্যাগ করল। মঞ্জুর ঘুম ভেঙ্গেছে। কাঁদছে না ঠিক। চোখ ছলছল করছে, পাশের কোন্‌ ঘরের উনোনের ধোঁয়া গলগল ক'রে এঘরে এসে ঢুকে চোখ কানা ক'রে দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ওর চোখে জল এল বুঝি।

'ডেন'—মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন অসহায় চাপা গলায় শিবনাথ গর্জন করে উঠল। 'এই নরকে বেশিদিন বাস করলে টি. বি. না হয়ে যায় না। যত শীগ্‌গির সম্ভব আমাদের এখানকার আস্তানা গুটোতে হবে।'

'কিছু হবে না।' রুচিও উনুনে আঁচ দেবার উদ্যোগ আয়োজন করছিল। 'থাকতে থাকতে সব সয়ে যায়। এখানে আর দশটি শিশুর মত মঞ্জুরও ধোঁয়াটোয়া সয়ে যাবে।'

রাগ ক'রে রুচি কথাগুলো বলেছে কি না মঞ্জুকে কোলে নিয়ে হাত দিয়ে ওর চোখ মোছাতে মোছাতে শিবনাথ ভাবে।

আর এবাড়িতে নতুন ভাড়াটের সঙ্গে যেচে সকলের আগে আলাপ পরিচয় করে লক্ষ্মীমণি। কাল নিতান্তই পথে পরিচয় ক'রে কমলা আগে ভাগে রুচির ঘরে ঢুকে জমিয়ে ফেলেছিল, কতকটা এই কারণে, আর সারাক্ষণ শিবনাথ রুচির প্রায় গায়ের

সঙ্গে লেগেছিল ব'লে লক্ষ্মীমণি ওধারে ঘেঁষেনি।

না হলে পরিচয় করতে আলাপ জমাতে লক্ষ্মীমণি সকলের চেয়ে বেশি ওস্তাদ।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর শিবনাথ একটু বেরিয়েছে কি লক্ষ্মীমণি ভিজা কাপড়ে রুচির ঘরে এসে ঢুকল। 'আমার সংসারের খাওয়া-দাওয়া শুরু ও শেষ হ'তে সেই বেলা তিনটা। বলে কিনা রাবণের ঝাঁক।'

আলাপের শুরুতেই বিধু মাস্টারের বৌ হাসল। 'দিদির ছিমছাম সংসার দেখলে চোখ জুড়ায়।'

বিছানায় সবে একটু কাত হয়ে শুয়ে মঞ্জুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে রুচি একটু ঘুমের চেষ্টা করছিল। কাল জিনিসপত্র টানা-হেঁচড়া পথের কষ্ট, এখানে এসেই আবার নতুন ক'রে সব গুছানো সাজানোয় রুচি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এরকম হবে ও জানে। তাই স্কুলে বাড়ি বদলের জন্য পুরো দু'টো দিনের ছুটি চেয়ে নিয়েছে।

হেসে রুচির ঠোঁটের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে লক্ষ্মীমণি বলল, 'দিদির পান খাওয়ার অভ্যেস নেই?'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর ক'রে বেশ সতর্ক চোখে রুচি তিন নম্বর ঘরের প্রতিবেশিনীকে দেখতে লাগল। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দিকে প্রথমটায় সব মেয়েই যেমন সতর্ক ভয়ে তাকায়।

'কি দেখছেন?'

রুচির দেখা শেষ হয়ে গেছে এমন একটা সময় অনুমান ক'রে লক্ষ্মীমণি খুক্ করে হাসল।

'আগো দিদি, হাসিও পায় দুঃখও লাগে। কিন্তু করব কি। বলে কিনা, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, স্বামী মোদের ধর্ম।'

মেয়েমানুষ রুচি, তাই ওই একটা প্রসঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে উঠেছে ভেবে তেমনি খুকখুক ক'রে হাসতে হাসতে লক্ষ্মীমণি মাথাটা নুইয়ে উপবিষ্ট রুচির মাথার সমান্তরালে এনে ফিসফিস করে বলল, 'কি ক'রে পারেন বোন, সত্যি আপনাদের দেখলে দেবতা মনে হয়। কিন্তু কি করব। সংসারে তরী চালাবার হাল যার হাতে, সে যদি অবুঝ হয় তো আমি স্ত্রীলোক করব কি, করবার কে। আসে আসুক? বার্লি খেয়ে বাচ্চা বড় হচ্ছে দেখতে যদি অসাধ্য না লাগে, হোক না একটার পর একটা। এই নিয়ে আমার তেরো বার গর্ভ হ'ল। বয়েস? আমি আপনার চেয়ে বড় হব না দিদি।'

যেন কথার শেষে হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনল রুচি। চমকে নবপরিচিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যি সেখানে হাসি নিভে গেছে, মেঘলা আকাশের মত মুখখানা করুণ থমথমে।

'আপনি বসুন।' এই এতক্ষণ পর রুচি যেচে আলাপ করতে আসা ভদ্রমহিলাকে বসতে বলল।

'না দিদি, বসব না। নেয়ে এলাম, ভিজে কাপড় পরনে।'

দেখা গেল সেসব ভাবনা ধরাবাঁধা সৌজন্যতার পালিশ রক্ষার মাথাব্যথা বিধু

মাস্টারের স্ত্রীর তিলমাত্র নেই। সহজ ঠাণ্ডা হাসি হেসে মুখের গুমোট মেঘটা কাটিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদির ওই একটি মেয়েই বুঝি। সাত বছরে পা দেবে দেখে বেশ মনে হ'ল। আর বুঝি চান না ?'

রুচি গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল।

এবার যেন লক্ষ্মীমণি একটু সতর্ক হ'ল। এবং সেভাবেই আলাপটা গড়াতে দিলে। 'খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে আপনার ?'

'হ্যাঁ।' রুচি মাথা নাড়ল এবং চুপ ক'রে রইল।

'কর্তা আপিসে বেরোলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।' রুচি মিথ্যা কথাই বলল।

'আপনাদের রেশন কার্ড করিয়েছেন ?'

'না।' রুচি বলল. 'এদিকে শুনছি ব্ল্যাকে খুব চাল পাওয়া যাচ্ছে ?'

'জানি না দিদি।' আলাপটা বড় বেশি ঘষামাজা। পরিচয়ের মধ্যে ফাঁক রাখতে চাইছে অনুমান করে লক্ষ্মীমণি চেহারা কেমন অপ্রসন্ন করে তুলল।

'মাস্টার মানুষ। সরল সিধা লোক। ব্ল্যাক-ফ্ল্যাক জানেও না। যাবেও না এই পথে। ঠিকা ঝিকে পাকা ঝি নাম লিখিয়ে দশখানা রেশন কার্ড করিয়েছি। ঠিকে ঝি-ও অবশ্য বেশিদিন রাখতে পারলাম না দিদি। একলা হাতে এখন সব করি। তা কি বলছিলাম। হ্যাঁ রেশন। না ব্ল্যাক কেন। দশখানা কার্ডের সব চাল আনলে আমার সংসার খেয়ে তুষ্ট থাকে। কর্তা নিয়মের বাইরে পা বাড়ান না। সেই দশখানা কার্ডের সব চাল কেনবার টাকা কি আমাদের মত গরীব লোকের ঘরে সব সময় থাকে দিদি। দু' হপ্তা পুরো রেশন আনি, দু' হপ্তা অর্ধেক। তাই তো বলছি, খুব কাজের কথা দিয়ে আলাপটা আরম্ভ করেছিলাম দিদি, খুব বেঁচে গেছেন। আমাদের মত লোভী বেড়াল নন যে ভাজা খাবার আশায় আশায় বার বার গরম কড়ায়ের দিকে জিভ বাড়াবেন, আর জিভ পুড়িয়ে কালো করবেন। স্বামী-স্ত্রীর জীবন কি আর সুধার ভাণ্ডার আছে দিদি, পোড়ার যুদ্ধের আগুন লেগে সেই যে হাঁড়ি গরম হয়ে আছে আর ঠাণ্ডা হচ্ছে না। ছেলেমেয়ে কম থাকলে বা ছেলেমেয়ে না থাকলে ঘরদুয়ার ঝলমল করে ; কত ভাল লাগে দেখতে জামা-কাপড়, জুতো-গামছা, বাসন-কোসন, বিছানা পাটি। কি নাম আপনার খুকুর ? হ্যাঁ, মঞ্জু। খুকির বাবাকে তখন ডাকতে শুনলাম।' একটু থেমে লক্ষ্মীমণি বলল, 'খুকির বাবা কোন আপিসে চাকরি করেন দিদি ?'

রুচি একটা মিথ্যা আপিসের নাম বলল ও চুপ ক'রে রইল।

খুব বেশি না, তবু খানিকটা সতর্কভাবে পা বাড়াবার মতন ক'রে লক্ষ্মীমণি বলল, 'আমাদের কর্তা আর আপনার কর্তা বয়সে খুব বেশি বেশকম হবে না। তখন আমার বড় মেয়ের কামিজটায় সাবান মাখাতে পাতকুয়োয় যেতে যেতে দেখলাম। একটা আধটা চুল পেকেছে কানের ধারে। কেমন দিদি, আপনার ওঁর বয়েস পঁয়ত্রিশের ওপরে গেছে—খুব ভুল আন্দাজ করলাম কি।'

শিবনাথের বয়স যথার্থ আন্দাজ করতে কৃতকার্য হয়েছেন আশ্বাস দিয়ে যেন

একটু করুণা ক'রেই রুচি মহিলাকে প্রশ্ন করল, 'কোন হসপিটালে যাচ্ছেন? ধারে-কাছে রাত-বেরাতে বেড খালি পাওয়ার সুবিধা আছে তো?'

'তা দিদি থাকেই।' এবার গালভরা হাসি হেসে লক্ষ্মীমণি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন হঠাৎ মুহুর্মুহু দু-তিনবার রুচির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। পরে যেন কিছুটা হতাশ হয়ে বলল, 'না থাকলেও ওরা ক'রে দেয়। কংগ্রেসের আমলে আমার তো মনে হয় দিদি অই একটা বিষয়ে সুবিধা হয়েছে। ফেরায় না কাউকে। খাট খালি না থাক, মেঝেতে শুতে দেবে। দেশী লোক এখন সব হাসপাতালে হাসপাতালে কাজ করে, নার্স চৌদ্দ আনা বাঙালী মেয়ে। মার ব্যথা বোনের ব্যাথা ওরা বোঝে। মাছ দেয় না এখন আর, তবু পেট ভরে তিনদিন বিউলি ডাল পুঁই শাক খাওয়ায়। গরীব দেশ, পারবে কোথায় মাছমাংস খাওয়াতে। শুনি তো বলাবলি করে সব। আর তিন দিনেই খালাস দেয়। তা দিদি, আমার ত মনে হয় ভাল করে ওটা। সাতদিন ধরে রাখলে আমাদের কত লোকের সংসারে এদিকের কি হ'ত? আমার রাণী যখন হয়, মমতা সাত বছরের। ও পারে নিচের ছোট ছোট পাঁচটা ভাই-বোনকে সামলাতে? তবু তো কর্তা সাতদিন ইস্কুলে ছুটি নিল। নিজের হাতে রাঁধল বাড়ল, অজয়কে শশাঙ্ককে হিরণকে নীলিমাকে রোজ দুপুরবেলা নাওয়াল খাওয়াল, নিজে ঘুমিয়ে ওদের ঘুম পাড়াল। রাত্রে পারেনি, রাতে ট্যুইশনি ছিল। তখন মমতা একলা হাতে সব করেছে, গুছিয়েছে। এদিক থেকে আমি সুখী দিদি। বরং কর্তা যদি আর ক'টা দিন বেশি ছুটি পেত, দিন পনরো হাসপাতালে পড়ে থাকতেও আমার খারাপ লাগত না। আ, চারিদিকে খালি ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ—সে এক মজা দিদি,—সেই এক দৃশ্য! আর নার্সদের ধমক। চুপ করান শিশুকে, বাচ্চা সামলান। শিশু পেটে নেই আপনার এখন মনে রাখবেন। হাত পা অসাবধানে নাড়াচাড়া করলে, হুঁশ না রেখে ঘুমোলে শিশুর কি অবস্থা হয়, কাল সকালে উঠে দেখবেন। চ্যাপটা হয়ে দলা পাকিয়ে একেবারে আমসি।' বলে হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে হাসতে প্রায় রুচির গায়ের ওপর ঢলে পড়ে লক্ষ্মীমণি। কিন্তু রুচি তা হতে দিলে না। খাট ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কারণও ছিল। ঘরে আর দুটি মেয়ে এসে ঢুকেছে। কমলা আর প্রীতির ছোট বোন বীথি। দুজনকে দেখে লক্ষ্মীমণিরও হাসি এবং কথা হঠাৎ একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

'আমরা শুনেছি। আর চুপ থাকছেন কেন।' যেন চোখ বড় ক'রে কমলা নার্স বিধু মাস্টারের স্ত্রীকে শাসালো।

'কেবল হাসপাতাল আর হাসপাতালের গল্প। ছেলে হওয়া আর বাচ্চা হওয়ার ঘ্যানঘ্যানানি। বাপ্‌রে বাপ, হাসপাতালে গিয়ে গিয়ে আর সাধ মেটে না!'

বীথি ঠিক শাসালো না। খোঁচা দিলে। মেয়েটিকে দেখে রুচির মনে হ'ল উনিশ-কুড়ি হবে বয়স। পরনের কাপড়টা একটু ময়লা। কিন্তু তা হলেও বেশ টেনেটুনে ঘুরিয়ে পরা। সবুজ আঁচলটা পিঠ থেকে আলগা হয়ে কাঁচা কচি ধানের ছড়ার মতন ঝুলছে। যেন আঁচল ঝুলিয়ে কথা কওয়াতেই ওর আনন্দ। তাই কথার সঙ্গে কোমরটা ঈষৎ আন্দোলিত করছিল মেয়েটি। খুব মৃদুভাবে প্রায় দেখা যায় না

মতন করে। রুচি দেখল, বিধু মাস্টারের স্ত্রী দেখল না। কেন না বীথির কথার খোঁচায় লক্ষ্মীমণি সেই যে মাটির দিকে চোখ নামাল, আর চোখ তুলতে পারলে না। 'আপনাদের মতন মূর্খ মায়েরা এখনো অনেক অনেক আছেন বলে এ-জাতটা আজ ভাল হাতে ডুবছে। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলে কি হবে। কুড়িতে পা দিতে ছটির মা হওয়া, ছিঃ।'

বলতে বলতে বীথি নিজেই লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে তিন হাত দূরে, অর্থাৎ টিনের বেড়াটা ঘেঁসে দাঁড়াল, একটা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে।

'বীথির বাড়াবাড়ি এটা। বেশি পাকামি।' কমলা একটু ধমকের সুরে বলল, 'শত হলেও তিনি তোর মার বয়েসী। তোর মা আর লক্ষ্মীদি সমান হবে।' কথাটা বলে ফেলেই অবশ্য কমলা ঠোঁট টিপে হাসে আর আড়চোখে লক্ষ্মীমণিকে একবার দেখে রুচির দিকে তাকায়। কিন্তু রুচি গম্ভীর। রুচি লক্ষ্য করল লক্ষ্মীমণির মুখ পাংশু হয়ে গেছে। মহিলার জন্য রুচির কেমন কষ্ট হ'ল। একটু পর তিনি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'আহা, সেজন্য কি আর মাকে আমরা কম কথা শোনাই।' ভুরু উঁচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বীথি তখন কমলাকে বলছে, 'দিদি আর আমি রাতদিন বলছি, কী দরকার ছিল আমাদের এতগুলো ভাইবোন দিয়ে. কী লাভ হ'ল চারগণ্ডা ছেলেমেয়ে সংসারে এনে। গায়ের কাপড় নেই, পেট ভরে খেতে পারছে না। এসব মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না।'

এবার কমলাও গম্ভীর।

একটু চুপ থেকে বীথি বলল, 'যাকগে, আমার কাজের কি করলে কমলাদি বলো, সেজন্যই তোমাকে ডেকে নিয়ে এলাম। মার সঙ্গে আজ সকালেও খুব ঝগড়া করলাম।'

'কেন?' কমলা বীথির চোখে চোখ রাখল।

'দিদি যে-টাকা ঘরে আনে তাতে তেরো দিনের বেশি চলে না। তারপর থেকে সারা গুষ্টি উপোস চলে। মা বলছিল আমাকে একটা কাজে ঢুকে পড়তে। বললাম, ট্রেনিংয়ে আছি. আর মাস চার বাকি আছে। কিন্তু ঐ যে বলে রাঁধতে সয়, বাড়তে সয় না। আমাদের অবস্থা তাই। চার মাস অপেক্ষা করার উপায় নেই। মার ইচ্ছা আজই আমি কোন আপিসে-টাপিসে ঢুকে পড়ি।'

'কেন, প্রীতি পারলে না তোকে ওর আপিসে ঢোকাতে। অনেকদিন তো ও টেলিফোনে আছে।'

'টেলিফোনে শীগ্গির ছাঁটাই আরম্ভ হবে শোনোনি বুঝি? এখন আর নতুন লোক নিচ্ছে না। তা ছাড়া—' বীথি হঠাৎ থামল।

'কি বল্।'

'আমি ম্যাট্রিক পাশ নই তুমি জানো, সেজন্যেই আরো বেশি অসুবিধা হচ্ছে। আপিসে ঢুকতে কি আর আমি চেষ্টা কম করছি। মা সেসব জানে না, বাড়িতে ব'সে থেকে দেখে না। ভাবলাম, এমনি যখন সময় যাচ্ছে, তার চেয়ে বিনি পয়সায় গুরু-ট্রেনিংটা নিয়ে রাখি। টাইপরাইটিং শিখতে পারতাম, কিন্তু তা শিখতে পয়সা লাগে।'

'কত আর পয়সা লাগে' কথাটা প্রায় বলতে বলতে কমলা থেমে গেল, ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখি আমি তোর জন্যে চেষ্টা করছি, সুবিধা হচ্ছে কোথায়।' যেন হঠাৎ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে কমলা রুচির দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল, 'আপনার আজ ছুটি ?'

রুচি মাথা নাড়ল।

'খাওয়া-দাওয়া শেষ ?'

রুচি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, 'বসুন।'

কিন্তু কমলা বসল না। ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। 'ও, আপনিও এই সাবান গায়ে মাখেন ?' ঘরে সেল্ফ নেই। একটা কাঠের বাক্সের ওপর পুরোনো খবরের কাগজ বিছিয়ে রুচি তেলটা সাবানের কেসটা কোনোরকমে রাখতে পেরেছে। কমলা সেই বাক্সটার সামনে দাঁড়িয়ে। বীথিও সরে গিয়ে সেখানে দাঁড়ায়।

'কি সাবান ?' বীথি কেসটার দিকে হাত বাড়ায়। কমলা বলল, অনেক দাম একটা কেকের। তোমাদের এই খালপারের দোকানে এসব পাবে না।' এমন সুর করে কথাটা বলল কমলা এবং ভুরু ও চোখের এমন ক্ষুরধার ভঙ্গি করল যে, এই সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করতেই যেন বীথি সাহস পেলে না। কমলা রুচির দিকে চোখ ফেরালো। 'যাকগে আপনার সঙ্গে আমার অন্তত একটা দিকে রুচির মিল আছে। সত্যি, আছি বটে এ-বাড়িতে, কিন্তু ঐ এক প্রীতি ছাড়া কারো সঙ্গে মিশব, দুদণ্ড বসে কথা বলব এমন মানুষ পাই না। লোটেস্ট, বুঝলেন ভয়ানক লোটেস্ট এখানকার মানুষের। ইচ্ছেই করে না কারো সঙ্গে কথা বলি।'

রুচি অবশ্য তখনো সাবানটার কথা ভাবছিল। এটা ওরা এখানে এসে কেনেনি। কবে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে থাকতে এক বাক্স পীয়ার্স সোপ কিনে এনেছিল শিবনাথ। তখন ওর চাকরি ছিল। দুটো অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। কৃপণের ধনের মত রুচি একটা কেক ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর একদিন ভুলে গেছে। ওর মনেই ছিল না। সব ভাল ভাল জিনিস বিক্রি করে হাতছাড়া করে খুইয়ে ফেললেও এমন একটা সম্পত্তি তার ঘরে এখনো আছে যে এই বাড়ির লোকেরা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। বাক্স-পেঁটরা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পরশুদিন এটা বেরিয়ে পড়েছে। দেখে রুচি যত খুশি হয়নি, শিবনাথ হয়েছে তার চতুর্গুণ। তৎক্ষণাৎ ওটা, যেন সন্দেশ পেয়েছে, রুচির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে শিবনাথ নিজের কেসে পুরেছে। সাবান দেখে কমলার হঠাৎ খুশি হওয়ায় রুচির এখন সেই কথা মনে পড়ল।

'ঐ যে বলে পাঁকে থাকি তবু পাখায় তা আটকাতে দিই না, সেই হাঁসের মতন কোনোরকমে এই বস্তিতে বেঁচে আছি আর কি।' কথার শেষে কমলা খিলখিল হাসল। রুচি চুপ। অবাক হ'ল সে ভেবে তবু কেন কমলা দিনের পর দিন এখানে আছে, কী উদ্দেশ্য,—আর কোথাও ভালভাবে বাস করার সংস্থান ওর আছে যখন। কিন্তু কমলা যেমন তার কারণ বলে না, বলবে না কাউকে, রুচিও সে-প্রশ্ন করা থেকে নিবৃত্ত রইল।

'ঘরে ডিসইনফ্যাকটাণ্ট মানে, ফিনাইল লাইজল কিছু রেখেছেন তো? ফ্লিট আছে?'

'হ্যাঁ।' রুচি সংক্ষেপে উত্তর করল।

'উঃ, মাছি, কী ভীষণ মাছি এখানে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একটু গরম পড়লে দেখবেন। আলপিনটি রাখবার জায়গা থাকেনা কোথাও, মেঝে বারান্দা যেন মাছি দিয়ে বুনে রাখা হয়েছে এমন। তেমনি মশা। রাত বলে রাত, দিনের বেলাই কামড়ে গায়ের চামড়া ঝাঁজরা করে দেয়। বাপ্! সেইজন্যে আমি যেদিন হাসপাতালে ডিউটি না-ও থাকে, ঘরে থাকি না, বেরিয়ে যাই, তাই বলে বেলেঘাটা চিংড়িঘাটায় কি আর থাকি! কোলকাতায় চলে যাই। ফুটপাতে ঘুরি। শহরের ফুটপাথেরও একটা চার্ম আছে, কি বলেন?' কমলা আবার খিলখিল হাসল।

রুচি হ্যাঁ না কিছু বলল না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ইনি। যেন টের পেয়ে কমলা একটু দমে গেল।

'কেবল মশা মাছি! গরমের দিনে টিন তেতে কী অবস্থা হয় বৌদিকে একবার ব'লে রাখো' বীথিও হাসে।

'হ্যাঁ, টিকটিকি আরশোলাগুলো পর্যন্ত টিকতে পারে না। কিছু পালিয়ে যায়, বাকিগুলো গরমে ভাজা হয়ে ঝুরঝুর ক'রে পড়ে মাথায় ঘাড়ে।'

রুচি এবার বিশীর্ণ একটু হাসল।

আবহাওয়া তরল হয়ে এসেছে টের পেয়ে বীথি হুট ক'রে কথাটা তুলল। এখানে হালে মেয়েদের একটা সমিতি করা হয়েছে। 'দীপালি সঙ্ঘ' এর নাম। বীথি সম্পাদিকা. আগে তার বড় বোন প্রীতি ছিল। কিন্তু টেলিফোনের চাকরিতে ঢুকে ও আর সময় পাচ্ছে না ব'লে বীথি ওটা এখন দেখাশোনা করছে। বড় মেয়ে এতে খুব বেশি নেই। ছোট মেয়েদের নিয়েই মুখ্যতঃ এই সমিতি। নাচ, গান. সূচের কাজ, রান্না, রুগীর সেবা ইত্যাদি সবকিছুই একটু একটু শেখানো হয়। কিছু বই রাখা হয়েছে। একখানা মাসিক পত্রিকা. একটা সাপ্তাহিক এবং একখানা বাঙলা দৈনিক কাগজ রাখা হচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট পারিজাতবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি রায়। কমলা বলল, 'আমার মনে হয় এ-ধরনের সমিতি সঙ্ঘ হওয়া খারাপ না। বড়দের মন বিষিয়ে গেছে। কিন্তু যারা কচি, যাদের মন এখনো বরফের মত সাদা, ছাপ পড়েনি কিছুর. হোক না ধনী হোক গরীব, এক সঙ্গে এক জায়গায় এসে মিশতে পারলে পরস্পরের ব্যবধানটা অনায়াসে ভুলে যায়। বীথির বোন কুঙ্কুমের গায়ে সুতীর জামা আর পাড়ার নিবারণ ঘোষের মেয়ে চম্পার গায়ে সিল্ক এটা তখনকার মত, যতক্ষণ সমিতির উঠোনে ছুটোছুটি ক'রে ওরা কানামাছি খেলে মনে রাখে না। পারিজাত একটু দাম্ভিক, কিন্তু দীপ্তি চমৎকার মানুষ। মিশুক, অমায়িক, অহঙ্কার নেই। এই ধরনের একটা সমিতি এপাড়ায় গড়ে উঠেছে শুনে নিজে থেকে ভাল টাকা চাঁদা দিয়েছে। এই বছরের জন্যে দীপ্তিকে প্রেসিডেণ্ট করা হয়েছে।'

'আমাকে কি করতে হবে?' কমলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রুচি প্রশ্ন করল।

'মানে কোন বাধ্যবাধকতা, জোর জুলুম নেই, যার যেমন খুশি, যার যতটুকুন সামর্থ্য সাহায্য করলে আমরা সন্তুষ্ট হই।' বলা শেষ করে বীথি পিঠের আঁচলটা আন্দোলিত ক'রে হাত দিয়ে কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিল।

'আট আনা এক টাকা যা খুশি আপনি দিতে পারেন, বিশ পঞ্চাশ দিলেও যে ওরা খুব পেয়ে গেছে বলে লাফাবে তা নয়,' কমলা রুচিকে বোঝাল, 'কেননা, টাকাটা ততটা না, যতটা আপনার সদিচ্ছা ও সহানুভূতির ভিকিরি ওরা।'

'অবশ্য এখুনি আপনাকে যে দিতে হবে তা নয়—সবে তো কাল এলেন। জানিয়ে রাখলাম। কমলাদিকে ধরে নিয়ে এসে আপনার সঙ্গে পরিচয় করলাম।'

বীথির চোখে চোখ রেখে রুচি বলল, 'বেশ, আমি সাধ্যমত সাহায্য করব। আমার পুরো সহানুভূতি আছে আপনাদের সমিতির প্রতি।'

কমলার হাত ধ'রে বীথি বেরিয়ে গেল। রুচি হাল্কা নিশ্বাস ফেলল। না, এখানকার সবটাই মাছি মশা নোংরা, বছর বছর সন্তানের জন্ম দেওয়া, দারিদ্র্য, কলহ, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতায় ভরা নয়। আলো আছে, আলোর একটা শিখা যেন কতক্ষণের জন্যে চোখের সামনে তুলে ধরে গেল ন'নম্বর ঘরের মেয়েটি। বীথির গায়ের ময়লা রং বেশভূষার মলিনতা সত্ত্বেও ওর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি, ভ্রূরেখার উদ্ধত গরিমা বেশ কিছুক্ষণের জন্য রুচির চোখের সামনে ভাসতে লাগল। শিক্ষা, সুযোগ, যত্ন ও স্নেহ পেলে আরো ভাল হ'ত, একটা কিছু করতে পারত ওই মেয়ে, মনে মনে বলল রুচি।

কিন্তু একটু পর তার এই বিমুগ্ধ ভাব কেটে গেল। শুনল কোন্ ঘরে কে চিৎকার করছে। আর একজন কাঁদছে যেন। রুচি কান খাড়া করল।

'মুখপুড়ি! মার বয়সী তাকে অসম্মান করতে পারিস তুই, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। এই কি তোর সমিতির শিক্ষা। না না এসব হবে না, সেইজন্যেই বলছি একটা কিছুতে তুমি ঢুকে পড়ো, গরিব মানুষ আমি। ঘরে পয়সা আসা নিয়ে কথা। তোমার ভাই বোন উপোস আধপেটা থেকে দিন কাটায়, আর ওদিকে পারিজাতের স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে কেবলই সমিতি করবে, নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকবে, আমি হতে দেব না। ছি ছি, এত ভাল মানুষ লক্ষ্মীদি, তাকে তুই এসব কি বলেছিস, এ্যাঁ!'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল একজন।

রুচি অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও বুঝল না এই কান্না লক্ষ্মীমণির না বীথির। বাইরে একটা কাক ডাকছিল। কাদের ঘরে এখনো উনুন জ্বলছে। নতুন ক'রে কয়লা দিয়েছে যেন আবার, রাশি রাশি ধোঁয়া ঢুকছে জানালা দিয়ে। রুচি জানালা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সাত

সমস্ত সন্ধ্যাটা শিবনাথ খালপাড় ধ'রে হাঁটল। নতুন জায়গায় সে বেড়াতে এসেছে বটে, পরিচিত হতে চায়।

পরিচিত হওয়াও তার একান্ত দরকার।

আজকালই যে সে একটা চাকরি বাগিয়ে ফেলবে তার স্থিরতা নেই, আজকাল কেন, অনেকদিনেও না।

শহরের বাইরে চলে এসেছে, মানে কথায় কথায় এখন সে আর ডালহৌসী চৌরঙ্গীতে হাজির থাকতে পারছে না। একদিন যাতায়াতেই অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে যায়। অথচ কর্মস্থল তার সেখানেই।

তাছাড়া, এবার বাড়িবদলের পর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট ও কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই।

এখন থেকে তাদের বেশ কিছুদিন, রুচির মাইনে পাওয়া অবধি টাইট হয়ে চলতে হবে। এখানে হট্ করে ধার কর্জ পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। পাড়া প্রতিবেশী ?

এদের ওপর লোকে ভরসা করে বটে।

প্রতিবেশী, মানে বাড়ির অন্য ভাড়াটে থেকে শেষ দিকটায় শিবনাথ কিছু ধারকর্জ পায়নি এবং চায়ওনি। কেননা তার চাকরি নেই—একথা মুক্তরামবাবু স্ট্রীটের বাড়ির লোকেরা জেনে ফেলেছিল।

তবু পানের দোকানটায়, রাস্তার ওপারের মুদি দোকানে ধারে অনেকদিন পর্যন্ত শিবনাথ জিনিস এনেছিল।

এখানে এখনি সে-সব হবে না।

বাড়ির লোক ? যেন চৌদ্দ আনা ভাড়াটের অবস্থা শিবনাথ একটা রাত আর আজ এই সারাদিনে জেনে ফেলেছে।

কেউ না, কারো কাছে হাত পাতলে একটা আধলা ধার দেবে না। যদি হাজার বছরও শিবনাথ এ বাড়িতে থাকে এবং হাজার বছরও ওরা জানতে না পারে, শিবনাথ বেকার তবু না। বেড়াতে বেরিয়ে সে একথাটাই বেশি করে ভাবছিল।

একজনের আয়ে দশ পনরো বিশজন খাচ্ছে।

টেলিফোনে চাকরি করে একটা মেয়ের আয়ের ওপর ওর বাপ মা আর তিন গণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে চৌদ্দটা মুখ খাচ্ছে। মাস্টারের এগারোটা মুখ, (বারোটা হবে শীগ্‌গীর), ডাক্তারের পোষ্য বেশি না হলেও খুব যে একটা ভাল আয়, হালচাল দেখে শিবনাথ ভরসা করতে পারল না। বাড়ি ছাড়ছি, শহরে যাচ্ছি, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি ব'লে হোমিওপ্যাথ যতই লাফাক।

রাস্তার ওপর কাঁঠাল গাছতলায় আর একটা টিনের ঘরেই ডিস্‌পেন্সারী। সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নাম দেখে শিবনাথ চিনেছে। একখানাও পুরো নয়, আলমারীর নিচেটা ভেঙে গেছে ব'লে শিবনাথের সন্দেহ হয়েছে। কাঠ দিয়ে সামনের দু'দিকের মুখ বন্ধ ক'রে রাখা। ভাঙা আলমারীর ওপরের আধখানায় দু' সারিতে চার ছ' ডজন ওষুধের শিশি সাজিয়ে রেখে হোমিওপ্যাথের মাসিক রোজগারটা কত হবে শিবনাথ বেশ অনুমান করতে পারল। কৌতূহল বশত ডিস্‌পেন্সারীর দরজায় সে একবার উঁকি দিয়েছিল। শেখর ডাক্তার গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ছিল। ছ'পয়সা দামের বাংলা দৈনিক।

আর থাকে ওধারের ঘরে ফ্যাক্টরির ছেলে দু'টি। সকালে একটির কাজে বেরোনোর পোশাক দেখে, জুতোর রং দেখে শিবনাথ ধরে ফেলেছে ক'টাকা ডেইলী কামায় ছোঁড়া। আর একজন শীগ্‌গির ছাঁটাইয়ে পড়ছে শোনা যাচ্ছে।

আর থাকে সেই যে সাবান ফেরি ক'রে সংসার চালায়, সেলুনওলা এবং কে. গুপ্ত।

এক, কমলার অবস্থাই ভাল। শিবনাথের তাই ধারণা।

কেনই বা হবে না। শিবনাথ ভাবল।

খাটুনি বেশি বলে নার্সদের মাইনেও মোটামুটি ভাল হয়। অন্তত ইস্কুলের টিচারদের চেয়ে বেশি।

রুচির চেয়ে কমলা বেশি রোজগার করে। শিবনাথ কাল সন্ধ্যায় প্রথম দেখেই টের পেয়েছে। বেশভূষা এবং কথাবার্তায় কেমন একটু আভিজাত্যও আছে।

আর, স্বচ্ছল ওদিকের ঘরের রমেশের অবস্থা। শিবনাথ টের পেয়েছে।

কিন্তু লোকটার চালচলন এবং কথাবার্তা শুনে শিবনাথের মনে হয়েছে ব্যাটা শাইলক নাম্বার ওয়ান। অনুনয় বা ভিক্ষা নয়, বুকে ছুরি বসালেও হাতের মুঠ থেকে পয়সা ছাড়বে না, এমন। কেন জানি লোকটার ভুরু দেখেই শিবনাথের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

যদি কেউ ধার দেয়, অবশ্য দেবার ক্ষমতা থাকাটা খুব বড় কথা নয়, উদার ও মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গিই আসল। এবং এ বাড়ির একজনেরই তা আছে। কমলার। পোষ্য নেই। সিঙ্গল লাইফ। আনছে। খাচ্ছে। মেজাজটা ভাল, হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ অনুমান করল। দু'টো চারটে টাকা ঠেকে গেলে রুচি চাইতে পারবে।

হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ বেশ দূরে চলে যায়।

রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছের গুঁড়ি। আস্ত অথবা টুক্‌রো। ছোট ছোট টিলার মত স্তূপ ক'রে সাজিয়ে রাখা। শাল গাছ আছে, সেগুন, পলাশ, মহুয়া, সুন্দরী, জারুল। এত কাঠ দিয়ে কি হয়, কারা কেনে এবং কোথা থেকে এসব আসে ভাবতে ভাবতে শিবনাথ হাড়ের কল, চামড়ার কল পর্যন্ত চলে গেল। ধোঁয়া এ-তল্লাটে লেগেই আছে। শহরতলি পরিচ্ছন্ন, ফাঁকা, নির্ধূম, নির্ঝঞ্ঝাট থাকবে শিবনাথের আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখছে এখানে বসতি আরো বেশি, ধোঁয়া আরো গাঢ়। ট্রাম-বাস না থাকলেও ঠেলাগাড়ি ও মোষের ভিড়ে পথচলা কষ্টকর। তবু শিবনাথের হাঁটতে ভাল লাগছিল এইজন্য যে, কোমল নীলাভ বেশ বড়সড় আকাশের রুপোর পাতের মত এক চিলতে চাঁদ মাথার ওপর অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক দূর এগোবার পরও সে দেখতে পাচ্ছিল। চারতলা ছ'তলার বাধা ছিল না। গাছ এবং ইলেকট্রিকের খুঁটি থাকলেও তারা আকাশ ও চাঁদকে একেবারে ঢেকে রাখতে পারে নি। বরং পাতার ফাঁক দিয়ে, তারের নিচে দিয়ে চাঁদ ও আকাশকে আরো নতুন আরো সুন্দর ঠেকছিল। তারপর অবশ্য গাছের সারি শেষ হ'ল এবং আলোর খুঁটিগুলো আর দেখা গেল না। সেখানে আকাশ আরো বড়, চাঁদ আরো উজ্জ্বল। যেন জলের ওপর চাঁদ ঝুলছে। জ্যোৎস্নার ঝিলমিলে অনেকগুলো রেখা শিবনাথ একজায়গায় এক সঙ্গে দেখতে পেল। সল্ট লেক? কাগজে যা নিয়ে জোর লেখালেখি চলছে। এই

অঞ্চলের শীগ্‌গির ডেভেলপমেণ্ট হবে। এ-সম্পর্কে শিবনাথ নিশ্চিন্ত। তখন অবশ্য আর লোকে নাক সিঁটকাবে না, নিন্দা করবে না এখানে টিনের ঘরে কেন সে রুচিকে নিয়ে মঞ্জুকে নিয়ে থাকতে এল। ঘরের জায়গায় ঘর হয়তো থাকবে; কিন্তু বারোটা পরিবারের সভ্য সুশ্রী ও সুস্থভাবে বাস করার উপযোগী বারোখানা পরিচ্ছন্ন কামরা হবে তখন। এই বারান্দা থেকে ও-বারান্দা দেখা যায় না ; দেয়াল পার হয়ে তবে আর একটি ঘরের দরজা। হয়তো এটাই একটা খুব ফ্যাশনেবল্ ফ্ল্যাট বাড়িতে পরিণত হবে ভাবতে ভাবতে এবং তারপর, তখন অবধি কে কে এবাড়িতে থেকে যাবে যেন মনে মনে হিসাব করতে করতে শিবনাথ শরীরে মোচড় দিয়ে চাঁদ ও আকাশ পিছনে রেখে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরল।

রাস্তার পাশের অন্ধকার একটা গলি থেকে ছোট্ট মানুষটি বেরিয়ে এল। যথেষ্ট আলো না থাকলেও শিবনাথ প্রথম দেখেই চিনল। বিধুমাস্টার।

দুই হাত তুলে শিবনাথকে নমস্কার জানিয়ে মাস্টার আগে কথা বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, আপনি এখানে ?'

'হ্যাঁ, একটি ছাত্রীকে পড়াই।'

'কোন্ ক্লাশের।'

'ফার্স্ট ক্লাশে পড়ে। বেশ ইণ্টেলিজেণ্ট মেয়ে। আমি পড়িয়ে আরাম পাই। অথচ দেখুন, এতবড় লোকের মেয়ে। না, ধনী মেয়েরা লেখাপড়া করে না। রাতদিন আমোদ ফূর্তি গানবাজনা সিনেমা পিক্‌নিকে সময় কাটায়, বদনাম থাকলেও বিদিশা দত্ত অন্য ধাঁচের মেয়ে। আমার তো খুব ভাল লাগে। ও এবার স্কলারশিপ্ পাবেই।

কেন জানি একটু হাসতে গিয়ে শিবনাথ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, 'পড়ানো শেষ করে এখন বাড়ি ফিরছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ—না, আর এক জায়গায় আর একজনকে, ঠিক পড়ানো নয়। আকবরের প্যাসেজের দু'টো শক্ত লাইনের মানে বলে দিয়ে আসব। এই তো কাছেই।'

কে সে। ছাত্র কি ছাত্রী। ধনীর মেয়ে না গরিব। আকবরের প্যাসেজের মাত্র দু'টো শব্দের মানে ব'লে দেওয়ার জন্য মাসিক ব্যবস্থা কি—বেশ ইচ্ছা হ'ল শিবনাথের জানতে, জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু দেখা গেল, বিধুবাবু এক এক ক'রে নিজের সব বলতে শুরু করেছেন।

'চামেলী চ্যাটার্জি। বাবা কি এক কমার্স চেম্বারের চেয়ারম্যান। হাজার টাকার ওপর মাইনে। বিদিশার বন্ধু। যদি লেগে যায়। বিদিশা হঠাৎ আমায় সেদিন বলতে কথাটা খেয়াল হ'ল। বলল, আমার টিচার, আমাকে পড়াচ্ছেন পরিচয় দিয়ে চামেলীদের বাড়ি মাঝে মাঝে যাবেন। একটা দু'টো সাবস্টেন্স্ ট্রানশ্লেসন দেখেটেকে দিতে থাকুন, দু'টো ইংরেজী শব্দের মানে বলে দিয়ে আসুন। রাখবে,—আমার তো মনে হয়, বিশেষ—চামেলীর মা লোক ভাল। আপনার বয়েস হয়েছে, গরিব এবং আমাকে বেশ কিছুদিন ধ'রে পড়াচ্ছেন্ জানতে পারলে চামেলীর জন্যও রেখে দেবে। ও ইংরেজীতে বেশ কাঁচা।'

বিধুবাবুর ক'টা ট্যুইশানি হাতে আছে শিবনাথের জানতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু সে-সব প্রশ্ন না করে গম্ভীরভাবে বলল, 'চামেলীকে পড়িয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন বুঝি।'

'হ্যাঁ, পড়িয়ে ঠিক না, একটু দেখিয়ে। আকবরের প্যাসেজটা বেশ কঠিন। বিদিশাকে তিনবার sovereign কথাটার মানে ব'লে দিতে হয়েছে, তারপর মনে রাখল।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

'না, কই, একটা ছাড়া ট্যুইশানি জোটাতে পারলাম না। আর, কী ক'রে পারব। উকিল মোক্তার মার্চেণ্ট-অফিসের কেরানী সবাই কোমর কেছে ট্যুইশানি করতে লেগে গেছে, ওই যে বলে ডিমান্ডের চেয়ে সাপ্লাই বেশি। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রাইভেট টিউটর গজিয়েছে মশাই খালের এপারে ওপারে।'

শিবনাথ অল্প হেসে শুধু মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, সকালে তাই একটু এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু সুবিধা করতে পারছি কই।'

শিবনাথ চুপ।

'আপনি সল্টলেক পর্যন্ত হেঁটে এসেছেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'মর্নিং-ওয়াক একটু একটু আমিও আরম্ভ করেছি। যদিও উদ্দেশ্য ঠিক সেটা নয়'—যেন নিজের মনে কথাগুলো ব'লে পরে মাস্টার কতক্ষণ কি ভাবল, তারপর শিবনাথের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল 'আমরা পারব না, আমার নিজের কথা আলাদা। আমি না পারি করতে হেন কাজ সংসারে নেই, মানে রিক্সা টানতেও লজ্জা করবে না। কী করব, উপোসে তো মরতে পারব না। কিন্তু ওরা ভদ্রলোক, অতিরিক্ত বাবু হয়ে গেছে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের কথা বলছি মশাই।' হঠাৎ অসহায়ভাবে বিধুবাবু শিবনাথের দিকে তাকালেন 'কানুটাকে' আমি নিজে বলে, ওর মাকে দিয়ে বলেও পারলাম না রাজী করাতে। ফুলকপির সীজন এসে গেল। ধাপার ওধারে চাষীরা নিজেদের ক্ষেত থেকে তুলে আনে। সস্তায় ছাড়ে। হাতে ক'রে, দোষ কি যদি দু'চারটে মাথায়ও দিতে হয়, শেয়ালদা খুব বেশি দূর কি—প্রায় ডবল দামে এক একটা কপি বিক্রি করতে পারবি। নতুন ফসল। এই তো সবে বেরুতে আরম্ভ করেছে মশাই।'

'কানুর কত বয়েস?' হঠাৎ শিবনাথ প্রশ্ন ক'রে বসল। 'আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি।'

'তা আর প্রশ্ন করবেন না।' বিধুবাবু শিবনাথের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। 'ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম কি! বারোটি সন্তানের পিতা আমি। দু'টি মরেছে। দশটি জীবিত আছে। আর একটি শীগ্‌গির ভূমিষ্ঠ হবে।'

শিবনাথ নীরব।

'হ্যাঁ, কানু আমার বড় ছেলে।' বিধুবাবু বললেন, 'কিন্তু কথায় বলে—পণ্ডিতের ঘরে যত গাধা গরু জন্মায়। তিনবার হারামজাদা ম্যাট্রিক ফেল করেছে। তা চারবার

একলা তোকে চান্স্ দেব যে, আমার সে-সামর্থ্য কোথায় ? তার নিচে এতগুলো আছে। মমতা সাধনার এবার ফোর্থ সেকেণ্ড ক্লাস। কতগুলো বই লাগছে দু'জনের, কত টাকার ধাক্কা একবার হিসাব কর্তো ?'

'ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে ফ্রি-শিপ পাচ্ছে তো ?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'না, গেলবার এক সাবজেক্টে ফেল্ করাতে সাধনার ফ্রি-শিপ কাটা গেছে, সেই-জন্যেই তো আরো মুশকিলে পড়ে গেছি মশাই, পড়বেন না, দেখতেও উনি মেনকা উর্বশী নন—বিয়ে হবে না। তার চেষ্টাও করব না, যাক্গে সে-কথা হচ্ছে না, মাথায় এত গোবর থাকলে তুই কোন্ জন্মে ম্যাট্রিকের দরজা পার হবি আমি বুঝতে পারছি না'—আমার ক'টা ছেলেমেয়ে মশাই এমন হবে, মমতাটা একটু ভাল, তা-ও অঙ্কে ভীষণ কাঁচা, চানু আর সুমু কেমন হবে এখনো বলা যায় না। আরগুলো তো দুধের। ওরা আমাকে ভাল ক'রে ঠেকিয়েছে, বড় ছেলেটা আর বড় মেয়েটা।' যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে বিধুবাবু হঠাৎ দাঁতে দাঁত ঘষলেন।

শিবনাথ চুপ থেকে হাঁটতে লাগল।

'বাজারে গিয়েছিলেন আজ ? মাছ পেয়েছিলেন ?'

'না, সুবিধা হয়নি।' শিবনাথ একটু কাশল।

'চালানি ইলিশ আর চিংড়ি ছাড়া আমি তো কিছু দেখলাম না।'

শিবনাথ চুপ। বিধুবাবু প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তারকে ডিসপেন্সারীতে দেখলেন ?'

'না।' শিবনাথ বলল। 'দু একজন রুগী বসে আছে দেখলাম।'

'ঐ দু' একজনই।' যেন নিজের মনে বিধুবাবু হাসলেন। 'মশাই, চোখে ধুলো দিয়ে আর ক'দিন লোকের পয়সা খাওয়া যায়।'

শিবনাথ মাস্টারবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

'মশাই বলবেন না কারো কাছে। অবশ্য অনেকেই এখন জানে। শেখর হোমিও-প্যাথির 'হ' শেখেনি। ছিল ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্ক—এটা অবশ্য ওর মুখে শোনা,—আমার তো মনে হয় অর্ডিনারী লেজার ক্লার্ক ছিল। লেখাপড়ার দৌড় কত চেহারা দেখেই বুঝতে পারবেন। ব্যাঙ্কে কাজ করার সময় থেকেই নাকি হোমিওপ্যাথির চর্চা। আমি বিশ্বাস করি না। চাকরিটি খুইয়ে এসে এই ব্যবসা ধরেছিল। কথায় আছে না, যার নেই অন্যগতি সে ধরে হোমিওপ্যাথি।'—ব'লে বিধুবাবু বেশ শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন। শিবনাথ পিছনে ও দুপাশে তাকাল। ভদ্রলোকের পোশাক-পরা তেমন কাউকে দেখা গেল না। মুটে, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওলা এইসব। হঠাৎ শিবনাথের প্রায় কানের মধ্যে মুখটা ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে বিধুবাবু ফিসফিস করে উঠলেন। 'আমি কতদিন চোখে দেখিছি মশাই, স্পিরিটের সঙ্গে কলের জল মিশিয়ে ওষুধ ব'লে চালাচ্ছে। আর মানুষ অন্ধের মত তা পয়সা দিয়ে কিনে খাচ্ছে।'

'তাই নাকি !' শিবনাথ ফিসফিস করে উঠল।

'তাই কি না নিজের চোখে দেখবেন। থাকুন না। দু'দিন পারিজাতের খোয়াড়ে বসবাস করুন। আস্তে আস্তে জন্তু-জানোয়ারগুলোকে চিনতে পারবেন।'

কথা শেষ ক'রে বিধু মাস্টার শব্দ করে হাসেন। শিবনাথ চুপ থেকে হাঁটতে

লাগল। বিধুবাবুও কিছুক্ষণের জন্যে নীরব থেকে হাঁটেন। বাঁ-দিকের আর একটা গলির কাছাকাছি এসে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ান।

'আচ্ছা চলি।'

'চামেলীদের বাড়ি এসে গেছে বুঝি? এই রাস্তা?' শিবনাথও হাঁটা বন্ধ ক'রে দাঁড়ায়।

'হাঁ, আর একটু ভিতরের দিকে এগোতে হবে।' যেন কথাটায় তেমন জোর না দিয়ে বিধুবাবু তার চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা পাড়েন। 'আপনি আবার কথায় কথায় না বলে দেন, অবশ্য বললেও কিছু হবে না; আমার আপনার চেয়ে ঢের বেশী পুরু শেখরের গায়ের চামড়া। হবেই। হাড়কিপ্টে চশমখোর। একটা টাকা—বুঝলেন, পারতপক্ষে আমি ওর কাছে হাত পাতি না, তবু আজ সকালে একটু বাজার সওদা করব ব'লে অনেক ভেবে-চিন্তে ওর কাছে একটা টাকা কর্জ চেয়েছিলাম। টাকা তো দিলেই না, উল্টে ও আমাকে ইন্‌সাল্ট্‌ করলে।'

'কি রকম?' শিবনাথ ঢোক গিলল।

'বলে কিনা, মাসের দশ তারিখ না পেরোতে তোমরা সবাই এর-ওর কাছে ধার করতে লেগে যাও, একদিন না একবার না, ফি মাসে, বছর-ভর, এখানে এসে অবধি দেখছি, তোমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখলে আমার লজ্জা করে।'

'আর কি বললে?' যেন প্রশ্ন করতে মনে মনে তৈরী হয় শিবনাথ।

'বললে এতগুলো ক'রে এক একজনের পুষ্যি, দারিদ্র্যের প্রধান কারণ এটা, আমার তো মনে হয় তোমাদের যাদের আয় কম তাদের ছেলেপুলে না হওয়াই উচিত, তাছাড়া, আজকাল বিজ্ঞানের যুগে ভাল উপায় বেরিয়েছে।'

একটু সময় চুপ থেকে পরে মৃদু হেসে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার ইয়ে আরম্ভ করছে নাকি? তারও তো ছেলেমেয়ে কম না।'

বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলে এবং মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি ক'রে বিধুবাবু বললেন, 'ছাই করছে, ওই মুখেই বলে, নিণ্টুর পর থেকে নাকি সে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ক'রে আসছে। আমি বিশ্বাস করি না। বুঝলেন মশাই, শেখর যদি তামা-তুলসী হাতে নিয়েও একথা বলে আমি বিশ্বাস করব না। নিণ্টুর চার বছর, তারপর আর ওদের কোনো ইসু নেই, এর আর কিছু—', বলতে বলতে হঠাৎ আবার শিবনাথের কানের ভিতর মুখ ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে বিধুবাবু ফিসফিস করে ওঠেন এবং বক্তব্য শেষ হ'তে মুখটা সরিয়ে এনে শব্দ ক'রে হাসলেন: 'মুখে সকলের কাছে ব'লে বেড়ায় আমার স্ত্রীর চেয়ে ওর স্ত্রী বয়সে ছোট, কিন্তু বললে হবে কি। শেখর করবে বার্থ-কণ্ট্রোল, তবেই হয়েছে! আর তাছাড়া, ওর নিজেরও হেল্‌থ ভেঙ্গে পড়েছে, দেখছেন তো কেমন প্যাঁকাটির মত হাত পা'গুলো হয়েছে, হবে না? রাতদিন লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা উপায়ের কথা যারা চিন্তা করে তাদের এই হয়। দেখবেন, শেখর একদিন করোনারী থ্রম্বসীস কি ঐ ধরনের একটা সাংঘাতিক কিছুতে য়্যাটাক্‌ড্‌ হয়ে হঠাৎ মারা যাবে।'

শিবনাথ কথা বলল না।

'বার্থ-কণ্ট্রোল ! চোরের মুখে হরিনাম।' বিধুবাবু এবার নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে উঠলেন। 'এর জন্যে যতটা ইয়ে মানে সংযমের দরকার শেখরের তা নেই, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।' (শিবনাথের দিকে তাকিয়ে) 'এসেছেন নিজের চোখেই দেখবেন ; বাড়িতে এতগুলো মেয়েছেলে, হারামজাদা এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দেখে আমার নিজেরই লজ্জা করে। স্কাউণ্ড্রেল।'

শিবনাথ তথাপি নীরব দেখে বিধু বললেন, 'আচ্ছা আমি চলি, ওদিকে আবার চামেলী ব'সে থাকবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা', শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। মাস্টার গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হ'তে সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। টাকা কর্জ না পাওয়াতে ডাক্তার সম্পর্কে বিধুবাবুর এ বিষোদ্গার কিনা চিন্তা করে শিবনাথ এক সময় মনে মনে হাসল।

আট

একটু গলির ভিতরে রেস্টুরেন্ট। ইলেকট্রিকের খুঁটি এখান অবধি আসে নি। তা ছাড়া প্রকাণ্ড একটি কড়ি-গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে ব'লে দোকানের সামনেটা বেশ অন্ধকার। টিমটিমে একটা কেরোসিনের বাতি ঝুলছে রেস্টুরেণ্টের দেওয়ালে। দুটো লম্বা বেঞ্চ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল. কাচ-পরানো দু'তিনটা টিনে কিছু মুড়ি. বিস্কুট ও চিঁড়ের চাকতি সাজিয়ে ক্ষিতীশের চায়ের দোকান। অদূরে একটা প্যাকিং বাক্স তৈরীর কারখানা। জায়গাটা এমনি চুপচাপ। কেবল কারখানা থেকে কাঠ-চেরা মেশিনের একটানা ঘসঘস শব্দ আসছে। দুটি হিন্দুস্থানী কি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বচসা করার পর আবার এখন থেমে গেছে। কারখানার সামনে একটা লরী দাঁড়িয়ে। যেন কল বিগড়ে গেছে বলে গাড়িটা আজ আর চলবে না। ড্রাইভার নেই। আলো নেই। কে একজন, খুব সম্ভব কারখানার লোক রেস্টুরেণ্টের টেবিলটার ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। তার সামনে একটা শূন্য কাচের গ্লাস। তলায় একটু চা পড়ে আছে। এই লোকটি কি অন্য কোন খদ্দের চা খেয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে গেছে, শিবনাথ বুঝতে পারল না।

হাঁ, একটু ইতস্ততঃ করছিল বৈকি শিবনাথ। ময়লা কাপড়চোপড় পরা দেখতে প্রায় ইতরশ্রেণীর মত খদ্দেরের পাশে টুলের ওপর হুট করে বসতে রুচিতে বাধছিল বলে শিবনাথ দোকানে ঢোকার পরও এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল।

'বসুন স্যার, আমার হয়ে গেছে।' বিড়িটা তাড়াতাড়ি মুখ থেকে নামিয়ে লোকটি সোজা হয়ে বসল। 'এ পাড়ায় আপনি নতুন এসেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীর গলায় উত্তর ক'রে শিবনাথ লোকটি ও নিজের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে বেঞ্চের এক পাশে বসল। 'এক কাপ চায়ের দাম কত নেয় এখানে ?'

'চার পয়সা। এর আগে কলকাতায় ছিলেন বুঝি ?'

'হাঁ' শিবনাথ ঘাড় ফিরিয়ে আবার আপাদমস্তক লোকটিকে দেখল। বিড়ি নিভে গেছে, দেশলাই জেলে বিড়ি ধরাচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে এক ঝলক ধোঁয়া শিবনাথের

মুখের দিকে ছেড়ে দিয়ে লোকটি দাঁত বের করে হাসল। 'বাবুর দল শহর ছেড়ে আস্তে আস্তে খালপারের দিকে আসছে। জায়গাটার জেল্লা বাড়ছে দিনকে দিন। তা শহরের মতন মাজাঘষা রেস্টুরেণ্ট পাবেন না এখানে। কি করে হবে—এ তল্লাটে তো আর ভদ্রলোক বলতে কিছু ছিল না। কেরোসিন কাঠের টেবিল আর তেলের বাতি আর আমরা দু'চারটে কুলি-মুটে খদ্দের নিয়ে ক্ষিতীশ দোকান খুলেছিল। এবার আপনারা এসেছেন, যদি শালার কপাল খোলে। কইরে, বাবুকে চা দে।'

হঠাৎ এখন শিবনাথের নজরে পড়ল দোকানে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তার পিছনে একটা চটের পর্দা ঝুলছে। হয়তো সেখানে উনুন এবং ক্ষিতীশ উনুনের পাশে কাজে ব্যস্ত আছে, শিবনাথ অনুমান করতে যাবে; এমন সময় সেখান থেকে পুরুষ, না, একটি মেয়ের গলার স্বর ভেসে এল। 'বাবুকে বসতে বলো জলটা একটু ফুটবে।'

শিবনাথ চমকে লোকটির মুখের দিকে তাকাল।

'বুঝতে পারছেন না।' লোকটিও শিবনাথের চোখের দিকে গোল চোখে তাকিয়ে মুখব্যাদান করে হাসে। 'চৌরঙ্গীর চায়ের দোকানে মেমসাহেব মেয়েমানুষ যেমন খদ্দেরকে চা এনে দেয়, ক্ষিতীশও আপনাদের জন্যে সে রকম কিছু একটা এখানে চালু করতে চাইছে। না হলে বাবুরা ভিড়বে কেন? মধু না থাকলে ভোমরা আসে না!'

শিবনাথ নীরব ফ্যালফ্যাল্ চোখে লোকটির বত্রিশ দাঁতের নিঃশব্দ হাসি দেখে কেমন চমকে উঠে, যেন ভয় পায় এবং দারুণ অস্বস্তি বোধ করে।

'হা-হা।' এবার লোকটি শব্দ ক'রে হাসল। 'তা ক্ষিতীশের বুদ্ধি আছে। বলুন স্যার, মেয়ে না রাখলে আপনাদের শহরে এখন কোন্ কারবারটা চলছে। চায়ের দোকান, দুধের দোকান, সেলুন, লণ্ড্রি, আপিস, মায় শেয়ালদা ইষ্টিশানে পর্যন্ত সেদিন দেখে এলাম মেয়েছেলে টিকিট বিক্রি করছে।'

শিবনাথ চুপ।

হঠাৎ লোকটি সরে এসে শিবনাথের গা ঘেঁষে বসল এবং বিধু মাস্টারের মত মুখটা প্রায় শিবনাথের কানের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে ফিসফিস করে উঠল: 'কেনই বা হবে না, বিয়ে-থা হচ্ছে না যখন ধিঙ্গী সেজে ঘরের অন্ন ধ্বংস করবে, তাই বাপ-মা ঠেলে ঠেলে ওদের পাঠাচ্ছে দোকানে আর আপিসে। বছর দুই যাক না, দেখবেন ব্যাটাছেলেরা আর কোন জায়গায় পাত্তা পাবে না। সাধে কি এত ছাঁটাই চলছে। মেনকা উর্বশীদের ঠাঁই করতে হবে তো—'

হঠাৎ কে একজন এসে দোকানে ঢুকতে লোকটির মুখের কথা থেমে গেল এবং বেশ ব্যস্ত হয়ে শিবনাথের কানের কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'আবার তুই আমার দোকানে ঢুকেছিস সাধন। তোকে না বলেছি আমার দোকানে আসতে পারবি না। আবার এলি?'

ভীত, সঙ্কুচিত হয়ে সাধন মুখ নিচু করল।

'চা খেতে হয়, খালপারে আরো পাঁচটা দোকান আছে, সেসব জায়গায় গিয়ে

খা। আমার এখানে না।

'আজকে আর ধারে খাইনি ক্ষিতীশ, পয়সা দিয়েছি।'

'পয়সা দিলেও এখানে তুমি চা পাবে না। হ্যাঁ, আমার এক কথা। বাজে লোক এসে দোকানে আড্ডা দেবে, আমি পছন্দ করি না।' কথা শেষ করে ক্ষিতীশ আর কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে সোজা পর্দার আড়ালে চলে গেল।

সাধন এক মিনিট তেমনি নীরব নতমুখ থেকে পরে গজগজ করে কি জানি বলতে বলতে আস্তে আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'শালা বদমাশ। মেয়েমানুষের গন্ধ পেলে আর কথা নেই। পই পই করে বারণ করে দিয়েছি এখানে না। কুলি-মজুরের জন্যে 'তৃপ্তি নিকেতন' খোলা হয়নি। তোদের জন্যে আরো পাঁচটা দোকান আছে খালের এপার-ওপার। সেখানে বসে চা খা, আড্ডা মার গিয়ে। তুই-ই বা ওকে চা দিতে গেলি কেন? তোকে নিয়ে আমি পারি না।'

পার্দার আড়ালে থেকে বললেও শিবনাথ সব শুনল।

'আমি নিষেধ করেছি, ও শোনেনি।' মেয়ের গলা।

'হারামজাদারা কেন এখানে আসে, তুই কি বুঝিস না!' ক্ষিতীশের ক্রুদ্ধকণ্ঠ। 'এমনধারা করলে তোকেও আর আমি দোকানে ঢুকতে দেব না, বেবি। হ্যাঁ, আমার এক কথা।'

শিবনাথ চমকে উঠল! বেবি? নামটা পরিচিত নয় কি!

এবং এক মিনিট পর চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে মেয়েটি যখন পর্দার এপারে এসে দাঁড়াল, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল শিবনাথ। তার প্রতিবেশী কে. গুপ্তের দুহিতা!

শিবনাথকে দেখে বেবিও চমকে ওঠে। হাতের পেয়ালাটা একবার কেঁপে ওঠে বৈকি! কিন্তু পরমুহূর্তেই বেবি সামলে নেয়। বরং স্মিত হেসে সংযত হাতে বাটিটা শিবনাথের সামনে টেবিলের ওপর রাখে।

'বিস্কুট দেব?'

'না।' রুমাল বের করে শিবনাথ কপাল মুছল।

'তুই এখন বাড়ি যা, রাত হয়েছে। চা খেয়েছিস?' বলতে বলতে ক্ষিতীশ এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে পর্দার বাইরে এল। বেবি মাথা নেড়ে জানাল 'হুঁ'।

'তোর মার জন্য চা নিয়ে যা।'

'আচ্ছা।' ঘাড় নেড়ে বেবি আবার পর্দার আড়ালে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পর একটা কাচের গ্লাসে ক'রে চা নিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে গেল।

ক্ষিতীশ হাতের পেয়ালায় মুখ দিয়ে শিবনাথের পাশে বসল। 'চিনতে পারলেন মেয়েটিকে?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে থাকে।'

'ভদ্দরলোকদের দিনকে দিন কি অবস্থাটা হচ্ছে একবার দেখুন।' বাটিতে আর

একটা চুমুক দিয়ে ক্ষিতীশ একটু সময় চুপ করে রইল।

শিবনাথ নিঃশব্দে চায়ের বাটি মুখের কাছে তোলে।

'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এখানে ঘুর-ঘুর। না করি আর কি ক'রে। চোখের ওপর তো দেখছি। ভাত খেতে পায় না তো চা আর জলখাবার! শুকিয়ে মুখটা কেমন আমসির মত হয়ে যাচ্ছে দেখলেন তো! না হলে এই বয়সে কত লাবণ্য কেমন জেল্লা থাকত চেহারার।' ক্ষিতীশ বিড়ি ধরায়। 'আপনার চলে?'

'না',—শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'আমার সিগারেট আছে।'

'আসে, এসে বলে মা একটু চা খাবে, দাদা একটু চা খাবে, এক বাটি চা দিন, কাল-পরশু দামটা দিয়ে দেব। শুনে মনে মনে হাসি—দুঃখও হয়। কত কাল-পরশু চলে যাচ্ছে। তা করবে কি, কোথা থেকে দেবে চায়ের পয়সা। যেন নিজের মনে কথা বলে ক্ষিতীশ লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে। 'শহরে থাকতে মেমদের ইস্কুলে' কি নাম, হ্যাঁ, লরেটোতে পড়ত। বাপের পয়সা ছিল। চা-জলখাবারই বা কম খেয়েছে কি! তাই তো জিহ্বা চুকচুক করে এখন এক ফোঁটা গরম জলের জন্যে। হা-রে কপাল! তা আসে আসুক, খায় খাক। বারণ করি না। আমারও একটা কাজ হয় যতক্ষণ দোকানে থাকে। সন্ধ্যার পর শেয়ালদা গেলাম কিছু সওদা আনব বলে। দোকানে বেবিটাকে রেখে গেলাম। বললাম, বাবুরা কেউ এলে একটু চা ক'রে দিবি। তা দেখলেন তো কাণ্ডখানা। পিছন ফিরেছি, আর ঐ শালা ঢুকল এখানে আড্ডা মারতে। মেয়েছেলের গন্ধ পেলে মাছির মত এসে সব জোটে কোথা থেকে—' বলতে বলতে ক্ষিতীশ হঠাৎ থামল। ব্যস্তসমস্তভাবে আর একজন এসে দোকানে ঢুকল। শিবনাথ দেখেই চিনল ক্ষিতীশের দাদা রমেশ রায়।

রমেশ রায়ের গায়ে একটা বেশ ভারি মতন গরম কোট। গলায় মাফলার জোড়ানো, মাথায় গরম কাপড়ের টুপি। কেবল তাই নয়, পায়ে মোজা, হাতে দস্তানা। দেখে শিবনাথের হাসি পেল। কেননা এতটা ঠাণ্ডা পড়েনি যে, এমনভাবে গরম কাপড় দিয়ে সর্বশরীর মুড়ে রাখতে হবে।

ক্ষিতীশ হাত থেকে চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

'চা খাবে নাকি?'

'না।' বলে গম্ভীরভাবে রমেশ রায় কেক্-বিস্কুটের টিনগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। ক্ষিতীশ হাতের লুকানো বিড়িটা কায়দা করে নিভিয়ে ফেলে।

'পাঁচু আসে এখানে চা খেতে? পাঁচু ভাদুড়ি?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে।' ক্ষিতীশ দাদার মুখের দিকে তাকায়। চোখ বড় করে রমেশ রায় বলল, 'খবরদার, ওই শালাকে দোকানে ঢুকতে দিবি না।' বলে রমেশ শিবনাথের দিকে তাকায়। 'নমস্কার, রায়সাহেবের বাড়িতে আপনি নতুন ভাড়াটে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, শিবনাথ প্রতিনমস্কার জানায়। এ-বাড়ির সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান বিত্তশালী লোকটির সঙ্গে তার এই প্রথম আলাপ হয়।

'মশাই, দোকান খুলেও কি আর স্বস্তিতে আছি।' রমেশ রায় শিবনাথের পাশে

বসল। 'পাঁচুকে আপনি দেখেছেন তো ?'

'হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর ঘরের ভাড়াটে।'

'শালার সিফিলিস আছে, বুঝলেন।' রমেশ রায় চোখ-মুখের বিকৃত ভঙ্গি করল। 'বেশ্যাবাড়ি পড়ে থাকে। ওর এসব হবে না তো কার হবে। তাই। হাজার বার ক'রে আমি ক্ষিতীশকে বলছি, না, এখানে না। ওই ব্যারাম নিয়ে শালা এখানে খেয়ে যাবে, আর সেই বাটিতে ক'রে আপনারা ভদ্রলোকেরা চা খাবেন, এটা ঠিক না, কি কি বলেন ?'

'নিশ্চয়ই।' শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'তা, কে ভদ্রলোক কে ছোটলোক, সহজে কি আর চেনা যায় ?' রমেশ রায় আবার চোখ-মুখের বিকৃত ভঙ্গি করল। ম্যাট্রিক ফেল্ করে ক্ষিতীশ যখন বাড়িতে বসা, আর কোন কাজকর্ম জোটাতে পারে না, তখন অনেক ভেবেচিন্তে কিছু পুঁজি দিয়ে দোকানটা ক'রে দিলাম। আগে তো আর এ-তল্লাটে কুলি-মজুর ছাড়া কিছু ছিল না। যখন দেখলাম শহর থেকে. পাকিস্তান থেকে, ভাল ভাল লোকেরা এখানে এসে বাস করতে শুরু করেছে, মনে একটু আশা জাগল, ভাল একটা রেস্টুরেন্ট খুললে তা চলবে, লোকসান হবে না। এখন দেখছি, আমার স্পেকুলেশান ঠিক হয়নি।' রমেশ রায় থামল। শিবনাথ একটা সিগারেট ধরালে। ক্ষিতীশ উঠে পর্দার আড়ালে গিয়ে কি যেন করছে। পেয়ালাপিরিচের টুং-টাং শব্দ হয়। যেন সেগুলো ধোয়া হচ্ছে।

'অমল চাকলাদারকে চেনেন তো ?' রমেশ প্রশ্ন করল।

'হ্যা, দশ নম্বরের ভাড়াটে।' শিবনাথ রমেশের চোখে চোখ রাখল।

'উনিশ টাকা শালার কাছে পাওনা মশাই। কেমনরে ক্ষিতিশ, উনিশ টাকা কত আনা যেন বাকি পড়েছে ?'

'এগারো আনা।' পর্দার ওপার থেকে ক্ষিতীশ জবাব দেয়।

'তা'হলে মশাই বুঝুন কি ক'রে আর কারবার চলে।' হাত ঘুরিয়ে রমেশ বলল, 'চাকরি বাকরি করে, ভদ্রলোকের ছেলে। কাজে যাবার আগে চা-টা টোস্ট-টা খেয়ে যেত, বলত, মাসের শেষে একসঙ্গে সব দাম মিটিয়ে দেবে। এখন বাছাধনের চাকরি নেই শুনলাম।'

শিবনাথ নীরব।

'তোমার চাকরি নেই, বুঝলাম উপোস করে মরবে, কিন্তু আমার পাওনা মেটায় কে ? এখন বলুন মশাই, পারিজাতের বাড়ির আপনিও তো একজন ভাড়াটে। অমল চাকলাদারও ভাড়াটে। এতগুলো টাকা বাকি পড়েছে, আপনারা আমায় বলে দিন, এর কি বিহিত করা যায়।'

শিবনাথ নিরুত্তর।

'আমি আদায় করব। ভদ্রলোক চিনে ফেলেছি। গলায় গামছা দিয়ে উনিশ টাকা এগারো আনা আদায় না করছি তো আমার নাম রমেশ রায় নয়।' উত্তেজনায় রমেশের মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। শিবনাথ দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরায়।

'তা আবার শালার গুমোর কত!' যেন নিজের মনে রমেশ এবার গজ্‌গজ্‌ করে কথা কয়। 'কেন, এ-তল্লাটে একটা না, চার ছ'টা গেঞ্জির কারখানা আছে। কত ভাল ভাল ঘরের বৌ-ঝিরা এখন কারখানায় ঢুকে কাজ করছে। দে না বৌকে পাঠিয়ে। কিন্তু একবার সেই প্রস্তাব দিন, দেখবেন চাকলাদার আপনাকে রুখে মারতে আসবে।'

রমেশ চোখ-মুখের এবং হাতের এমন ভঙ্গি করে কথা বলল যে, শিবনাথ না হেসে পারল না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক জায়গায় আছেন, দেখবেন। দেখেছেন নিশ্চয়ই ওর বৌকে। অমলের ধারণা কমলার চেয়ে রূপসী মেয়ে এ দেশে আর একটি নেই। শালার ভাত জোটে না খেতে, বৌয়ের রূপের দেমাকে পেট ফাটো-ফাটো। হাসি পায় মশাই, হাসি পায়। আমরা জানি,—পারিজাতের সঙ্গে উঠতে বসতে, আমার সঙ্গে তো কথা হয়। দু'মাসের বাড়ি-ভাড়া জমেছে। এ-মাসে ভাড়া ক্লিয়ার করতে না পারলে অমলকে দারোয়ান দিয়ে ঘাড়ে ধরে তুলে দেবে। ভদ্রলোক! কত দেখলাম। ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে পারিজাতের বাড়িতে এসে ঘর-ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করে। বাস্‌, দু' মাস ছ'মাস যেতে না যেতে খোলস খসে গিয়ে আসল রং বেরিয়ে পড়ে। কত দেখছি—হা হা।' রমেশ এবার বিকট সুরে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে শিবনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা নিচু করে বলল, নতুন এসেছেন. আপনাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, পারতপক্ষে কাউকে একটা আধলা ধার দেবেন না. দিয়েছেন কি মারা পড়েছেন। মশাই বাইরে সাবান শাড়ির বাহার, ভিতরে ফুটুশ। সাবধানে পা না ফেললে বিপদে পড়বেন।' বলে রমেশ উঠে দাঁড়াল।

'পাঁচুকে আর দোকানে ঢুকতে দিবিনে, বুঝলি? হারামজাদার ভেনারেল ডিজিজ।'

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল। দাদাকে উঠতে দেখে সে পর্দার এপারে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আর, গরম জলটল দিয়ে কাপ-ডিসগুলো ভাল ক'রে ধুয়ে তবে এঁদের চা দিবি।' শিবনাথকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে রমেশ ভাইকে উপদেশ দিলে। ক্ষিতীশ দ্বিতীয়বার ঘাড় নাড়ল। উপদেশ দেওয়া শেষ করে রমেশ আবার ব্যস্ত-সমস্তভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

এক সময় দোকান থেকে বেরিয়ে শিবনাথ ভাবছিল। এখানে এসে যেন এই প্রথম কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছিল। কেন তার কারণ ঠিক অনুমান করতে পারল না যদিও সে। শেখর ডাক্তার শিশিতে জল ভরে ওষুধ বলে চালাচ্ছে। কে. গুপ্তর মেয়ে রোজ ধারে চা খায় ও মার জন্য নিয়ে যায় বলে ক্ষিতিশ সময় সময় বাবুদের চা তৈরি করে দিতে বৌবিকে দেকানে রেখে অন্য কাজে বেরুচ্ছে। অমল চাকলাদার বেকার হয়ে রেস্টুরেণ্টের বিল শোধ করতে পারছে না, তাই রমেশ ওর গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করবার মতলব করেছে। পাঁচু ভাদুড়ীর কুৎসিত রোগ আছে বলে তাকে আর রেস্টুরেণ্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

এর কোনটার সঙ্গে শিবনাথের মনে হঠাৎ একটা কালো ভয়-সিরসিরে ছায়াপাতের কারণ থাকতে পারে, ভাবতে ভাবতে একবার শিবনাথ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সেও ওই বাড়িতে সারি সারি ঘরের একখানা ভাড়া নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছে বলে কি? কিন্তু সে-সব পরিবারের সঙ্গে শিবনাথের মিল কোথায়, হয়তো কোনো পরিবারের সঙ্গেই কোনটার মিল নেই, একটা বাড়িরই বারোখানা কামরা যদিও, যেমন হারমোনিয়মের বারোটা রীড। কিন্তু এক একটার এক এক রকম সুর। তা হলেও, তা হওয়া সত্ত্বেও বারোটা রীডের সমষ্টিগত সুর মিলিয়েই কি ঐকতান সৃষ্টি হয়? এক উঠোন, একটা কুয়ো, এর উনুনের ধোঁয়া ওর ঘরে যাচ্ছে, ওর রান্নার গন্ধ এর নাকে আসছে, এই শিশুর কান্না ওই শিশু শুনছে, এক সংসারের অভাবের দীর্ঘশ্বাস আর এক সংসারকে ভাবিয়ে তুলছে বলে কি? কুয়াশা-কুণ্ঠিত শীত-শীত সন্ধ্যায়ও শিবনাথের কপাল ঘামে। পকেট থেকে রুমাল বার করে সে ঘাম মুছল। সাংঘাতিক রকমের একটা ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে মোষের গাড়িটা শিবনাথের গা ঘেঁষে চলছিল। হঠাৎ গাড়োয়ানের হৈ-হৈ শব্দে শিবনাথ রাস্তার এক-পাশে সরে গিয়ে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল। তা হলেও, তা হওয়া সত্ত্বেও রুচি আর মঞ্জুকে নিয়ে শিবনাথের সংসারের চেহারাটাই অন্য সবগুলো থেকে স্বতন্ত্র। নিশ্চয়ই শিবনাথের এখানেই জোর। রমেশ রায়ের মত সে চায়ের দোকান খুলে বসেনি। শেখর ডাক্তারের মত হাড়কিপ্টে চশমখোর বলে তার বদনাম নেই, বিধু মাস্টারের সংসার যেমন বাচ্চায় বাচ্চায় পিলপিল করছে, শিবনাথের সে অবস্থা হয়নি। তা ছাড়া, এসব ছেড়ে দিয়েও সবচেয়ে যেটি বড় কথা, রুচি উচ্চশিক্ষিতা। এ-বাড়িতে আর পাঁচটি মেয়ে কেন, কোনো পুরুষই রুচির চেয়ে বেশি লেখাপড়া করেনি। তাছাড়া কমলাক্ষী গার্লস স্কুলে রুচির পার্মানেণ্ট চাকুরি। ফ্যাক্টরী না। ধর্মঘট এবং ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন সেখানে অনুপস্থিত। তা ছাড়া শিবনাথেরও ডিগ্রী আছে। আজ সে বেকার। চাকুরি নেই। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই দু'তিনটা ট্যুইশানি সে সহজেই বাগাতে পারবে। এবং তার ট্যুইশানি বিধুমাস্টারের ট্যুইশানি হবে না। ছাত্রী বিদিশা দত্তর সখী চামেলীকে ভবিষ্যতের আশা বুকে জ্বেলে বিনি পয়সায় ইংরেজী প্যাসেজের মানে বলে দিতে সে পাগলের মত ছুটবে না। কেন না বিধুমাস্টারের মত শিবনাথের রোজগার খেতে এতগুলো মুখ হাঁ-করে বসে নেই। ভাবতে ভাবতে সকালবেলা মেথরের কাজে সাহায্যনিরতা বালতি-হাতে লক্ষ্মীমণির চেহারাটা হঠাৎ শিবনাথের মনে পড়ে গেল। ফুল,—বিধুমাস্টারের মত বোকা লোকদের এ-দিনে বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না, নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল শিবনাথ। যেন তার শিস দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল এমন হাল্কা হয়ে গেল মন। একটা সিগারেট ধরালে সে। ছিমছাম মাজাঘষা নির্মল এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত তার সংসার। এর মূলে চোদ্দ আনাই রয়েছে রুচির বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব। তার উন্নত আধুনিক মনের স্বচ্ছ বিভায় ছোট্ট সংসারটি ঝলমল করছে। ভেবে শিবনাথের বড় ভাল লাগল। রুচিকে বোধ হয় আর কোনোদিন এত ভাল লাগেনি তার, এমন ভাল করে আর দশটি মেয়ের সঙ্গে সে যাচাই করে দেখেনি, আজ, এখন, ক্ষিতীশের দোকান

থেকে হঠাৎ মন খারাপ করে বেরিয়ে এসে খালের ধারের রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর যেমন দেখছিল।

একটি কিশোর এবং একটি কিশোরী।

শিবনাথ ঠিক ধরতে না পারলেও দু'জনের কথাবার্তা শুনে কিছুটা আঁচ করতে পারল এরা কারা।

জায়গাটা বেশ ফাঁকা এবং নির্জন। দু'দিকে কপির ক্ষেত। সন্ধ্যার পর সির্‌সিরে মেঠো হাওয়া বইছিল। কিন্তু ধোঁয়া এবং ধুলো একেবারে ছিল না বলে হাঁটতে শিবনাথের ভাল লাগছিল। ময়লার খাল এবং রেললাইন পিছনে ফেলে সে অনেকদূর এসে পড়েছে। ছোট্ট একটা ঝোপের কাছাকাছি এসে ঠাণ্ডা অনুচ্চ দুটি কিশোরকণ্ঠ শুনে শিবনাথ থমকে দাঁড়াল। মাথার ওপর তারার ঝিকিমিকি। ক্ষেতগুলো থেকে ওলকপির কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। ঝোপের ওপার থেকে পাথরের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে চলা ঝর্ণাধারার মত একটি কণ্ঠের কলহাস্য শিবনাথের কানে এসে লাগল। মেয়েটি হাসছে।

'আজ আমাদের ভাত রান্না হয়নি। এ-বেলা ও-বেলা উনুনে আগুন দিতে হল না।'

'ভালই তো, বেঁচে গেলি, কাজকর্ম করতে হল না তোর। কি খেলি ?'

'ধাপার মাঠ থেকে বাবা কাল এক আঁটি মুলো চুরি করে এনেছিল।'

'সারাদিন বুঝি মুলো খেয়ে আছিস ?'

'তুই, তোরা ?'

'ও-বেলা মুলো সেদ্দ আর ভাত হয়েছিল। এ-বেলা একটা বিস্কুট আর এক মগ জল।'

'বিস্কুটের পয়সা কে দিলে ? তোর বাবা, মা ?'

'বেবি।' ফ্রকের তলায় দু'টো গুঁজে এনেছিল। একটা মা খেল, একটি আমি খেলাম।

'তোর বাবা আজ মদ খেয়েছে ?'

'জানি না। হয়তো খায়নি। রোজ আর কে এত মাগ্‌না বোতল খাওয়াবে। তোর বাবা মদ খায় না ?'

'নাঃ, যখন বড়বাজারে বাবার ফলের কারবার ছিল, দুধ মিশিয়ে মাঝে মাঝে সিদ্ধি খেত। সিদ্ধি চিনিস কাকে বলে ?'

'তুই আমায় সিদ্ধি চেনাস, খুব চালাক হয়ে গেছিস মাইরি। তোরা যেমন কোলকাতায় ছিলি, আমরাও ছিলাম মনে রাখিস। পার্ক স্ট্রীটে কত বড় বাড়ি ছিল আমাদের।'

'তোর বাবা ভয়ানক অসভ্য।'

'কেন ? তোকে কিছু বলেছে নাকি ?'।

'আমাকে ? তোর বাবা ? এ-বাড়ির একটাও ব্যাটাছেলে আমার সঙ্গে কথা বলতে

সাহস পায় না, জানিস ?'

'সত্যি সারাক্ষণ তুই এমন কটমটে চেহারা করে রাখিস। যেন কত বড় মেয়েটি হয়ে গেছিস।'

'তোর চেয়ে আমি বড় মনে রাখিস।'

'কক্ষনো না। তোর বয়েস এখন কত শুনি ?'

'চৌদ্দ।'

খিলখিল মিঠা হাসিতে জায়গাটা ভরে গেল।

শিবনাথও মনে মনে হাসল। পারিজাতের বস্তির বাসিন্দা এরাও। কে. গুপ্তর ছেলে আর সাবানের ফেরিওয়ালা বলাইর মেয়ে।

'আমার পনরো পার হয়ে গেছে।'

'তবে আর কি, এখন বিয়েটিয়ে করে সংসারী হয়ে যা।' কিশোরীও এক ঝলক হাসল।

'না রে, মন ভাল না।' কিশোরের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। 'বাবার রুজিরোজগার নেই, আড্ডা মেরে আর মদ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, বোবি বড় হচ্ছে, আমার লেখাপড়া বন্ধ, মা সারাদিন শুয়ে থেকে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে, এসব দেখে কিছু ভাল লাগে না। এক এক সময় ইচ্ছে করে—'

'তুই এক কাজ কর্ না।' ছেলেটির কথা থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'সাইকেল জানিস ?'

'কেন ?'

'খবরকাগজ ফেরি করলে ভাল রোজগার হয়। বাবা বলছিল। বাবা সাইকেল জানে না বলে মুশকিলে পড়েছে। কাপড়কাচা সাবানের এখন একদম বিক্রি নেই। সাইকেল চালাতে জানলে খবরকাগজ ধরত।'

'ও-সব আমি পারব না। লোকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে কাগজ বিলানো, ধ্যেৎ লজ্জা করবে।'

একটু সময় মেয়েটি চুপ করে রইল।

'আজ চুল বাঁধলি না ?'

'বেঁধেছিলুম ও-বেলা। এক ফোঁটা তেল নেই ঘরে তো আর চুল-টুল বাঁধব কি, ইচ্ছে করে না। অঃ, করছিস কি, ছেড়ে দে, ভীষণ লাগে।'

'না দেখছিলাম, তোর চুল তেল না দিয়েও ভারে নরম।'

'মেয়েমানুষের চুল নরম থাকবে না তো কি শক্ত থাকবে ?'

কতক্ষণ দু'জনের কোন কথা শোনা গেল না। বেশ অস্বস্তিবোধ করছিল শিবনাথ, কেমন যেন অপরাধী বোধ করছিল নিজেকে অজানিতভাবে, হঠাৎ এখানে ঝোপের পাশে এসে পড়ে চুপি চুপি এদের কথা শুনছিল বলে। কিন্তু শিবনাথ তখন জায়গাটা ছেড়ে উঠে আসতে পারল না। সিরসিরে বাতাস, ফিকে অন্ধকার, তারার ঝিকিমিকি ও পাশের ক্ষেত থেকে উঠে-আসা কপির সুন্দর মিষ্টি গন্ধের আমেজ তাকে সেখানে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখল। সিগারেট খাবার ইচ্ছা থাকলেও সে

সিগারেট ধরাল না।

'তুই একটা কাজে-টাজে ঢুকে পড় না, সাবান ফেরি করে যখন তোর বাবা সংসার চালাতে পারছে না।'

'লেখাপড়া জানি না, আমায় চাকরি দেবে কে?'

আজকাল মেয়েদের আবার চাকরির অভাব। কত মেয়ে কাজে ঢুকছে দেখিস না? পারিজাতের গেঞ্জির কারখানায় অনেক মেয়ে নিচ্ছে। ও-পাড়ার বেলা টগর চাঁপা কুন্দ সব ঢুকেছে। শুনছি তো এবার পরীক্ষায় পাস দিতে না পারলে আমাদের বাড়ির বিধুমাস্টারের দুই মেয়েকেও ঢুকিয়ে দেবে। তুই তো পারিজাতের বৌয়ের সমিতিতে নাম লিখিয়েছিস। একটু বললেই তো ফ্যাক্টরীতে কাজ পাস।'

'লিখিয়েছিলুম সমিতিতে নাম। আর যাই না। পারিজাত আমার বাবাকে কুত্তা বলেছে।'

'কবে কোথায় কখন? তুই শুনলি কি ক'রে?' কিশোরকণ্ঠ গর্জন করে উঠল।

নিবন্ত স্তিমিত গলায় কিশোরী বলল, 'পারিজাতের উঠানে পেয়ারাতলায় আমরা সমিতির মেয়েরা ক্যারম খেলছি সেদিন। বৌয়ের পাশে দাঁড়িয়ে পারিজাত খেলা দেখছিল। এমন সময় সেখানে সরকার গিয়ে বলল, অমল চাকলাদার, বলাই নন্দী আর কে. গুপ্তর ঘরভাড়া বাকি পড়েছে।'

'তারপর?'

'শুনে পারিজাত গরম হয়ে বলল, কুত্তা দুটোকে তাড়াতে না পারলে মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কাঁহাতক মাসের পর মাস ভাড়া নিয়ে ঝামেলা পোহাবেন সরকার। কুকুর দুটোকে কালই নোটিশ দিয়ে দিন।'

'শুনে সরকার কিছু বলল না?'

'দাঁত বার করে হাসছিল।'

একটু পরে কিশোরের প্রশ্ন শোনা গেল, 'তারপর থেকে বুঝি তুই সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ করেছিস, আর যাসনি ও-বাড়ি।'

একটু থেমে থেকে পরে কিশোরী বলল, 'আমাদের বারো ঘরের সব ভাড়াটে মিলে যদি ভাড়া বন্ধ করে দিই, খুব আক্কেল হয়।'

কিশোর তৎক্ষণাৎ কোনো কথা বলল না। যেন একটু সময় কি ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি একদিন পারিজাত শালার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। টাকার গরমে শালা সব মানুষকে কুকুর বেড়ালের মত দেখছে।'

'খুলি উড়িয়ে দিলে তোকে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে।'

'আগে তো শালা মরবে।'

কিশোর কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কিশোর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'উঃ! কত কাল সিনেমা দেখি না।'

'আমি সেদিন ফাঁকতালে একটা বই দেখে নিলাম।'

'কবে, কার সঙ্গে গেছলি, কি বই দেখলি ?'

'এটম বম্, কমলাদি দেখালে। আমাকে আর বীথিকে। নন্দনকানন হাউসে।'

'ওটার সঙ্গে মিশবি না। আমি কতদিন বলেছি তোকে, কমলাটা একেবারে বাজে মেয়ে। ঠোঁটে রং মাখে আর টেনে টেনে নাকিসুরে কথা কয়, ও কক্ষনো ভাল হতে পারে না।'

'আহা, যেন এ বয়সেই কত মেয়ে চিনিস তুই !'

'তবে কি, আমাদের পার্ক স্ট্রীটের বনানী চ্যাটার্জিকে দেখেছি। ডোভার লেনে মামার বাসা। সে-পাড়ায় নন্দিতা রায়কে দেখতাম ঃ আর টালিগঞ্জে ছোটকাকুর বাসায় থাকতে দেখতাম রমলা সান্যালকে। কোলকাতায় ছড়িয়ে আছে এসব মেয়ে। কিছু কিছু এখন বস্তিতেও গজাচ্ছে। ঠোঁটে রঙ মাখে, টেনে টেনে কথা কয়, আর কোমর নাচায়।'

'আঃ, তুই ভয়ানক বাজে বকিস ! কমলাদি ওরকম মেয়ে না।'

'দেখবি আস্তে আস্তে। বীথিটাকে বখাচ্ছে, তোরও মাথা খাবে। কতর সীটে গেছলি তিনজনে !'

'দশ আনা। এক টাকা চৌদ্দ আনা গেল কেবল টিকিটে। ট্রামবাসে তেরো আনা। আর রেস্টুরেন্টে দু'টাকা খেলাম। কমলাদিই খাওয়ালে।'

'তবেই বোঝ কোথায় তিনি এত পয়সা পান। নার্সগিরি ক'রে কত আর তাঁর রোজগার হয় শুনি ?'

'কি জানি, জানি না।' যেন হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল মেয়েটি। 'তুই কি বলতে চাস্ শুনি ?'

'কিছুই না।' প্রবীণের কণ্ঠ কিশোরের। 'বলছিলাম চাকরি ছাড়াও ওর অন্যরকম রোজগার আছে।'

কিশোরী চুপ।

'সেদিন দেখলাম হাতে নতুন ঘড়ি। আগের মাসে জুতো কিনল, শাড়ি কিনল একজোড়া। বেশ দামী শাড়ি। মাকে দেখাতে এনেছিল। বাবা বারান্দায় বসা ছিল। শাড়ি দেখিয়ে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পর বাবা ওর সম্পর্কে যা ওপিনিয়ন দিলে, অবশ্য ঘুরিয়ে বলেছিল কথাটা মাকে। কিন্তু আমি বুঝে গেলাম।'

'কি বুঝলি ? সেজন্যই তো কমলাদি সেদিন বলেছিল তোর বাবা ভয়ানক অসভ্য।'

'তাই বল, ওটা কমলার কথা, আমার বাবা অসভ্য।' কিশোর অল্প শব্দ ক'রে হাসে। 'ঠিক ধরেছে। জহুরী জহর চেনে। বাবাও ওকে চিনে ফেলেছে। বুঝলি, একটা কমলা না। দশটা কমলা বাবার আপিসে চাকরি করত। কমলা করবে এবাড়িতে ফুটোনি। বাবার সামনে। সেজন্যেই তো বাবা ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না।'

'তোর পায়ে ধরি, ওর কথা এখন রাখ। কাজের কথা বল্। আমায় কবে সিনেমা দেখাবি ? খুব ভাল হয়েছে শুনছি আনারকলি।'

'দাঁড়া বলেছি তো, একদিন আমাতে তোতে একটা ভাল ছবি দেখব।' স্তিমিত নিষ্প্রভ গলায় কিশোর বলে, 'কিছুতেই পাঁচ সিকের পয়সা যোগাড় করতে পারছি না।'

'পাঁচ সিকে, আর বাস ভাড়া? আনারকলি হচ্ছে সেই কোথায় শ্যামবাজার। এখানে! রেস্টুরেণ্টে না হয় না-ই খাওয়া গেল। যাতায়াতের ভাড়া নিয়ে অন্ততঃ দুটো টাকা লাগবেই।'

'দাঁড়া, আমার এক ফ্রেন্ড-এর কাছে গোটা পাঁচেক টাকা ধার চেয়েছি। হয়তো দেবে। পাঁচ সাত দিন দেরি হতে পারে।'

'কে ফ্রেন্ড? ও সেই যে একটা ছেলে এসেছিল একদিন তোর কাছে! কোট-পেণ্টলুন পরা।'

'হ্যাঁ, স্যুট পরে এসেছিল সন্তোষ। পার্ক ষ্ট্রীটে বাসা। ওদের আর ঠিক দুটো বাড়ি পরেই থাকতাম আমরা। মস্ত বড়লোক সন্তোষের বাবা। কী সব মেশিনারীর দোকান আছে মিশন রো-তে।'

'হ্যাঁ, মন্দ না দেখতে, চুলগুলো খুব সুন্দর।'

'তোর খুব পছন্দ হয়েছিল?'

'যাঃ, কি বলতে কি বুঝিস।'

'হো-হো!' তরল স্নিগ্ধ হাসি মাঠের বুকে ছড়িয়ে পড়ে! 'আসুক আর একদিন সন্তোষ। বলব ময়না তোর প্রেমে পড়েছে।'

'এই রুণু!'

'ওর চুল সুন্দর, আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, কেমন রে?'

'আমি চললাম। অসভ্য। আমি বলেছি নাকি তোর চুলের চেয়ে ওর চুল সুন্দর? নাকটা খ্যাঁদা, কপালটা উঁচু। স্যুট পরলে কি হবে। বানরের মত দেখায়।'

'মাইরি?' রুণু হাসে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' দৃপ্ত শাণিত গলা ময়নার। 'ছেঁড়া শার্ট-পেণ্টলুন হলে হবে কি। এই চেহারার কাছে ওই চেহারা দাঁড়াতে পারে না। এমন অদ্ভুত নাক পাবে কোথায়। সত্যি একখানা নাক নিয়ে এসেছিলি সংসারে? দেখি।'

'আঃ লাগে।'

'আ-হা, ননীর শরীর,' মৃদু ঝোপের ভিতর দিয়ে কাঠবেড়ালের চলার মতন খসখসে গলার স্বর। 'না ছুঁতে ভেঙে যায়, কেমন?'

শিবনাথ সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভব ক'রে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

নয়

বনমালীর দোকানের সামনের পায়া-ভাঙ্গা বেঞ্চে বন্ধুকে বসতে দিয়ে কে. গুপ্ত হাসল, 'এই আমার রাজসিংহাসন ব্রাদার, বোস।'

'চমৎকার, চমৎকার।' বন্ধুর চারদিকে চোখ বুলিয়ে রাজসিংহাসনে বসল।

'খুব ভাল জায়গায় এসে আস্তানা গেড়েছ যা হোক। কে. গুপ্ত জোরে হাসে। বন্ধুকে তার বস্তির ঘর উঠোন পাইখানা সব দেখিয়ে এখন বৈঠকখানায় অর্থাৎ মুদিদোকানের সামনে নিয়ে এসেছে, দু'জনে ব'সে অনেকদিন পরে একটু সুখদুঃখের গল্প করবে বলে।

'হ্যাভ এ স্মোক।' কে. গুপ্ত বন্ধুকে বিড়ি অফার করল। বুদ্ধিমান চারু রায় কোনপ্রকার দ্বিধা না ক'রে হেসে হাত বাড়িয়ে বিড়ি তুলে নিলে।

'থাকী।' গুপ্ত চোখ বড় বরে হেসে বন্ধুর দিকে তাকায়।

'দ্যাটস অলরাইট। তারপর কেমন আছ? ছেলেমেয়ে ভাল আছে? ওয়াইফ কি সিক্?'

'না।' গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'মন খারাপ তাই অহোরাত্র শুয়ে কাটান।'

চারু রায় এসম্পর্কে আর কিছু প্রশ্ন না ক'রে বরং অধিকতর উচ্ছল হাস্যবিচ্ছুরিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকায়। 'দারুণ জায়গায় এসে বাসা বেঁধেছ ভায়া। আমি ভাবছিলাম, তাই তো, কোথায় গেল আমাদের গুপ্ত, এমন শৌখিন লোক এমন সুখের পায়রা কোলকাতার আড্ডা ছেড়ে দিয়ে কোন্ বনে উড়ে যেতে পারে আমরা বন্ধুরা কেবলই বলাবলি করছিলাম। এ্যাঁ, ইন দি লঙ রান তুমি যে দেখছি সুন্দর মৌ-বনটিতে এসে যাকে বলে গা-ঢাকা দিয়ে আছ।'

বনমালী হাঁ ক'রে তাকিয়ে রীমলেশ চশমা-পরা দাঁড়িগোঁফ কামানো ফর্সা ধবধবে চারু রায়ের মেয়েলী চেহারা দেখছিল। কথা শুনে এখন মুখ টিপে হাসল।

'মৌ-বনই বটে, মৌ-মাছির ঝাঁক।' গুপ্ত খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ কালো করে। 'দুঃখের বিষয় মধু খাওয়া হয় না।' টাকা বাজানোর মত দু' আঙুলের মাথায় বাড়ি মেরে কে. গুপ্ত হতাশ ভঙ্গিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, 'এই না হলে ভুবন মিছে।'

'দরকার কি।' ক্রিজ করা পেন্টলুন সমেত পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দিয়ে চারু হঠাৎ মেরুদণ্ড টান করে সোজা হয়ে বসল। 'টাকা খরচ করে মধু খাওয়ার চেয়ে মধু বিক্রি করে টাকা রোজগার করছ না কেন? ওটাই তোমার এখন করা উচিত।'

'কে কিনবে শুনি, কার কাছে বিক্রি করব?'

'হোপ্‌লেস।' চারু হতাশ ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকালো, একটু যেন ভাবল কি, তারপর গুপ্তর দিকে চোখ নামিয়ে মৃদু হাসল। 'আমি, আমরা। তুমি কি চারু প্রডাকসনের নাম ভুলে গেছ?'

গুপ্ত চোখ বড় করল।

'নতুন বইয়ে হাত দিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ।' চারু দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছ না?'

'কাগজ আর পড়ি না।'

'না পড়া ভাল। কিন্তু আমি তো এলাম তোমাকে জানাতে। আমার এখন একটা না, এক ঝাঁক মৌমাছির দরকার, দাও, পার দিতে?'

'এত!'

'হ্যাঁ এত।' বুক ফুলিয়ে চারু সতেজ ভঙ্গিতে বলল। 'কয়েক ডজন মেয়ের দরকার আমার ছবিতে। আই ওয়াণ্ট ডজনস অব গালস্, দাও।'

গুপ্ত কথা বলে না।

'এমন ছবিতে হাত দিয়েছি আমি যা আর সব বাংলা আর হিন্দীকে একসঙ্গে কানা করে দেব।'

'অনেক মেয়ের পার্ট আছে বুঝি বইয়ে।'

'হ্যাঁ, অনেক সেক্স। দেখি কোন্ ব্যাটারা টেক্কা দেয় চারু রায়ের ডিরেকশনের সঙ্গে, কোন্ ছবি মাথা তোলে মায়াকাননকে ছাড়িয়ে।'

'ছবির নাম মায়াকানন হবে বুঝি ?' ওধার থেকে বনমালী প্রশ্ন করল।

চারু রায় এ-প্রশ্নের জবাব দিলে না। পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বার করে কে. গুপ্তকে সিগারেট অফার করল। সিগারেট ধরিয়ে গুপ্ত এক চোখ ছোট ক'রে বন্ধুকে বললে, 'তা এ-বনের মৌমাছিদের কেমন দেখলে ?'

'ওটি কে, ওই যে বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ?'

'ওটা কিস্সু না। বাজে। দেখলে না কেমন লম্বাটে ধরনের গুতনি।' মুখ বিকৃত করল গুপ্ত এবং নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। শেখর ডাক্তারের মেয়ে। এ্যাণ্ড শী ইজ গোয়িঙ টু বি ম্যারেড সুন।'

'চুলোয় যাক।' ভক্ করে একগাল ধোঁয়া বার ক'রে চারু ঠোঁট বাঁকা করল। 'আর একটিকে দেখলাম মাগ্ হাতে কুয়োতলার দিকে যাচ্ছিল! শ্যামলা চেহারা।'

'হ্যাঁ, এর বড়টাই টেলিফোনে কাজ করে। মন্দ না। ফেসকাটিং ভাল।' গুপ্ত ঘাড় নেড়ে বলল, 'বীথি নাম।'

চারু কিছু বলল না, শুধু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'কিন্তু আসলটিকে তুমি দেখোনি।' গুপ্ত মিটমিটি হাসল! 'হাজবেণ্ড ঘরে ছিল ব'লে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই সাহস পেলে না।'

'কত নম্বর ঘর ?' চারু ভ্রূকুঞ্চিত করল। 'চার্মিং ?'

'বলে কিনা চার্মিং।' গুপ্ত জোরে সিগারেটে টান দিল। তারপর বেশ খানিকটা ধোঁয়া গলাধঃকরণ ক'রে বাকিটা মুখ থেকে ছাড়বাড় সময় তাই দিয়ে সুন্দর একটা রিং তৈরি করে ফেলল। ধোঁয়ার চাকাটা ঘুরতে ঘুরতে একদিকে উঠে যাবার পর কে. গুপ্ত বলল, 'তোমার সেক্সের ছবির হিরোইন হতে পারে।'

'এমন !' চারু ভুরু টান করল। 'আহা, একবার দেখতে পেলাম না।'

'পাগল হয়ে যাবে রায়। আমি অলরেডি পাগল হয়েছি।' কে. গুপ্ত হপ্‌কিন্স আওড়ায়—

How to keep—is there any, any, is there none such, nowhere known some, bow or brooch or braid or brace, lace....latch or catch or key to keep.

Back beauty, keep it, beauty, beauty beauty....from vanishing away ?

'এভেলেবুল ?' চারু ভুরু কুঁচকোয়।

'তা জানি না।' গুপ্ত মাথা নাড়ল। তবে কানাঘুষা শুনছি শ্রীমান শীগ্‌গির বেকার হচ্ছে, হয়তো হয়েই গেছে! কাল কোন্ ঘর থেকে আটা ধার করে এনেছিলেন বধূ। সেটা আর ফিরিয়ে দিতে না পেরে খুব অপমানিতা হয়েছেন।'

চারু গম্ভীর হয়ে কি ভাবে।

'আমার মৌ-বনের কুইন।' গুপ্ত বেশ শব্দ করে হাসে। 'একবার প্রপোজ করতে পার। ভাল টাকা দিয়ে শ্রীমানটাকে যদি বশ করতে পার, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে বলতে হবে আজকাল অনেক কুলীন ঘরের বৌ-ঝিরা ফিল্‌মে নামছে, দোষের কিছু নেই, নতুন মফস্বল থেকে এসেছে, বুঝবে না—' গুপ্ত হঠাৎ থামল। কেননা তার কথা এমনিও চাপা পড়ে গেছে একটা মোটরের শব্দে। গুপ্ত, চারু রায় এবং ওধারে আর একটা বেঞ্চে বসা শিবনাথ, বলাই ও দোকানের ভিতর থেকে বনমালী ঘাড় টান করে দেখল অদূরে লিচুতলায় কর্পোরেশনের জলের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।'

এ-পাড়ায় বাসিন্দা বেড়েছে। পাইপের জলে কুলোচ্ছে না বলে দু'বেলা পিঁপে গাড়িতে ক'রে 'পানীয় জল' বিলানো হয়। গাড়ি এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে পিল্ পিল্ করে ছুটে আসে মানুষ। সে-এক কাণ্ড। কে আগে জল ধরবে এই নিয়ে মারামারি। লাইন করে সাজিয়ে রাখা কলসী বালতি ডেক্‌চি গামলা হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দ ক'রে ছত্রখান হয়ে যায়। কেননা যতটা সময় গাড়ি দাঁড়াবার ও যত গ্যালন জল ঢালবার কথা তার চেয়ে প্রায়ই বালতি কলসীর সংখ্যা বেশি হয়ে যায় বলে শেষ পর্যন্ত আর লাইনের নিয়ম রক্ষা হয় না। এর মাথার ওপর দিয়ে ওর বালতি ছুটে যায়, ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে এর ডেকচি বেরিয়ে আসে। চলকানো জলে কারো মাথা ভেজে, কারো ব্লাউজ। বকাবকি ঝকাঝকি।

'হরিবল'। দৃশ্য দেখে ঘাড় ফেরাল।

'আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে গা-সওয়া।' কে. গুপ্ত শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 'এখানে বসে অই ত দেখি।'

'এখানকার ম্যানেজমেণ্ট আরো ভাল হওয়া উচিত।' ছোট্ট একটা নিশ্বাস ছেড়ে চারু রায় বলল, 'এতগুলি ভদ্দরলোকের বাস যেখানে, সেখানে—' কথা তার হঠাৎ থেমে যায়। কে. গুপ্ত প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বন্ধুর একটা হাত চেপে ধরল। 'দ্যাট' দ্যাট লেডী, এ কুইন, লুক ইয়ণ্ডার।' চারু রায়ের কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল কে. গুপ্ত। চারু রায় চমকে লিচুতলার দিকে ঘাড় ঘোরায়। তারপর হা ক'রে তাকিয়ে দেখে।

মাটির কলসী কাঁখে বিধুমাস্টারের দুই মেয়ে মমতা সাধনা, পিছনে একটা বড় বালতি হাতে ময়না বীথি টগর। তারপর করবী ছন্দা বেবি। ওদের হাতে মাগ্ ঘটি। এবং বেবির ঠিক পিছনেই চলছিল কমলা। দশ নম্বর ঘরের গৃহিণী। আঁচল খসে খোঁপাটা দেখা যাচ্ছে। একটা বড় কুন্দফুল গোঁজা। আর কলসীর ভারে যৌবনপুষ্ট শরীরে দোলা লাগছিল। গভীর জলের বুকের মন্থর ঢেউয়ের মতন। কমলার পিছনে

আর কেউ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওর সবটাই দেখা গেল, তারপর বাসকের বেড়ার আড়াল পড়ে যাওয়াতে আর কিছু দেখা গেল না। জল নিয়ে ঘরে ফেরার দল অদৃশ্য হ'ল।

দেখা শেষ হ'তে চারু ঘাড় ফেরায়।

'মক্ষীরাণী কিনা?' গুপ্ত চোখ বড় করে আছে।

তৎক্ষণাৎ কথার জবাব না দিয়ে চোখ বুজে চারু কি যেন চিন্তা করল, তারপর সোনার ডিবে থেকে সিগারেট তুলে বন্ধুকে একটা অফার করে এবং নিজে একটা মুখে গুঁজে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সিগারেটে দুটো টান দেবার পর আস্তে আস্তে বলল, 'দ্যাখো গুপ্ত, যজ্ঞ যখন আরম্ভ করেছি, সম্পন্ন করবই। আই উইল ট্রাই, মাস্ট ট্রাই। আই লাইক টু হ্যাভ অল দোজ ফেসেস। কি নাম বললে আগের দুটির; বাপ মাস্টার? তাতে আটকায় না, আটকাচ্ছে না আজকাল। লিলুয়া থেকে আমি ডলিকে পেয়েছি, বাপ মাস্টার ঠিক নয়, টোলের পণ্ডিত। আরো গোঁড়া আরো ভীরু। কিন্তু কী করবে, পেট বড় কি মান বড়। বরানগরের সুমিতার বাবা তো রিসার্চ স্কলার। মফস্বলের কোন্ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন এককালে। বুড়ো বয়স তায় অন্ধ হয়ে গিয়ে কি আর হবে, সুমি গাইতে পারে ভাল, দিলেন ফিল্মে ঢুকিয়ে। তেমনি আমার মীরা, চিত্রা, পাখি বোস, টেবি রায়। মোট আটটি মেয়ে আমি জোগাড় করতে পেরেছি এবং বংশ বল গোত্র বল পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা বিচার করলে কেউ তারা হীন নয়। কাজেই এখানেও যে আমি একেবারে নিরাশ হব বলা চলে না।'

'গুপ্ত চুপ ক'রে সিগারেট টানতে লাগল।'

'আরো আট দশটি মেয়ের আমার দরকার হবে। অ্যাণ্ড অল শুড বি নিউ ফেসেস। ছবি তোলার কাজে এই হল আমার প্রিন্সিপল। বিশেষ যে-সমাজ অবলম্বন করে আমার গল্প সেই সমাজের সেই অবস্থার মুখগুলোকে একত্র করে বই আরম্ভ করতে না পারা তক প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

গুপ্ত কথা না কয়ে ঘাড় নাড়ল।

'মায়াকানন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ নিয়ে ছবি?' ওধারের বেঞ্চের শিবনাথ প্রশ্ন করে। 'ক্ষয়িষ্ণু নরনারীর গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'তার ওপর সেক্স-এর কড়া রঙ!' এপাশ থেকে কে. গুপ্ত দাঁত বের করে হাসল। 'চমৎকার ছবি হবে।'

'ইকনমিক্ ফ্রাসট্রেসান আর সেক্স অঙ্গাঙ্গী জড়িত', চারু রায় বক্তৃতা ক'রে বলল, 'যুদ্ধোত্তর জার্মেনীতে এই হচ্ছে, জাপানে হচ্ছে। আজ বাংলাদেশেও যা ঘটছে, তার প্রথম ছবি আমি তুলব। অ্যাণ্ড দিস্ উইল বি এ গ্রেট পিক্চার।' কথা শেষ করে চারু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। সবাই শুনে চুপ।

'এই ছবি দেখলে গায়ে কাঁটা দেবে, রক্ত হিম হবে, অথচ ছবি শেষ হয়ে যাবার পরও লোকে জায়গা ছেড়ে উঠতে চাইবে না।'

'এত অ্যাপীল, এমন ইণ্টারেস্টিং ?' ওধার থেকে শিবনাথ চোখ বড় করল।

'হ্যাঁ।' চারু এবার শিবনাথকে সিগারেট অফার করল। 'আছে নাকি আপনার জানাশোনা মেয়ে। মোটামুটি ইণ্টেলিজেণ্ট মডারেট শিক্ষিত। চেহারা যে খুব একটা মেনকা উর্বশী হতে হবে, তার কিছু নেই। ধরুন মিস ইভা চ্যাটার্জি সাবানের কারখানায় কাজ করছে, ওর অপ্সরী রূপ হবার দরকার নেই। সাধারণ প্লট, কমন জিনিস নিয়ে গল্প হলে কি দরকার, কাদের দরকার বুঝতে পারছেন ?'

অল্প হেসে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, জানাশোনা এমন কাউকে অবশ্য দেখছি না।'

'না, না, তোমার টু-সীটার নিয়ে দিনকতক ঘোরাঘুরি কর এ-পাড়ায়, একটু চেষ্টা করলে, খোঁজাখুজি করলে পেয়ে যাবে মনের মত মুখ।' গুপ্ত বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে তার সোনার ডিবে থেকে নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিলে। 'চাকরিই তো করছে এখন চৌদ্দ আনা। ঘরে ব'সে আর ক'টা মেয়ে। এসো মাঝে মাঝে, আমরা বলে কয়ে দেখব'খন।'

'ডিসেণ্টভাবে থাকবার মেয়েদের এখন অই তো একটি লাইন।' পকেট থেকে সিল্ক-এর রুমাল বের করে মুখখানা একবার মুছল। 'একটু পার্টস আছে এমন মেয়েদের কেরিয়ার গড়ে তোলার কত বড় সুযোগ !' আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরা বোম্বে মাদ্রাজের মত সাড়া দিতে পারছে না।'

'ভীরু, বড় লাজুক।' ওধার থেকে শিবনাথ বলল, 'একটু দেরি করছে। কিন্তু দেবে সাড়া।'

চারু রায় আর মন্তব্য করল না।

'আচ্ছা, আজ উঠি ব্রাদার।' একটু পর কে. গুপ্তর দিকে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। 'আর এক শনিবার আসব। কুইনকে জুটিয়ে দাও গুপ্ত। বলে কয়ে দ্যাখো। তোমাকে আমি মোটা কমিশন দেব। এ বিউটিফুল ওম্যান। কী নাম না যেন বললে হ্যাজবেণ্ডের, কত নম্বর ঘর ?'

'অমল চাকলাদার, দশ নম্বর ঘর।' কে. গুপ্ত কিরণের স্বামীর নাম ও ঘরের নম্বর বলল। চারু নোট বইয়ে টুকে নিলে।

'মাঝে মাঝে দেখতে পাবেন মশাই, আসব এ-পাড়ায়, চলি আজ, নোট বই পকেটে পুরে চারু শিবনাথের দিকে তাকায়।'

'আসবেন বইকি', হেসে শিবনাথ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'রিলিজড হোক। মায়াকানন ছবি আমি দেখতে ভুলব না।'

যেন এ কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করল চারু রায়। অথবা যেন উত্তরে কি বলবে ভেবেও মুখে সেটা আর প্রকাশ করলে না, মুচকি হেসে হরিতকী গাছের ছায়ায় রাখা তার হলদে টু-সীটারে গিয়ে চাপল।

গাড়িটা অদৃশ্য হ'তে কে. গুপ্ত বেশ শব্দ করে হাসল। 'শালা সিনেমার মেয়ে খুঁজতে গেরস্ত পাড়া অবধি ধাওয়া করছে।'

'আমাদের পাড়ায় একটাও মেয়ে পাবে না।' বলাই এই প্রথম মুখ খুলল।

'তোরা সেইজন্যেই তো না খেয়ে মরিস হতভাগা দল।' কে. গুপ্ত বলাইয়ের দিকে তাকায়। 'কেন, দে-না তোর ময়নাকে ঢুকিয়ে,—ভাল চেহারা, উঠতি বয়েস, বলব চারুকে ?'

'ময়নার মা আপত্তি করবে।'

'তাতে বয়ে গেল। তুই বাপ। তোর অনুমতি থাকলেই হ'ল।'

'নাঃ।' যেন একটু সময় কি ভেবে বলাই মাথা নাড়ল। 'সিনেমায় ঢুকলে ছেলে-মেয়ের চরিত্তির বিগড়ে যায়। ওটা ভালো রাস্তা না সাহেব।'

'তবে মরগে যাও! ভ্রূকুঞ্চিত করল গুপ্ত। আমি ভেবেছি বছর দুই যাক, আমার বেবিটাকে ঢুকিয়ে দেব। প্রমিনেণ্ট নাক-চোখ আছে। একটু দিশা থাকলে শাইন করতে পারবে।'

'তাই দাও, তাই দিও গুপ্ত। এখানে ভাঙ্গা টুলে বসে গাছের পাতা গুনলে দিন যাবে কেন।' বলে বনমালী মুচকি হাসে। দেখে শিবনাথও হাসল।

'কি মশাই, আপনারও প্রেজুডিস আছে নাকি। চান্স পেয়ে ওয়াইফ যদি ফিল্মে নামতে চান আপনি আপত্তি করবেন নাকি ?'

হঠাৎ এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যেন প্রস্তুত নেই, এমন ভান ক'রে শিবনাথ গুপ্তর মুখের দিকে তাকায়।

'বলুন তো চারুকে বলি, রাজী আছেন ?'

এবার বেশ অপ্রস্তুত হয়ে ও ঈষৎ আরক্ত হয়ে শিবনাথ মাটির দিকে তাকায়। যেন ভদ্রলোকের অসহায় ভাব লক্ষ্য ক'রে বনমালী বলল, 'ওটা উনি পরে ঠিক করবেন। তুমি আগে বলে কয়ে অমলকে রাজী করাও গুপ্ত। আহা ঐ চেহারা পর্দায় উঠলে শহরসুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়বে ছবি দেখতে।' কথা শেষ ক'রে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেশ চড়া গলায় সে হাসল, তারপর হঠাৎ গুপ্তর চোখে চোখে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'খবরদার, ওটি করতে যেওনা গুপ্ত! বৌ-পাগলা মানুষ অমল। এমনধারা প্রস্তাব দিতে গেলে তোমার মাথা আলগা ক'রে দেবে ও দায়ের কোপে।'

'তোর মতন গজমূর্খ কিনা আমি।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কে. গুপ্ত মাথাটা কাত করল। 'অমলের কানে এ-প্রস্তাব দিতে যাব কেন? বলতে হয় সোজাসুজি কিরণকেই একদিন নিরিবিলি ডেকে বলব—জিজ্ঞেস করব, রাজী কিনা।'

'সেই নিরিবিলি তোমায় দিচ্ছে কে, পাচ্ছ কোথায় কিরণকে একলা যে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে সিনেমায় নামাবে।' বেশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বনমালী কে. গুপ্তর দিকে তাকায়। 'বাড়িভরা মানুষ। এখন এখানে রাস্তায়ও রাতদিন লোক গিসগিস করে।'

'শালা, ঈশ্বর সহায় হলে পাড়া ঠাণ্ডা হ'তে কতক্ষণ। ধর কলেরা লেগে চৌদ্দ আনা লোক সাফ হয়ে গেলে, বাকি দু'আনা পালাল প্রাণের ভয়ে। রইল শুধু কিরণ, আর আমি, আর তুই। আমি তোর দোকানের দরজায় এমনি ব'সে আছি। কর্পোরেশনের জলের গাড়ি এল জল দিতে। বস্তি থেকে কলসী কাঁখে বেরিয়ে এলো সেদিন একলা কিরণ। এমন দিনও তো আসতে পারে, কি বলেন মশাই।'

কে. গুপ্ত শিবনাথের দিকে চেয়ে টেনে টেনে হাসে। 'ঈশ্বর সহায় থাকলে

সংসারে কি না হয়।'

শুনে শিবনাথ, বনমালী ও বলাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

সেদিন সকালে আড্ডা জমল ভাল।

ঠিক দুপুরটি হলে শহর থেকে ফেরিওয়ালা এখানে আসতে আরম্ভ করে। চীনা সিঁদুর আসে, আলতা আসে, সেফ্‌টিপিন, ধূপকাঠি, কাগজের ফুল, আয়না চিরুনি, চুলের কাঁটা, ফিতা—

এত বড় কাঠের বাক্সের মাথায় দোকান সাজিয়ে হাজার রকমের মনোহারী নিয়ে সাড়ে ছ'আনা আসে, কাচ পরানো বাক্স বুকে ঝুলিয়ে আসে রেশমি মেঠাই, অবাক্‌-খাবার। আঙুর আপেল বেচতে আসে, কেউ বা শুধু কলা। কেউ না ডাকলেও ফেরিওয়ালা বস্তিতে ঢোকে এবং সোজা উঠোনে চলে আসে।

আর মাছির মতন ঝাঁক বেঁধে তখন সকলের আগে ছেলেমেয়েগুলো ফেরিওয়ালার বেসাতি ঘিরে দাঁড়ায়। পিছনে দাঁড়ায় বৌ-ঝিরা, সকলের পিছনে বুড়ীর দল। তারা চোখে কম দেখতে পায় এবং ঠেলাঠেলি করার মতন গায়ে জোর পায়না বলে জিনিস দাম করার চাইতে সামনের মাথাগুলোকে দন্তহীন মাড়ি দিয়ে চিবোতে বা প্রত্যেক-টিকে এই মুহূর্তে যমপুরীতে পাঠাতে পছন্দ করে বেশি। ভাগ্যিস ক্ষীণ কণ্ঠের অভিসম্পাত বা তিরস্কার কারো কানে পৌঁছায় না। যুবতীর কলহাসি, বালিকার চিৎকার, শিশুর আবদারে কান্না বা হাসিতে কানে তালা লেগে যায়। জিনিস কেনার চেয়ে দেখার, হাতাবার এবং শুধুই দরদস্তুর করার আগ্রহ দেখে ফেরিওয়ালারা ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকে এবং বেসাতি গুটিয়ে তখনি সরে পড়ার ভয় দেখাতে থাকে। কিন্তু এসেই ও চলে যাবে সাধ্য কি, রাস্তা কোথায়! কাচ্চাবাচ্চা এবং বড় মানুষের দঙ্গলের মধ্যে আটকা পড়ে লোকটা হাঁসফাঁস করতে থাকে এবং ভবিষ্যতে এ-বস্তিতে আর ঢুকবে না ব'লে সবাইকে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করে। যদিও বাড়ির লোকগুলো এবং তার চেয়েও বেশি সে নিজে জানে যে কাল আবার ঠিক এমন সময় তাকে এই উঠোনেই ফিরি নিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে।

অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর বিমল হালদারের বৌ হিরণ কাচের বাটিটা কিনল। বীথির বড় বোন প্রীতি কিনল প্লাষ্টিকের কুরশী-কাঁটা। কমলা কিনল জুতোর কালি। রমেশ-গিন্নীও অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর মেজো মেয়ের আবদারে একটা স্নো ও একটা পাউডার-পাফ কিনলে। ডাক্তারের মেয়ে কিনল লাল সবুজ সুতোর লাছি। একটা টেবিল-ক্লথ তৈরী করছে সে। সম্ভবত, বিয়ে হলে ওটা ওর বরের টেবিলে বিছাবে, মনে মনে ঠিক ক'রে এখন রাতদিন ওটা নিয়েই পড়ে আছে। চার কোণায় চারটে গোলাপ, মাঝখানে শুধু তিনটি পাতা। একটা ফুল ও পাতার কাজ একটু বাকি আছে, তাই আজ আরো খানিকটা সুতো কিনে নিলে। ডাক্তার-গিন্নী প্রভাতকণা টেবিল ঢাকনাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে মেয়েকে চাপ দিচ্ছে। এবং এখন সুনীতির সুতো কিনতে খাওয়া শেষ না হতে এঁটো হাতে ছুটে এসেছে উঠানে ও বাঁ-হাতে লাছি দু'টো তুলে নিয়ে বার বার পরীক্ষা করছে রংটা পাকা কি কাঁচা! এবং গলা বড় করে তিনবার ফেরিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল টেবিল

ঢাকনার কাজ হবে, ধোপে টেঁকবে কি না, এ-ঢাকনা জামায়ের টেবিলে থাকবে। হেসে ফেরিওয়ালা ঘাড় কাত করে বলেছে, এক ধোপ কেন সাত ধোপেও রং উঠবে না। শহরের তিনটে পাড়ায় এইমাত্র সে বারো লাছি সুতো বিক্রি ক'রে এল। সেদিন বালিগঞ্জে বিক্রি করেছে বিশ লাছি। বিধু মাস্টারের বৌ ছোট দু'ছেলে ও এক মেয়ের জন্যে তিনটে পেন্সিল কিনে পয়সার অভাবে আর কিছু কিনতে পারে না।

'আর কারো কিছু চাই?' ফেরিওয়ালা হাঁক দেয়, যেন দোকান গুটিয়ে এখনি উঠবে, ঘন ঘন সকলের মুখের দিকে তাকায়। কিরণ হাত থেকে কাচের কুঁজোটা নামিয়ে রাখল, ময়না সাবানটা কিনতে পারলে না। হিরুর মা ও প্রমথর মা শেষ-মুহূর্তে একটা করে কাচের গ্লাস ও কুঁজো কিনল এবং সেজো মেয়ের আবদার রাখতে রমেশ-গিন্নী প্লাষ্টিকের বড় সোপ-কেসটা কিনল। পাঁচু ভাদুড়ীর বৌ কিনল আলতা। আর কেউ কিছু কিনবে না, এই বেলা দোকান তোলা যায়, ফেরিওয়ালা ভাবছিল, এমন সময় তিন লাফে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক পুরুষ। অমল চাকলাদার। এসেই কিরণের হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে তাকে নিয়ে গেল ঘরে। কি ব্যাপার! উঠোনে দাঁড়ানো আর দশটি মেয়ের চোখে বিস্ময়, ফেরিওয়ালা হতভম্ব। ভয় পেয়ে তিনটি শিশু একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

কান খাড়া রাখল সবাই দশ নম্বর ঘরের দিকে।

কিরণ কাঁদছে।

'শাসন করছে।' নিচু গলায় একজন আর একজনকে বলল।

'মেরেছে, মারছে ওই শোন।' চাপা হাসি হেসে রমেশ-গিন্নী বলল, 'এদিক না থাক ওদিক আছে মরদের,একটা ছুঁচ কিনতে পারলে না, মেয়েটা মার খেয়ে মরছে।'

'কেন কি হয়েছে, কি দোষ করল কিরণ?' কে একজন প্রশ্ন করতে ঠোঁট বেঁকিয়ে আর একজন উত্তর দেয়: 'ছোট লোক, ছোটলোকের বাস এখানে, রাতদিন মারপিট কান্না হৈ-রৈ লেগেই আছে, কারণ, আর অকারণ কি? ভাল ভদ্রপাড়ায় ঘর পেলে আমি কালই উঠে যেতুম।'

চোখ ফিরিয়ে সবাই দেখল প্রভাতকণা। এঁটো ডানহাতটা শূন্যে তুলে রেখে বাঁ-হাতে সুনীতিকে ধ'রে ডাক্তার-গিন্নী সকলের আগে উঠোন ছেড়ে ঘরে উঠে গেল।

'বেশি অহংকার হয়েছে ডাক্তারনীর।' বীথির মা বিধু মাস্টারের স্ত্রীর কানে কানে বলে। 'পয়সার গরম!'

'অহংকার ভাল না, অহঙ্কারে পতন ঘটে।' অনেক আবৃত্তির মতন সুর ক'রে লক্ষ্মীমণি মন্তব্য করে। এবং হয়ত পুরো কবিতাই একটা শিক্ষকগিন্নী সেখানে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলে যেত কিন্তু সেটা পারল না, হ'ল না কিরণের কান্নার বাড়াবাড়িতে। চিৎকার করে কাঁদছে এখনও।

আর কেউ কোনো কথা বলছে না।

বেসাতি তুলে ফেরিওয়ালা আস্তে আস্তে উঠোন থেকে সরে যায়! এবার একদঙ্গল ছেলেমেয়ে তার পিছনে লেগেছে। তারা মুখ দিয়ে গলা দিয়ে নানারকম আওয়াজ বার করছে, শ্লোগান আওড়াচ্ছে: 'সাড়ে ছ'আনা অনেক দর, জিনিসপত্তর সস্তা কর।'

আর একদল বলছে 'ফেরিওয়ালার জুলুম—চলবে না' ইত্যাদি। তাদের এই ধরনের আন্দোলন করার কারণ পয়সার অভাবে তারা কেউ একদিনও লোকটার কাছ থেকে কিছু কিনতে পারে না। অথচ কী সে না আনে! লাট্টু, লাটাই, রবারের বল, লুডো, প্লাষ্টিকের মাউথ-অর্গান পর্যন্ত। অতিরিক্ত খেলনার মধ্যে আজ এনেছিল প্লাষ্টিকের তৈরি একটা প্যাগোডা এবং একটা মোটর সাইকেল। তাতে একজন মেমসাহেব বসা। রাস্তায় নেমেও ফেরিওয়ালার পিছন পিছন বাচ্চাগুলো অনেকদূর ছুটে যায়।

দশ

বেশ অন্ধকার ক'রে রুচি ফেরে। শিবনাথ ঘরের মেঝেয় উবু হয়ে ব'সে হ্যারিকেনের চিমনি পরাতে ব্যস্ত। মা'র ফিরতে দেরি দেখে মঞ্জু কাঁদছিল এবং এতক্ষণ মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সান্ধ্যবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ আলোটা জ্বালতে পারেনি। কাজেই রুচি ভিতরে ঢোকার পরও ঘর অন্ধকার ছিল।

আলো জ্বলতে সে ঘরে একটা নতুন জিনিস দেখতে পেল।

'ওটা কখন কিনলে?'

'দুপুরে, একটা ফেরিওলা এসেছিল।' শিবনাথ অল্প হাসল।

কিন্তু বাক্সের ওপর রাখা অ্যাশ্‌ট্রেটা হাতে নিয়ে রুচি একবার দেখল না। হাতের থলেটা নামিয়ে রেখে সে কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হয়।

'বেশ নতুন ডিজাইন। দেখে পছন্দ হ'ল।' নতুন কেনা অ্যাশ্‌ট্রেটা হাতে নিয়ে শিবনাথ নাড়াচাড়া করে। 'সাড়ে ছ' আনা, দাম খুব বেশি না।'

'ঘরে তো পয়সা ছিল না, যে ক' আনা ছিল আমি সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। পয়সা পেলে কোথায়?'

স্ত্রীর এই প্রশ্নে শিবনাথ একটু গর্বিত-ভঙ্গিতে তাকায়। অ্যাশ্‌ট্রেটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, 'তোমার কি মনে হয়?'

'কি ক'রে বলব!' বেশ গম্ভীর হয়ে রুচি উত্তর দেয়। ফর্সা ব্লাউজ ছেড়ে সে ময়লা মতন ব্লাউজটা গায়ে চড়ায়; মঞ্জু আর অপেক্ষা না করে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শিবনাথ যতটা উৎসাহ নিয়ে কথা বলবে বলে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, রুচির চেহারা দেখে তা আর পারল না। তবু যতটা সম্ভব হাসি-হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে এসেছি, একটু একটু ক'রে এখন সকলের সঙ্গে জানা-শোনা হচ্ছে। তখন জিনিসটা পছন্দ হ'তে ভাবলাম কোথা থেকে দাম দিই, ফেরিওয়ালারা কখনো ধারে কিছু বিক্রি করে না, এমন সময় বনমালী নিজে থেকে বললে, 'তার জন্যে কি, আমি পয়সাটা দিয়ে দিচ্ছি, পরে একসময় আমাকে দিলেই চলবে।'

'দুপুরেও বুঝি মুদিদোকানের সামনে তোমাদের আড্ডা জমেছিল।' রুচি এবার ঘাড় ফেরায়। 'কে কে ছিল?'

শিবনাথ ঈষৎ লজ্জিত হয়। 'আমি, কে. গুপ্ত।' একটু থেমে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি বেরিয়ে গেলে কাজে, মঞ্জু ঘুমোচ্ছিল, একলা একলা আর কি করি তখন—'

'কারো কাছে কিছু খোঁজখবর পেলে ? এ-মাস তো কাবার হ'তে চলল। সামনের মাসে একটাও অন্ততঃ ট্যুইশানি যদি না যোগাড় করতে পার খুব মুশকিলে পড়তে হবে আমাদের।'

শিবনাথ নীরব।

মঞ্জুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে রুচি হাত-মুখ ধুয়ে এল।

'তা ছাড়া, এ্যাদ্দিন সবাই আমরা আশায় আশায় ছিলাম, কম হোক বেশি হোক এবছর একটা ইনক্রিমেণ্ট হবে। আজ সেক্রেটারির কথায় বুঝলুম, এবছর তা হবার আশা কম, কম কি নেই-ই একরকম। সিনিয়র টিচারদেরও বেতন বাড়বে বলে মনে হয় না। ইস্কুলের ফাণ্ডের অবস্থা নাকি ভাল না।'

শিবনাথ তেমনি চুপ থেকে হাতের নখ খোঁটে।

ও-বেলা রুটি-তরকারি ক'রে রেখেছিল রুচি। ঠাণ্ডা পড়েছে। এখন এক বেলার জিনিস আর এক বেলায় রেঁধে রাখলেও নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই, তাই শিবনাথই রুচিকে এ-প্রস্তাব দিয়েছে। কেবল কয়লা বাঁচবে বলে নয়, খেটেখুটে এসে আবার এসব কাজে হাত লাগাতে রুচির কষ্ট হবে চিন্তা করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মঞ্জুকে খেতে দিয়ে রুচি বলল, 'চাকরিবাকরি যখন শীগ্‌গির হবার সম্ভাবনা নেই, তখন ট্যুইশানির চেষ্টা করাই ভাল।'

'আমি চেষ্টা করছি।' শিবনাথ বলল, 'নতুন জায়গা, দু'চারদিন যাক, আর একটু জানাশোনা হয়ে গেলেই একটা দু'টো অন্ততঃ জুটবেই। হ্যাঁ, অনেক পয়সাওলা লোকও এসব অঞ্চলে আছে টের পাচ্ছি, তাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ইস্কুল কলেজে যায় !'

হঠাৎ শিবনাথ থামল।

কেননা একটা চামচিকে ঘরে ঢুকে ফররর্ শব্দ করে মাথার ওপর অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে দেখে মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল, রুচিও খুব হাসতে লাগল। আবহাওয়া তরল হয়েছে অনুমান ক'রে শিবনাথ ঢোক গিলল এবং ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা অ্যাশ্‌ট্রেটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে আস্তে বলল, 'দুপুরবেলা আজ বাড়িতে এক কাণ্ড হয়েছে।'

'কি ?' রুচি শিবনাথের দিকে তাকায়।

'অমল আজ তার বৌকে খুব মেরেছে।'

'কে অমল ?' রুচি অবাক হয়ে তাকাল।

'দশ নম্বর ঘরের ভাড়াটে। কিরণ। কিরণের স্বামীর নাম অমল চাকলাদার।'

রুচি চুপ করে রইল। বস্তুতে এ বাড়ির প্রায় সব ক'টা ঘরের নম্বর এবং বাসিন্দাদের নাম শিবনাথ যেমন মনে রাখছে রুচি তা পারছে না। কেবল গোলমাল হচ্ছে ওর। এতগুলো মুখ, তাদের নাম ও প্রত্যেকের ঘরের নম্বর ঠিক রাখতে মনের যে

স্থৈর্য, নিশ্চিন্ততা ও সময়ের প্রয়োজন, রুচির তা নেই যদিও। শিবনাথ অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত, ঠাণ্ডা মেজাজের এবং চাকরিটি গেছে পর থেকে সময় তো প্রচুর পাচ্ছেই।

একটু বাঁকা সুরে রুচি প্রশ্ন করল, 'কি দোষ করেছিল তোমাদের কিরণ?'

খোঁচাটুকু শিবনাথ হয়তো বুঝল, কিন্তু গায়ে মাখল না। বলল, 'আমিও তখন বাড়িতে ছিলাম না, বনমালীর দোকানের সামনে ব'সে আছি, সেখানেই লোকটার কাছ থেকে অ্যাশট্রেটা কিনি। পরে বাড়িতে এসে শুনলাম, ফেরিওয়ালাটা অনেকক্ষণ এই উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। আর দশটি মেয়ে যেমন দাঁড়িয়ে জিনিস কিনছিল, কিরণও ছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু আর দশটি মেয়ের হাতের সঙ্গে হাত না ঠেকে কিরণের হাতের সঙ্গেই নাকি লোকটার হাত ঠেকেছিল। ঘরের ভেতর থেকে জিনিসটা তার স্বামীর নজরে পড়েছিল। পড়তেই উঠোনে ছুটে এসে বৌকে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে ভীষণ প্রহার। চিৎকার ক'রে সারা দুপুর কাঁদছিল বেচারা।'

কথা শেষ ক'রে শিবনাথ হাসল। রুচি গম্ভীর।

'লেখাপড়া না শেখার যা দোষ। অত্যন্ত কনজারভেটিভ এই লোকটা। অমল চাকলাদার। এদিকে কিন্তু শ্রীমানের চাকরি নেই। চায়ের দোকানে উনিশ টাকা বাকি।'

কিন্তু রুচি হঠাৎ একটু বেশিরকম গম্ভীর হয়ে আছে দেখে শিবনাথ চুপ করল।

মঞ্জুর খাওয়া শেষ হ'তে হাতমুখ ধোয়াতে রুচি উঠে যায়। শিবনাথ সিগারেট ধরায়। সিগারেট ধরিয়ে ভাবে এখন এই অবস্থায় সকালের সেই কে. গুপ্ত এবং তার সিনেমার বন্ধু চারু রায়ের মধ্যে এ বাড়ির মক্ষীরাণী কিরণকে নিয়ে যে-গল্পটা হয়েছিল, রুচিকে সেটা বলা ঠিক হবে কিনা। অবশ্য এ-গল্পের সঙ্গে রুচিও এক জায়গায় সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে। ভেবে শিবনাথ মনে মনে হাসল। কিন্তু আবার মঞ্জুর হাত ধরে স্ত্রীর ঘরে ফিরে আসার পর তার চেহারা দেখে শিবনাথ বলতে সাহস পেলে না গল্পটা। রাত্রে বহুক্ষণ সেটা কেবল তার মগজের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগল।

রাত্রে শিবনাথ এবং রুচি দু'জনেই শুনল পাশের কোন্ একটা ঘরে অত্যন্ত কর্কশ গলায় কে কাকে গালাগাল দিচ্ছে।

'আমি তোমায় পুনঃপুনঃ নিষেধ করেছি মুদিরদোকান থেকে আর ধারে জিনিস এনো না, ও চার আনার সওদা ধারে আনলে অমনি খাতায় আট আনা—ডবল দাম লিখে রাখে,—বনমালী হারামজাদা আমাদের সর্বস্ব গিলতে চাইছে তুমি কি জান না?'

প্রতিপক্ষের গলা শোনা গেল না।

'এটায় কুলাচ্ছে না, ওটা ফুরিয়ে গেল—রব ছাড়া তোমার মুখে আমি অন্য কথা শুনি না, যখনই ঘরে আসি।'

'আমার তো একটা মুখ না। ঘর ভরে ফেলছ বাচ্চা দিয়ে, চাল থেকে নুন, ডাল থেকে কয়লা, চিনি থেকে কাঠ কেরোসিন কোন্‌টা কম লাগছে, এর চেয়ে কম দিয়ে কে চালাতে পারে? একবার তুমি ঘরে এসে আসন পেতে দ্যাখ না।'—স্ত্রী-কণ্ঠ।

'না, আমি বাইরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি, বেশত,

একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দ্যাখো না ক' টাকা রোজগার ক'রে আনতে পার। হ্যাঁ, আমি ভাত সেদ্ধ করছি।' পুরুষের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ।

'তোমার চেয়ে অনেক বেশি পারি আমি। তোমার মত গাধা না সবাই। এমন মোটা বুদ্ধি! ইস্কুলের মাস্টারি ছাড়া সংসারে আর টাকা রোজগারের পথ নেই!' বিদ্রূপ আরও কড়া।

'কি করতে, সিনেমায় নামতে, ওই চেহারায়? বারোটি সন্তানের মা হয়ে? গায়ে থু-থু দেবে সব, হা-হা।' পুরুষ হেসে উঠল।

'এই, সাবধানে কথা বলো বলছি, অসভ্য! না হলে গায়ে ভাতের গরম মাড় ঢেলে দেব। কী কুৎসিত চরিত্র হয়েছে তোমার দু'টো গাধা মেয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে। কেন আমি কি বলেছি নাকি যে সিনেমায় নামব। সাধনা, মমতা, রইল তোদের সংসার, রান্না; ভাইবোন মানুষ করা। আমি কালই ডিহিরি তোদের মামাবাবুর বাসায় চলে যাব। দাদা সেদিন এই সংসারের ও আমার নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলছিলেন, 'চল্ লক্ষ্মী! ক'দিনের জন্য ডিহিরি, তোর বৌদির কাছে থাকবি। কালই আমি চলে যেতে পারি ইচ্ছে করলে, আমায় বেশি ঘাঁটিও না বলছি।' লক্ষ্মীমণির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একঘর শিশু কলরব করে উঠল, 'না মা, তুমি যেও না, তুমি চলে গেলে বাবা আমাদের শুধু শুকনো চিঁড়ে আর মুলো খাইয়ে মেরে ফেলবে। আমরা মরে যাব।'

'এই চুপ্, চুপ্ শুয়ারের দল!' বিধু মাস্টারের প্রচণ্ড গর্জন রাত্রির অন্ধকারে কেঁপে উঠল, 'তা আমি একলা হাতে ক'দিক সামলাব, ইস্কুল, ভাত-রান্না, ট্যুইশানি একসঙ্গে তিনটে হয় না। হ্যাঁ, চিঁড়ে কেন, এবার যদি তোদের মা কোথাও বেড়াতে চলে যায়, তোদের গুষ্টিকে আমি শ্রেফ্ গোবর খাইয়ে রাখব। আমি বদমাশ কম না।'

এরপর লক্ষ্মীমণির গলা একবারও শোনা গেল না। রাত বাড়তে লাগল। ঘরে ঘরে শোনা যেতে লাগলো কেবল ঘুমের গর্জন, লম্বা লম্বা নিশ্বাস। এর সবটাই ঘুম না। সবাই ঘুমোয় না। জেগে থেকে বিছানায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাসের করাত চালিয়ে অন্ধকার চিরছে অনেকে। রুচি জেগে ছিল। শিবনাথ অনেকক্ষণ ঘুমোচ্ছে।

দিনের বেলা রুচি শিবনাথকে বেশ কড়াভাবে বলল, 'হুট ক'রে ধার ক'রে সাড়ে ছ' আনা দিয়ে একটা অ্যাশট্রে কেনার বিলাসিতা তাকে ছাড়তে হবে, না হলে মঞ্জুকে নিয়ে সে রাঁচিতে তার কাকাবাবুর কাছে চলে যাবে। এভাবে একটা বস্তিতে বাস ক'রে সারারাত সব মধুর কণ্ঠের দাম্পত্যালাপ শুনে জীবন-যাপন করতে রুচি রাজী নয় এবং দুপুরবেলা সে মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলে পড়াতে চলে গেল।

সারাদুপুর মন খারাপ করে রইল শিবনাথ। তারপর একটা ট্যুইশানির চেষ্টায় বেরোবে ব'লে এক সময় পাঞ্জাবি ও চাদর গায়ে দিয়ে রাস্তায় নামল।

পিছনটা দেখেই শিবনাথ দু'জনকে চিনতে পারল। কমলা এবং ন' নম্বর ঘরের বীথি। টেলিফোনে কাজ করে প্রীতি, তার ছোট বোন।

সাধারণতঃ রুচি যে-ধরনের চুল বাঁধে এদের দু'জনের চুল বাধার ধরন তা থেকে একটু আলাদা।

কমলার চুল ভাঁজ করে রাখা টুপির মতন। বীথির মাঝখানটা গর্ত রেখে ধারগুলো বেলুনের মত ফাঁপানো। একজনের কানে রিং, একজনের ছোট্ট দুটো বল। মটরদানা। লাল আর বেগুনি শাড়ি। একজনের পায়ে চটি আর জনের সু। নার্সদের স্মার্ট হয়ে চলতে হয় তাই কমলার সু, শিবনাথ অনুমান করল।

ওরা বাঁক ঘুরে মেন্ রোডে পড়তে শিবনাথও সেই রাস্তা ধরে চলল।

কমলা নুয়ে একটা লোকের কাছ থেকে চিনাবাদাম কিনল, তারপর বীথির হাতে এক মুঠো ছেড়ে দিয়ে দু'জনে বাদাম ভেঙ্গে মুখে দিয়ে আবার কথা বলতে বলতে চলল।

পিছনে থেকে শিবনাথ সিগারেট ধরায়।

'প্রীতি রাস্তা খুঁজে পেয়েছে, আর ভয় নেই। হ্যাঁ, আমিই ওকে বলেছিলাম টিচারি ছেড়ে দে। যদি পয়সার মুখ দেখতে চাস আপিসে ঢোক্। তাই তো ও টেলিফোনে ঢুকেছে।'

'আমি তো খুঁজছি কমলাদি। আমি একেবারে সুবিধে করতে পারছি না। সেই জন্যেই তো তোমাকে বলা।' বীথি ইচ্ছা ক'রে ডান হাতটা কমলার কোমরে ঠেকাল। 'দিদির মত একটা সুবিধে ক'রে দাও।'

উত্তরে কমলা কিছু বলল না। থুতনিটা আকাশের দিকে তুলে কি একটু ভাবল।

'হ্যাঁ, দিদি আমার চেয়ে স্মার্ট, কথাবার্তায় ঢের বেশি চোখামুখা! তাই তো দিদির হয়ে গেল।'

'তোরও হবে। কমলা বীথির দিকে চোখ নামাল। 'অ্যাদ্দিন তো আর রাস্তায় বেরোসনি। ভাবছিলি বেলেঘাটাটাই বুঝি কোলকাতা শহর।'

শুনে বীথি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

'হ্যাঁ' তা-ও বটে। এই সেদিনও কেমন ভয়-ভয় করছিল একলা বেরোতে। শেয়ালদা পর্যন্ত যেতে ও বাসে উঠতে অনেক দিন সাহস পেতাম না। বেশি ভিড় দেখলে তো কথাই নেই। তাছাড়া ঠিক করে রেখেছিলাম গুরু-ট্রেনিং পাস করে এদিককারই একটা ইস্কুলে-টিস্কুলে ঢুকে পড়ব।'

'দূর বোকা! কেন ইস্কুলে মরতে যাবি। কী হয়েছে তোর যে, ইস্কুল ছাড়া গতি নেই?' সোহাগ-মাখা অথচ শাসনের সুর কমলার।

বীথি আবার লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

'এমন যার ভুরু, এমন নাক, তার কিনা—' কথাটা শেষ করল না।

'শুধু চেহারা ভাল হলেই চাকরি পায় মেয়েরা এমন চাকরি আছে কমলাদি?'

'আছে', কমলা বলল, 'লেখাপড়া জানা দূরের কথা, কথা বলতে পারে না, কানে শোনে না—এমন কি চোখেও দেখে না, অন্ধ মেয়ে, চেহারা ভাল হওয়াতে চাকরি পেয়েছে কোনো অফিসে আমি জানি।'

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কি যেন ভাবল বীথি। তারপর প্রশ্ন করল, 'কি কাজ? চোখে দেখতে পায় না সে আবার কাজকর্ম করবে কী।'

'অই আর কি। চোখে দ্যাখে না মানে কাজকর্ম যা করে সবটাই ভুল হয়। কাজের দিকে মন না রেখে কাজ করলে যা হয়?'

'বকুনি খায় না ভুলের জন্য?'

'বকতেই তো ভিতরে ঘন-ঘন ডাক পড়ে।'

'কার, মেয়েটার? কে ডাকে?'

'ওপরওলা।'

'কতদিন বকছে? এভাবে তবে আর ওকে রাখছে কেন?'

'এত ভাল-চোখের-পাতা-মেয়ে হুট্ করে পাওয়া যায় না বলেই। যে-দিন পাওয়া যাবে সেদিন হয়তো মন দিয়ে কাজ করে না বলে ওর চাকরিটি যাবে।'

বীথি চুপ করে রইল।

'মাইনে তো বকুলের জলখাবার কেনার পয়সা।'

'অথচ ওই টাকা মানে নব্বুই টাকাই তো বকুল ফি-মাসে ঘরে আনে এবং এই দিয়ে সারা মাসের ওদের সংসার খরচ চলে। মায় রাণী-টুনির ইস্কুলের বেতন। এই দিয়ে কুলোতে পারছে না বলে বকুল সন্ধ্যার পর একটা গানের ট্যুইশানি নিয়েছে।'

'হ্যাঁ. অই একটা ট্যুইশানির টাকারই তো ও গেল মাসে হার গড়িয়েছে।'

'হার নাকি ওর কোন্ জ্যাঠামশাই দিয়েছে?'

'বাড়িতে বকুল একথা বলেছে নাকি, বাড়ির লোকেরা কি তাদের এমন একজন আত্মীয় আছেন জানতেন না। বকুলের বাপ না খেয়ে রাত জেগে জেগে প্রেসের কাজ ক'রে শেষটায় টি. বি. হয়ে মরল। এই তো মাস ছ'য়েকের কথা না। জ্যাঠামশাই ব'লে কেউ উঁকি দিতে এলেন না, আর আজ অমনি বকুলকে আহ্লাদ ক'রে চার ভরি সোনা দিয়ে হার গড়িয়ে দিলেন!'

যেন বীথিরও একটু চোখ খুলল।

'কে তবে এই জ্যাঠামশাই?'

'আফিসের ম্যানেজার।' কমলা বলল, 'তার কাছেই রোজ সন্ধ্যার পর যায়, গান শেখাতে নয়, শোনাতে।'

বীথি অতিমাত্রায় গম্ভীর।

লক্ষ্য ক'রে কমলা হাসল।

'যাকগে সেসব আফিসে কাজ নিয়ে আমার দরকার নেই। অত টাকাও আমাদের লাগে না, দিদি যা পাচ্ছে আর আমার যদি মোটামুটি রকম একটা ইন্‌কাম থাকে তবেই যথেষ্ট'। বীথি কমলার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' ঘাড় নাড়ল কমলা। 'সেসব আফিসে ঢুকে চোখ দেখিয়ে গায়ের রং দেখিয়ে তুই মোটা ইন্‌কাম করবি আমি বলছি না। বলছিলাম চেষ্টা থাকলে এই বিদ্যায় এই চেহারায় তুইও বকুলের মতন, মতন কেন, বেশি রোজগার করতে পারিস।'

'থাক!' অস্ফুট একটা শব্দ করল বীথি।

'কিন্তু তা ব'লে ইস্কুলে টিচারি করতে তুমি যেও না,' কমলা আবার আকাশের দিকে তাকাল। 'ওতে কোনোদিনই অবস্থার পরিবর্তন হয় না, দিনের নাগাল পাওয়া যায় না। গরীব থেকে যাবে।'

বীথি একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'তা কি আর বুঝি না, তা কি চোখে দেখছি না।'

'বারো নম্বর ঘরের নতুন ভাড়াটে রুচিদিকে দেখলি তো কাল ?'

বীথি ঘাড় নাড়ল।

'দেখতে-শুনতে এমন ভাল, তার ওপর বি-এ পাস। অথচ কি বা ঘরের চেহারা, কি তাঁর শাড়ি-ব্লাউজ ! আমি তো দেখে অবাক্। এ-বাড়িতে, বাড়িতে কেন, পাড়ায় খুঁজলে ক'টা আর বি-এ পাস মেয়ে পাওয়া যায়। তার সংসারের এই ছিরি ?'

'আমার মনে হয় শিবনাথবাবুর চাকরি নেই। মুখে প্রকাশ করছ না বটে, কিন্তু দেখলে বোঝা যায়।' ফিক্ ক'রে বীথি হাসল।

কমলা হাসল না।

'না-ই বা থাকল স্বামীর চাকরি। না থাকা অস্বাভাবিকও না। চারদিকে এত ছাঁটাই চলেছে। কিন্তু তুমিই বা কোন্ বুদ্ধিতে ইস্কুলে পড়ে আছ। বরং ও বেচারার যখন কাজ নেই, একটা অফিসে ঢুকে—'

কমলা কথা শেষ করল না।

'বুদ্ধির দোষ।' বীথি বলল।

'নাহ'লে আড়াই জনের সংসার,' কমলা এবার অল্প শব্দ ক'রে হাসল। 'দু'জনের চাকরি না করলেও চলে। ইস্কুলের চাকরি ছাড়া আর কিছু করব না পণ থাকলে অবশ্য অন্য কথা।'

বীথি নীরব।

'তাই বলছিলাম।' কমলা শেষ করল, 'এ-দিনে, এই দুর্দিনে এতটা রুচিবাগীশ হয়ে লাভ কি, কষ্ট পাওয়া ছাড়া !' কথা শেষ ক'রে সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। দেখাদেখি বীথিও কচুপাতা-রঙ ছোট্ট রুমালটি কপালে মুখে বুলিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগে পুরল। শেয়ালদার বাস্ এসে গেছে। দু'জন গিয়ে গাড়িতে উঠল।

লাইট-পোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে শিবনাথ ভীষণ ঘামছিল। রুমাল দিয়ে ঘাড় এবং কপাল মুছল।

শিবনাথ ভেবে অবাক হ'ল এতক্ষণ, এতটা সময় দাঁড়িয়ে কথা বলল দু'জন, একবার পিছন ফিরে তাকাল না, দেখল না কে এপাশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাকালে শিবনাথই কি বেশি লজ্জা পেত না ?

বাস সরে গেছে।

ধারে-কাছে পরিচিত কেউ নেই দেখে শিবনাথ বিড়ি ধরায়। বিড়ি খাচ্ছে ব'লে শিবনাথের দুঃখ হয় না। দুঃখের অন্য কারণ আছে, ভাবল সে।

এগারো

ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলাই। তার হাঁটু ছড়ে গেছে, কপাল কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। নাকের ডগায় এসে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে নোলকের মত ঝুলছে। বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে বলাই সেটা মুছে ফেলে। পরনের ময়লা লুঙ্গি ও গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিতে রক্ত লেগে চট্‌চট্‌ করছে। যন্ত্রণায় বলাই চিৎকার করে কাঁদত, কিন্তু বুঝি তার সময় ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে, পুলিসের গাড়ি আছে কি চলে গেছে। না, তখনো গাড়িটা দাঁড়িয়ে। আর দেখতে না দেখতে গাড়ি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে ফল, সব্‌জি, পেঁয়াজ, আলু, পান, বাতাসা, তেলেভাজা খাবার ও চিনাবাদামের ঝুড়ি ঝাঁকা টিন ও ডালায়। রাস্তার ওধারে গেঞ্জি, গামছা ও মনোহারী জিনিসের দোকান সাজিয়ে যারা বসেছিল তারাও রেহাই পেলে না। জিনিসপত্রের সঙ্গে সঙ্গে দোকানীকেও পাকড়াও ক'রে পুলিস গাড়িতে তুলছিল। বলাইর মত যারা দোকান ফেলে পালিয়ে গেল তারা অবশ্য বাঁচল। কিন্তু সবাই তো আর দোকানের মায়া ছাড়তে পারে না। 'হল্লা' এসেছে শুনে তাড়াহুড়ো করে কেউ হয়তো দোকান গুটোতে শুরু করে, কিন্তু ইতিমধ্যে হুড়মুড় করে গাড়ি এসে যায় আর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠির গুঁতোয় সব লন্ডভন্ড ক'রে দেয়। কিছু জিনিস গাড়িতে উঠে, কিছু রাস্তার ধুলোয় ছড়ে ছিট্‌কে পড়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে বলাই তাকিয়ে দেখছিল তার ফেলে-আসা বেগুনের ঝুড়িটা পুলিস বুটের ডগা দিয়ে ঠুকছে। ঝুড়িটা কাত হয়ে গড়াতে গড়াতে প্রায় নর্দমার কাছে চলে যায়। বেগুনগুলো অনেক আগেই রাস্তার মাঝখানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

'এগুলো গাড়িতে তুললো না?'

'নাঃ, কানা বেগুন সব।' বলাই এই প্রথম শিবনাথকে দেখে ঈষৎ হাসল এবং বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে আর একবার নাকটা মুছল।

'তুলত হয়তো', কে আর একজন শিবনাথের পিছন থেকে বলল, 'গাড়িতে আর জায়গা হচ্ছে না ব'লে ছেড়ে দিল।' কথা শেষ করে লোকটি হাসে।

'এগুলো নিয়ে লাভ কি।' একজন বলল, 'গরিব লোক সব। দু'চার পাঁচ টাকার জিনিস নিয়ে রাস্তায় বসেছিল, কিন্তু তা-ও তাদের বেচতে দেবে না। দিনে পাঁচবার ক'রে গাড়ি আসছে আর সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিচ্ছে।'

'লাভ আর কি।' গম্ভীর হয়ে শিবনাথ বলল, 'রাস্তার ওপর দোকান সাজিয়ে বসলে ভিড় জমে, গাড়িঘোড়া লোকজনের চলাফেরার অসুবিধা।'

'ওকথা বলবেন না, স্যার।' শিবনাথের পিছনের লোকটি চড়া গলায় বলল, 'রাস্তার মাঝখানে তো আর কেউ দোকান দিয়ে বসে না। বসে একেবারে ধার ঘেঁষে। গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের চলাফেরা করার অনেক জায়গা থাকে। খামকা বেচারাদের হয়রানি করা।'

'হাতে অন্য কাজ নেই তো, গভর্নমেণ্ট কি আর ওমনি বসিয়ে বসিয়ে বাছাধনদের খাওয়াবে? তাই কাজ দেখাতে পুলিস এসব কর্ম করে।'

ভিড়ের জন্যে শিবনাথ লোকটার চেহারা দেখতে পেলে না। কিন্তু তা হলেও সে বলতে ছাড়ল না। 'গাড়িঘোড়া লোকজনের চলাফেরার অসুবিধা ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে যা আমাদের বুঝে চলা উচিত। এটা শহর,—এখানে সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে। দোকানের জায়গায় দোকান থাকবে, সব্‌জি ফল কাপড়চোপড় সব কিছু বিক্রি করার জন্যে বাজারের ভিতর আলাদা আলাদা জায়গা ক'রে দেওয়া হয়েছে। এলোমেলো ছত্রখান করে শহরময় এটা ওটা ছড়িয়ে রাখলে শহরের সৌন্দর্য থাকে না, তাই পুলিস রাস্তার ওপর দোকান বসাতে দিচ্ছে না।'

'এটা শহর না, স্যার শহরতলী।' পিছনের লোকটি দু'পা এগিয়ে এল।

'অই একই কথা।' যেন লোকটির দিকে তাকিয়ে শিবনাথ করুণা ক'রে হাসল। 'এখানেও কর্পোরেশনের নিয়ম চলছে, আমাদের জল দিচ্ছে, আমরা ইলেকট্রিক পাচ্ছি, রাস্তা সাফ করতে দু'বেলা ঝাড়ুদার আসছে, শহর না-ই বা কি ক'রে বলছি।' একটু চুপ থেকে শিবনাথ বলল, 'আসল কথা আমরা ডিসিপ্লিন মেনে চলি না, সিভিক সেন্স বলে আমাদের কিছু নেই, সেজন্যেই এসব কাজ করি, রাস্তায় দোকান খুলি, হাস-পাতালে ঢুকে হৈ-চৈ শব্দ করি, ইষ্টিশানে টিকিট কাটতে গিয়ে মারামারি করি।'

যে লোকটি এগিয়ে এসেছিল সে চুপ ক'রে রইল। পিছনের লোকটি বলল, 'যে দেশের লোক খেতে পায় না তারা ডিসিপ্লিন বোঝে না, সিভিক-সেন্স কাকে বলে জানে না।'

'শিক্ষিত লোক হয়ে আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন।' শিবনাথ একটু বেশিরকম গম্ভীর হয়ে বলল, 'ইউরোপ আমেরিকায়ও এমন দিন হয় যখন লোকে খেতে পায় না। তাই ব'লে তারা ডিসিপ্লিন রেখে চলতে ভোলে না।'

'ওরা না খেয়েও যা খায় তা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে সর্বদাই ঢের বেশি খাওয়া হয়।' যেন লোকটি টিপ্পনি কাটল।

একটু রাগের সুরে শিবনাথ বলল, 'আরো বেশি ইল্‌লিটারেটের মত আপনার কথাগুলো হ'ল।'

'মশাই আপনিই বা কোন্ মহা লিটারেটের মত কথাগুলো আওড়াচ্ছেন শুনি।' যে-লোকটি এগিয়ে এসে চুপ করে ছিল সে হঠাৎ চোখ লাল করল। 'পুলিসকে সাপোর্ট করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভদ্রভাবে কথা বলবেন, ইতর।'

'এই, আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন।' শিবনাথ জামার আস্তিন গুটোয়। 'রাস্কেল'!'

'ইডিয়ট!'

'মূর্খ!'

'আহাম্মক।'

'ননসেন্স!'

'স্টুপিড!

'আপনি···আপনি···আপনি···' শিবনাথ উত্তেজনায় আর কিছু বলতে পারে না। দাঁতে দাঁত ঘষে।

'তুমি আমার কাঁচকলা করবে, পাঠা—' বলতে বলতে সামনের লোকটি স'রে গেল।

পিছনে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে-ও বিড় বিড় করে কি বকতে বকতে শিবনাথের দিকে শেষবারের মত বিষকটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে আগের লোকটির অনুগমন করল।

'অদ্ভুত মেণ্টালিটি মানুষের, গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে আসে। নিজের মনে বলল শিবনাথ এবং সমর্থন পাবার আশায় এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু তখন আর কেউ বড় একটা সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। পুলিসের গাড়ি চলে গেছে, আস্তে আস্তে যে যার কাজে সরে যাচ্ছে। বলাই ইতিমধ্যে কানা বেগুনগুলো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলে ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছে।

'আপনাদের ঝগড়া থামল?' শিবনাথের দিকে তাকিয়ে সে মুখ টিপে হাসে।

'আর বলো না, যত সব মূর্খ আসে তর্ক করতে।' শিবনাথ একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'তারপর? আজ আর বেগুন বিক্রি করা হবে না বুঝি।'

'নাঃ।' বলাই মাথা নাড়ল। 'এমনি মন্দার বাজার, তার ওপর সাতবার হল্লা এসে দোকান ভেঙ্গে দিলে বাজার জমে কখনো!'

শিবনাথ হঠাৎ কিছু বলল না। বলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

'শালার বেগুন দিয়েও সুবিধা করতে পারছি না।' হাঁটতে হাঁটতে বলাই একবার মুখ খুলল, 'চার পয়সা সের তা-ও লোকে এখন কিনতে পারছে না।'

'হুঁ', শিবনাথ গম্ভীরভাবে বলল, 'হার্ড ডেজ্। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব কিছুরই অবস্থা খারাপ।'

বলাই কিছু বলল না।

'সাবান দিয়ে বুঝি সুবিধা হল না?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'নাঃ।' বলাই বলল, 'সারা বিকেল ব'সে থেকে আড়াই সের চালাতে পারলাম না। এক সের বেগুন বেচে ক'পয়সা লাভ থাকে বলুন। এভাবে তিনটে পেট চলে?'

'পাগল!' শিবনাথ মাথা নাড়ল। একটু চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তোমার সুবিধে ছিল।'

'কি রকম?' বলাই ঝুড়িসুদ্ধ মাথাটা ঘোরাল।

'না, বলছিলাম, একটু লেখাপড়া যদি শেখাতে মেয়েটাকে, একটা আপিস-টাপিসে ঢুকে পড়লে দুটো পয়সা রোজগার করে তোমাকে হেল্প করতে পারত।'

বলাই গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমি অবশ্য সিনেমায় দিতে বলছি না। কাল সকালে কে. গুপ্ত তাই তোমাকে বলছিল না?'

'ওর কথা ছেড়ে দিন। পাগল। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।' বলাই ঈষৎ হাসল।

শিবনাথ হাসল।

'এককালে বড় চাকরি করত।'

'এককালে আমারও বড় কারবার ছিল।'

'ও বলছে বেবিকে সিনেমায় দেবে।'

'যা খুশি করুক গে।' বলাই হাসি বন্ধ করল। 'আমার কথা হ'ল কি শিবনাথ-বাবু, শেষ পর্যন্ত দেখব। ফলের কারবার গেছে, পরে সাবান ধরেছিলুম, সাবানে সুবিধা হয়নি দেখে বেগুন ধরেছি। বেগুনে কিছু না করতে পারলে আমড়া ফিরি করব। যদি তাতেও সুবিধে না হয় লোকের জুতো সাফ করব। আর জুতো সাফ করেও যদি দেখি পেট চালাবার মতন রোজগার হচ্ছে না, তখন চুরি করতে আরম্ভ করব, সিঁদ কাটব, পকেট কাটব, হ্যাঁ চুরিতে সুবিধে না হলে লোকের মাথায় বাড়ি মেরে গলায় ছোরা বসিয়ে টাকা আদায় করব ঠিক ক'রে রেখেছি। উপোস থেকে মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করব তো, তাই ব'লে ঘরের বৌ আর মেয়ের রূপযৌবন ভাঙিয়ে পেটের ভাতের যোগাড় করতে যাব না।'

কেমন একটা অদ্ভুত গুমগুম শব্দ বেরোচ্ছিল বলাইর গলার ভিতর থেকে। তার কথা বন্ধ হবার পরও যেন শব্দটা বাতাসে ভেসে ভেসে চলতে লাগল। শিবনাথ নীরব। দু'জনে খালের ধারে এসে গেল। বলাই আর কথা বলছে না। সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে। দূরে কোথাও করাত-কলের ঘস-ঘস শব্দ হচ্ছিল। দম বন্ধ করা ধোঁয়ার চাদরে চারিদিক ঢাকা পড়ে গেছে। খালের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে জোনাকি পোকা-গুলো নাচানাচি করছিল।

খেয়া পার হয়ে বলাই বলল, 'আপনি কি এখন ঘরে ফিরবেন?'

'না, আমি একটু বেড়াব।'

'আমি চলি।'

কথা না বলে শিবনাথ শুধু ঘাড় নাড়ল। বলাই বাড়ির রাস্তা ধরল। শিবনাথ উল্টোদিকের রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগল।

লোকটা সরে যেতে শিবনাথ স্বস্তিবোধ করল। অশিক্ষিত, তাই এমন গোঁয়ার, ভাবল সে। না খেয়ে মরবার আগে চুরি-ডাকাতি করব। বৌ বা মেয়ের রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে পেটের ভাতের যোগাড় করব না। যত নিচের দিকে তাকাচ্ছে শিবনাথ, মানে যেসব জায়গায় শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি, স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে পুরুষরা বড় বেশি সচেতন, সতর্ক, সতীত্ব যাবে মনে করে বড় বেশী সন্ত্রস্ত সব, এটাই যেন বেশি দেখছে। অমল চাকলাদারকে দেখেছে শিবনাথ, এখন বলাইয়ের কথাগুলো শুনল। মরুকগে। যেমন-তেমন একটা সুবিধে হয়ে গেলেই এ বাড়ির এদের সঙ্গ ত্যাগ করব আমি, শিবনাথ মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করল এবং বেশ একটু জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। এক সময় শিবনাথের মনে পড়ে কপাল ও পা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বলাইয়ের। শিবনাথ হলে পৃথিবীর আর কিছু ভাবনা ভাববার আগে কাটা জায়গাগুলোতে আইডিন লাগাতে চেষ্টা করত। পয়সা সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলে ধার-কর্জ করে, ধার-কর্জ না পেলে জুতো জামা, চশমা—যা হোক একটা কিছু বাঁধা রেখে হলেও টাকা যোগাড় করে একটা অন্ততঃ

অ্যাণ্টিটিটেনাস্ ইঞ্জেকসন নিয়ে নিত। অর্থাৎ যে জায়গায় সতর্ক হবার, যেটি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত থাকবার, তা থাকত শিবনাথ এবং এখনও তাই আছে। বলা যায় কি, বলা যায় না। হয়তো রাত ভোর হলে সবাই শুনবে, দেখবে বলাই ধনুকের মত বাঁকা হয়ে বিছানায় মরে আছে। বিছানার পাশে ব'সে বৌ ও মেয়ে কাঁদছে এবং বলাইকে কোনরকমে একটা ফাস্ট-এড নিতে বলতে ভুলে গেছে বলে শিবনাথের মনে এখন একটুও অনুতাপ হ'ল না। হয়তো রাগ করে সে শিবনাথের সৎপরামর্শ কানেই তুলত না, মেয়েকে সিনেমায় দিতে কে. গুপ্তর মত সে-ও পরামর্শ দিচ্ছে ভাবতে ভাবতে এখন হয়ত ঘরে ফিরছে বলাই। শিবনাথ নিজের মনে হাসল। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের অজ্ঞতা এবং রুক্ষতা নিয়ে এখানে এই শহরে, শহরতলীতে আরো কত শত লোক আছে, চিন্তা করতে করতে শিবনাথ বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ-দিকের গলিতে ঢুকল।

টিমটিমে গ্যাসের আলোটা আজ বোধ হয় আর জ্বলেনি। কড়ি গাছের নিচেটায় অন্ধকার ছমছম করছিল। তার ওপর কুয়াশা এবং পাশের খোট্টা বস্তি থেকে উঠে-আসা কাঠের ধোঁয়া। চোখ জ্বালা করে। চোখ বুজে শিবনাথ গলিটা পার হয়ে এসে মাঠে পড়ল। এখানে তারা-ছড়ানো আকাশের নিচে অন্ধকার খুব পাতলা। অন্ধকারকে আর অন্ধকারই মনে হয় না, যেন একটা ঘোলাটে কাঁচ। পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যায় ওখানে একটু দূরে ওটা গাছ কি মানুষ, গরু কি গাড়ি। মাঠ পার হয়ে শিবনাথ কপি-ক্ষেতের ধারে চলে এল। ঝোপটা সে চিনতে পারল। শব্দ না হয় এমনভাবে পা ফেলে আস্তে আস্তে সে ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অনুমান তার মিথ্যা হয় না। একটু সময় কান পেতে রেখে শিবনাথ দু'জনের কথা শুনতে পেল।

'আমি খেয়েছি, তুই খা।'

'আমি তো খেলাম তিনটে, তুই এটা খা।'

'কাশীর পেয়ারা।'

'তা হবে। চার আনায় ছ'টা পেলাম।'

'কোথায় পেয়েছিলি পয়সা ?'

'চুরি করেছি।'

ছেলেটির কথা শুনে মেয়েটি একটু সময় যেন ভাবল। তারপর প্রশ্ন করল, 'কাদের ঘরে ঢুকেছিলি, রুচিদির ? ওদের খুব পয়সা আছে মনে করিস না।'

'তা চার-ছ'আনা কি আর থাকবে না ঘরে।' ছেলেটি বলল। 'না বাপু, বাড়ির লোকের পয়সা চুরি আমি করি না। শত হলেও আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে এ বাড়িতে। বাবা এত বড় চাকরি করত। আমাকে সন্দেহ করবে ভাবতে মন খারাপ লাগে।'

'যাদের বেশি আছে, তাদেরটা চুরি করতে ক্ষতি কি।' মেয়েটি বলল, 'আমি হিরুদের ঘর থেকে সেদিন চার কৌটো চাল চুরি করে এনেছি।'

'না বাপু, আমি বাড়ির লোকের ঘরে সাহস পাই না।'

'চার আনা কোথায় পেলি ?'

'ফেরিওলার ডালা থেকে তুলে নিলাম। ব্যাটা তার জিনিস বিক্রি করে পয়সাগুলো ডালায় রাখে, দেখিস না ?'

'হুঁ।'

'সবাই যখন এটা-ওটা হাতে নিয়ে দেখছিল, আমিও একটা চা-ছাকনি তুলে দাম জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তারপর ?'

'ডান হাতে ছাকনিটা তুলে নিয়ে ওর চোখের সামনে ধরলাম।'

'তারপর ?'

'বাঁ-হাত বাড়িয়ে সিকিটা তুলে নিলাম।'

'বেশ পরিষ্কার হাত তো তোর, তবে আর কারোর ঘরে ঢুকে একটা কিছু তুলে আনতে ভয় পাস কেন ?'

'ধ্যেৎ, বাড়িতে সবগুলো ঘরে এত লোকজন।'

'ফেরিওলার সামনে তো লোকজন কম ছিল না।'

'তাই তো সুবিধা হ'ল। ফেরিওলা যদি টের পায়, ওর ত'বিলে চার আনা সর্ট আছে তো এ বাড়ির সবাইকে সন্দেহ করবে, আমার মতন উঠানে এসে সবাই দাঁড়িয়েছিল দোকান দেখতে। তা ছাড়া ভিড় থাকলেও পয়সার দিকে কেউ চেয়ে ছিল না, কাচের গ্লাস আর আরশি আলতা চিরুনির দিকে চোখ ছিল সবার।'

'আমি একদিন একজনের জিনিস সরাব।'

'কা'র শুনি না ?' ভয়ানক নিচু গলায় কিশোর প্রশ্ন করল। 'কি জিনিস ?'

'কমলাদির রিস্টওয়াচ।'

যেন কিচ্ছুক্ষণ কি ভাবল ছেলেটি।

চুরি করে এনে তোর কাছে দেব।' মেয়েটি বলল।

'আমি কি করব ?' প্রস্তাব মনঃপুত হল না রুণুর।

'বিক্রি করবি, বাইরে কারো কাছে বেচে দিয়ে টাকা আনবি।' ময়না বলল।

রুণু আবার ভাবে।

ফিসফিসে গলায় ময়না বলল, 'আমায় দিয়ে তো আর ও-কাজ সম্ভব হবে না। ক'টা টাকা হলে দুজনে রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে, সিনেমা দেখা হবে।'

'ও, তার জন্যে চুরি করবি!' রুণু খুশি গলায় হাসে। 'দেখিস আবার না ধরা পড়িস।'

'তোর চেয়ে আমি ঢের বেশি চালাক।' ময়নার সরু গলা। 'যেদিন এনে ঘড়িটা তোর হাতে তুলে দেব, সেদিন না আবার বলিস আমার ভয় করবে বিক্রি করতে, আমি পারব না।'

'ধ্যেৎ, আগেই তোর ওসব ভাবনা। আন্ না তুই। বিক্রি করে টাকা আনতে পারি কি না পারি, দেখবি।'

'কোন্ রেস্টুরেন্টে খাব আমরা ?' কোমল আব্দারের সুরে ময়না প্রশ্ন করল।

'চৌরঙ্গী, চৌরঙ্গীর ভাল রেস্টুরেণ্টে যাব একদিন তুই আর আমি।' কে. গুপ্তর ছেলে সেয়ানা সুরে বলল, 'ইস্, কতকাল মুরগী খাই না জানিস। যখন বাবার চাকরি ছিল, আমরা মুরগীর মাংস আর ভাত ছাড়া রাত্তিরে অন্য কিছু খাইনি।'

'এখন শুধু মুলো-সেদ্ধ চালাচ্ছিস।' ময়না নিচু গলায় হাসল।

'তোরা মাছ-ভাত খাস্ নাকি।' রুণু খোঁচা দেয়। 'কৈ, গন্ধ পাই না তো একদিনও রান্নার। দেখি, হাতটা শুঁকি। গন্ধ লেগে থাকবে। কি মাছ খেয়েছিলি তোরা দুপুরবেলা ?'

'আঃ, ছাড়ো, লাগে।' ময়না ব্যস্ত গলায় ফিসফিস করে উঠল।

'ননীর শরীর, মাখনের শরীর, গলে যায়। দাও এবার গালটা শুঁকি।'

'ইস্, কী অসভ্য ?'

সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে শিবনাথের ; সির্‌সিরে হাওয়ার সঙ্গে ওলকপির মিষ্টি গন্ধটা তাকে অনেকক্ষণ ঝোপের পাশে ধরে রাখল।

'কি মশাই, দাঁড়িয়ে কেন, আসুন ভেতরে আসুন।'

দোকানে ঢুকতে গিয়ে শিবনাথ দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ইতস্ততঃ করছিল।

কিন্তু রমেশ রায় এমনভাবে আদর-অভ্যর্থনা জানাল যে, শিবনাথ আর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে না থেকে চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে চলে এল।

'বসুন বসুন।' রমেশ রায় নিজের হাতে বেঞ্চটা মুছে দিল। 'তারপর খবর কি, আজ যেন দেরি করে ফেললেন চা খেতে আসতে।'

আগের দিন এই সময় না আরও আগে এখানে এসে ঢুকেছিল, ঠিক মনে করতে পারল না শিবনাথ। শূন্য বেঞ্চটার এক পাশে সে বসল।

'বেবি !'

'যাই।'

'বাবুকে ভাল করে এক কাপ চা করে দাও।' পর্দার কাছ থেকে সরে এসে রমেশ শিবনাথের সামনে দাঁড়াল।

শিবনাথ আড়চোখে পর্দাটা দেখে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কদ্দুর গেছলেন ?' রমেশ বেঞ্চের আর এক পাশে বসল।

'মাঠ পর্যন্ত বেশিদূর গেলাম না।' শিবনাথ লক্ষ্য করল ক্ষিতীশ নেই। 'ছোট-ভাই বাইরে গেছে বুঝি ?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, একটু কাজে পাঠিয়েছি।' রমেশ মাথার গরম টুপিটা খুলে ফেলল। 'আজ ঠাণ্ডাটা কম, কি বলেন।'

'তাই মনে হয়।' বলে শিবনাথ হঠাৎ ঘাড় ফেরাতে দেখল, পর্দা সরিয়ে চা নিয়ে আসছে কে. গুপ্তর মেয়ে। শিবনাথকে দেখে আগের দিনের মত ততটা লজ্জাবোধ করছে না যেন ও। বরং একটু হাসতে চেষ্টা করছে।

এই হাসতে চেষ্টা করাটাই বেবির ভুল হ'ল, হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল পেয়ালা টেবিলে রাখতে গিয়ে। টেবিলের কোণায় বাড়ি খেয়ে ওটা উল্টে ওর হাত

থেকে নিচে পড়ে গেল। ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল গরম চা, আর পেয়ালার ভাঙা টুকরো।

এক সেকেন্ড চুপ। এক সেকেন্ড চুপ থেকে সবটা দৃশ্য দেখল রমেশ রায়। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে বেবির বেণী ধরে এমন জোরে টান মারল যে, ও মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল।

'ইয়ার্কি করতে আসিস এখানে, ছোটলোক, ছোটলোকের মেয়ে'! রমেশ গর্জন করে উঠল। 'চা নষ্ট হ'ল, একটা পেয়ালা ভাঙল আমার, জানিস একটা পেয়ালার কত দাম ?'

মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে বেবি। দুই হাতে মুখ ঢাকা। কাঁদছে কি ? শিবনাথ ঠিক বুঝতে পারল না। হয়তো লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, ভাবল সে।

'আবার দাঁড়িয়ে ঢং করা হচ্ছে !' রমেশ আবার ওর বেণীতে হাত দেয় কিনা শিবনাথ আশঙ্কা করল, কিন্তু তা না করে গলায় একটা ধাক্কা মেরে বেবিকে পর্দার ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে রমেশ চীৎকার ক'রে বলল, 'যা, চা ক'রে নিয়ে আয়। বাবু কতক্ষণ বসে থাকবেন।' হুকুম শেষ ক'রে সে টেবিলের কাছে ফিরে এল। শিবনাথের সঙ্গে চোখোচোখি হতে রমেশ অল্প হাসল।

'একটু শাসন না করলে বেড়ে যায়, বুঝেছেন তো, আমি রোজ মুখ খুলি না, রোজ গায়ে হাত তুলি না ; কিন্তু বেয়াদপি দেখলে, বেসামাল হয়েছে দেখলে টেম্পার ঠিক রাখতে পারি না।'

'তা তো ঠিকই, সত্যি কথা।' মাথাটা ঈষৎ আন্দোলিত করল শিবনাথ এবং একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'চার ছ'আনা একটা পেয়ালার দাম।'

'একটা পেয়ালা !' শিবনাথের কানের মধ্যে মুখ ঢোকাতে চেষ্টা করে রমেশ ফিসফিস করে উঠল : 'চা-চিনি কিছু দিয়ে আমি কুলোতে পারছি না মশাই, কী করব। ঠেকেছে, বিপদে পড়েছে। শত হলেও তো ভদ্রলোকের মেয়ে !'

'তা তো ঠিকই।' শিবনাথ আবার মাথা নাড়ল।

'না হ'লে আমি কি আর পারি না বাইরের একটা ছেলেকে মাইনে দিয়ে রাখতে। বরং আমার আরো দুটো একটা কাজের সুবিধে হ'ত।'

'তা' তো হ'তই।'

'কিন্তু লোকে তো আর তা দেখবে না, শুধু দেখছে, বলাবলি করছে বিনি-পয়সায় আমি কে. গুপ্তের মেয়েকে দোকানে খাটাচ্ছি।'

একটু বিস্মিত হয়ে শিবনাথ রমেশের দিকে তাকায়। তবে কি সত্যই এই মেয়েকে দিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে টি-গার্লের কাজ করানো হচ্ছে, ভাবল সে। ওর মা ওর বাবার অনুমতি আছে কি এতে ? প্রশ্নটা যখন মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া করছে, তখন বেবি চা নিয়ে এল। এবার আর হাসি নেই, গম্ভীর আনত মুখ। বাটিটা টেবিলে সাবধানে নামিয়ে রেখে পর্দার দিকে সরে যাচ্ছিল ও, রমেশ রায় গম্ভীর গলায় বলল—রাত হয়েছে এখন ঘরে যা।'

বেবি ঘুরে দাঁড়ায়।

'চা খেয়েছিস ?'

বেবি ঘাড় নাড়ল।

'একটা মগে করে চা তৈরি ক'রে বাড়ি নিয়ে যা। তোর মা চায়ের জন্যে হাইফাই করছে।'

বেবি ঘাড় কাত করল।

'কেক-বিস্কুট আজকে শর্ট আছে। কিছু নিবি না।'

'না।' অস্ফুট শব্দ করল বেবি ও রমেশের দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে পর্দার ওপারে চলে গেল।

বারো

শিবনাথ নিঃশব্দে তার পেয়ালার চাটুকু শেষ করল। বেবি চা নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

রমেশ এবার চড়া গলায় বলল, 'বুঝেছেন মশাই, দারিদ্র্যের অনেক দোষ—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়—শাস্ত্রকাররা কি আর মিছিমিছি ব'লে গেছে?'

শিবনাথ চোখ তুলে রমেশের দিকে তাকাল। ততটা চড়া স্বর না হ'লেও বেশ জোরে জোরে রমেশ বলল, 'ক্ষিতীশ আমার কাছে গোপন করে, কিন্তু করলে হবে কি, আমি টের পাই, বেশ টের পাই,—দোকানে সর্বদা থাকি না, কিন্তু বুঝি এতটা চিনি লাগতে পারে না। দিনে ক'-কাপ চা কাটে আর কতটা চিনির দরকার তা কি আর আমাকে শেখাবি তুই।' রমেশ মুখের বিকৃত ভঙ্গি ক'রে হাসল।

'ক্ষিতীশ চুরি গোপন করছে কেন?' প্রশ্নটা ঠোঁটের আগায় এলেও শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

'হাতে-নাতে অবশ্য ধরতে পারছি না।' রমেশ গলার স্বর পরিবর্তন করল। কিন্তু যেদিন ধরব সেদিন আর মেয়েটাকে আস্ত রাখব না, হ্যাঁ, ক্ষিতীশকেও ব'লে রেখেছি।'

'তবে আর মেয়েটাকে দোকানে রাখা হচ্ছে কেন।' বলতে চেষ্টা ক'রেও শিবনাথ বলতে পারল না।

রমেশ বলল, 'আমি কি আর সাধ ক'রে বেবিকে দোকানে ঠাঁই দিয়েছি মশাই, মেয়েটা দোকানে থাকে ব'লে ক্ষিতীশও দোকান ছেড়ে আর বড় একটা এখন এদিক সেদিক যায় না। একটা অর্থব্যঞ্জক হাসি রমেশের স্থূল ঠোঁটে ঝুলতে থাকে। 'না হলে কি আর হারামজাদাকে দিয়ে আমি রেস্টুরেণ্ট চালাতে পারতাম। কোথায় ফ্লাশের আড্ডা, কোনখানে পাশা চলছে, কেবল সেদিকে দিশা ছিল ভায়ের আমার। যেদিন থেকে বেবি এখানে এসে ঘুর ঘুর করতে লাগল, ক্ষিতীশও ভারি কাজের মানুষ হয়ে দোকানের দিকে মন দিয়েছে, হা—হা'।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে শিবনাথ রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'এইটুকুন তো মেয়ে।' যেন বলতে যাচ্ছিল সে, রমেশ বলল, 'তা মন্দের ভাল, দোষ দেখি না আমি কিছু, ভায়েরও আমার উঠতি বয়েস,—কিন্তু, না, চুরিফুরি আমি বেশিদিন সহ্য

করব না। বাবা, চা-টা বিস্কুটটা খাইয়ে যত ইচ্ছে পীরিত কর আপত্তি নেই, তা ব'লে রোজ পোয়া-আধপো চিনি শর্ট পড়বে এ কেমন কথা, কি বলেন আপনি?'

কিছুই বলল না শিবনাথ।

'এমন ধারা চলতে থাকলে আমি ঠিক কারবার গুটিয়ে ফেলব, কাজ নেই আমার চা বেচে।' দস্তানা-পরা হাতটা শূন্যে ঘুরিয়ে রমেশ অনেকটা যেন নিজের মনে বলল, রেস্টুরেণ্ট তুলে দিলে তারপর দেখব তুমি কোন্ চুলোয় যাও,—কি করে খাও। মা'র পেটের ভাই, বয়েসেও অনেক ছোট, আমার কর্তব্য ছিল তোমার একটা হিল্লে ক'রে দেওয়া। এখন তুমি যদি লাভের অর্ধেক পিঁপড়েকে খেতে দাও তো আমার সেখানে করবার কী আছে, কী করতে পারি বলুন।'

প্রসঙ্গটা আরো অনেকক্ষণ চলবে ভেবে শিবনাথ অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু চট্ ক'রে সে উঠতে পারছিল না। সঙ্গে পয়সা ছিল না। চায়ের দামটা বাকী থাকবে বলতে সে ইতস্তত: করছিল! যেমন ইতস্তত: করছিল দোকানে ঢুকতে। চালাক লোক রমেশ। শিবনাথের চেহারা দেখে বুঝল কথাগুলো তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনছে না সে। তাই যেন অধিকতর চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ তুলতে রমেশ সোজা হয়ে বসল, বলল 'ব্যাটাকে আজ ধরেছিলাম এই রাস্তার মাঝখানে, বাড়িতে তো সুবিধে হয় না, ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনেছিলাম দোকানের ভেতরে।'

কার কথা হচ্ছে হঠাৎ বুঝতে না পেরে শিবনাথ আবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে রমেশের মুখের দিকে তাকায়।

'রাস্তায় তখন লোকজন ছিল না, তাই ঘাড়ে ধরা সত্ত্বেও চাঁদ একবার মুখ খোলেনি, হা—হা'—রমেশ হাসতে লাগল।

শিবনাথ ঢোক গিলল, কিন্তু হাসতে পারল না।

আর ধরুন, আশে-পাশে অন্য লোক আছে, তখন ঘাড়ে ধরব কি, একটু কড়াভাবে আমার পাওনার কথাটা তুললেও শালা চোখ লাল ক'রে উঠত, এই করে ওরা, কেবল কি অমল চাকলাদার,—কত হারামজাদাকে দেখলাম। যেন ধারে খাইয়ে আমি ঠেকেছি, একবারের বেশি দুবার তাগিদ দিলে নদের চাঁদদের প্রেষ্টিজে লাগে।'

'তারপর?' শিবনাথ এবার একটু হাসল। 'কি বললে অমল?'

'স্রেফ পায়ে ধরল, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই', রমেশ মোজা-পরা একটা-পা টেবিলে তুলে দিয়ে বলল, 'এই পা ধরে কত কাকুতি-মিনতি, আর দুটো দিন অপেক্ষা করুন—আর একটা চাকরি খুব সম্ভব পেয়ে যাব ইত্যাদি—হা-হা।' রমেশ আরো টেনে টেনে হাসতে লাগল।

শিবনাথও শব্দ ক'রে হাসল।

'আপনি কি বললেন?'

'মোক্ষম কথাটা তুললাম আর কি, রমেশ সবেগে দুবার মাথাটা নেড়ে বলল, 'সুযোগ পাচ্ছিলাম না এ্যাদ্দিন; আজ সুযোগ আসতে প্রস্তাবটা দিতে আর বিলম্ব করিনি হা—হা—'

'কিসের প্রস্তাব?' শিবনাথ বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল।

'আরে মশাই, আমি,—আমার কি ইচ্ছা যে, তুই তোর সুন্দরী বৌকে ঘরের বাইরে পাঠা,—দেখছি ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, উপোস থেকে থেকে দু'জনেই চিমসে লেগে যাচ্ছিস, তাই তো কথাটা না ব'লে পারলাম না।'

'ওর বৌ চাকরি করবে বুঝি।' কথা শেষ ক'রে শিবনাথ আর একটা ঢোক গিলল।

রমেশ টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'মশাই, গণ্ডায় গণ্ডায় ঘরের বৌ-ঝি'রা ঢুকছে ওর গেঞ্জির কারখানায়। বলি তোর বৌ গিয়ে ওখানে কাজ করলে কি আর পারিজাত কিছু হাতে চাঁদ পাবে! উপোস আছিস, খেতে পাস না, ঘরভাড়া বাকি পড়ছে, কথাটা কানে উঠতে সেদিন পারিজাত আমায় বললে, এমনি খুব যে একটা ইয়ের ভাব নিয়ে রায় সাহেবের ছেলে প্রস্তাবটা দিয়েছিল তা নয়।'

শিবনাথ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তা ছাড়া, যদি ইয়ের ভাব নিয়ে কথাটা বলেও থাকে, আমি কিছু দোষের দেখি না। ওরা পয়সার ওপর ঘুমোয় মশাই, অনেক রকম সাধ থাকতে পারে। বাগানে দশরকমের ফুলগাছ লাগায় দশরকমের ফুল ফুটছে নিজে দেখবে এবং আরো দশজন দেখে তারিফ করবে বলে, এ-ও তেমনি—দশটা মেয়ে ওর কারখানায় কাজ করছে, তোর সুন্দরী বৌ সেখানে ঢুকে কারখানার ভেতরটাকে আর একটু আলো ক'রে দিক, পারিজাতের এইরকম একটা ইচ্ছে থাকা স্বাভাবিক, কি বলেন?'

'কি বললে অমল?'

'নিমরাজী হয়েছে, কথার ভাবে বুঝলাম', কথা শেষ ক'রে আবার টেনে টেনে রমেশ হাসল। শিবনাথ একটু অবাক।

'অথচ কাল দুপুরে ফেরিওলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব'লে বৌকে কী মারই না মারলে।'

'জানি জানি, শুনেছি আমি সব রাত্রে বাড়িতে গেছি পরে।' রমেশ হঠাৎ হাসি বন্ধ করল। চোখ দু'টো গোল বিস্ফারিত ক'রে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসব আব্দারের দিন গেছে,—ছিল, যখন তোমার চাকরি ছিল, বৌকে কাগজে মুড়ে বাক্সে পুরে রাখতে কি শিকেয় ঝুলিয়ে রাখতে, কারো কিচ্ছু বলবার ছিল না। আজ ওসব বললে শোনে কে।'

বাইরে অন্ধকারের দিকে চোখ ফিরিয়ে রমেশ কি যেন একটু ভাবল। শিবনাথ আবার অস্বস্তিবোধ করে। তৎক্ষণাৎ উঠতে পারে না, কেননা তার আগে একটা কথা বলতে হবে দোকানদারকে।

'না, আমিও একটু অবলিগেশনের মধ্যে আছি পারিজাতের কাছে। সময়ে ও আমার উপকার করেছিল। রেললাইনের ওধারে দীঘিটা দেখেছেন তো। ওটা ইজারা নেবার সময় পারিজাত আমায় খুব হেল্‌প করেছিল। তা ছাড়া আর একটা জমি কেনার কথা চলছে। কোথায় জমি, কি তার বৃত্তান্ত আমি অবশ্য এখনি আপনার কাছে আউট করতে পারছি না মশাই, তবে জেনে রাখুন রমেশ রায় একটার তালে নেই, অনেক ধান্দায় আছে,—থাকতে হচ্ছে, না হ'লে, যে দিনকাল এসে পড়ছে, কি

বলেন, বাঁচতে হবে তো।'

শিবনাথ ক্লান্ত বিমর্ষভাবে মাথা নাড়ল।

'যাকগে, পারিজাত উপকার করেছে আমার, আরো করবে। কাজেই একবার যখন আমার কাছে মনের ইচ্ছে খুলে বলেছে, আমি তার ইচ্ছা পূরণ করবই, হ্যাঁ, আপনারা দেখবেন, রমেশ রায় পারে কিনা কিরণকে কারখানায় ঢোকাতে। জলে আগুন ধরানোর মত অসম্ভবকে আমি সম্ভব ক'রে তুলব। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝি, আপনি উঠবেন ?'

'হ্যাঁ।' রমেশ ঈষৎ হেসে মাথা নাড়ল। 'ইয়ে, আপনাকে—'

'বলুন, বলে ফেলুন। আমার কাছে কিছু বলতে আপনার সঙ্কোচ কেন। শত হোক, এক বাড়িতে আছি, এক ইঁদারায় জল খাচ্ছি।'

'না, না, সঙ্কোচ না।' শিবনাথ আর ইতস্ততঃ করল না। 'সঙ্গে খুচরো পয়সা নেই, চায়ের দামটা কাল সকালে—'

কথা শেষ করতে পারল না সে, চোখ বুজে রমেশ রায় তালুর সঙ্গে জিহ্বা ঠেকিয়ে মৃদুরকম একটা শব্দ বার করল মুখ দিয়ে, 'এর জন্যে আবার আমাকে বলতে হবে, মুশকিল, আপনারা মানুষ চেনেন না, হ্যাঁ, চিনবেন বা কি ক'রে—কাজকারবার তো আর হয়নি এতকাল, হয়তো শুধু লোকের মুখে শুনেই এসেছেন রমেশ রায় মাছ কাঠ চা নিয়ে আছে, গায়ের চামড়াটা তার ভয়ানক পুরু। চামড়া পুরু হলেও আত্মাটা তার কাদার মত নরম, আস্তে আস্তে পরিচয় পাবেন। আপনার যখন খুশি দোকানে ঢুকে চা খাবেন, কেক্‌ বিস্কুট খাবেন যা ইচ্ছে,—দামের জন্য কি, আপনিও পালিয়ে যাচ্ছেন না, আমারও যে পরমায়ু একেবারে শেষ হয়ে এসেছে তা মনে করি না।'

কথা শেষ ক'রে রমেশ রায় প্রবলবেগে হাসতে লাগল।

একটু সময় সে-হাসিতে যোগ দিয়ে সৌজন্যতাসূচক মাথাটা একবার নেড়ে শিবনাথ বলল, 'আচ্ছা চলি।'

রাস্তায় নেমে শিবনাথ যেন সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারল। এই সামান্য কথাটা রমেশকে বলতে মনে মনে তাকে এতক্ষণ কী যুদ্ধটাই না করতে হয়েছে। অবশ্য তার কারণ ছিল। অমল চাকলাদারের চেহারাটা শিবনাথের চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। ননসেন্স। বিড়বিড় করে বলল এখন শিবনাথ। লোকটার মাথায় কিছু নেই। এতগুলো টাকা ধার জমতে দিয়েছিলি তুই কোন্‌ সাহসে। অপমান—অপমান করার অধিকার রমেশ রায়ের আছে। শিবনাথ রমেশকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করল।

'শুনুন, শুনুন !'

প্রথমটায় বুঝতে পারেনি শিবনাথ। ঘাড়টা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে ফের সে ঘাড় সোজা ক'রে হাঁটে।

'আপনাকে, স্যার, হ্যাঁ আপনাকেই ডাকছি।'

গলার স্বরটা এবার পরিচিত ঠেকল। হাঁটা বন্ধ ক'রে শিবনাথ দাঁড়াল। জোরে পা চালিয়ে লোকটা শিবনাথের সামনে এসে যায়। বিধুমাস্টার।

'কি খবর ?'

'খুব ভাল।' মাস্টার মাথাটাকে একদিকে কাত করে বলল, 'জাল জুয়াচুরি করি না, ব্ল্যাকমার্কেট কথাটা শুনি কিন্তু কিভাবে তাতে ঢুকতে হয় সেই কৌশল জানি না। খেটে খুটে যা আনি তা দিয়ে শাকভাত হোক, মাছভাত হোক খেয়ে আছি, ছেলেমেয়েগুলোকে খাওয়াতে পারছি। গড্ ফেভারে আছে বলতে হবে। আমার তো মনে হয় সৎপথে থাকলে ঈশ্বর চালিয়ে নেন।'

'তা নেন বৈকি।' সংক্ষেপে বলল শিবনাথ।

'তার প্রমাণ আমি অনেকবার পেয়েছি এবং আজ আবার পেলাম।'

'কি রকম ?'

বিধুমাস্টার হাসল।

'একদিনে আকবরের প্যাসেজটা বুঝিয়ে দিলাম, সবগুলো কঠিন শব্দের মানে লিখিয়ে দিলাম, তাতেই মিসেস্ চ্যাটার্জি খুশী। তিনি বুঝতে পারলেন, এভাবে কোচ্ ক'রে গেলে মেয়েকে ম্যাট্রিকুলেশনের বাবাও আটকাতে পারে না।'

'কে মিসেস্ চ্যাটার্জি ?' অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল শিবনাথ, তার আগেই বিধুমাস্টার পরিচয় দিলেন। 'চামেলীর মা। সিলেকশনে যতগুলো স্টোরি আছে, ওই আকবরটাই সবচেয়ে কঠিন। ইংরেজীটা খটমটে। নিজেও শিক্ষিতা তিনি। চামেলীকে যখন কাল পড়াই, দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আজ যেতেই বললেন, একটা আওয়ার ঠিক করে এই তিন মাস আপনি চামেলীকে কোচ্ করুন। আমি আপনাকে ওর প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করছি।'

'ভালই তো।' শিবনাথ খুশি হবার ভান করল।

'পনরো টাকা চেয়েছি।' কিন্তু তিনি বারোর ওপরে উঠতে চাইছেন না। তা উঠবেন না আমি জানি। বলেছি আপনাকে, ডিমাণ্ডের চেয়ে সাপ্লাই এখন বেশি। যত না পড়ছে মাস্টারের সংখ্যা হয়েছে তার তিনগুণ। হ্যাঁ, প্রাইভেট টিউটরের কথা বলছি। কাজেই—'

মাস্টার থামল।

শিবনাথ কিছু প্রশ্ন করবে কিনা ভাবল।

'তারপর যখন উঠে আসি তেরো টাকা বললেন, কণ্ডিশন—ওর ছোট ছেলেটাকেও মাঝে মাঝে একটু দেখিয়ে দিতে হবে। আমি রাজী হয়ে গেলাম ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, একটুও কষ্ট নেই, কি বলেন ?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

ধোঁয়া ও কুয়াশা বেশি ছিল, তাই বিধুমাস্টার তা দেখতে পেল না।

'আপনি হয়তো বলবেন, খাটুনির তুলনায় টাকাটা কম। আমি ভাবছি গড্স্ গ্রেট ফেভার। এই ট্যুইশানি জোটাতে আমাকে আরো এক মাস বিনি পয়সায় খাটতে হত। তাই করে আজ সবাই জোটাচ্ছে মশাই। ট্যুইশানির বাজারের কী অবস্থা আপনি জানেন না।'

শিবনাথ চুপ।

'বলেছি কাল আপনাকে। একটা টাকা কর্জ চেয়েছিলাম বলে দ্যাট আনকালচার্ড দ্যাট্ ব্রুট্ হোমিওপ্যাথ আমাকে ইন্সাল্টিং ল্যাঙ্গুয়েজে কত কী না বলল। বলেছি তো কাল আপনাকে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।' সংক্ষেপে বলে সারতে চেষ্টা করল শিবনাথ।

কিন্তু মাস্টার তাকে সেখানেই অব্যাহতি দিল না। কালকের মত আজ আবার মুখটা শিবনাথের কানের ভিতর ঢোকাতে চেষ্টা করল। 'মশাই যা পাচ্ছি তা-ই এখন আমাকে হাত পেতে নিতে হবে। এক মাস পর ওয়াইফ লেবারে উঠছে, দেখছেন তো ওর শরীরের অবস্থাটা। হস্পিট্যালের ডাক্তার ডেট্ বলে দিয়েছে। টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারী, ডেট বড় একটা নড়চড় হয় না আমার স্ত্রীর। কতবার লক্ষ্য করলাম। ঠিক টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারী রাত্রে কি পরদিন সকালে পেন্ আরম্ভ হবে।'

পয়সার অভাব বা সুনীতি চর্চাও কারণ হতে পারে, বিন্ধুমাস্টার পান সিগারেট খায় না। কানের কাছে মুখ নিয়ে যখন কথা বলছিল, মুখের একটা পচা ভ্যাপ্সা গন্ধ শিবনাথের নাকে লাগল। শিবনাথ মুখটা সরিয়ে নিলে। বিধুমাস্টার শব্দ করে হেসে উঠল। 'বুঝতে পারছি, এসব বিষয়ে আপনি খুব শাই। আমি মশাই ফ্রাঙ্ক। কি, আমার ছাত্রী বিদিশার মা পর্যন্ত জানে ডেলিভারি ডেট্ কবে পড়েছে। সব বলি আমি, সবাইকে বলি। চামেলীর মাকে আজ বললাম। আমার তো মনে হয় সেই বিবেচনা করেই তিনি মেয়ের ট্যুইশানি করতে আরো বেশি গরজ করলেন। শিক্ষিতা মহিলা। 'তা ছাড়া,' মাস্টার আবার শিবনাথের কানের মধ্যে মুখ ঢোকাতে চেষ্টা করল ঃ 'মেয়েদের এই অবস্থায় মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি সিম্পেথেটিক হয়, কি বলেন আপনি?'' পচা ভ্যাপ্সা গন্ধটা শিবনাথের নাকে এবার প্রবলভাবে এসে ঢুকল।

'আপনি কি বাড়ি ফিরছেন?'

'হ্যাঁ, আপনি? চলুন রাত হল।'

'না, ওদিকে আমার একটু কাজ আছে।' আঙুল দিয়ে সামনের রাস্তাটা দেখাল শিবনাথ এবং মিথ্যা কথা বলল।

'আচ্ছা চলি, চলি।'

শরীরে মোচড় দিয়ে মাস্টার ডান দিকের গলিতে ঢুকল। শিবনাথ সহজভাবে নিশ্বাস ফেলল। বলাইর সঙ্গে হাঁটবার সময় যেমন বিরক্তিবোধ করছিল, অমল চাকলাদারকে মনে পড়ে যেমন অস্বস্তিবোধ করছিল, তেমনি এই মাস্টারটাকে দেখে শিবনাথের খারাপ লাগছিল। ভয়ানক বিশ্রী লাগে তার লোকগুলোকে। কারণ? দারিদ্য এবং মূর্খতা। এরা না থাকলে বাড়িটার একটা শ্রী থাকত, মনে মনে বলল শিবনাথ।

একটা জাহাজের মত মনে হয় বাড়িটাকে। বারোটা কামরা জাহাজের বারোটা কেবিন। কোনোটায় আলো জ্বলছে। কোনোটা অন্ধকার। অন্ধকার আকাশের নিচে সাঁতার কেটে চলেছে জাহাজটা। যাত্রীরা খাচ্ছে, গল্প করছে, কথা বলছে, কথা শুনতে শুনতে কেউ ঘুমে ঢুলছে। কোনো কামরার দরজা হাঁ-খোলা, কোনোটার দুটো পাল্লাই ভেজানো। জানালা কারো খোলা, কোনোটার বন্ধ। দরজা জানলা দুটোই

বন্ধ থাকলে সেই ঘরে কি হচ্ছে উঠোনে দাঁড়িয়ে কিছু দেখা যায় না। ঘরের লোকেরা যদি ফিসফিস ক'রে কথা বলে তবে কথাও শোনা যায় না কোন্ বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে। বাসনকোসনের শব্দ হ'লে বোঝা যায় খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। যে ঘরে কোনো রকম শব্দ নেই, সে-ঘরের খাওয়া-নাওয়া শেষ হয়েছে বুঝতে হবে। এবং কোনো সময়ই যদি শব্দ না হয়ে থাকে বোঝা গেল, সেই ঘরের লোকের উপোস চলছে। নির্জীব হয়ে থাকে ঘরটা। ভিতরের মানুষগুলো ঘুমিয়ে কি চুপ ক'রে শুয়ে রাত্রির প্রহর গুনছে তা বোঝা যায় না। কিন্তু সেই নির্জীবতাকে উপেক্ষা ক'রে পাশের কামরার লোকেরা শব্দ করে বাসন-কোসন নাড়াচাড়া করতে, বাঁটনা বাঁটতে, মাছ কুটতে, হাসতে, হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে দ্বিধা করে না। রাত গভীর হতে গভীরতর হয়। আকাশে সপ্তর্ষি ঘুরে যায়। বাড়ির পিছনে হরিতকী গাছে এক সময় একটা পেঁচা ডেকে ওঠে। 'দূর্—দূর্!'—একটা ঘর থেকে কে যেন চীৎকার করে গালাগাল দেয়, 'অলুক্ষুণে। লক্ষ্মীকে আনতে ক্ষমতা নেই, ডাকাডাকি সার।'

'আসছে দিদি। তোমার ঘরে এখন লক্ষ্মী বাঁধা থাকবে। বীথি যখন এত ভাল আপিসে কাজ পেয়ে যাচ্ছে, তোমার আর ভাবনা কি।' হিরুর মা ভাত খেয়ে পান মুখে পুরে বীথিদের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

'না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।' বীথির মা'র মুখ তেমন প্রসন্ন না।

'হবে, হয়ে যাবে। কেন হবে না, কমলা আমাকে বলল, বড় সাহেব নাকি ওকে দেখেই বলেছে চাকরি তৈরি আছে, যদি বীথি রাজী হয় কাল থেকেই লাগতে পারে।'

বীথির মা আর কিছু বলল না।

'কোন্ আপিসে দিদি? কি কাজ?'

'নাম তো জানি না ভাই, আমেরিকানদের আপিস।'

'আরো মেয়েছেলে কাজ করছে বুঝি?'

'সব মেমসাহেব।'

'তোমার মেয়ে দেখতে ভাল।'—হিরুর মা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল।

হিরুর মা'র পিছনে এসে দাঁড়ায় প্রমথর দিদিমা। তার পিছনে আট নম্বর ঘরের হিরণ। বিধুমাস্টারের স্ত্রী লক্ষীমণি এবং আরো দু' একজন। বীথির মা'র ঘরের দিকে আজ সকলে ঈর্ষার দৃষ্টি।

এখনো সে-ঘরের খাওয়া-দাওয়া হয়নি। বীথির মা কা'কে দিয়ে বাজার থেকে একটা ফুলকপি আর একপো চিংড়ি মাছ আনিয়েছে। বীথির খবর শুনে তখনি বাজারে পাঠিয়েছিল সন্ধ্যার পর। প্রীতি ঘরে ফিরে বোনের চাকরি হচ্ছে শুনে খুশি হয়ে নিজের পয়সা দিয়ে বাজার থেকে আধ সের রসগোল্লা আনিয়েছে।

রাত ন'টা অবধি চা মিষ্টির পর্ব লেগে ছিল। প্রীতির দু'জন সখী এসেছিল। বীথির দু'জন পরিচিত মেয়ে এসেছিল এ-পাড়ার। খবর শুনে সবাই খুশি।

কমলা সকলের আগে চা ও সবচেয়ে বেশি রসগোল্লা খেয়ে আবার বেরিয়ে গেছে। আজ ওর নাইট ডিউটি। তাই ওর ঘরে তালা ঝুলছে। কমলার প্রশংসা সকলের

মুখে মুখে ঘুরছিল। বীথির চাকরির মূলে ও।

সখীরা চলে যেতে প্রীতি বীথি এখন কুয়োতলায় ব'সে সাবান দিয়ে স্নান করছে। গল্প করছে। অবশ্য এত আস্তে দু'বোন কথা বলছে যে, তাদের কথা কেউ টের পাচ্ছে না। কেবল তাদের গা থেকে উঠে-আসা সাবানের মিষ্টি গন্ধটা উঠোনে বাতাসের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বীথির চাকরি হ'চ্ছে শুনে রুচিও জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, এইমাত্র আবার নিজের ঘরে ফিরে গেছে। শিবনাথ শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে।

বীথিদের দরজায় একজন অনুপস্থিত ছিল।

ডাক্তারের স্ত্রী।

প্রভাতকণার ঘরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। ডাক্তার ফিরবে অনেক রাত্রে, ধাপার দিকে একটা কল-এ বেরিয়েছে। কলেরা কেস্। একটা দু'টো কলেরা হচ্ছে ওধারটায়।

ডাক্তারের জন্য রুটি তরকারী দুধ আলাদা ক'রে ঢেকে রেখে মা মেয়ে বসে গল্প করছে। দরজার দুই পাল্লা ভেজানো। জানালা ভেজানো। এই ঠাণ্ডা রাত্রে বাইরে পাতকুয়োর নিচে ব'সে প্রীতি-বীথির সাবান মেখে স্নান করা দেখে প্রভাতকণা তার স্ব-জেলা ঢাকার গল্প করছে মেয়ের কাছে। মার হাঁটুর উপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে সুনীতি। তার কানের জুঁইপাতা মাকড়ি দু'টো হারিকেনের কমানো আলোয় চকচক করছে। টেবিলে ডাক্তারের টাইমপিস ঘড়িটা টিকটিক করছে।

প্রভাতকণার ঢাকা শহরের বাসার পাশে আর এক বাড়িতে একরকম দু'বোন ছিল। মেয়ে দু'টো ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান! ওরা এমনি ঠাণ্ডা রাত্রে গায়ে সাবান মেখে স্নান করত।

'ওরা এখন কোথায় মা?' সুনীতি ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করল।

'কি ক'রে বলব, কবে ছেড়ে এসেছি ঢাকা। আর তো যাইনি।'

'ওদের বিয়ে হয়নি?'

প্রভাতকণা মাথা নাড়ল এবং চোখ দু'টো বড় ক'রে ঘরের বাইরে পাতকুয়োটাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে মেয়েকেই বলল, 'এদেরও হবে না। প্রীতির তো অনেকদিন আগেই বয়েস গেছে। বীথির তবু আশা ছিল। এখন এটাও ডুবল।'

মার দিকে তাকিয়ে থেকে সুনীতি একটা বড় ঢোক গিলল আর চুপ করে রইল।

'যাক, মাকড়িটা গড়িয়ে রাখলাম, আরো চার গাছা চুড়ি গড়িয়ে রাখতে পারলে বিয়ের অলঙ্কারের ভাবনা আমার একরকম শেষ হয়ে গেল।'

প্রভাতকণার কথাগুলো মেয়ে কান পেতে শুনল।

তেমনি দশ নম্বর ঘরের দু'টো পাল্লাই ভেজানো। জানালাও ভেজানো।

পেটের তলায় বালিশ-চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে অমল তার স্ত্রীকে এখন চাপা গলায় শাসন করছে: 'এত যদি ব্যাটাছেলে ঘেঁষে দাঁড়াবার শখ হয় তো বাজারে

নাম লেখালেই পারো। ওই হওয়া ছাড়া আর উপায় কি। লেখাপড়া তো আর শেখনি যে আপিসে ঢুকবে। সেখানেও অবশ্য ঘেঁষাঘেঁষি করার সুবিধে আছে।'

ঘর অন্ধকার। তেলের অভাবে কোনদিনই আর রাত্রে এখন আলো জ্বালে না।

কিরণ মাটির ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। কথা বলছে না। যেন ঘুমিয়ে আছে। ঘুমোয়নি। শ্রান্ত, অচৈতন্য। পিঠের কাপড় সরে গিয়ে আর একদিকে মেঝেয় লুটোচ্ছে। এত ফর্সা কিরণের গায়ের রঙ যে, অন্ধকারেও সাদা দেখাচ্ছিল পিঠটাকে, যেন আলোর একটা ঢেউ।

বকতে বকতে হঠাৎ চুপ করে কটমট করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে অমল।

তেরো

এই অবস্থা। যাত্রীদের বিভিন্ন অবস্থায় বুকে নিয়ে জাহাজবাড়িটা রাত্রির গাঢ় জলে সাঁতার কেটে চলছিল। সপ্তর্ষি আরো খানিকটা ঘুরে গেল। আর একটা ঘরের দরজার পাল্লা দুটো এই সবে বন্ধ হ'ল।

রুণু বেবির মা অর্থাৎ কে. গুপ্তর স্ত্রী চুপ করে শ্রান্ত অচৈতন্যর মত বিছানায় শুয়ে আছে। ফ্রকের তলা থেকে বেবি এতবড় একটা পাঁউরুটি আর কাগজের মোড়ক করা চিনিটা মার বিছানার পাশে রাখল। কোন প্রশ্ন না করে পাঁউরুটিটা হাতে নিয়ে বেবির মা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল।

এইমাত্র রুণু ঘরে ফিরেছে। হাতে চারটি বড় মুলো। মাঠ থেকে তুলে এনেছে। চুরি করে এনেছে একটু বেশি রাত্রে। পাহারাওয়ালা যখন ছিল না।

সুপ্রভা চিনি দিয়ে পাঁউরুটি খেয়ে আবার চোখ বুজে শুয়ে রইল। এইবার রুণু ও বেবি খেতে বসল। মেঝের ওপর মুখোমুখি বসে দু'জন নুন ও লঙ্কা দিয়ে কাঁচা মুলো কচ্‌কচ্‌ করে খেতে লাগল।

'একদিন ধরা পড়বি।' বেবি এতবড় একটা মুলোর টুকরো চিবোতে চিবোতে বলল, 'ধরলে পাহারাওয়ালা হাড় ভেঙে দেবে।'

'ধরলে তোকেও রমেশ রায় আস্ত রাখবে না।'

'ইস্‌, আমি ক্ষিতীশকে দেখিয়ে আনি।'

রুণু আর কিছু বলল না।

'তোর সঙ্গে আর কে ছিল?'

'ময়না।'

'ময়না আর তোতে খুব ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দু'জনে বেড়াতে যাওয়া হয়, আমি টের পাই।'

'ধ্যেৎ।' রুণু ধমক দিয়ে বেবিকে মারবার ভঙ্গি করে শূন্যে হাত নাড়ে। বেবি খিলখিল হাসে। 'আমি টের পাচ্ছি, তোমাদের হাবভাব দেখে সব বুঝি।'

'এই বেবি চুপ কর।' ভাই বোনকে তেড়ে মারতে যায়। কালি-পড়া হ্যারিকেনের ঝাপসা আলোয় ঘরের দেওয়ালে করোগেটেড টিনের ওপর দু'টো ছায়া চঞ্চলভাবে

নড়ে। বেবির মাথা রুগ্ণর মাথা। অনেকদিন তেল নেই চুলে। ছায়ার মধ্যেও যেন ধরা পড়ে সেই রুক্ষতা, বিবর্ণতা। স্থির অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে সুপ্রভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পাশাপাশি ঘর বলে সেই দীর্ঘশ্বাসও রুচি শুনতে পেল। চুপ করে সে-ও শুয়েছিল। সিগারেটটা নিভে যাওয়ার পর শিবনাথও অন্ধকারে চোখ মেলে চুপচাপ শুয়ে।

দু'জনের মাঝখানে মঞ্জু; কেবল মঞ্জুর নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল।

এক সময় রুচি শিবনাথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিলে?'

'নারকেলডাঙ্গায়।'

'কেন?'

'ট্যুইশানির খোঁজে।'

'হবে? কিছু কথা দিয়েছে?'

'করব না।'

'কেন?'

'কম মাইনে।'

রুচি চুপ করে রইল।

'প্রাইভেট ট্যুইশানি করা ছোটলোকের কাজ। দেখতে পাও না বিধুমাস্টারকে! কী বা পোশাক, কী বা চেহারা! মাস্টারগুলোকে দেখলে আমার ঘেন্না করে।'

অন্ধকারে শিবনাথ মুখ বিকৃত করল।

'আমিও ইস্কুলে মাস্টারি করছি, আশা করি ভুলে যাও নি।' বলে রুচি একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

'আহা, সে-কথা হচ্ছে না।' শিবনাথ তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করল। 'তার জীবন আর তোমার, মানে আমাদের জীবনে অনেক তফাত, প্রায় আকাশ-পাতাল বলতে পারো।' একটু চুপ থেকে পরে শিবনাথ বলল, 'বারো টাকায় ট্যুইশানি নিয়েছে ম্যাট্রিকের এক মেয়েকে পড়াবে, জানো?'

রুচি চুপ করে রইল।

'কেন নেবে না, হাজার গণ্ডা বাচ্চার জন্ম দিলে এই অবস্থা হয়।' শিবনাথ বলল, 'আউটলুক নিয়ে কথা হচ্ছে। এধরনের ইচ্ছা করে গরিব হয়ে থাকা মানুষ গুলোকে আমি ঘৃণা করি।'

'তুমি কি বড়লোক হয়ে গেছ নাকি?'

'নিশ্চয়, ওর তুলনায়, ওদের তুলনায় আমি রাজা। পাঁচ গণ্ডা সন্তানের বাপ নই আমি। আমার একটা মেয়ে।

রুচি আর কোন কথা বলল না।'

এমন সময় বাইরে এক গণ্ডগোল শোনা গেল। শিবনাথ শয্যা ছেড়ে উঠল: রুচি উঠল না।

দরজা খুলে শিবনাথ বারান্দায় এলো।

হাতে লণ্ঠন নিয়ে বাড়ির সরকার মদন ঘোষ। সঙ্গে ওটা কে ? শিবনাথ অনুমান করল বাড়িওয়ালার দারোয়ান, হাতে লম্বা লাঠি। একজন না, দু'জন দারোয়ান। তিনজন বলাই-ওর ঘর মুখ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে।

শিবনাথ শুনল, একজন আর একজনকে বলছে, লাঠি দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারো।

মদন ঘোষ দু'বার 'বলাই' 'বলাই' করে ডাকল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

'জেগে ঘুমোচ্ছে।' একজন বলল।

'তা বললে চলবে না।' যেন ঘরের ভিতরের জাগ্রত ঘুমন্ত বলাইকে সম্বোধন করে মদন ঘোষ চেঁচিয়ে বলল, 'ভাড়া না দিলে কাল সকালের মধ্যে ঘর খালি করে দেবে।'

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। দরজা খোলার শব্দ হয়। উঠোনের লোকেরা দরজার কাছে সরে গেল। দরজা খুলতে ময়নাকে দেখা গেল। বলাই-এর মেয়ে।

'তোর বাবা কোথায় ?' মদন ঘোষ প্রশ্ন করল।

'ঘুমোচ্ছে।'

ভাল করে কথা বলতে পারছে না মেয়েটা। কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়ে কাঁপছে।

'ডেকে দে শালাকে।'

মদন ঘোষ বিকৃত মুখের ভঙ্গি করল।

কিন্তু ময়না ডাকবার আগে বলাই উঠে এল।

'কাল সকালে তুমি ঘর ছেড়ে দিও, অন্য ভাড়াটে আসছে।'

আর ঘর ভাড়ার তাগিদ না দিয়ে সরকার সোজা কথাটা বলে ফেলল।

বলাই মুখ তুলছে না। নীরব!

ময়না বাবার পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

লণ্ঠন ও লাঠিওয়ালারা উঠোনের আর একদিকে চলে গেল।

অমলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন।

অমলবাবু ঘরে আছেন ?'

'কে ?'

সরকারের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে অমল ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'ঘর-ভাড়া দিন।' মদন ঘোষ হাত পাতল।

'টাকা পাইনি।' অমল ভয় পায়নি মুখের এমন ভাব করল। কিন্তু মদন ঘোষ তা গ্রাহ্য করল না। সরস গলায় বলল, 'তাই ভাল, আবার যখন টাকা হবে এ-ঘরে এসে বাস করবেন। দয়া করে কাল দুপুরের মধ্যে জিনিস-পত্তর বার করে ঘর খালি করে দেবেন। নতুন ভাড়াটে আসছে।'

ব'লে সরকার লাঠিওয়ালাদের সঙ্গে করে আর এক ঘরের দরজার দিকে সরে গেল।

'ইয়ার্কি' আর কি। ন'মাস ভাড়া দিয়ে এসেছি। দু'মাস ভাড়া দিচ্ছি না, ঘর

ছাড়ো, সেই দিন এখন গেছে। রেণ্ট-কণ্ট্রোল আছে। আমিও ফাইট্ করব।'

'তাই কর দাদা, তাই করে দ্যাখো!' প্রতিবেশী কোন ঘরের লোক গলা বড় করে বলল, 'বাড়িওয়ালার জুলুম এখন টেঁকে না।'

মদন ঘোষ দলবল নিয়ে কে. গুপ্তর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে। শিবনাথ লক্ষ্য করল কে. গুপ্তর ছেলে ও মেয়েটি মুখ কালো করে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'তোমাদের বাবা কোথায়, খুকি?'

'বাবা এখনো ঘরে ফেরেনি।' বেবি বলল।

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।' রুণু বলল।

একটু ইতস্ততঃ করে মদন ঘোষ বলল, 'তোমাদের মা ঘরে আছেন কি?'

একটু ভেবে বেবি বলল, 'ঘুমোচ্ছেন। মার শরীর ভাল না।'

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে সরকার সরস গলায় বলল, 'দ্যাখো, দ্যাখো ভাই, বাবুদের কী অবস্থা আজ। লোকটার হাজার টাকার ওপর মাইনে ছিল। এখন হাঁড়ি চড়ছে না নিয়ম মতন।'

রুণু ও বেবি পরস্পর মুখের দিকে তাকায়।

মদন ঘোষ একটু ভেবে পরে বলল, 'আচ্ছা খুকি, বাবাকে বলবে, সরকার এসেছিল। তিন মাসের ভাড়া পরিষ্কার করে না দিলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে দু'চার দিনের মধ্যে।'

রুণু ও বেবি একসঙ্গে মাথা কাত করল।

সঙ্গীদের নিয়ে সরকার উঠোন ছেড়ে চলে গেল। আর কাউকে ঘর ছাড়তে বলা হল না, তার অর্থ বাকি সব ঘরের ভাড়া পরিষ্কার আছে। তারা, যাদের ভাড়া পরিষ্কার, প্রায় সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ চুপচাপ ছিল আর দাঁড়িয়ে শুনছিল মদন ঘোষ কোন্ কোন্ পরিবারকে ঘর ছাড়তে শাসিয়ে গেল।

সরকার চলে যেতে এখন এক এক করে মুখ খুলল। শিবনাথ কিছু বলল না, শুনে গেল।

'একটু বেশি কড়াকড়ি আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হয়।'

'শুনছি, এই বস্তি রাখবার ইচ্ছে নেই রায় সাহেবের। পারিজাতও তাই চাইছে। বস্তি তুলে দিয়ে কারখানা খুলবে। বস্তির অনেক হাঙ্গামা।'

'সে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে দাদা, আমরা যারা নিয়মিত ভাড়া গুনছি, তাদের তুলবে কেমন করে। বস্তি ভেঙে দিতে ওকে দিচ্ছে কে।'

'বস্তি দিয়ে তেমন আয় হয় না। তাই এখানে কারখানা খোলার মতলব।'

'বটে। কিসের কারখানা?'

'চামড়ার।'

'না-না, ওসব বাজে কথা। আমার সঙ্গে এই বিকেলেও পারিজাতের কথা হচ্ছিল। মানে যারা ভাড়া দিতে পারছে না, ডিফল্টার হয়ে আছে, তাদের পারিজাত তুলে দেবে। এখন ভাল ভাল সব লোকজন আসছে এখানে ঘর ভাড়া নিতে।'

'তা ভাড়াও তো এক একটা ঘরের কম না ! মাস যেতে আঠারটি টাকা ।'

'তা তো বটেই । আমরা বস্তি বস্তি করে নাক সিঁটকাই, তা এই বস্তিতেই বা থাকতে পারছে ক'জন ।'

'এই এক বছরের মধ্যে কত ভাড়াটে গেল, কত এল ।'

'হ্যাঁ, যদি একটা ফিক্সড্ ইনকাম না থাকে, তবে আমার তো মনে হয়, এত ভাড়া দিয়ে এখানে থাকাটা ঠিক না ।'

'তা ছাড়া একজনের দরুন বাকি তিনজনকে সাফার করতে হয় । পারিজাত বলছিল, কবেই ইলেকট্রিক আনা হয়ে যেত । কিন্তু হচ্ছে না, কেন আনা হচ্ছে না—বুঝতে পারছেন তো ?'

'তা আর বুঝি না ! আমি মশাই এটা পছন্দ করি না । যখন যেমন আয়, সেভাবে থাকতে হবে বৈকি । আরো সস্তায় ঘর আছে, টেংরা ধাপার দিকে । আট-দশ টাকায় ঘর পাওয়া যায় । এখানে এত ভাড়া দিয়ে থাকার কি অর্থ হয় ।'

'আমি মশাই ভাড়ার ব্যাপারে ভয়ানক পার্টিকুলার । পান খাই না, সিগারেট খাই না কি কম দুঃখে । এমনি এতগুলো সন্তান । তার ওপর কী দুর্মূল্য হয়েছে জিনিসপত্তর ।'

শিবনাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিধুমাস্টার কথা বলছে । আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে না থেকে শিবনাথ ঘরে চলে এল । কিন্তু সেখান থেকে বাইরের লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ।

'টেংরা-ধাপায় যাব কেন । এখানেই থাকব । কিন্তু ঘরভাড়া বারো টাকার বেশি দেব না । এই ঘরের, যে-বাড়িতে কল চালু নেই, ইলেকট্রিক নেই, ছ' ফুট ন' ফুট একটা ঘরের ভাড়া বারো কেন দশ হওয়া উচিত । আঠারো টাকা জুলুম । বাড়িওয়ালার জুলুম আর টেঁকে না । রেন্ট-কন্ট্রোল আছে ।'

'কিন্তু আমরা সকলে এক হ'তে পারছি কই । ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ । এই দুর্দিনের বাজারে কারোরই উচিত না আঠারো টাকা ভাড়া দেওয়া । একসঙ্গে সকলের ভাড়া বন্ধ করা উচিত ।'

'তা কি আর হয় দাদা । এখানে সেই হ্যাভস্ এন্ড হ্যাভ্ নট্স্-এর দলাদলি । শুনলেন না, শেখর ডাক্তার কি বলল, যাদের ফিক্সড ইনকাম নেই, তাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে টেংরা-ধাপায় চলে যাওয়া উচিত ।'

'বটে, যাচ্ছি, আসুন না কাল মদন ঘোষ । কি করে আমাকে তোলে, আমিও দেখে নেব ।'

কিছুক্ষণ আর কারো গলা শুনল না শিবনাথ । রুচি ঠিক ঘুমুচ্ছে কি না, বুঝতে পারল না । মঞ্জুর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল । মশারির একটা ধার সাবধানে তুলে আস্তে আস্তে সে ভিতরে চলে গেল । কিন্তু সেখানে থেকেও শিবনাথ বাইরের লোকের কথা শুনতে পেল ।

যেন আবার শেখর ডাক্তার বিধু মাস্টারকে বলছিল, 'দশ টাকা ভাড়া করলেও কি তুমি মনে করো সবাই নিয়মিত তা দিয়ে যাবে । তখনও ডিফল্টারের সংখ্যা এখনকার

মতনই থাকবে। বাড়তেও পারে।'

'যা বলেছ। হ্যাঁ, ক্রমশই হার্ড ডেজ আসছে। না, ভাড়া কমানো-টমানোর প্রশ্ন উঠবে না। ও সবাই ওঠার আগে এসব বলে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে, তারপর যেদিন যাবার ঠিক উঠে যায় পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। কতজনকে দেখলাম।'

'তাই বলছিলাম, বস্তি বস্তি করে আমরা নাক সিঁটকাই বটে, কিন্তু এই ঘরেই বা থাকতে পারছে ক'জন।' শেখর ডাক্তারের গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'চল মাস্টার একটু রকে গিয়ে বসি।'

'হিম পড়ছে।' বাইরে রকে গিয়ে বসতে বিধু মাস্টার গররাজী, বোঝা গেল।

'আরে ধ্যেৎ, হিম। তোমার দেখছি,—চল প্রাইভেট কথা আছে।'

মাস্টারকে আর আপত্তি করতে শোনা গেল না। প্রাইভেট কথা শুনতে ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। অথচ দু'জনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে কী অহি-নকুল সম্পর্ক শিবনাথ জেনে ফেলেছে। কিন্তু এখন বোঝা যায় না, এখানে মনের সেই ভাব অনুপস্থিত। কেন না, দুজনের ঘরভাড়া পরিষ্কার আছে।

যাদের বাড়িওয়ালার লোক শাসিয়ে গেল, শিবনাথ তাদের গলা আর শুনতে পেল না। বাড়িটা এবার ঝিমোচ্ছিল, শিবনাথের প্রায় তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ এমন সময় বাইরে কার মোটা উঁচু শক্ত-সমর্থ গলা শোনা গেল। কান খাড়া করে ধরল শিবনাথ। রমেশ রায় কথা বলছিল।

'ওসব আইডিয়া ছেড়ে দিন, ভাড়াটাড়া বন্ধ করার হাঙ্গামা আছে। তাছাড়া বাড়ির সকলে একজোট হতে পারছেন কই। আমি হয়তো আপনাকে সমর্থন করলাম, আর তিনজন করবেন না। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না?'

ঠিক কাকে কথাগুলো বলা হচ্ছে, শিবনাথ বুঝতে পারল না?

'দিনের হালচাল বদলে গেছে এখন। যখন যেমন, ঠিক সেইভাবেই চলতে হবে, না হলে বিপদ। ছি, ছি, মদন ঘোষ এত সব কথা শোনায় আপনাকে, কেন, আপনি কি জলে পড়েছেন।'

'ছোটলোক। আমি বলেছি, সামনের মাসে সব পরিষ্কার করে ফেলব, কিন্তু শুনছে না।'

শিবনাথ বুঝল, অমল কথা বলছে।

'যাকগে, আমি বলব পারিজাতকে—কথায় বলে, মনিবের চেয়ে চাকরের গলা বড়—বলে দেব, এখানে [illegible] ভদ্রলোকের ছেলে, মদন ঘোষ কথাবার্তা যেন একটু সাবধানে বলে।'

'সাধারণ এক[illegible]সরকারের কী তেজ!' অমল বলল।

'ছেড়ে দিন, বললাম তো চাকর চাকরই।'

রমেশ রায় বোঝায়। 'এসব ভেবে আর মন খারাপ করবেন না। আমি আপনাকে ওবেলা যা বলেছিলাম ভেবে দেখেছেন কি?'

শিবনাথ আরো মনোযোগ দিতে বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ধরল।

রমেশ বলছিল, 'যখন যেমন সেভাবে চলতে জানলে ঠেকতে হয় না, অপমানও

শুনতে হয় না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তা-ই বলছে মশাই,—'

'সুতরাং বুদ্ধিমানের মত, এখনকার মত সেই রকম ব্যবস্থাই করুন। তারপর আপনার একটা সুবিধে হয়ে গেলে, বুঝলেন না?'

অমল মাথা নাড়ল কি নাড়ল না, ঘরে থেকে শিবনাথ দেখতে পেল না। কিন্তু এখনকার মত কি ব্যবস্থা করতে রমেশ সদুপদেশ দিচ্ছে বুঝল।

রমেশ রায়ের গলা আর এক ঘরের সামনে শোনা যায়। উঠোনের আর এক দিকে সরে গেছে, সে, শিবনাথ টের পেল।

'হাতের কাছে লাঠি থাকলেও সুবিধে হত না বলাই, রাগের মাথায় বলছ বটে, কিন্তু মদন ঘোষের মাথায় বাড়ি মারলে তুমি জেলে যেতে—বাড়ির পাঁচটি ঘর তোমার হয়ে সাক্ষী দিত, কিন্তু বাকি সাতঘর যেত মদনের পক্ষে,—যাবে। এই এ-বাড়ির দস্তুর।' বলাই চুপ।

'কাজেই ওসব অসম্ভব ভাবনা না ভেবে আমি যে-কথাটা বলেছি, ভাল করে সেটাই ভেবে দেখ। আমার প্রস্তাবটা জলে ফেলে দিও না।'

কি প্রস্তাব—বলাইকে কি ভাবতে রমেশ রায় সৎ পরামর্শ দিচ্ছে, শিবনাথ বুঝতে পারল না।

'ব্যবসার হালচাল বদলে গেছে, আগের দিন আর নেই, বেগুন মাথায় নিয়ে সারাদিন ঘুরলে ঘাম ঝরবে, পয়সা চোখে দেখবে না।'

যেন বলাই ভাবছিল। কথা বলছে না।

রমেশ রায় বলল, 'কাজেই যেভাবে চললে ঠেকবে না, ঠকবে না, বুদ্ধিমানের মত তাই তোমাকে করতে বলা হয়েছে। রাজী যদি থাক তো কাল সকালে আমায় জানিও।'

বলাই মাথা নাড়ল কি না শিবনাথ দেখল না। বৌকে কারখানার কাজে লাগাতে অমলকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। বলাইকে? ময়নাকেও কি রমেশ রায় কারখানায় দিতে বলছে? না কি অন্য কোন পরামর্শ! শিবনাথ ঠিক বুঝতে পারল না। রমেশ রায়ের গলা আর শোনা গেল না। বাড়ির কলরব এখন একেবারে থেমেছে। অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে জাহাজ হেলেদুলে চলেছে। পিছনের হরীতকী গাছের পেঁচাটা আর একবার ডেকে উঠল। আর কেউ এখন 'দুর্ দুর্' করল না। আরো কিছুক্ষণ পর, আলপিন পড়লে তার শব্দ শোনা যায়, চারদিক যখন এমন নীরব হয়ে এসেছে, তখন গমগম করে উঠল একজনের কণ্ঠস্বরঃ Beauty Beauty Beauty Beauty··· কে তে

'এ-বাড়ির সকলের চেয়ে কে. গুপ্ত সুখী।' কে জানি বলল।

'আজ আর বোতল না, পিঁপেসুদ্ধ ঢেলে এসেছে।' আর এক ঘর থেকে একজন বলে উঠল, 'মদন ঘোষের বাবার সাধ্য কি মহাদেবকে অপমান করে।'

শুনে দু-তিনটা ঘরের স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুরা একসঙ্গে হেসে উঠল। বস্তির মানুষের খুব চোখে ঘুম কম, শিবনাথ জেগে থেকে ভাবে।

চৌদ্দ

পরদিন সকালবেলা স্বামী-স্ত্রীতে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। এবং কথাগুলো দুজনের কেউ আস্তে বলল না। রুচি বলল, 'তোমার যদি সামনের মাসের মধ্যে একটা সুবিধা না হয়, আমি নৈহাটি চলে যাব।'

নৈহাটিতে রুচির দিদি থাকে। দিদির বর সেখানে রেলের চাকরি করে।

এক ধরনের শাসানি শিবনাথ আগে কোনোদিন স্ত্রীর মুখে শোনেনি। বস্তিতে এসে এই প্রথম শুনছে।

মুক্তরামবাবু স্ট্রীটের বাসায়ও এই ক'টা মাস তারা ভয়ানক কষ্টেই কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় পেয়ে রুচি একদিনও দিদির কাছে কি কাকাবাবুর কাছে পালিয়ে যাবার কথা তোলেনি।

রুচির শাসানিটাকে শিবনাথ অন্য কাজে লাগাল। ভয় পেয়ে তার মুখ শুকনো হল না। বরং সুক্ষ্ম একটা রসবোধ হয়েছে, মুচকি হাসির মধ্য দিয়ে সে তা ফুটিয়ে তুলল। বেশ জোরে বলল, 'তা আমার কাজের সুবিধে হচ্ছে না বলে রাগ করে তুমি চলে যাচ্ছো, আমি বলব এটা তোমার সেলফিশ মনের কথা। হ্যাঁ, দিদির কাছে গিয়ে তো তুমি থাকতে পারোই। জামাইবাবু বড় চাকুরে। চাকরি-বাকরি কিছু না করেও সেখানে স্বচ্ছন্দে ছ'মাস কাটাতে পার। রোজ মাছের মাথা খাবে, বাঁধাকপি খাবে। গুড্‌সে আছেন তোমার ব্রাদার-ইন-ল। রোজ প্রচুর ভেট পান। এখানে বস্তিতে থেকে পুঁটি চচ্চড়ি খেয়ে অসুখ-বিসুখ বাঁধানোর কী দরকার। মঞ্জুকেও নিয়ে যাও।'

শিবনাথ একবার থেমেছিল দরজার দিকে তাকিয়ে। অনেক মেয়ের মুখ দরজায় উঁকি দিয়েছে। সরল দাম্পত্যকলহ দাঁড়িয়ে দেখতে মেয়েদের চেয়ে উৎসাহশীল জীব পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

তা ছাড়া আর দশটা ঘরের যেমন পর্দা ছিল না, এ-ঘরেও তা ছিল না। মুক্তারাম-বাবু স্ট্রীটের পর্দাটা আনা হয়েছিল। কিন্তু এখানে খুলে দেখা গেল, ইঁদুরে জায়গায় জায়গায় খেয়ে গাঙ করে ফেলেছে, দরজায় টাঙানো যায় না।

এবং পর্দা না থাকার দরুন উঠোনে দাঁড়িয়েও অনেকে এ-ঘরের নতুন ভাড়াটেদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখল।

কেউ কিছু মন্তব্য করল না। দাম্পত্যকলহে বাইরের লোকের নাক ঢোকানো পাপ। জানে বলেই সকলের মুখে কাপড় অথবা হাত। আড়ালে তারা হাসছে কি দুঃখ করছে বোঝা যায় না।

শিবনাথও তা নিয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজনবোধ না করে রুচির দিকে তাকিয়ে সোজা বলে ফেলল, 'আমার সুবিধা হচ্ছে না বলে মনে দুঃখ হচ্ছে তোমার, কিন্তু আমারও তো দুঃখ হয় তোমার হাবভাব দেখে।'

'কী রকম!' রুচি বড় করে স্বামীর দিকে তাকালো।

'হাই ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা অফিসে ঢুকলে এর ডবল মাইনে পেতে তুমি। আমাদের তাহলে অন্ততঃ বস্তিতে থাকতে হয় না।'

তারপর একটু চুপ থেকে পরে বেশ অভিমানের সুরে বলল শিবনাথ, 'আমিও কিছু আর চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে আসিনি। আমারও চাকরি হবে। এবং ভাল চাকরি হবে। কোলকাতায় আবার ভাল বাড়িতে আমি ফিরে যাচ্ছি শীগ্‌গিরই।'

রুচি আর কোন কথা বলেনি। মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে পড়াতে বেরিয়ে গেল।

শিবনাথও ঘরে বসে রইল না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই ঝগড়া বেধেছিল। শিবনাথ শহরে যেতে রুচির কাছে কিছু পয়সা চেয়েছিল। কিন্তু রুচি দেয়নি। শিবনাথ কাল ধার করে অ্যাশ-ট্রে কিনেছে। রুচি আজ সকালেও একথাটা জোরে জোরে বলল। বাড়ির সবাই শুনল। সেজন্যেই শিবনাথ আহত হল বেশি। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আজকাল আর অত প্রেষ্টিজ নিয়ে মেয়েরা চলে না। অফিসে কাজ করছে সব মেয়েই কিছু খারাপ না।'

শিবনাথ যখন কথাগুলো জোরে জোরে বলছিল, রুচি তখন রাস্তায় নেমে গেছে। কাজেই শিবনাথের কথাগুলো কানে গেল না। শিবনাথের স্বগতোক্তিটা বাড়ির আর পাঁচজন উপভোগ করল। আর পাঁচটি মেয়ে।

শার্ট গায়ে চড়িয়ে দরজায় তালা দিয়ে শিবনাথও এক সময় রাস্তায় নামল।

মানে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। একটা কিছু সুবিধা তাকে কয়েক দিনের মধ্যেই করে নিতে হবে। না হলে,—না হলে যে ঠিক কী হবে শিবনাথও বুঝল না।

শিবনাথ তিনজনের মুখে পড়ে গেল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেখল বেঞ্চের এপাশে বসে কে. গুপ্ত, ও-পাশে অমল এবং দোকানের ভিতরে বসা বনমালী। তিনজন তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন কে. গুপ্ত ও বনমালী কি বলাবলি করছে।

শিবনাথ গিয়ে সামনে দাঁড়াতে দুজন চুপ করল।

'কোথায় বেরুচ্ছেন?' বনমালী ভুরু কুঁচকে প্রথম প্রশ্ন করল। 'কাজে বেরোচ্ছেন নাকি?'

হুট্ করে শিবনাথ মিথ্যা কথাটা বলতে পারল না। ঘুরিয়ে বলল, 'না, অফিসে একটা গণ্ডগোল আছে, সে জন্যেই বেরোচ্ছি না কদিন। আজ বেরোব কি না তাই ভাবছি।'

'ও, আপনার আপিসে স্ট্রাইক চলছে, ছাঁটাই হচ্ছে বুঝি? তবে আর খামাকা বেরোচ্চেন কেন। সীক-লীভ্ চেয়ে পাঠিয়ে চুপ করে বসে থাকুন বাড়িতে। একটা মাসের মাইনে পাবেন। ওখানে গিয়ে দরজায় চেহারা দেখিয়ে স্ট্রাইকার্স লিস্টে নাম তুলছেন কেন?'

শিবনাথ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল বক্তা অমল। একটা সিগারেট মুখে।

কে. গুপ্তর মুখেও সিগারেট জ্বলছে। সিগারেট ঠিক কে অফার করেছে শিবনাথ বুঝতে পারল না।

'বসুন বসুন।' কে. গুপ্ত এতসব ভূমিকা করল না। 'ও এমনিও গেছে অমনিও যাবে। আপনার স্ত্রী তো আমার আর অমলের স্ত্রীর মতো অশিক্ষিত নন। তা ছাড়া অলরেডি একটা চাকরি করছেনও। আমাদের তুলনায় আপনি যে মশায় লাটসাহেব। বসুন বসুন, আপনার আবার বেকার থাকার ভাবনা কি?'

প্রায় শিবনাথের হাত ধরে কে. গুপ্ত তাকে বেঞ্চের পাশে বসায়।

'তারপর, খবর কি বলুন, কন্যাকে আজ সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন গিন্নি, দেখলাম?'

'হুঁ।' শিবনাথ সংক্ষেপে উত্তর সারতে চেষ্টা করল। 'বাড়িতে একলা থাকলে মঞ্জু কাঁদাকাটি করে।'

'তা করবেই তো, নতুন জায়গা।' বনমালী বলল।

শিবনাথ চোখ তুলে আর একবার অমলকে দেখল।

'যাক গে সুখী লোক, আপনার কথা আলাদা।' একটা নিশ্বাস ছেড়ে কে. গুপ্ত বলল, 'মশায় শুনেছেন বোধ হয়, এঁর বিপদের কথা।' কে. গুপ্ত খুতনি তুলে ইঙ্গিতে অমলকে দেখাল। 'কাল বাড়িওয়ালার লোক এসে নোটিশ দিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, জানি আমি। আমি বাড়িতে ছিলাম।' শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'তোমায়ও তো নোটিশ দিয়েছে', বনমালী বলল, 'তোমারটাও বলো ওঁকে।'

কে. গুপ্ত বনমালীর কথায় কর্ণপাত করল না। শিবনাথের দিকে চোখ রেখে বলল, 'মশায়, চাকরি-বাকরি নেই বেচারার, ভাবনায় পড়েছে। আর তার মধ্যে কিনা উল্লুকটা অমলের পেছনে লেগেছে।'

'কে উল্লুক?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'রমেশ রায়।' বনমালী বলল, 'অমলকে ফুসলাচ্ছে বৌকে পারিজাতের গেঞ্জির কারখানায় পাঠাতে।'

'মশায়, পয়সার গরম।' কে. গুপ্ত চোখ বুজে বলল, 'দুটো পয়সা আছে তাই কাকে কোন্ কথা বলছে, রমেশ রায় দিশা করতে পারছে না।'

শিবনাথ আড়চোখে অমলকে দেখল। বিমর্ষ, অধোবদন। সিগারেটটা টানছে না। দুই আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে।

কে. গুপ্ত চোখ খুলল।

'এ্যাঁ, না হয় অবস্থায় পড়ে আজ শহরে এসেছে। পাড়াগাঁ-র মেয়ে। চিরটাকাল নুন দিয়ে কুল খেয়েছে, মাঘমণ্ডল ব্রত করেছে, শিবচতুর্দশীতে রাত জেগেছে, পিঠে গড়েছে, চটের টুকরোয় ফুল তুলে লক্ষ্মীর আসন তৈরী করেছে, সেই মেয়েকে কিনা হারামজাদা বলছে গেঞ্জির কলে ঢুকতে, আক্কেলটা দেখলেন মশায়।'

শিবনাথ নীরব।

বনমালী মুখ টিপে হেসে কে. গুপ্তকে বলল, 'রমেশ রায় তো তোমাকেও এ-প্রস্তাব দিতে পারে, তখন করবে কি?'

'কে আমি?' কে. গুপ্ত চোখ বড় করল। 'শালার মাথায় লাঠি ভাঙব। আমাকে এমন একটা কু-প্রস্তাব দিতে এলে রমেশ রায়কে খুন করব।'

কথা শেষ করে কে. গুপ্ত গম্ভীরভাবে অমলের দিকে তাকায়। কিন্তু অমল আর

একবারও চোখ তুলছে না। একটু পর সে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা, আমি এখন যাই।'

'কোথায় যাবে?' বনমালী আলগা একটা প্রশ্ন করল। কিন্তু অমল তার উত্তর দিলে না। মাথা নিচু করে রাস্তায় নেমে একদিকে চলে গেল। অমল অদৃশ্য হ'তে বনমালী শব্দ করে হেসে উঠল এবং হাসতে হাসতে সে যা বলল, তা থেকে শিবনাথ বুঝতে পারল অমলের মনের ভাবটা একটু নেড়েচেড়ে দেখবে বলে তারা তাকে এখানে ডেকে এনেছিল। রমেশ রায়ের ওপর অমলের ভীষণ রাগ। তার রেস্টুরেণ্টে সামান্য ক'টা টাকা বাকী পড়েছে বলে সে অমলকে এমন অভদ্র প্রস্তাব দেবার সাহস পেলে। কেন, অমলের দিন কি ফিরবে না? তখন সে রমেশ রায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে। সে উপোস আছে, তা বলে কি রমেশ রায়ের দরজায় ভিক্ষে করতে গেছে। উঁহু, কিছুতেই সে বৌকে ঘরের বাইরে পাঠাবে না। পাড়াগাঁয়ে থেকে মানুষ, লেখাপড়া শিখে নাক মুখ যে চোখা করেছে তাও না, আর সবচেয়ে বড় কথা কিরণ পাঁচটা-সাতটা সন্তানের মা হয়ে বুড়ী সাজেনি, কাজেই—

কথা শেষ করেও বনমালী হাসে।

'তারপর, গুপ্ত, দেখলে তো বৌ সম্পর্কে অমল কেমন সজাগ। সিনেমার প্রস্তাবটা তুমি ওকে দেবে কেমন করে?'

কে. গুপ্ত হঠাৎ কথা বলল না। আকাশের দিকে মুখ তুলে অনেকটা নিজের মনে হাসল।

'কাল বাদে পরশু তোমার বন্ধু আসছে মনে আছে তো।'

'আছে।' বনমালীর চোখে চোখ রেখে কে. গুপ্ত একটা নিশ্বাস ফেলল। চারু যেমন পাগল হয়েছে কিরণকে দেখে, এখন দেখা যাক কি করতে পারি।'

শিবনাথ অস্বস্তিবোধ করছিল। কে. গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে সে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'কি মশায়, আপনিও যে দেখছি একেবারে রসকষশূন্য মানুষ। কী এমন হাতি-ঘোড়া কাজ ফেলে এসেছেন যে এরই মধ্যে উঠছেন।' কে. গুপ্ত শিবনাথের হাত ধরতে যাচ্ছিল, শিবনাথ আর একটু সরে দাঁড়ায়। হাত জোড় ক'রে ব্যস্তভাবে বলে, 'না, এখন না, অন্য সময়, আর একবার এসে গল্প করব, একটু কাজে বেরোচ্ছি।'

'আহা, আড্ডাটা সবে জমতে আরম্ভ করেছিল। অমলের মত আপনিও যে দেখছি রসের আসরে জল ঢেলে দিয়ে পালাচ্ছেন, ব্যাপার কি—'

শিবনাথ বনমালীর দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তায় হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে আরম্ভ করল। চারিদিকে চন্‌চন্ করছিল রোদ। একটা ধুলোর ঘূর্ণি উঠল। এক ঝলক ধুলো নাকে মুখে লাগতে শিবনাথ পকেট থেকে রুমাল বার করল।

'শুনুন, আপনাকে ডাকছি।'

রাস্তার ওপাশ থেকে কে যেন শিবনাথকে ডাকে। শিবনাথ ঘাড় ফেরায়। উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুন।' প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড দরজার এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে। তার

নিচে দাঁড়িয়ে পাঁচু ভাদুড়ী। হাত তুলে শিবনাথকে ডাকছে ঃ 'দয়া ক'রে একবার পায়ের ধুলো দিন স্যার, আসুন।'

গালে হাত বুলোয় শিবনাথ। সেলুন চোখে পড়লে হাত দিয়ে গাল অনুভব করা শহরের লোকের অভ্যাস। এবং শিবনাথ টের পেল তার গালের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আজ সকালে দাড়ি কামানোর কথা। কিন্তু রুচির সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে তা আর হয়নি। শিবনাথ গাল থেকে হাতটা নামিয়ে নেয় এবং দাঁড়িয়ে থেকে ইতস্ততঃ করে।

ভাদুড়ী ততক্ষণে চৌকাঠের বাইরে চলে আসে।

'এক বাড়িতে আছি অথচ একদিনও দর্শন দিলেন না, চলে আসুন স্যার।'

শিবনাথ আর ইতস্ততঃ করল না। রাস্তা পার হয়ে উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুনের দরজায় চলে গেল। ভাদুড়ী হাতে ধরে শিবনাথকে ভিতরে টেনে নিয়ে যায়।

'বসুন স্যার।'

গদি-আঁটা উঁচু উঁচু চেয়ার, চার দেয়ালে টাঙ্গানো মোটা ফ্রেম-বাঁধানো বড় বড় আরশি, কাচ পরানো আলমিরায় চুল কাটার ক্লিপ, কাঁচি, বুরুশ, শেভিং সোপ, ক্রিম পাউডারের ডিবে ঝকঝক করছে। একদিকের ব্রাকেটে ভাঁজ ক'রে রাখা ধবধবে তোয়ালে। কোন কোণায় যেন ধূপকাঠি জ্বলছে।

'তারপর কোথায় যাওয়া হচ্ছিল ?' উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে পাঁচু পকেট থেকে সিগারেট কেস্ তুলল। 'নিন স্যার।' একটা সিগারেট শিবনাথের হাতে তুলে দিয়ে নিজে একটা ধরায়। স্যার, কোলকাতা থেকে নতুন এসেছেন, জানি ক্যানেল সাউথ রোডের সেলুনে ঢুকতে আপনাদের মন ওঠে না, একদিন পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

'না না, সে একটা কথা কি। দাড়ি কামাতে চুল ছাঁটতে কি আর রোজ কোলকাতায় যাওয়া পোষায়।' উদ্ধত ভঙ্গিটাকে একটু খাটো করল শিবনাথ। চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'সাজ-সরঞ্জাম সবই তো আছে দেখছি, শহরের সেলুনের চেয়ে কম বা কি।'

'তা শুধু সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তো আর সেলুন চলে না কর্তা', শিবনাথের আপাদ-মস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে ভাদুড়ী দাঁত বার ক'রে হাসল। 'হাতের কাজ, হাত ভাল না হলে ও শালা জার্মান বলুন ইংলিশ ফ্রেঞ্চ জাপানি,—শালার কোনো রেজার ক্লিপে সুবিধে হয় না।' ভাদুড়ীর দাঁতগুলো ভীষণ নোংরা। মদখোরের দাঁত অপরিচ্ছন্ন থাকে কার কাছে যেন শুনেছিল শিবনাথ। কদম ফুলের মত মাথার চুলগুলো সমান ক'রে ছাঁটা। নিকেলের ফ্রেম-বাঁধানো চশমা চোখে। হাত-কাটা ফতুয়া গায়ে। পায়ে চটি। চটি পুরোনো হয়ে চামড়া ফাটো ফাটো করছে। কিন্তু তা হলেও নিয়ম মত কালি ও বুরুশ লাগিয়ে ভাদুড়ী পায়ের জুতো বেশ পরিষ্কার রাখে বোঝা গেল। গায়ের জামা পরনের কাপড়টিও ফরসা। শিবনাথ লক্ষ্য করল। সেই তুলনায় তার জামা কাপড় জুতো জোড়া মলিন অপরিচ্ছন্ন বৈকি। অত্যন্ত সতর্কভাবে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবং সেটা ঢাকতে শিবনাথ হেসে প্রশ্ন করল, 'তা সেলুনের নাম 'উর্বশী' কেন, উর্বশীরা এখানে আসে নাকি ?'

'আসে আসে, স্যার।' ভাদুড়ীর সবগুলো নোংরা দাঁত দেখা গেল। 'আপনি কি মনে করেন গড়পার ইটালি শ্যামবাজার ভবানীপুরের উর্বশীরা কেবল সেলুনে ঢোকে। বেলেঘাটা টেংরা চিংড়িঘাটার উর্বশীদেরও এখন খেয়াল চাপছে সিঙ্গল করা মাথা না হ'লে তারা সেকেলে থেকে যাবে!'

শিবনাথ শব্দ করে হাসে।

'মাটির ঘর টিনের ঘর ছেঁচা-বাঁশের ঘরে থাকে এক একজন, মশাই, কিন্তু যখন হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে আঁচর দুলিয়ে সিঙ্গল করা মাথাটি টান ক'রে রাস্তায় হাঁটে আপনার বাবার সাধ্যি কি টের পান যে—'

শেষ টান দিয়ে ভাদুড়ী সিগারেটের জলন্ত টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভাদুড়ী ব্রাকেট থেকে তোয়ালে টেনে আনে। শিবনাথ একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। 'বড় হবে স্যার, না কেবল ছোট?'

প্রশ্নটা হঠাৎ বুঝতে পারল না শিবনাথ। ফ্যালফ্যাল ক'রে ভাদুড়ীর মুখের দিকে তাকায়।

'বলছি চুল দাড়ি দুটোই হবে, না কেবল দাড়ি?'

বড় ও ছোটর অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পেরে শিবনাথ মৃদু মন্দ হাসল। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, চুল ছাঁটতে সময় নেবে, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। কেবল দাড়িটা,—মুখটা ইয়ে করলেই এখনকার মত আজকের মত চলে।'

'সোজা হয়ে বসুন।' ব'লে গম্ভীর হয়ে তোয়ালেটা শিবনাথের বুকের ওপর বিছিয়ে দিয়ে ভাদুড়ী সাবান ব্রাশ রেজার আনতে আলমিরার কাছে সরে যায়। সেই ফাঁকে শিবনাথ জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতটা তখনি আবার তুলে আনল। তারপর সতর্কভাবে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'মানুষই মানুষের বড় শত্রু বুঝলেন স্যার, তারপর সেই মানুষ যদি এক পাড়ায় থাকে কি এক বাড়ির বাসিন্দা হয় তো কথাই নেই।' শিবনাথের গালে সাবান মাখাতে মাখাতে ভাদুড়ী বলল, 'হ্যাঁ, আমি কুকুরটার কথা বলছি! চোরাবাজারে ঘুরে পাঁচটা লোকের সর্বনাশ ক'রে আজ তুই দুটো পয়সা করেছিস, তাই না লম্বা চওড়া কথা মুখে লেগেই আছে। আমি? সৎপথে থেকে এক পয়সা রোজগার করি দু'পয়সা রোজগার করি আফসোস নেই। লোকের গলায় ছুরি বসাইনে, কি বলেন?'

গালে ক্ষুর উঠেছে তাই শিবনাথ মুখ নাড়তে পারলে না, কেবল 'হুঁ' শব্দ করল।

'কুত্তার বাচ্চা, আপনি শুনেছেন কি, আমার ওপর নোটিশ জারি করেছে, তার দোকানে ঢুকে চা খেতে পারব না।'

'কেন?' শিবনাথের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল।

'আমার সিফিলিস আছে, আমি বেশ্যাবাড়ি যাই, পাঁচটা ভদ্রালোক তার রেস্টুরেন্টে চা খায়, কাজেই পাঁচু ভাদুড়ীর সেখানে ঢোকা নিষেধ।'

একটা গাল শেষ ক'রে ভাদুড়ী শিবনাথের আর একটা গাল ধরল।

'তা আমিও এর শোধ তুলব, হ্যাঁ তুই যে জলের কুমির আমিও সেই ডাঙ্গার বাঘ। আমার নামে বদনাম দিস শালা। কিন্তু দিনের নাগাল কি পাব না। আমার বড়

ব্যামো আছে, কিন্তু তোর ? আমি যদি বলি তোর শালা গণোরিয়া আছে। ওর ছোট ছেলেটাকে দেখেছেন তো স্যার ? আড়াই বছর বয়স হয়েছে, দেখলে মনে হয় ছ' মাস ন' মাসের বেশি হবে না। পাকাটির মত হাত পা। শেখর ডাক্তার বলে দিয়েছে রমেশের বাচ্চার রিকেটি রোগ। তা রিকেটি তো এ বাড়ির আরো পাঁচটা ঘরের শিশুদের আছে মশাই, সে একটা কিছু না। রমেশের ছেলে জন্মান্ধ আপনি সে খোঁজ রাখেন ?'

শিবনাথ হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না। বাড়ির এতগুলো শিশুর মধ্যে একটি অন্ধ শিশু আছে কি না তাও সে এখন ঠিক মনে করতে পারছে না। হয়তো থাকবে। ভাল ক'রে সে লক্ষ্য করেনি।

'মশাই, ভাল জামা কাপড় পরে থাকলে কি হবে। পাপ ঢেকে রাখা যায় না। ঈশ্বর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। শেখর ডাক্তারের কাছ থেকে আমি আসল কথাটা বার করতে পারলাম না সেদিন, বললে না ও,—আর ও শালা ডাক্তারির জানেই বা কি! চিংড়িঘাটার সুকুমার ডাক্তারকে চেনেন ? চারটে টাইটেল আছে মশাই, আর কত বড় ডিস্পেন্সারী ওর মুন্সিবাজারে। হ্যাঁ, ওই সুকুমার ডাক্তারের কাছে চুপি চুপি গিয়েছিল রমেশ ছেলের চোখের চিকিৎসা করাতে। তা সুকুমারের কম্পাউণ্ডার ললিত হ'ল গিয়ে আমার খদ্দের। ললিত সেদিন এই আপনার চেয়ারে বসে দাড়ি কামাতে কামাতে বলে গেল গুহ্য কথাখানা। সুকুমার ডাক্তার নাকি স্রেফ বলে দিয়েছে রমেশকে তার গণোরিয়া আছে, গণোরিয়া রোগীর ছেলে জন্মান্ধ হয়।'

ক্ষুরটা এতক্ষণ গালে লাগানো ছিল বলে শিবনাথ পাঁচুর মুখ দেখতে পারেনি। ক্ষুর আলগা হতে এবার মুখ তুলল। নোংরা দাঁত বার করে পাঁচু হাসছে।

'পাপ কি আর ঢেকে রাখতে পারে কেউ, ও শালা আপনা থেকে বেরিয়ে পড়ে—হা-হা। ফরসা জামাকাপড় পরে থাকলে হবে কি ?'

'ফিট্‌কিরি আছে কি ?' শিবনাথ হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'তা থাকবে না, বলেন কি স্যার।' ভাদুড়ী হাতের ক্ষুর রেখে দিয়ে এতবড় একটা ফিটকিরির চাকা তুলে শিবনাথের মুখে জোরে জোরে ঘষতে লাগল। 'না, আমার এই সেলুনে আপনাদের কল্যাণে যত খদ্দের আসে সবাই ভদ্দরলোক,—বাজে লোকের মুখে আমি ক্ষুর লাগাইনে। বলা যায় কি কোন্ হারামজাদার কি ব্যামো আছে। শালার যত সিফিলিস আর এক্‌জিমার রোগী এ তল্লাটে গিসগিস করছে মশাই। তবু সাবধানের মার নেই। ভদ্দরলোকদেরও ফরসা জামাকাপড়ের নিচে কি ব্যাধি লুকোনো আছে কে জানে। রমেশ শালার মত আরো দু'দশজন থাকতে পারে বৈকি। আমি বাবা একবারের জায়গায় পাঁচবার তাই ক্ষুরখানা চামড়ায় ঘষে নিই, গরম জল দিয়ে ব্রাশ ধুই, একদিন অন্তর তুয়ালেগুলো ডাইংক্লিনিং থেকে সাফ করিয়ে আনি। আর এই দেখুন স্যার, কত ভাল স্নো আছে আমার সেলুনে। একটু স্নো দেব কি আপনার মুখে ?'

হাতের ফিটকিরি রেখে ভাদুড়ী স্নো-র কৌটো তুলে আনে। কৌটোর গায়ের লেবেলটায় চোখ বুলিয়ে শিবনাথ সন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় নাড়ল।

'তাই বলি, তোর দোকানে চা খাব দূরে থাক আমি পেচ্ছাব করতেও যাব না সেখানে, বেলেঘাটা ট্যাংরা চিংড়িঘাটায় কি আর চায়ের দোকান নেই। আর আমি দেখে নেবো তুই কোন্ সেলুনে ঢুকে চুল কাটিস দাড়ি কামাস। আমি রাষ্ট্র করে দেব, এ তল্লাটের সবগুলো হাতুড়ে নাপিতকেও বলে দেব রমেশের সিফিলিস আছে—'

'হল ?' যেন এতক্ষণ পর শিবনাথ উসখুস করছিল। 'আমাকে এক্ষুণি আবার একটা কাজে—'

'হয়েছে, এই তো হয়ে গেল স্যার, চুলটা একটু ব্রাশ ক'রে দিই। আপনার চুলও বেজায় বড় হয়েছে।'

শিবনাথ কথা বলল না। ভাদুড়ী স্নো-র কৌটো রেখে শিবনাথের চুলে ব্রাশ বুলোতে লাগল। শিবনাথ এবার ঘাড় সোজা করে দেয়ালের আরশিতে নিজের পরিচ্ছন্ন মুখ দেখে খুশি হ'ল।

'হয়েছে স্যার।' ভাদুড়ী হাতের ব্রাশ সরিয়ে রাখল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শিবনাথ কি যেন বলতে ইতস্ততঃ করে।

'কি, বলুন, আর কিছু বলবার আছে স্যার, কেন জুল্‌পিজোড়া ঠিক ক'রে কাটিনি ?' ভাদুড়ী ঈষৎ হেসে বলল, 'চমৎকার দেখাচ্ছে মাইরি, কেন দেখাবে না, সুখী লোক আপনারা ভাল করে শেভ্ করলে মুখখানা ডিমের মত চকচকে হয়ে ওঠে!'

শিবনাথ অল্প হাসল এবং ইতস্ততঃ না ক'রে বলল, 'দামটা আজ থাকবে, কাল আমি ইদিকে আবাব যখন আসব—'

'ছি ছি ছি!' শিবনাথের কথা শেষ হতে দিলে না ভাদুড়ী। 'আমি কি বলেছি আপনাকে, এখনি আমার পাওনা মিটিয়ে দেন। লজ্জা দেবেন না স্যার। এক বাড়িতে আছি, এক ইঁদারার জল খাই। যখন খুশি, যেদিন খুশি, আপনার সুবিধে মতন দিয়ে যাবেন। আপনিও কিছু রাতারাতি পালিয়ে যাচ্ছেন না, আমিও আর কালই মরে যাব না—হা—হা'

হৃষ্টচিত্তে শিবনাথ 'উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুন' থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

ভাল লাগছিল না শিবনাথের এখানকার লোকগুলোকে। যেন কি এক অদ্ভুত কথা তারা তার কানে তুলে দিতে সারাক্ষণ গলা বাড়িয়ে আছে, যেন অদ্ভুত দক্ষতায় সঙ্গে তারা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, টেনে নিতে চাইছে নিজেদের মধ্যে, নিজেদের নোংরামি, কুশ্রীতা, বীভৎসতার গভীর পঙ্কে।

বনমালী, কে. গুপ্ত, বলাই, বিধু মাস্টার, রমেশ রায়, পাঁচু ভাদুড়ী।

প্রত্যেকটি চেহারা তার কাছে খারাপ লাগছে। যেভাবেই হোক, যে কারণেই হোক।

আর সেই জন্যই শিবনাথ চাইছিল তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরতে। আজ আরো বেশি খারাপ লাগছে সকালে রুচির কথার পর।

নৈহাটীতে দিদির কাছে চলে যাবে ও। কেন শিবনাথ এখানে পড়ে থাকবে এই টিনের ঘরে। পাঁচু ভাদুড়ী আর বলাই···আর—

জোরে পা চালাচ্ছিল শিবনাথ বাস্-স্ট্যাণ্ড ··· ক'রে, হঠাৎ তার ঘাড়ে কে হাত

রাখল। থমকে দাঁড়াল সে। সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে শেখর ডাক্তার।

'কোথায় চলেছেন?'

'কোলকাতায় যাব।'

'এখন? এই অবেলায়?'

রাগে বিরক্তিতে শিবনাথ হঠাৎ এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। ডাক্তারের মুখে বিড়ি। গায়ে একটা আলপাকার কোট। জামার রঙটা এককালে কালো ছিল। ক্রমাগত রোদে পুড়ে এখন ধূসর হয়ে গেছে। পায়ে কাপড়ের জুতো। জুতোর রঙ লাল কি বাদামি ছিল, এখন আর বোঝা যায় না। ধুলো ও কাদার পুরু পলেস্তারা ভেদ করে জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া চটের মতন এক একটি অংশ উঁকিঝুঁকি মারছিল। হাতে এতবড় একটা ফাইবারের সুটকেশ। গলায় স্টেথস্কোপ ঝুলছে।

শিবনাথ অন্য দিকে চোখ ফেরাতে চাইছিল, কিন্তু ডাক্তার তা হতে দিলে না।

'মশাই আছেন সুখে। বাঁধা মাইনের চাকরি। তার ওপর ছুটিছাটা ভোগ করছেন। ক'দিনের ছুটি? এখন কোন কাজে যাচ্ছেন শহরে, না সিনেমা-টিনেমা দেখবার ইচ্ছে?'

'এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব।' গম্ভীর হয়ে বলল শিবনাথ এবং জোর ক'রে চোখটা অন্য দিকে সরাতে চেষ্টা করল।

'গিন্নী গ্র্যাজুয়েট, তিনিও চাকরি করছেন। একটিমাত্র সন্তান। সত্যি আপনাকে দেখলে ঈর্ষা হয়।'

কথা বলল না শিবনাথ, কিন্তু বুঝল পাল্টা একটা দুটো প্রশ্ন না ক'রেও সে সেখান থেকে নড়তে পারবে না। তাই অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল: 'তারপর, কি খবর, কোথায় যাওয়া হয়েছিল ডাক্তারবাবুর?'

'পাগলাডাঙার ওধারে, একটা কলেরা কেস; বাঁচতেও পারে না-ও বাঁচতে পারে, কিন্তু আমি বার বার বলে এসেছি এ-অবস্থায় সেলাইন ইঞ্জেকশন চলবে না।'

শিবনাথ আকাশের দিকে তাকাল।

'এখনও ছিঁটে-ফোটা রকমের হচ্ছে, পাইকারীভাবে আরম্ভ হয়নি।' আর একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে ডাক্তার বলল, 'জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী,—ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে, জেনারেলি তা-ই হয়,—জলটা তখন পচতে আরম্ভ করে, মাছে পোকা হয়, কপিতে পোকা, বেগুনে পোকা,—খারাপ জল আর যাচ্ছেতাই খাদ্য থেকে এসব অসুখের সৃষ্টি, আপনারা শিক্ষিত মানুষ জানেন স্যার।'

'কর্পোরেশন থেকে কলেরা-ভ্যাকসিন দেবার ব্যবস্থা নেই এসব অঞ্চলে?' শিবনাথ ডাক্তারের চোখের ভিতরে তাকায়।

'কেন থাকবে না, খুব আছে,—তা আপনারা যতই ভ্যাকসিনের গুণকীর্তন করুন মশাই, আমরা হোমিওপ্যাথরা এসবের ওপর একটু কম আস্থা রাখি। কেন, টিকা নেবার পর কলেরা হ'চ্ছে এরকম ক'টা কেস আপনি জানতে চান। আর, এত বড় একটা ছুঁচ বিঁধিয়ে পোয়াটেক জল শরীরে ঢুকিয়ে তিনদিন বেদনায় হৈ-হৈ করে কাটাবার মতন অবস্থা আমার আপনার হয়তো আছে মশাই,—কিন্তু যাদের মোট

বইতে হয়, ঠেলাগাড়ি ঠেলতে হয়, রিক্‌শা টানতে হয়, করাত দিয়ে কাঠ চিরতে হয়, কপি ক্ষেতের মাটির চাকা ভাঙতে হয়, জাল টেনে মাছ ধরতে হয়, তামা-কাঁসা পিটতে হয় তাদের,—তারা কাজ করতে পারবে না ভয়ে পারতপক্ষে কলেরার ইঞ্জেকশন নিতে চায় না, কজেই—'

'আপনার রোগী বেশির ভাগ এরাই বুঝি ?'

যেন শিবনাথের প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে ধরে নিয়ে ডাক্তার চড়া গলায় বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার—এখন এরাই আমার রোগী। ভদ্দরলোকদের চিকিচ্ছে করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি, ভদ্দরলোকের চেয়ে জেলে ছুতোর কামার কুমোর ভাল, ক্যান্ ইউ বিলিভ, স্যার, এই চিংড়িঘাটা বেলেঘাটায় আমার দেড় হাজার টাকার ওপর ওষুধের দামই পাওনা পড়ে আছে, হ্যাঁ, আপনার আমার মতন জেণ্টেলম্যানরা খেয়েছেন, তাদের পরিবারের বাচ্চা-কাচ্চার অসুখ হলে ওষুধ নিয়ে যেয়ে খাইয়েছে।'

শিবনাথ কথা বলল না।

'সাধে কি আর মশাই এখান থেকে নড়ছি না। আমি নড়তে পারছি না। আমায় ধরে রেখেছেন আপনারা, অবশ্য আপনাকে আমি ঠিক মিন্ করছি না, এই আপনার মতন দি সো-কল্‌ড ভদ্দরলোক ক্লাস।' কথা শেষ ক'রে ডাক্তার হাসল এবং একটু থেমে থেকে পরে বলল, 'কিন্তু আমিও দেখে নোব, বকেয়া ওষুধের দাম, প্রেসক্রিপ-শনের ফি, ভিজিটের টাকা কি ক'রে আদায় করতে হয়,—'

'এটা অন্যায়, ডাক্তারের টাকা এভাবে ধরে রাখা'—সৌজন্যতার খাতিরে শিবনাথকে বলতে হ'ল, 'ঠিক না।'

'রাখুক, আমি এখন শব্দ করছি না।' ঘাড় নেড়ে স্টেথস্কোপ দুলিয়ে শেখর ডাক্তার বলল, 'মশাই, এক মাঘে শীত যায় না—ফর্টি নাইন ফাঁক গেছে, ফিফ্‌টিতে কিছু হয়নি, কিন্তু এবার ? হেঁ—হেঁ—থার্ড ইয়ার—'

কথাটা বুঝতে না পেরে শিবনাথ ফ্যালফ্যাল্ ক'রে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়।

দু'টো বছর আমরা চোখমুখ বুজে থাকি। তারপর তিন বছরের মাথায় আবার শুরু হয় এপিডেমিক। ও শালার ভ্যাক্‌সিন্ ফ্যাক্‌সিন কিছুতেই আটকাতে পারে না। নেচার,—নেচারকে কে ঠেকাতে পারে মশাই, বলুন! আর রোগ বাড়লে রোগী বাড়লে আমাদের সুবিধে বোঝেনই তো।'

'এটা বুঝি কলেরা ইয়ার ?' বিড় বিড় ক'রে শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, জানেন তো দেখছি, কাজেই—' অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে শেখর ডাক্তার, যেন অনেকটা নিজের মনে কথা বলল এবং দাঁতে দাঁত ঘষল, 'কাজেই আমিও এবার সব চাঁদিকে দেখে নোব—'

কাঠ-বোঝাই একটা লরি আসছিল। দুজন রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ায়। আবার একটা ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে। শিবনাথ নাকে রুমাল দেয়। শেখর ডাক্তার রুমাল দেয়া দূরে থাক মুখের হাঁ-টাকে যেন আরো বড় করে ধুলোর দিকে মেলে ধরে কি ভাবে।

'আচ্ছা, চলি, আমার একটু—'

শিবনাথ পা বাড়াতে চেষ্টা করতে ডাক্তার খপ্ ক'রে তার হাত চেপে ধরল।

'না, না, শুনুন, বেড়াতে বেরোচ্ছেন তো অত তাড়া কি,—আরও কথা আছে, আর একটা কথা বলব বলে আমি আপনাকে ক'দিন ধ'রে মনে মনে খুঁজছি।'

'আমি তো বাড়িতেই আছি।' বলতে চেষ্টা করেও শিবনাথ বলল না, চুপ ক'রে রইল। বড় অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

শেখর ডাক্তার আর এক পা সরে এসে শিবনাথের শরীর ঘেঁষে দাঁড়াল এবং বলাইর মত রমেশ রায়ের মত বিধু মাস্টার ও পাঁচু ভাদুড়ীর মত মুখটা শিবনাথের কানের মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা ক'রে বলল, "বিধু আমার ফ্রেন্ড; একসঙ্গে ওঠা-বসা গল্প করা সবই হচ্ছে, আপনারাও দেখছেন, কিন্তু উঃ কী জঘন্য ওর চরিত্র, মশাই বললে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

শিবনাথ নীরব। মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

'অ্যাঁ, আজ বলে আট আনা ধার দাও, কাল বলে একটা টাকা চাই, পরশু পাঁচ-সিকে দরকার—কিন্তু ফিরিয়ে দেবার নামটি নেই; আমি স্টপ করে দিয়েছি ওকে ধার দেওয়া। আর সেই রাগে সেই খেদে ও কি না আমার নামে এর-ওর কাছে দুর্নাম গেয়ে বেড়াচ্ছে।'

ডাক্তার সম্পর্কে সেদিন বিধুমাস্টার কি সব উক্তি করেছিল শিবনাথের মনে আছে। কিছু বলল না সে। চুপ ক'রে রইল।

'আমার চিকিচ্ছের পদ্ধতি ভাল না, আমার ওষুধে কারও কোন কাজ হয় না, আমি কলেরা ডিসেণ্ট্রির কেসগুলো খামকা হাতে নিই, আমার হাতে রোগী বাঁচে না, — কেবল এই সব, এ-ধরনের কথাবার্তা ফাঁক পেলেই ও এখন লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে অথচ বাইরের লোকে জানে,—বাড়ির লোক আপনারাও দেখছেন, আমার চেয়ে মাস্টারের বড় ফ্রেন্ড কেউ নেই, ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।'

'ভালই তো' শিবনাথ ডাক্তারকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল, 'ভবিষ্যতে মাস্টারের পরিবারের কারো যদি একটা কিছু অসুখ-বিসুখ হয় তখন আপনাকে ডাকলে আপনি —তা ছাড়া এটা যখন এপিডেমিক ইয়ার—' শিবনাথ এবার অল্প হাসতে চেষ্টা করল।

'অ, আপনি আমাকে সেই আশায় থাকতে বলছেন,—তবেই হয়েছে।' ডাক্তারও প্রচন্ড শব্দ ক'রে হেসে উঠল। 'মশাই, চারবার পক্স ছ'বার কলেরা এপিডেমিক হয়ে গেল এ-তল্লাটে। উহুঁ, ওই বিধু মাস্টারের ঝাঁক ঠিক আছে, একদিন একটাকে কলেরা দূরে থাক পেটের অসুখে ভুগতে দেখি না, পক্স হবে কি, খোস-পাঁচড়াটি হবার নাম নেই কারও মাস্টারের ঘরে।'

শিবনাথ এবারও না হেসে পারল না।

'কেন, ওদের সকলের স্বাস্থ্য খুব ভাল বুঝি?'

'আপনি তা বলতে পারেন, কিন্তু আমি একে বলি চাষাড়ে স্বাস্থ্য।' শেখর ডাক্তার মাথা নাড়ল। 'ভদ্দরলোকের ঘরে আবার অসুখবিসুখ থাকে না নাকি। কিন্তু এখানে আপনি তা পাবেন না। বিধুর কোন দিন মাথা ধরতে দেখি না মশাই, তেমনি

তাঁর স্ত্রী। একবেলা দাঁতের কন্‌কনানিতে ভুগছে আজ অবধি শুনলাম না। আর তেমনি হয়েছে ছেলেমেয়েগুলো,—খাচ্ছে তো স্রেফ মুলো আর ভেণ্ডি সেদ্ধ। শীতে মুলো বর্ষায় ভেণ্ডি।' একটু থেমে থেকে পর ডাক্তার বলল, 'অভাব অভাব করছে, তা অভাব ওর কী ক'রে যাবে। এত পরিবারের এত ছেলেমেয়ে এই ব্যারামে সেই ব্যারামে মরে, কিন্তু বিধুর ঝাঁক বাড়ছে ছাড়া কমছে না।' বলতে বলতে মুখটা হঠাৎ শিবনাথের কানের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে ডাক্তার ফিস্‌ফিস করে উঠল ঃ 'অ্যানাদার ওয়ান্ ইজ কামিং। মূর্খ, মূর্খ ছাড়া বিধুকে আমি আর কিছু বলি না। মশাই, বিজ্ঞানের যুগে এত ভাল ভাল ব্যবস্থা থাকতে আবার এসব কেন? বেশ তো আমায় বল্, আমি এক ডোজ ওষুধ দিই তোর পরিবারকে, দেখি কেমন,—কিন্তু, কাকে বলব মশাই, চোরের কাছে হরিনাম।' ডাক্তারের হাসির শব্দে কানে তালা লাগে। শিবনাথ লক্ষ্য করল এখন আর ঘূর্ণি হাওয়া নেই, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। অদূরে বাদামগাছের পাতাগুলো কাঁপছে, সূর্য হেলে পড়েছে অনেকখানি।

'আচ্ছা, চলি।' শিবনাথ আবার পা বাড়ায়। ডাক্তার এবার তার হাত ধরে না। কেবল ঘাড়টা ঘুরিয়ে টেনে টেনে হাসে। 'যাবেনই তো মশাই, আমি যাব আপনি যাবেন, সবাই যাবে, কেউ থাকতে আসিনি হা-হা, থেকে যাবে শুধু বিধু আর বিধুর ঝাঁক। জল আগুন মড়ক দুর্ভিক্ষ কিছুতেই ওদের কিছু করতে পারে না, কেবল বাড়ছেই বাড়ছে।'

শিবনাথ কিছু শুনল কিছু শুনল না, দ্রুত পা চালিয়ে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

পনের

সার্পেণ্টাইন লেনে একটা অন্ধকার কামরা ভাড়া নিয়ে শিবনাথের বন্ধু মোহিত কারবার আরম্ভ করেছিল। কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরি ক'রে পরে শ পাঁচশ হাজার করা হিসাবে সেগুলো এখানে ওখানে সাপ্লাই দেয়। বন্ধু হলেও শিবনাথ মোহিতের এই ব্যবসাটাকে খুব ভাল চোখে কোনদিন দেখেনি। বরং মনে মনে সে একটা নাক-সিঁটকানো ভাব পোষণ করত। দিনরাত পরিশ্রম ক'রে জুতো আর গেঞ্জির বাক্স তৈরী করা, তারপর রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কখনো রিক্সায় কখনো কুলির মাথায় চাপিয়ে সেগুলো বড়বাজারে, চীনাবাজারে নিয়ে যাওয়া, তারপর আবার মালের দাম আদায়ের জন্য হন্যে কুকুরের মত বগলে খাতা নিয়ে মহাজনদের দরজায় দরজায় ছুটোছুটি করা —শিবনাথ মনে মনে নাক-সিঁটকাতো এবং হাসত। নিজে যখন সে চাকরি করত, তখন তো বটেই, বেকার হবার পরও শিবনাথ মোহিতকে অনুকম্পা করা ছাড়া আর কিছু করত না। অবশ্য এদিকে অনেকদিন সার্পেণ্টাইন লেনে শিবনাথ পা বাড়ায়নি এবং মোহিতের কারবারের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে সে খোঁজ করারও প্রয়োজনবোধ করেনি। আজও সে করত না। বৌবাজার ক্রশ করার সময় মোহিত হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে শিবনাথের হাত চেপে ধরেছিল। শিবনাথ চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে প্রথম-

টায় মোহিতকে চিনতেই পারেনি। না পারার কারণ ছিল। মোহিতের মাথায় আর তৈলহীন রুক্ষ একবোঝা চুল গায়ে ময়লা খাকি হাফ্ শার্ট বা পায়ে মোটা চপ্পল ছিল না। সুন্দর চকচকে পাট করা চুল, ভাল ক'রে কামানো মসৃণ গাল, চাঁচা ঘাড়, সিল্কের পাঞ্জাবি, পেটেন্ট লেদার পাম্পশু, নরুণ-পাড় মিহি ধুতি, আঙুলে আংটি, মুখে সিগারেট এবং শিবনাথ লক্ষ্য করল মোহিতের পিছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় একটা ঝুড়ি। ঝুড়িতে সব্জি, ফল এবং আরো যেন কি কি, আর হাতে ঝুলছে এতবড় একটা মাছ।

'তারপর, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কি ?' মোহিত হাসে।

'তারপর, কি খবর, বাজারে গিয়েছিলে ?' শিবনাথ প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ।' মোহিত ঘাড় নাড়ে। 'বাজার-টাজার করার বড় একটা সময় পাইনে, আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল,—তা ছাড়া,' হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে মোহিত পিছনের লোকটিকে বলল, 'এই তুই চলে যা,—আমি—আমার ফিরতে একটু দেরি হবে।'

'চাকর ?'

'হুঁ।' মোহিত বন্ধুর হাত ধরে আকর্ষণ করে ঃ 'এসো।'

'বাসা কোথায় ?'

'স্কট লেন।'

'কারবার বুঝি সেই সার্পেন্টাইন লেনেই আছে।'

মোহিত বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

'না, তোমার সামনেই—সার্পেন্টাইন লেনের ঘরে কুলোচ্ছিল না। এসো।'

শিবনাথ মোহিতের সঙ্গে আরও কয়েক পা অগ্রসর হ'ল। ঠিক বড় রাস্তা না। একটু ভিতরের দিকে একটা বাড়ির সামনে এসে দু'জন দাঁড়ায়। শিবনাথ চোখ তুলে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড দেখতে পেল ঃ 'দি ইস্টার্ন কার্ড-বোর্ড বক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স।'

দরজার সামনে দুটো লরি দাঁড়ানো এবং দুটো গাড়িতেই পাহাড়ের মত উঁচু করে কাগজের বাক্স সাজানো রয়েছে।

'কারবার এখন বেশ বড় হয়েছে তোমার দেখতে পাচ্ছি।' অস্ফুটস্বরে বলল শিবনাথ।

'না, কোথায় আর বড়,—এসো।'

বন্ধুর হাত ধরে মোহিত সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটি ঘরে উঠে গেল।

'তোমার আফিস ঘর ?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, বসো।'

পর্দা, গালিচা, চেয়ার, টেবিল সাজানো সুন্দর ঘর। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য পেপারওয়েট, পিন-কুশন, অ্যাশট্রে এবং ফুলদানির মাঝখানে গোল্ডফ্লেকের হলদে টিন। ঈর্ষান্বিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে শিবনাথ দেখল এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তারপর, তোমার খবর কি, আছ কোথায় ?'

'এখানেই।' শিবনাথ বেলেঘাটার উল্লেখ করল না এবং তার সম্পর্কে বন্ধু আর

কোনো প্রশ্ন করতে না পারে তাই তাড়াতাড়ি শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'তারপর বাড়ির খবর কি, বাচ্চা-কাচ্চা ক'টি হল ?'

মোহিত হঠাৎ কথা বলল না। কেবল সিগারেটের টিনটা শিবনাথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে টেবিলের কাগজপত্রগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। শিবনাথ একটা সিগারেট তুলে ধরায়।

'চা খাবে ?'—মোহিত কাগজ থেকে মুখ তুলল।

অল্প হেসে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

মোহিত বেল্ টিপতে একজন বেয়ারা ছুটে এল। চায়ের কথা বলে দিয়ে যেন এবার বন্ধুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলতে মোহিত কাগজপত্রগুলো একদিকে সরিয়ে রেখে কৌটো থেকে সিগারেট তুলে মুখে গুঁজল।

'তারপর ? অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তুমি এখন কোন্ অফিসে ?'

শিবনাথ একটা মিথ্যা অফিসের নাম বলল এবং ঠোঁটের মৃদু হাসিটা না মুছে আস্তে আস্তে বলল, 'চাকরিতে সুখ নেই ব্রাদার, ব্যবসা,—বিজ্‌নেস ছাড়া দিনের নাগাল পাওয়া যায় না।'

মোহিত কথা বলল না।

শিবনাথ সন্তর্পণে প্রশ্ন করল, 'তারপর, গাড়িটাড়ি করেছ বুঝি ?'

'না-রে ভাই, না, না।' মোহিত প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। 'যতটা তোমরা ভাবছ—ততটা করতে পারিনি, কিছুই করা হয়নি।'

চা এল।

মোহিত বলল, 'হ্যাঁ' কি বলছিলে, বাচ্চা ? চা খাও।'

'কি, নিজের মনে হাসছ ?' বাটিতে চুমুক দিয়ে শিবনাথ মুখ তুলে মোহিতের চোখের ভিতরে তাকায়। 'বলতে লজ্জা করছে নাকি, আমার কিন্তু অই একটিই,—একটা মেয়ে।'

'আমার একটিও না।' মোহিত শিবনাথের চোখের ভিতরে তাকাল। শিবনাথ লক্ষ্য করল, মোহিত হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে।

'কেন', প্রশ্ন করতে করতে শিবনাথ থেমে গেল।

বাটিতে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে মোহিত একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল।

'একটি সন্তান হবে সেই সুযোগ আমাদের জীবনে এল না।'

শিবনাথ মোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'দুঃখ ভাল, বুঝলে ব্রাদার, যতদিন দুঃখে ছিলাম জীবন একরকম মন্দ ছিল না। বলে মোহিত অল্প হাসল।

'এখন সুখ পেয়ে কি অশান্তি হচ্ছে', প্রশ্নটা ঠোটের আগায় এনেও শিবনাথ চুপ করে রইল। মোহিত বলল,—'বরং যখন দরিদ্র ছিলাম, অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটত, আশা ছিল। তখন ইচ্ছা ক'রে সন্তান আনিনি। বার্লির জল খাইয়ে বাচ্চা মানুষ করার আইডিয়াকে আমরা বরাবর ঘৃণা করতুম।'

'আজ ?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'আজ সুখে থেকে সুখে খেয়ে বৌ অন্য রকম বুলি শিখেছে। আজ সে সন্তান চাইছে না, তার শরীর খারাপ হবে, চেহারা ভাঙ্গবে, সময়ের আগে বুড়িয়ে যাবে, এই দুর্ভাবনা।'

'কি চাইছে তবে?' এবার শিবনাথ মুখ না খুলে পারলে না।

'চাইছে শাড়ি গয়না জুতো ক্রিম পাউডার'—মোহিত হঠাৎ থামল।

'আর?' শিবনাথ হাসে।

মোহিত হাসে না।

'চাইছে, রোজ মাংস ভাত খেতে, আঙুর আপেল, ক্ষীর-ননী।'

শিবনাথ এবার কিছু প্রশ্ন না ক'রে টেনে টেনে হাসে।

'আর চাইছিল ঘরের এক ফোঁটা কাজকর্ম না-করতে', মোহিত বলল, 'দুটো চাকরে কুলোচ্ছিল না, আর একটা চাকর রেখে দিয়েছিলাম ইদানীং শ্রীমতীর জন্যে।'

মোহিতের গলার স্বর শুনে শিবনাথ চমকে উঠল।

মোহিত স্বরটাকে তেমনি বিকৃত করে বলল, 'প্রচুর সময় প্রচুর অবসর চাওয়ার অবশ্য কারণ ছিল তার। যথেষ্ট সময় না পেলে এবং যখন খুশি বাইরে বেরোতে না পারলে ইচ্ছামতন প্রেমসাগরে সাঁতার কাটা যায় না, সাদা কথাটা আশা করি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

চেয়ারের হাতল দুটো শিবনাথ শক্ত হাতে চেপে ধরল এবং হাঁ-করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মোহিত নতুন সিগারেট ধরালো। একটু সময় চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'কাজেই বাচ্চার বাপ হওয়া আমার আর হ'ল না।'

'এখন', ঢোক গিলে শিবনাথ কি যেন বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই মোহিত বলল, 'সাঁতার-কাটা এদিকে খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাই সেদিন মায়াকে আমি বুঝিয়ে বললাম, 'এটাকে স্বামী-স্ত্রীর জীবন বলে না। বেশতো, রাত দুটোর আগে তোমার যদি ঘরে ফেরার সম্ভব না হয় তো তুমি আলাদা থাক। আমার আপত্তি নেই। বরং তখন কোনো রাত্রে ঘরে ফেরা যদি সম্ভব না-ও হয় আর একজনের কাছে জবাবদিহি করার হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবে।'

এবার শিবনাথ অল্প হেসে প্রশ্ন করল, 'তাতে তিনি কি বললেন, তোমার স্ত্রী?'

'রাজী হ'ল। মায়া আর এখন আমার সঙ্গে নেই তো। পার্ক-সার্কাস না কোথায় আছে ঠিক বলতে পারব না,—অর্থাৎ পা বাড়িয়েই ছিল, কেবল আমার একটা কথা, একটু বলার অপেক্ষা। ব্যাস, যেদিন বললাম তার পরদিনই ও তার জিনিস-পত্তর নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল শিবনাথ।

প্রসঙ্গ শেষ ক'রে মোহিত যে খুব একটা গম্ভীর বিমর্ষ চেহারা ক'রে চুপ ক'রে রইল তা না। বেশ একটু উৎফুল্ল গলায় পরে বলল, 'জল যেদিকে গড়াবার সেদিকে গড়াতে দিয়ে আমিও শান্তিতে আছি ব্রাদার।'

'তুমি এখন'…শিবনাথ বলতে ইতস্ততঃ করল।

'আমিও এখন আর একটিকে নিয়ে আছি, রক্ষিতা,—হ্যাঁ, তা-ই বলব, বলতে আমার লজ্জা করে না। কেন করবো বলো, দুঃখ ভুলতে কেউ যখন মদ খেতে আরম্ভ করে, তখন কি আর সে একথা ভেবে লজ্জা পায়, না ভয় করে যে, লোকে তার মুখের গন্ধ টের পাবে? এ-ও তেমনি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুরা, এখানে আমরা কর্মচারীরাও জানে মোহিত রায় একটা বেশ্যাকে নিয়ে আছে। বাঁচতে হলে একটা নেশার দরকার, কি বল?' মোহিত শব্দ ক'রে হাসল।

শিবনাথ নীরব।

একজন, খুব সম্ভব কর্মচারী, কি একটা কাগজ হাতে ক'রে মোহিতের সামনে এসে দাঁড়াল। কাগজটায় মোহিত সই ক'রে দিতে লোকটি আবার বেরিয়ে গেল। আকাশের আলোর জোর কমে গেছে, জানালায় চোখ পড়তে শিবনাথ টের পেল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সে লক্ষ্য করল বেয়ারা ঘরে ঢুকে সুইচ্ টিপে আলো জেলে দিলে।

'তারপর, কোন্‌দিকে যাচ্ছিলে?' মোহিত চোখ তুলল।

'এই এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।' শিবনাথ টিন থেকে আর একটা সিগারেট তুলল।

সিগারেট ধরিয়ে শিবনাথ কি যেন একটু চিন্তা করল। বস্তুতঃ নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এত সব ব'লে এবং এখন সে কিভাবে জীবন যাপন করছে তা-ও বন্ধুর কাছে সগর্বে ঘোষণা ক'রে এমন মোহিত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, শিবনাথ কথাটা বলতে আর ইতস্ততঃ বোধ করছিল না। এমন কি বর্তমানে যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে টিনের ঘরে বাস করছে এবং বেশ অর্থকষ্টের মধ্যে আছে বন্ধুর কাছে এটা আর গোপন না করলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না। তার চেয়ে মোহিতের দুঃখ অনেক বেশি, মনের অবস্থা তার আরও খারাপ শিবনাথ অনুমান করতে পারল। কিন্তু তবু আর একবার চিন্তা করে শিবনাথ সে সমস্ত কথা একেবারে চেপে গেল। বরং হেসে অন্যভাবে সে বন্ধুকে বিষয়টা খুলে বলল।

শুনে মোহিত ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বার করল।

'তা, এতক্ষণ বলনি কেন, প্রথমেই তো তোমার দরকারী কথাটা বলা উচিত ছিল। ছি ছি,—আজেবাজে এতগুলো কথা ব'লে খামকা আমি তোমার সময় নষ্ট করলাম, কি মুশকিল! তা এখন তোমার স্ত্রী আছেন কেমন?'

'এখন একটু ভাল। শ' দুই টাকা এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে। ওষুধ ইঞ্জেক্‌শন ফাঁক যাচ্ছে না! তারপর পথ্য, এটা-ওটা।'

'তা তো যাবে। 'মোহিত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'অসুখটা কি বললে?'

'বিকলাই ইনফেক্‌শন ডাক্তার বলছে।' শিবনাথ দেয়ালের দিকে চোখ ফেরায়। একটু থেমে থেকে পরে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'বুঝতে পারছ, আমাদের চাকুরে জীবন। একেবারে ধরা-বাঁধা মাইনে,—তার ওপর কি না হঠাৎ এই খরচের ধাক্কা—'

মোহিত কথা না কয়ে মনিব্যাগ খুলে গুণে গুণে পাঁচটা দশ টাকার নোট বার

করে টেবিলে রাখল।

শিবনাথ কথা না কয়ে হাত বাড়িয়ে নোটগুলো তুলে তৎক্ষণাৎ ভাঁজ করে পকেটে পুরল।

একটু পর আস্তে আস্তে বলল, 'সামনের মাসে হয়তো পারব না। তার পরের মাসে আমি টাকাটা তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি, ব্রাদার।'

'আমি কি বলছি তোমাকে যে, পরের মাসেই আমার টাকাটা চাই। কি আশ্চর্য!' মোহিত দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। 'সামান্য পঞ্চাশটা টাকা তোমার এই বিপদে যদি সাহায্য করতে না পারলাম তো—'

'না না, সেকথা বলছি না'; অভিমানাহত বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল শিবনাথ। 'তুমি পার, তোমার ক্ষমতা আছে বলে আর কারোর কাছে না চেয়ে তোমার কাছেই তো চাইলাম।'

মোহিত নীরব।

'আচ্ছা, উঠি আজ। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।' শিবনাথ উঠে দাঁড়াল।

ডাক্তারের কি নাম, কোথায় ধাম, সেসব প্রশ্ন করার তিলমাত্র আগ্রহ মোহিতের চেহারায় না দেখে শিবনাথ আরাম পেল। 'চলি'। আর একবার বললে সে।

মোহিত কথা না কয়ে শুধু ঘাড়টা কাত করল এবং তেমনি বাঁদিকের দেয়ালে চোখ রেখে কি যেন ভাবতে লাগল।

মোহিত কি ভাবছে চিন্তা ক'রে শিবনাথ অবশ্য মাথা খারাপ করল না। কী আর ভাববে। যে যার ভাবনায় অস্থির। নিজের অবস্থার কথাই চিন্তা করছে মোহিত। ভাবতে ভাবতে হৃষ্টমনে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বৌবাজারের পেভমেণ্টে এসে দাঁড়াল। এই ধরনের একটা ভাবনায় মোহিত ডুবে আছে দেখেই তো শিবনাথ হুট্ করে তার কাছে পঞ্চাশটা টাকা চাইতে পারল। কথাটা চিন্তা ক'রে শিবনাথ নিজের মনে হাসল। অবশ্য রুচির কাছে এসব কিছুই বলবে না, সে মনে মনে ঠিক ক'রে রাখল।

না, বলবে,—শিবনাথ ভাবল, মোহিতের গল্পটা রুচির কাছে বলার প্রয়োজন আছে। প্রচুর টাকা-পয়সা সচ্ছল দিনের মুখ যখন দেখতে শুরু করেছিল বেচারা, আর এক দিক থেকে চাপ চাপ অন্ধকার, স্তূপাকারে মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল জীবন, সুখ-শান্তি। টিনের ঘরে থাকতে পারছে না রুচি, মনের ভার কাটছে না, যেহেতু শিবনাথের চাকরি নেই। চাকরি, টাকা, ধন-দৌলত…'

কিন্তু কী তার দাম, কতটা তার আশ্বাস, অথবা শিবনাথ চিন্তা করল, ঘরে টাকাপয়সা না থাকলে রাত্রে চোখে ঘুম আসে না, টাকাপয়সা থেকে মোহিত কত ঘুমোতে পারছে!

ঘুমোচ্ছে বই কি! শিবনাথ আবার নিজের মনে হাসল। মেয়েটা দেখতে মোহিতের স্ত্রীর চেয়ে ভাল না কুৎসিত, জানতে একবার ইচ্ছা হয় বৈকি শিবনাথের। মোহিত দুঃখ ভুলতে মদ ধরেছে। মেয়ে-মদ। দুঃখ ভুলতে আর কে মদ ধরেছে, বেলেঘাটার বাসে বসে চিন্তা করতে করতে শিবনাথের কে. গুপ্তর চেহারাটা মনে

পড়ল। বেচারা! মনে মনে অনুকম্পা করল সে লোকটাকে। তা তো বটেই। ওরা কে. গুপ্ত, বলাই, বিধু মাস্টার, অমল চাকলাদার শত মাথা খুঁড়লেও কারো কাছ থেকে একটা আধলা কর্জ আনতে পারবে না। বেশভূষা ছাড়াও ওদের এক একজনের চেহারার মধ্যেই এমন দৈন্যের ছাপ রয়েছে যে, একটা আধলা দিয়ে কেউ তাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে ক'রে শিবনাথ প্রত্যেকটি চেহারা স্বতন্ত্রভাবে মনের সামনে আনতে চেষ্টা করল, আর ভিড়ের মধ্যেও চেষ্টা ক'রে কষ্টেসৃষ্টে সে গাড়ির সামনের দিকে টাঙানো বড় আরশিটার মধ্যে নিজের মুখখানা দেখল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন মসৃণ মুখমণ্ডল। পাঁচু ভাদুড়ী যত্ন করে কামিয়ে দিয়েছে। কত অভিজাত, কত ভদ্র এই চেহারা! না হলে শিবনাথ অত্যন্ত গর্ববোধ করল ভেবে, একবার, একটিবার মুখ থেকে কথাটা বার করতে মোহিত আজ এতগুলো টাকা তার হাতে তুলে দিয়েছে! কাজেই একটা সুবিধা হচ্ছে না ব'লে রুচি যতই রাগারাগি করুক, অভিমান করুক, শিবনাথ নিরাশ হবে না, হয়নি। হলে সে আর বিধু মাস্টারের মধ্যে তফাত থাকত কোথায়! চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে নারিকেলডাঙ্গার ট্যুইশানিটা সে তাহলে নিতে পারত। একটা মাস কুকুরের মত খাটলে তবে কুড়িটা টাকা। শিবনাথ সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল।

ষোল

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই আগুন দেখল এবং নানারকম গল্প করল।

প্রথমটায় 'আগুন' 'আগুন' শুনে সবাই চমকে ওঠে। বুঝি বা নিজের গায়ে আগুন লাগল, ঘরে, পাশের ঘরে, না, তা-ও না, পাশের বস্তিতে। ছুটোছুটি ঠেলা-ঠেলি ক'রে যে-যার ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে, এক লাফে উঠোন পার হয়ে রাস্তায়, রাস্তা ডিঙিয়ে বনমালীর দোকান লাগোয়া পোড়ো জমিতে, জাম গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায় সব। দেখে নিশ্চিন্ত হল। বেশ দূরে, ডোম পাড়ায় আগুন। একটা ঘর শেষ হয়ে আর একটা এইমাত্র ভাল ক'রে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। ফরসা হয়ে গেছে চারদিক।

'রাত্রির আগুন সুন্দর দেখায়।'

'আগুন একটু দূরে থেকে দেখতেই ভাল। আকাশে যেন কে কুঙ্কুম ছড়িয়েছে।'

কে. গুপ্ত অল্প হেসে ঘাড়টা তেরচা ক'রে শিবনাথের দিকে চোখ রেখে বলল, 'আপনার মধ্যে দেখছি মশাই বিস্তর কবিত্ব, কি ব্যাপার, কবিতা-টবিতা লেখার অভ্যেস আছে নাকি?'

'না।' শিবনাথ হেসে বলল, 'অনেক আগে ছেলেবেলায় লিখতুম। তারপর বুঝতেই পারছেন, চাকরির ঘানিতে পড়ে সব গেছে—'

কে. গুপ্ত আগুন দেখতে ঘাড় ফেরায় এবং তৎক্ষণাৎ, যেন অনেকটা নিজের মনে আবৃত্তি করল ঃ

'The wild fingers of fier are making corruption clean....'

কে. গুপ্ত থামতে, ওপাশে ছিল বিধু মাস্টার, বলল, 'লরেন্স বিনিয়নের লেখা। আমরাও পড়েছি, আমাদের সময়েও সিলেক্‌শনে ছিল।'

কথা বলল না কেউ। কে. গুপ্ত, শিবনাথ, শিবনাথের পাশে বলাই, বনমালী, বনমালীর ওপাশে শেখর ডাক্তার, রমেশ রায়, অমল চাকলাদার, ক্ষিতীশ।

এখানে অনেকেই ইংরাজী কবিতার দু' লাইনের মানেটি বুঝতে পারেনি অনুমান ক'রে বিধু মাস্টার হেসে বলল, 'যা কিছু খারাপ, কুৎসিত,—আগুনে তা খেয়ে সাফ করে দিলে।' তর্জমা ক'রে চুপ করে রইল।

'ডোমেদের তুমি খারাপ কুৎসিত বলছ কোন্‌ হিসাবে?' বেশ বিরক্ত হয়ে শেখর ডাক্তার প্রশ্ন করল। 'আগে একথার উত্তর দায় তো শুনি?'

'ওরা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল খায়', রমেশ রায় এখানে কোনো কোনো ভাড়াটেকে ঠেস দিয়ে কথাটা বলছে কিনা বোঝা গেল না। বলেই চুপ ক'রে রইল।

'হ্যাঁ, ওরা ডেইলি মাছ খায়, মাংস খায়।' একটি যুবক বলল, 'এবং ফুর্তি-টুর্তি এখনো ওদের মধ্যে আছে। বিয়ের সময়, পুজোর সময় সাত আট রাত গান গেয়েই জেগে কাটায়। আমরা পারি না।'

'না, অমি ওদের এই যেমন থাকাটা নিয়ে বলছিলাম। প্রত্যেকটা ঘর ভেঙে চুরে যাচ্ছিল, পুরনো হয়ে গেছল খুব। আশেপাশে নোংরাও জমছিল বিস্তর। কেউ তো আর ওদের দিকে তাকায় না। এখন যদি নতুন করে ভাল ঘর-টর ওঠে, দেখতে আগের চেয়ে ভাল হবে। সেটাই আমার বক্তব্য।'

'হেঁ হেঁ, নোংরা বলছেন, কুৎসিত বলছেন মশাই, ওই যে-ঘরটা এখন আরো বেশি দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলছে সেই ঘরেই একটা মেয়ে কাঞ্চি নাম। সকালবেলা আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে কাঞ্চি বাজারে যায়। দেখেছেন তার শরীর, চলা বলা, হাঁটার কায়দা? আমার তো মনে হয়, আমাদের ভদ্রলোকদের ঘরে এমন চমৎকার মেয়ে কম আছে।'

'আপনি কি করাপশনের কথা বলছেন নাকি? আমাদের ভদ্রলোক বাবুদের ঘরে যত কেলেংকারী হচ্ছে মশাই, ওদের জাতের মধ্যে তার ছটাকও দেখা দেয়নি।'

চারদিক থেকে এভাবে আক্রান্ত হ'ল বিধু মাস্টার। যেন আগে বুঝতে পারেনি। কথাটা বলে ফেলেই চুপ করে ছিল যদিও।

মাস্টারের মনের অবস্থাটা উপভোগ করতে করতে শিবনাথ মেয়েদের দিকে তাকায়। মনে মনে সে রুচিকে খুঁজছিল:

যদি হতিমধ্যে মঞ্জুকে নিয়ে ফিরে এসে গিয়ে থাকে। এটাও ভাবছিল।

এখানে সেই রকম কাউকে দেখতে না পেয়ে শিবনাথ নিশ্চিন্ত হ'ল। জানে সে কোনো কোনো দিন রুচির, যদি কিছু জিনিসপত্তর কেনা-কাটা করার থাকে ফিরতে বেশ রাতই হয়।

আজ অবশ্য রুচি কি নিয়ে ফিরতে পারে সেটা অনুমান করতে পারল না শিবনাথ। তাতেই যা একটু অস্বস্তি বোধ ক'রে নালাটা ডিঙ্গিয়ে সে রাস্তায় উঠে এল। কেউ কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে। দুটি মেয়ে। একবার আগুনটা বেশ বড়

হয়ে উঠতে জলপাইপাতার চিকরি-কাটা ছায়া-পড়া মুখ দু'টো চকিতে শিবনাথ দেখে থমকে দাঁড়ালো।

ওরা ঠিক আগুন নিয়ে গল্প করেছে কি না জানবার ইচ্ছাটাই যেন শিবনাথের প্রবল। তাই সে আর না হেঁটে দাঁড়াল। সিগারেটের ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও সিগারেট ধরাল না। একটা গাছের আড়ালে ছিল সে।

'তারপর? কি বললেন তিনি? আমায় পরিষ্কার করে সব বল।'

'প্রথম দিনই আমায় জুতো ও শাড়ি কিনতে টাকা দিলেন। এই একগোছা নোট। আমার ভীষণ লজ্জা করছিল নিতে।'

'লজ্জা করলে চলবে না। বড়লোক মানুষ। বয়সও বিশেষ হয়নি। রুচি ও মেজাজে ক্ষুরের ধার। তার বাড়িতে সর্বদা যাওয়া-আসা করছ। সারাটা দুপুর সেখানে থাকতে হচ্ছে, একটু ভালভাবে, ফিটফাট না থাকলে চলবে না।'

চুপ করে রইল সেই মেয়েটি।

'চাকরিটা যে তোমার আজই হয়েছে, সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।'

বয়োজ্যেষ্ঠা বলল, 'ক'দিন ধরে আমায় বলছ কাজ দাও, কাজ দাও, তা জানো তো অফিসে-আদালতে ঘোরার সময় আমার নেই। তাছাড়া হাসপাতালে আট ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে তারপর আর কোথাও যাবার ইচ্ছা ও ধৈর্য থাকে না। শেয়ালদায় ভাগ্যিস শিশিরবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, কাজেই তোমার কাজটি আজকেই হয়ে গেল।'

'উনি বুঝি শিশিরবাবুর বন্ধু?'

'হ্যাঁ, মিহিরবাবু, নাম মিহির ঘোষাল।'

'অই একটি ছেলেই বুঝি ভদ্রলোকের?'

'হ্যাঁ।'

'আর বিয়ে করবেন না?'

'জানি না।'

ছোট মেয়েটি একটু চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'অবশ্য, তিনি বললেন, আমি যতক্ষণ তাঁর বাড়িতে থাকব, তিনি বাড়িতে থাকছেন না। কাজে বেরিয়ে যান।'

'বোকা মেয়ে।' বড় মেয়েটি বলল, 'বাড়িতে থাকতে পারছেন না বলেই তো তোমায় তাঁর ঘর আলগাতে বলা!'

'ছেলেটির কি অসুখ?'

'অসুখ হবে কেন। ঘরে মা নেই। ছোট শিশু। সারা দুপুর ছেলে রাখতে হবে। তাছাড়া তাঁর মতে ঝি-চাকর দিয়ে শিশু বড় করা যায় না। তুমি সারাদিন তাঁর বাড়িতে থেকে বেবিকে দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, গল্প বলা, ছড়া কাটা, সময়মত চান-টি করানো, গা-টি মোছানো, এসব করবে। পাউডার, তেল যখন যেটি মাখাবার দরকার মাখাবে। এ-ই কাজ। বলেনি তোকে?'

'হ্যাঁ, আর বললেন, টুটুল ঘুমিয়ে পড়লে তখন তুমি খুশি মতন আলমারি থেকে

বই বেছে নিয়ে পড়তে পার, গান-বাজনার শখ থাকলে এবং টুটুলের ঘুম ভাঙতে পারে ভয় করলে আমার বৈঠকখানায় গিয়ে সেতার, এসরাজও একটু-আধটু বাজাতে পারো। সেতার, এসরাজ দুটোই তাঁর বাড়িতে আছে।'

'হ্যাঁ, খুব শৌখীন লোক ছিলেন এককালে। আর কি বললেন?'

'বললেন, তিনটের পর বাগানে ছায়া পড়ে। যদি ঘরে থাকতে ভাল না লাগে, টুটুলকে নিয়ে তুমি বাগানে বিকেলটা সেখানে ব'সে কাটাতে পারবে। এ-বাড়িতে আমার বাগানটা সব চাইতে নাইস।'

বড় মেয়েটি কিছু বলল না।

ছোট রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

'কি কি করতে হবে যখন বুঝিয়ে দিলেন, বলতে কি আমার একটু সাহস হল, কমলাদি। প্রথমটায় ঘাবড়ে গেছলাম তোমার মুখে শুনে। শিশিরবাবুর এক বন্ধু একটি ইয়ং নার্স চাইছেন। কার আবার অসুখ।'

'নার্স, নার্সিং বলতে অনেক রকমের কাজ বোঝায় যদিও।' কমলা বলল, 'যদি রোগীর জন্যে নার্স চাইতো তো সেখানে আর তোমায় দিয়ে চলত না। পাশ না করলে সে সব চাকরি করা যায় না। তোমার ভাগ্য ভাল যে, হঠাৎ এ ধরনের একটা কাজ পেয়ে গেছে। মাইনেও বেশ ভাল।'

'পৃথিবীতে কত রকমের কাজ আছে, তাই ভাবি।' বীথি অল্প হাসল। এবং আগুনটা আবার একটা ঝলক দিয়ে উঠতে কমলার কানের লাল রিং জ্বলজ্বল ক'রে উঠতে দেখা গেল। পায়ে একটা মশা বসেছিল কিন্তু জুতোর শব্দ হতে পারে দুর্ভাবনায় শিবনাথ পা-টাও নাড়ল না, মুখ বুজে মশার কামড় সহ্য করে কথা শুনল।

'তা আমি অবশ্য মাকে এত সব কথা বলিনি। বলেছি, ভদ্দরলোকের বাড়িতে অফিস। তাঁর চিঠি-পত্র দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাইতো বলবে তুমি। তা-ই তোমাকে বলে দেওয়ার জন্যে শিশিরবাবুকে আমি পই পই করে বলে দিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে মাকে কি বলবে। বলে দেননি শিশিরবাবু?'

ছোট মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

'হ্যাঁ, আর একটা কথা, কাল শাড়ি-জুতোর টাকা পেলে, মা-কে তা বলে কাজ নেই। আমার কাছ থেকে ক'টা টাকা ধার করেছ বলবে। ভদ্দর লোকের বাড়িতে এই রকম বেশে যাওয়া যায় না, তাই জুতো ও একটা শাড়ি কিনেছো।

ছোট মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

'তারপর অবশ্য কবে আমার টাকা ফিরিয়ে দিলে কি না দিলে সে খোঁজ আর উনি করছেন না। কাজেই হুট্ করে কালই মাকে পোশাকের টাকা পাওয়া গেছে বলে লাভ নেই।'

বীথি মাথা নাড়ল।

'তা-ই আমি মাকে বলেছি।'

'আর শোন।' কমলা বোঝাল, 'মাস গেলে মাইনেটা পেয়েই ব্যাঙ্কে একটা একাউণ্ট খুলে ফেল।'

বীথি ঘাড় নাড়ল।

'যত টাকাই তুমি সংসারে সাহায্য করবে, সবই লাগবে। দুটো পয়সা আমার তো মনে হয়, প্রত্যেক মেয়েরই হাতে রাখা উচিত।' একটু থেমে কমলা বলল, 'তোমাদের যা রাবুনে গোষ্ঠী, কিছু বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'বকুলের একাউণ্ট আছে ব্যাঙ্কে?'

'জানি না।' আবার একটু চুপ করে থেকে কমলা বলল, 'বকুলের কথা ছেড়ে দাও। দশ দিক থেকে ওর রোজগার যেমন, একলা নিজের জন্যে ও দশ হাতে খরচও করে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, শুনেছি অনেক শাড়ি-জুতো ওর।' বীথি বলল, 'ওদের সংসার ছোট— আমাদের মত এতগুলো ভাই-বোন তো নেই।' বলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বীথি পরে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, কমলাদি, শুনলাম সেদিন, বকুলদি নাকি বার-এ যায়?'

'জানি না।' গম্ভীর থেকে কমলা আগুন দেখতে লাগল। অল্প বাতাসে জলপাই-পাতা নড়ছিল।

'আগুনটা এবার পড়েছে', বীথি বলল। একটু চুপ থেকে পরে প্রশ্ন করল, 'বার্ কথাটার ঠিক মানে কি কমলাদি?'

'শুঁড়িখানা। ইংরেজিতে বার্ বলে। বাবুরা বসে মদ খায় সেখানে।'

'ইস্ বকুলদিটা কি বিশ্রী!'

বীথির জিহ্বা ও ঠোঁটের অস্পষ্ট শব্দ হয় একটা।

'কে বিশ্রী, কে সুশ্রী তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।' কমলা মুখে রুমাল বুলিয়ে বলল, 'হ্যা, আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি। এখন থেকে দুটো পয়সা হাতাবে বলে কথায় কথায় সিনেমায় যাওয়া, রেস্টুরেণ্টে খাওয়া এসব করবে না।'

'না, রেস্টুরেণ্টে খাওয়া এমনি আমার পছন্দ হয় না।' বীথি মৃদু হাসল।

'বলছি এজন্যে, এতেও কম পয়সা নষ্ট হয় না।'

'সত্যি', বীথি বলল, 'বাজে খরচ।'

'বরং এই পয়সা দিয়ে নিজের জন্যে বাড়িতে আলাদা করে একটু দুধ রেখে খাও, একটু মাখন খাও।'

'হ্যাঁ ওতে শরীর ভাল থাকে।' বীথি ঘাড় নাড়ল।

'স্বাস্থ্য!' কমলা বলল, 'বকুলের আর যা দোষ থাক না কেন, স্বাস্থ্যটি চমৎকার— শরীরের দিকে ওর ভয়ানক নজর, এইজন্যে মেয়েটাকে ভাল ল্যাগ।'

'হ্যাঁ, সেজেগুজে যখন বেরোয়, ভারি সুন্দর লাগে দেখতে।'

'কেননা, বকুল জেনেছে, স্বাস্থ্যই মেয়েদের বড় সম্পদ, অস্ত্র, যে-মেয়ের শরীর সুন্দর না, তার মেয়ে-জন্ম বৃথা।' কথার শেষে কমলা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল এবং যেন অনেকটা নিজের মনেই শেষ দিকের কথাটা বলল। আগুন নিভে গেছে।

বীথি পরে কি বলছিল শোনা গেল না। কেননা, দমকলগুলো তখন ফিরে যাচ্ছে। যেন তিন-চারটা। একসঙ্গে আবার ঘণ্টা বাজছে জোরে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল বলে শিবনাথ মেয়ে দু'টিকে আর দেখতে পেল না।

ভিন্ন পাড়ায় আগুন দেখে হাল্কা হয়ে সব ঘরে ফিরছিল। কেউ কেউ গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। হাসছিল। খাওয়ার কথা বলছিল। রান্নার কথা। কেউ আধখানা রান্না নামিয়ে ঘর থেকে ছুটে বাইরে গিয়েছিল আগুন দেখতে। আগুন দেখা শেষ হতে এখন আবার রান্নার কথা ভাবছে এবং বাড়ি ফেরার পথে কাউকে না কাউকে বলছে সে কথা। কিন্তু কলরবে কথা পরিষ্কার বোঝা গেল না। আবার কেউ কেউ ঘুম, বিছানা, মশারি খাটানো, ছারপোকার গল্প করছে। কি ছেলে ঘুম-পাড়ানোর কথা। খাওয়া ও ঘুম নেই দলে এমন লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু তারাও চুপ করে ছিল না। পেটে আগুন জ্বলছে বলে তাদের মাথা গরম। আর মাথা গরম থাকলে আবোল-তাবোল যা মুখ দিয়ে আসে, তাই তারা বলে ফেলছিল।

পরশু রাত্রে ঠিক এমন সময় সরকার ঘর-ভাড়ার তাড়া দিয়ে গেছে। সময়টা মনে পড়তে দাঁত কিড়মিড়ে সুরে কে যেন বলছিল, 'শালার এখানে কবে আগুন লাগবে। বারোটা ঘর এক সাথে পুড়ে সাফ হবে সেদিন—'

তৎক্ষণাৎ আর একজনের গলার স্বর চড়ে গেল বলে বাকি কথাগুলো বোঝা গেল না।

'কেন, মূল জায়গাটায় আগুন দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কি, দালান পোড়ানো যায় না। খুব যায়—কিন্তু আমাদের মধ্যে একতা কোথায়। না হলে দু' ঘণ্টায় পারিজাতের বাড়ি, বাগান, গ্যারেজ, গাড়ির মায় কর্পোরেশনের পিলার ঘেঁষে যে দেওয়ালটা তা-ও পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া যায়—কিন্তু—'

অমল চাকলাদারের আক্ষেপের সুর শোনা গেল। অমলের একটু পিছনেই ছিল বলে শিবনাথ গলাটা চিনল।

'পারিজাতের জমির একটা ঘাসের ডগায় আগুন দেবার ক্ষমতা নেই হে তোমার, খামকা কেন তড়পাচ্ছ।'

পাশেই ছিল বলে রমেশ রায়ের মোটা গলায় ধমকানি শিবনাথের কানে যেন বাড়ি মারল।

'বুঝলেন তো, রমেশ রায়ের রাগ কেন অমলের ওপর—' ফিসফিস করে বনমালী শিবনাথকে বলল।

'হ্যাঁ। পারিজাতের গেঞ্জির কারখানা, অমলের বৌ।' সংক্ষেপে শিবনাথ উত্তর করল। বনমালী গুজগুজ করে হাসল।

একটু দূরে বিধুমাস্টার কি বলছিল শোনা গেল না। কিন্তু শেখর ডাক্তারের কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হল না।

'ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়েছিলে তো। যদি চুরি হয় তো আগুন দেখার শখ বেরিয়ে যাবে।'

বিধু মাস্টারকে না, স্ত্রীকে প্রশ্ন করছিল ডাক্তার। প্রভাতকণা দশজনকে শুনিয়ে বেশ উঁচু গলায় বলছিল, 'না গো না, তোমার মত আমি কাঁচা ছেলে নই, তোমার মত কাছা ছাড়া লোক হলেই হয়েছিল আর কি। দুদিন পরে যে-মা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে —বলি রাজ্যের কলেরা রুগী হাটকে এসে তুমি ভাল করে হাত-পা ধুয়েছ তো, না কি অমনি—

কল্ থেকে এইমাত্র ফিরেছে শেখর। হাতে সেই ফাইবারের মস্ত বড় সুটকেস। কালো কোট গায়ে, তাই রবারের কালো নলটা দেখা যাচ্ছিল না। পাকুড় গাছের নিচে গ্যাসের আলো লেগে স্টেথস্কোপের সাদা মুখটা একবার ঝিকিয়ে উঠছিল।

'শালার এতদূরে ছুটোছুটি আর ভাল লাগে না,—রাত ক'টা বাজে, সুনীতির খাওয়া হয়েছে?'

কিন্তু সেকথার উত্তর না দিয়ে প্রভাতকণা হাসল, 'ও, তুমি চাইছ পাড়ায় কেন কলেরা লাগে না। পৌষ গেল, মাঘ যাচ্ছে, বাড়িতে আগুন কই?'

'তোমার মত কাঁচা মেয়ে নই আমি গিন্নী, যে ঘুঁটের আগুনে হাত পোড়াব; শালার এ-বাড়িতে যদি এশিয়াটিক কলেরার জার্ম ও ঢোকে তো পেটের অসুখ ছাড়া আর কিছু করাতে পারবে না। না খেয়ে এক একটি পেট এমন চিমসে মেরে গেছে—হা—হা—আর, পেটের অসুখ হলে এ-বাড়ির লোকে ক'দাগ ওষুধ খায়, আর খেয়ে কত তার দাম দেয়, তোমায় কি আমার বলে দিতে হবে। এ-বাড়ির ব্যারামের চিকিচ্ছে করতে আমি ডাক্তারি বিদ্যা শিখিনি।'

তার উত্তরে প্রভাতকণা কি বলল, শোনা গেল না। শোনা যাচ্ছিল পাঁচু ভাদুড়ীর গলা। প্রচুর খেয়ে এবং টেনে এসেছে পাঁচু। এবং এখন বাড়িতে গিয়ে নাক ডেকে প্রচুর ঘুমোবে, তাই রসবোধটা ওর সকলের চেয়ে বেশি হয়েছে বোঝা গেল। 'পকেটে চিংড়ি মাছ নিয়ে এলে ডোমপাড়ার আগুনে দিব্যি সেঁকে সেঁকে মুখে ফেলা যেত হা হা—আরে দাদা, যুদ্ধের আমলে আমেরিকান সৈন্যগুলোকে দেখতুম পেণ্টালুনের পকেটে ডিমের বড়া নিয়ে ঘুরত। শালারা সেলুনে বসে দাড়ি কামাতে কামাতে ডিমের বড়া ভেঙে মুখে দিত হা—হা—'

একটু ছাওয়া দিয়েছে তখন। মাথার ওপর গাছের পাতার সর্ সর্ শব্দ হয়। সবাই বাড়িতে ঢুকেছে। শিবনাথ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল। কেননা, রুচি ফেরেনি। ঘরে গিয়ে একলা কি করবে ভাবছিল, এমন সময় হাতের ওপর চাপ অনুভব করল। 'কে?' চমকে শিবনাথ ঘাড় ফেরায়। কে. গুপ্ত। 'কি ব্যাপার?'

'না কিছু না।' শিবনাথ সংক্ষেপে উত্তর করল।

'গিন্নী বুঝি ঘরে ফেরেন নি'

'না।'

'মশাই, এই তো সন্ধ্যে, আসুন একটু আড্ডা দেওয়া যাক।'

'বনমালী কি আজ দোকান খুলবে?'

'খুলবে না মানে!' কে. গুপ্ত খুক্ করে হাসল। 'অই দেখুন অলরেডি খুলে বসেছে। আগুন দেখতে গিয়ে একটু সময় তো বন্ধ রেখেছিল। আসুন।'

চোখ তুলে শিবনাথ দেখন দোকানের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। সামনের বেঞ্চটা খালি। না, খালি নয়। কে একজন যেন বসে আছে।

'চারু। আমার ফ্রেন্ড চারু রায়।'

'হঠাৎ?'

হ্যাঁ, ক্যামেরা নিয়ে ছুটে এসেছিল ফায়ারের ছবি তুলতে। স্টক শট্ নিয়ে রাখছে। ওর বইয়ের একটা দৃশ্যে আগুন আছে বলছিল। মায়া-কানন। নামটা মনে আছে?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'কি করে খবর পেলে?' বিস্মিত হয়ে শিবনাথ প্রশ্ন করলে, 'ও তো থাকে অনেক দূরে।'

'তাতে কি, তার জন্যে কি।' কে. গুপ্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'মাছি, কোথায় কার খড়ের চালায় আগুন লেগেছে, কোন্ যুবতীর অঙ্গে রূপের আগুন জ্বলছে টের পেয়ে তা ক্যামেরায় ধরতে ছুটে আসে। ওদের খবর দিতে হয় না।'

শিবনাথ চুপ।

কে· গুপ্ত মোটেই আস্তে কথা বলছিল না। বেশ চড়া গলা। আশে পাশে আর লোক ছিল না। তাই রক্ষা।

'আমাদের কিরণের ছবিও ও অমনি তুলে ফেলেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি? মাথার কাপড় ছিল না। খোঁপাটা ভেঙে সারা পিঠে চুল ছড়িয়ে পড়েছিল। সুপুরি গাছের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিধু মাস্টারের মেয়েদের সঙ্গে আগুন দেখছিল; আগুনের আভায় মুখটা গোলাপের মত হয়ে উঠেছিল। আমি তো মশাই আগুন যত না দেখেছি, অমল চাকলাদারের বৌকে দেখেছি তার চার ডবল। আপনি কি টের পাননি?'

'না।' শিবনাথ সংক্ষেপে বলল।

কে. গুপ্তকে সে খুব বেশি দোষ দিতে পারল না। বস্তুতঃ ডোমপাড়া পুড়ে যখন ছাই হয়ে যাচ্ছিল, তখন সে-ও কি ভিড় থেকে সরে গিয়ে চোরের মত জলপাই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়েকে দেখছিল না! ওদের কথাও শুনেছে।

সুতরাং কে. গুপ্তর এই কথাটার ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ না করে সে বরং ভাবছিল, চারু ক্যামেরার মুখটা আর কার দিকে ঘুরিয়েছিল।

এই আগুন এবং দর্শকদের ছবিতে রুচি থাকবে না দেখে শিবনাথ মনে মনে খুশি হল বৈকি।

শিবনাথ খুশি গলায় প্রশ্ন করল, 'তা আপনার বন্ধুর মায়া-কানন কবেতক রিলিজড হচ্ছে। সপরিবারে আমরা এ-ছবি দেখতে যাব কিন্তু।'

কে. গুপ্ত কথা বলল না।

সতেরো

একসঙ্গে হঠাৎ পঞ্চাশটা টাকা পেলে সবাই এদিনে খুশি হয়। রুচি বলল, 'যাক, সামনের মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত। কিন্তু একমাসই। কাজেই এর মধ্যে চেষ্টাচরিত্র ক'রে যাহোক একটা কিছুতে লেগে পড়ো। আর একটু ভাল করে ঘোরাঘুরি কর তুমি। এখানে এক মুহূর্ত আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

ভীষণ কাঁদছিল দশ নম্বর ঘরের কিরণ। তার তলপেটে লাথি মেরেছে অমল। মাথার কাপড় ফেলে অমন আলুথালু চুলে এলোপাথাড়ি অন্ধকারে ও ছুটে গিয়েছিল কার 'পারমিট' নিয়ে কাল রাত্রে ডোমপাড়ার আগুন দেখতে। আগুনের চেয়েও লম্বা 'জিভ' বার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-একজন কিরণের রূপ-যৌবন চাটছিল, তা কি সে টের পায়নি ? অমলের চোখে কিছুই এড়ায় নি ! ইত্যাদি—

তারপর আবার দুপদাপ শব্দ।

'বৌটাকে মেরে ফেলবে।' বলছিল কেউ কেউ।

রুচির খাওয়া হয়ে গেছে। স্কুলে যাবে। মঞ্জুও যাবে সঙ্গে। কাপড়-জামা পরা হয়ে গেছে।

এমন সময় ভীষণ কান্না।

শিবনাথ খাওয়া সেরে সবে সিগারেট ধরিয়েছে।

কিরণ ! কিন্তু পাশের ঘরে হিরণের ওপর নির্যাতন কম হচ্ছিল না ! বেশ জোরে জোরে কাঁদছিল। ঘর খোলা ফেলে গিয়েছিল আগুন দেখতে। বড় কাঁসার থালাটা চুরি গেছে। রাগ করে বিমল কাজে যায়নি। সেই সকাল থেকে স্ত্রীকে বকছে। থালার শোকে অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে। সব চোর-ছেঁচড়ের বাস এ-বাড়িতে, নবাবজাদী কি কথাটা ভুলে গিয়েছিল ? বিমল ফিরেছিল অনেক রাত্রে ওভারটাইম খেটে। এর অনেক আগেই আগুন নিভে গিয়েছিল। কাজেই হিরণ ঘরে ফিরে এসেছিল বলে বিমল টের পায়নি, কেমন করে তার ঘরে এই সর্বনাশটা হয়ে গেল। আজ সকালে জেরা করে জেনেছে !

এ বাজারে এমন একখানা থালার দাম ষোল সতেরো টাকা। এটা বিমলের পিতৃদত্ত সম্পত্তি। বিমলের সাধ্য নেই, এই রোজগারে আর এই বাজারে এমন একখানা থালা কেনে। বিমল এই থালায় করে পচা চিংড়ি, ট্যাংরা খায়। কিন্তু তার বাবা খেয়ে গেছে বাউসের পেটি, রুইয়ের মুড়ো। ছোটলোকের ঘর থেকে যে-মেয়ে এসেছে, সেই মেয়ে এই থালার মর্যাদা বুঝবে কি। তাই তো ঘর খোলা ফেলে রেখে গেল, আর থালাটা চোরে নিয়ে গেল।

লক্ষ্মীমণির ঘরেও আগুন জ্বলছিল এবং কাল আগুন দেখতে যাওয়ার ফলেই হয়েছে এটা।

বিকালে একটা বার্লির কৌটো কিনে এনেছিল বিধু মাস্টার। সেটা আজ পড়ে থাকতে দেখা গেছে বাইরের নর্দমায়। কে নিল, কে চুরি করল। না, মানুষে নেয়নি ওটা। কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে। দেখেছে হিরুর মা। ডোমপাড়ার আগুন

দেখা শেষ করে সকলের আগে হিরুর মা-ই বাড়ি ফিরছিল ও কুকুরটাকে একটা বার্লি'র কৌটো মুখে করে নিয়ে যেতে দেখেছিল। অর্থাৎ আগুন দেখতে যাওয়ার তাড়াহুড়োয় বারান্দার উনুনের ধার থেকে সরিয়ে কৌটোটা আর ঘরে রেখে যাওয়া হয়নি। টিনের মুখ কেটে একবার মাত্র বার্লি জ্বাল দেওয়া হয়েছিল।

হাতে আজ একটা পয়সা নেই। আবার সে বার্লি কিনে আনে কি দিয়ে। ধারে কিছু আনবে না, বিধু পরশু প্রতিজ্ঞা করেছে।

সকাল থেকে কিছু না খেয়ে কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করছিল, আর বারান্দায় একটা জলচৌকির ওপর বসে বিধু মাস্টার চীৎকার করছিল। একমাস পর আবার যে হাসপাতালে যাবে, সেই স্ত্রীলোকের এত রঙ্গরস কেন. নেচে আগুন দেখতে যাওয়ার বল সে কোথায় পায়। না, অন্ধকারে নর্দমায় কি গাছের গুঁড়িতে ঠোকর খেয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে abortion হয়ে মরত বলে মাস্টার দুঃখ করত না, করছে না। দুঃখ তার একটিন বার্লির জন্য। চামেলীর মার কাছ থেকে টুাইশন-ফি'র এডভান্স হিসাবে দুটো টাকা চেয়ে এনে, খুচরো বার্লি'র পয়সা দিতে দিতে হয়রান হয়ে যাচ্ছিল বলে একটা টিন কিনে আনল। সেই টিনের এ অবস্থা। নর্দমা থেকে ধাঙ্গড়কে দিয়ে ওটা তোলা হয়। কিন্তু ঘরে আনা হল না। ধাঙ্গড়টা নিয়ে গেল। তার বৌয়ের নতুন বাচ্চা হয়েছে। হেসে সবাইকে কথাটা শুনিয়ে বার্লি'র কৌটো গামছায় বেঁধে ফেলল। প্রিয়জনের শ্মশান-যাত্রা দেখে মানুষ যেমন হাউ হাউ করে ওঠে. তেমনি দিশাহারা হয়ে মাস্টার চীৎকার করে উঠোন কাঁপিয়ে তুলল। 'এসব স্ত্রীলোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে হয়, পিঠে কাঠের চেলা ভাঙতে হয়। ত্রয়োদশবার যে-রমণীর পেট ফুলেছে, তার আক্কেল না থাকলে মুশকিলের কথা।'

সাধু-অসাধু ভাষার সংমিশ্রণে মাস্টার স্ত্রীকে অনর্গল বকছিল।

আর আগুন জ্বলছিল চার নম্বর আর ন' নম্বর ঘরে। ডাক্তারের স্ত্রী প্রভাতকণা আর প্রীতি-বীথির মা'র ঝগড়া। দুটো জিহ্বা দিয়ে যে কত আগুন ঝরছিল, তা বাড়ির উঠোনটা টের পেল। মাছি বিজ বিজ করছিল উঠোনে, বারান্দায়, দরজায় থামের গায়ে। দুজনের চীৎকারে হুংকারে মাছিগুলো ভয় পেয়ে চঞ্চল হয়ে উড়তে শুরু করেছিল।

ইলিশ মাছ আনা হয়েছিল সকালে বীথিদের ঘরে। একটা বিড়াল হঠাৎ একটা ভাজা মাছ মুখে করে তাড়া খেতে খেতে গিয়ে ঢুকেছিল প্রভাতকণার ঘরে। বাস্, তাই থেকে প্রলয় কাণ্ড। প্রভাতকণা ছুটে এসেছিল বীথিদের ঘরের দরজায়। যদি সামলে না খেতে পারে, তবে লোকে এই 'বিষ্ঠা' খায় কেন। বিড়ালের মুখে, কুকুরের মুখে এই 'পায়খানা' তুলে দিয়ে আর পাঁচটা মানুষের ঘর-দরজা নোংরা করতে দেওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে। অনর্গল বকছিল প্রভাতকণা। কাজেই বীথির মা'র ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। 'চোখ টাটাচ্ছে। আমার দুই মেয়ে চাকরি করছে, আমার ঘরে মাছটা, ডিমটা আসছে. হিংসায় পেট ফাটছে আবাগীদের। বিষ্ঠা! আমার ঘরের ইলিশ মাছ ভাজা হল বিষ্ঠা। বিষ্ঠা তোমরা খাও, তোমাদের চৌদ্দ-পুরুষে খায়।'

দুই মেয়ের চাকরির কথায় প্রভাতকণা অট্টহাস্য করে উঠল। তার কারণ প্রভাতকণার মামাতো ভাই সুধীর, কাল সন্ধায় বেড়াতে এসে বোনকে একটা রসালো খবর দিয়ে গেছে। এ-বাড়ির ঘটনা। সুধীর শ্যামবাজারে থাকে। এ বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া-আসা আছে। ভায়ের মুখে ঘটনাটি শুনে অবধি প্রভাতকণার জিহ্বা চুলবুল করছিল। কতক্ষণে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বীথির মা'র ঘরের দরজা মুখ করে খবরটা রাষ্ট্র করবে। যাতে সকলে জানে। প্রমথদের ধুমসি বিড়ালটা বীথিদের ঘর থেকে একটা মাছভাজা মুখে করে ওর ঘরে ঢুকতে প্রভাতকণা সুযোগ পেয়ে গেল। জিহ্বার চুলবুলি নিয়ে আর বসে রইল না।

একে ইলিশ মাছ, তার ওপর বারান্দায় উনুন। কাদের রান্না হচ্ছে বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রভাতকণা উঠোন থেকে এক লাফে উঠে গেল বীথিদের দরজায় এবং মাছভাজার মামলা নিয়ে বেশিক্ষণ তাকে লড়তে হল না।

দুই মেয়ের চাকরির কথা মা উচ্চারণ করতে প্রভাতকণা চোখ দুটোকে ডিমের বড়ার মতন গোল করে ফেলল।

'ভাগ্যিস্ আমরা খালপারে আছি। ন' মাসে ছ' মাসে কলকাতায় যাই। কি করে জানব, কোন্‌টি চাকরি করছে, কোন্‌টি রাস্তায় টো টো করছে।' ঘাড় ঘুরিয়ে প্রভাতকণা বিধু মাস্টারের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ানো লক্ষ্মীমণিকে দেখছিল। যেন নিজের ঘরের আগুন এখন কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা. পাশের ঘরের আগুন দেখতে চোখ মুছে মাস্টারগিন্নী এইমাত্র চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালো দরজার পাল্লা ধরে। অন্তঃস্বত্বা লক্ষ্মীমণি দরজার সবটা জুড়ে দাঁড়ায়।

এবং তার সঙ্গেই যেন কথা হচ্ছে, এভাবে গলার আওয়াজটা আরো চড়িয়ে ও রসিয়ে প্রভাতকণা বলল, 'শেয়ালদার চায়ের দোকানে আড্ডা মারছিল, দিদি! কমলা সঙ্গে ছিল। তা কমলা যেখানে কাণ্ডারিনী, ফল কি হয় বুঝতেই পার।'

ভাগ্যিস্ কমলা বাড়িতে ছিল না। তাই কথাগুলো সে শুনল না। কমলার ঘরের দরজার তালা! সকালে উঠে হাসপাতালে ডিউটি দিতে গেছে।

কমলার ঘর বন্ধ জেনে, নিশ্চিন্ত হয়ে প্রভাতকণা আর একগাল হেসে ফেলল, 'তা শ্রীকৃষ্ণও ছিল সেখানে। তিনজনের হাসির চোটে চায়ের দোকানের সামনে রাস্তার লোক চমকে উঠেছিল! আমার ভাই সুধীরও ছিল সেই রাস্তায়। রেস্টুরেণ্টে বসা গোপিনী দুটিকে দেখে সুধীরের কষ্ট হয়নি চিনতে। কাল বিকেলে সুধীর এসেছিল আপনি দেখেন নি। হ্যাঁ, আমার ভাই। শ্যামবাজারে থাকে। প্রায়ই তো সে আসে এ বাড়ি।'

লক্ষ্মীমণি ঘাড় নাড়ল কি নাড়ল না, বোঝা গেল না।

কিন্তু প্রভাতকণা চুপ থাকল না।

'কাল সুধীর বলে গেল ঘটনা। এই তো চাকরি করা। তার আবার অত ঢক্কানিনাদ, থু-থু।'

বীথিদের দরজায় থুথু ছিটোবার ভান করল প্রভাতকণা।

'তুমি একটু ভাল করে কথাবার্তা বলবে সুনীতির মা।' কথা বলার ধরন দেখে

রাগে দুঃখে ঠকঠক করে কাঁপছিল বীথির মা। মার পিছনে দাঁড়িয়ে বীথিও কথাগুলো শুনছিল।

লাল হয়ে উঠেছিল বীথি।

আর থাকতে না পেরে চীৎকার করে বলল, 'আপনি চুপ করুন, আপনি চুপ করুন। ভাল লাইনে কথা বলতে যদি না পারেন, এখান থেকে চলে যান। আমি চাকরি করি কি করি না, তা আপনার কাছে প্রমাণ দিতে চাই না। বেশতো, আসুক না কমলাদি। ওর নামে যা-তা বলা বার করে দেব।'

বীথির রাগ হচ্ছিল বেশি, কাল শেয়ালদা স্টেশনের রেস্টুরেণ্টে শিশিরবাবুর সঙ্গে বসে সে ও কমলা চা খেয়েছিল বটে, কেননা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার নতুন কাজের কথা বলার সুবিধা হচ্ছিল না। আর সেই শিশিরবাবুকে দেখে এসেই ডাক্তারের শালা সুধীরচন্দ্র এ-বাড়ি এসে এটার এই কদর্থ করেছে।

'হ্যাঁ, আমার মেয়ে চাকরি করবেই। সেইজন্য তার বাইরেও যেতে হবে। আমার স্বামী ডাক্তার না চোর যে, ওষুধের নামে জল খাইয়ে আর জলের ইঞ্জেকশন দিয়ে মানুষের পয়সা লুঠবে। তাহলে আমিও বীথির বিয়ে দিতাম।' রাগে বীথির মার চোখে জল এসে গেল।

'বিয়ে হবে না, ছাই হবে। ওই যে মামাটি আসে, ওই সুধীর মামাই কাল— ছোঃ, আজ তিন বচ্ছর তো শুনছি, সুনীতির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে —হচ্ছে না কেন, বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে কোন্ দিক থেকে কথাটা কি এক-আধ দিন ভেবে দেখেছেন সুনীতির মা?' পিছন থেকে প্রীতি কথা কয়ে উঠল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ঝগড়া শোনার পর সে এই প্রথম মুখ খুলল।

প্রীতির কথা শেষ হতে ওপাশের ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো লক্ষীমণির ঠোঁটে একটা বেশ বড় রকমের মোচড় দেখা গেল।

দেখে প্রভাতকণা আগুন হয়ে উঠল। হিংসুক, হিংসায় তোমাদের পেট ফাটছে প্রীতি-বীথি। তাই তো এসব বাজে কথা বলছ। আমার মেয়ের বিয়ে হবেই। তোমাদের নাকের ওপর দিয়ে বরের হাত ধরে এই নবকপুরী ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই ফাল্গুনেই। গয়না গড়ানোর বড় কাজটি সারা হয়েছে।'

বলে আর সেখানে না দাঁড়িয়ে পায়ের দুপ-দাপ শব্দ করে উঠোন ডিঙিয়ে প্রভাতকণা নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রীতি-বীথি একসঙ্গে হেসে উঠে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি-করল। বীথি ফিস-ফিস করে বলল, 'জব্দ, এ্যাদ্দিনে খুব জব্দ হয়েছে ডাক্তারগিন্নী, আর মেয়ের বিয়ের দেমাক দেখাতে আসবে না আমাদের দরজায়।'

প্রীতি, যেন রুদ্ধশ্বাসে ঝগড়াটা বসিয়ে দিতে পেরে খুশি হয়েছে, এখন নিশ্বাস ফলে বলল, 'হওয়া উচিত, আমরা বাইরে ঘুরছি বলে আমরাই খারাপ, আর তোমরা তোমাদের মেয়েরা ঘরে থাকছ বলে সোনা-মুক্তা। দেখিস, এই সুধীর মামাটি খাবে, শেষ করবে সুনীতিকে। মেয়ের বিয়ের আহ্লাদ বেরোচ্ছে ডাক্তারনীর শীগ্‌গিরই।'

এ-কথায় বীথি সরাসরি কিছু বলল না মা আর দিদির সামনে। পাশের ঘরের

লক্ষ্মীমণির মত ঠোঁটে মোচড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বস্তুতঃ ঘর থেকে এসব কদর্য ঝগড়া শুনতে হবে ভয় পেয়ে সময়ের একটু আগেই রুচি মঞ্জুর হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে স্কুলে চলে গেছে। যাবার সময় শিবনাথকে বলে গেল—যেন বাড়িতে ঘুমিয়ে বা বসে এগারো ঘরের 'কেচ্ছা' শুনে সময় না কাটিয়ে শিবনাথ বেরিয়ে যায়। ঘোরাঘুরি করলে অন্য দু-একটা ট্যুইশানির খবর পাওয়া যেতে পারে।

আজ উপদেশটা ঠাণ্ডা রকমের ছিল। তাই 'ট্যুইশানির' কথায় ততটা ঠোঁট বাঁকা না করে মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল শিবনাথ। অর্থাৎ যা করবার, যেটি করবার উপযুক্ত লাইন সে মনে মনে বাছচে, সেটি যতক্ষণ না হবে এবং হওয়ার পর স্ত্রীকে এসে সরবে ঘোষণা না করতে পারবে, তার আগে মাষ্টারি কি ট্যুইশানি করব না বলে ঝগড়া বাধানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন বুঝতে পেরে শিবনাথ শিষ্ট ছেলের মত রুচির কথায় কেবল সায় দিয়ে গেল।

রুচি চলে যাবার পর আরো একটা আস্ত সিগারেট সে টেটে টেনে শেষ করল, আর ডাক্তারগিন্নী ও প্রীথি-বীথির ঝগড়াটা উপভোগ করল। কমলার এ সময়ে বাড়িতে উপস্থিত থাকাটা বাঞ্ছনীয় ছিল ; মনে মনে বলল শিবনাথ এবং যখন ডোমদের ঘর জ্বলছিল, কাল রাত্রে জলপাই গাছের অন্ধকারে দাঁড়ানো দুটি মেয়ের গল্প মনে পড়ে এখন আরো বেশি করে দাঁড়িয়ে সে বীথিকে দেখতে লাগল। মনে হয় বীথি এখন কাজে বেরোবে। পুরনো কিন্তু ফরসা একখানা শাদা জমির শাড়ি পঁরনে। কালো পাড়। জুতোটা বেশি পুরনো বলে মুচিকে দিয়ে কালি বুলানোর পরও কেমন নিষ্প্রভ থেকে গেছে।

এই শাড়ি এবং জুতো কাল আর থাকছে না অবশ্য, শিবনাথ মনে মনে বলল এবং আর বেশিক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে অন্যের ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকাটা অশোভন হবে চিন্তা করে ভিতরে চলে এল, পায়চারি করল একটু সময়, তারপর কি ভেবে গায়ে জামা চড়িয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আঠারো

দু'চার দিনের আলাপেই শিবনাথ রমেশ রায়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল। এবং কথা-বার্তা বলে বুঝতে পারল আসলে লোকটি খারাপ না। কর্মঠ, মিতব্যয়ী এবং ভবিষ্যৎ-দর্শী। এককথায় সাবধানী লোক।

লোকে রমেশ রায়কে 'চামার' বলে কারণ সে সিনেমা দেখে না, মদ খায় না, সিগারেট ছোঁয় না। নানাভাবে পয়সা রোজগার করে এবং লোকটা নীরস।

'আমার কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, বুঝলেন মশাই, শত্রুরা তাই ঠাওরে নিয়ে রাতদিন দুর্নাম গাইছে।'

শত্রু কারা শিবনাথকে প্রশ্ন করতে হল না। রমেশ রায় আঙ্গুলের মাথা ধরে ধরে তাদের নাম বলে গেল। 'পাঁচু ভাদুড়ী, বিলু মাস্টার, ডাক্তার—কে আমার

শত্রু না মশাই। বলে বেড়াচ্ছে আমি রায় সাহেবের দালাল। আরে শালা, তোরা যে এ কথাটা বলিস, পারিজাত এক মাস আমার ঘরভাড়া মাফ্‌ দিয়েছে তোরা বলতে পারিস ?'

টেবিলের ওপর জোরে কিল বসিয়ে রমেশ রাগ প্রকাশ করল।

'আমি আমার নিজের চেষ্টায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দাঁড়িয়েছি। আমি কি মাথা বিক্রি করে দেবার পাত্র রায় সাহেব, তস্য পুত্র পারিজাত, বা তস্য মহিষী দীপ্তি রায়ের কাছে ? বলুন তো ?'

কিছু না বলে শিবনাথ হাঁ করে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রমেশ ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, কর্তারা মাঝে মাঝে ডাকেন, এস্টেটের কোথাও গণ্ডগোল বাধলে ডাকিয়ে দুটো একটা কথা বলেন। চুপ করে শুনি। কখনো যদি বুঝি 'কাজটা' করা ভাল, করতে বলি। ভাল না দেখলে নিষেধ করি। এবং দেখা গেছে আমার কথামত কাজ করে রায় সাহেব, রায় সাহেবের ছেলে লাভবান হয়েছে। গোড়ায় আমাকে দিয়ে উপকার পেয়েছে বলে এখন আর ছাড়তে চাইছে না, সব কাজে আমার ডাক, সব বিষয়ে রমেশের পরামর্শ।'

একটু থেমে রমেশ বলল, 'চিংড়িঘাটার মোড়ে বরফ-কলটা বসাবার কথা আমি বলেছিলাম, দেখুন সেই কারখানায় আজ বছরে কত টাকা লাভ হচ্ছে। তাই তো বলছিলাম মশাই, রাজা জমিদার আমার কথা শোনে, তোরা পরামর্শ নিবি কেন। আমার কথা শুনলে আজ অমলের এই দুরবস্থা হত কি, একবার চিন্তা করে দেখুন।'

'তা তো বটেই।' গম্ভীর হয়ে শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'ছেলেটা একটু কেমন যেন জেদী একরোখা।'

'বেরিয়ে যাবে কাল সকালে জেদ।' রমেশ গলার একটা শব্দ করল।

'কাল বুঝি—

তার আগেই রমেশ বলে শেষ করল, 'দারোয়ান পাঠিয়ে পারিজাত ঘর থেকে জিনিস পত্তর টেনে বার করে অমলকে ওঠাবে। বিকেলে দশ নম্বরে নতুন ভাড়াটে আসছে।

শিবনাথ কথা না বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'ইচ্ছা ছিল কিছু টাকা দিয়ে আপাততঃ সরকারকে বুঝিয়ে বলব, থাক এখন তুলে কাজ নেই, এই দুঃসময়ে কোথায় গিয়ে বেচারা আবার ঘর খুঁজবে, তাও অনেক টাকার ধাক্কা। বরং এখানকার ভাড়াটা আস্তে আস্তে ও দিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু মশাই—।' রমেশ একটু থামল, থেমে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু কোন্‌ ভরসায় ওর হয়ে বাড়িভাড়ার টাকা দিতে যাব ?'

'তা তো ঠিকই।' শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'তোর চাকরি নেই, অথচ বৌয়ের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। ও আর বলতে হত না। রাত দিন মেয়ে নিচ্ছে এখন গেঞ্জির কলে। বাড়ির কাছেই ছিল। আর রাজ্যের মেয়ে এসে ঢুকছে। তোর বৌয়ের চেয়ে ঢের শিক্ষিত ভাল ভাল ঘরের মেয়েরা সব আসছে। কি করবে মশাই, পেট তো আগে।'

অল্প হেসে শিবনাথ বলল, 'কনজারভেটিভ অর্থাৎ গোঁড়া মন। শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশে অমলের সংখ্যা আজও বেশি।'

'আমার তো মশাই, যখন আপনার স্ত্রী কাজে বেরোয়, দেখে এত আনন্দ লাগে।'

'ও হয়ে যাবে।' হাসিটাকে না নিভিয়ে শিবনাথ বলল, 'যত দেশ শিক্ষিত হবে, এই সব আপত্তি বাধা ভয় কমতে থাকবে। আগের তুলনায় এখন ঢের বেশি মেয়েরা বাইরে বেরোচ্ছে, কাজ নিচ্ছে।'

'এখন ঘর বলে ঘর, গাছতলায়ও তোমার জায়গা হবে না, আর গাছতলায় থাকলেও বা খাবে কি—পেটের আগুন তো সতীত্ব শোনে না।' কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রমেশ বলতে লাগল, 'আমার চায়ের দোকানের পাওনা কুড়ি টাকা, আমি আগে উশুল করব দেখবেন কাল সকালে। দারোয়ান এসে জিনিসপত্তর টেনে বার করার আগে আমি অমলের ঘরে ঢুকে থালাটা, গ্লাসটা, কড়াই ডেকচি হাতা খুন্তি যা হাতের কাছে পাওয়া যায় নিয়ে নেব। আর, আছেই বা কী ছাই ওর ঘরে। সব মিলিয়ে কুড়ি টাকার সাগ্রী হবে না, গিন্নী কাল আমায় বলছিল। আমি তো বেশি-ক্ষণ ঘরে থাকি না, মেয়েছেলেরাই টের পায় পাশের ঘরে কি খায়, আর সেই খাওয়া কলাপাতায় সারে কি রুপোর বাসনে। আমার তো মনে হয় এলুমিনিয়ামের দু-এক-খানা বাসন ছাড়া আর কিছু নেই। তামা কাঁসা পাব না।'

শিবনাথ রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তা আপনি একবার দেখা করুন। বেশ ভাল লোক। কথায় বলে চাটে পাট। বড় মানুষের সঙ্গে রাখা ভাল।'

অর্থাৎ এতক্ষণ পর রমেশ শিবনাথকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল। শিবনাথ একবার গিয়ে পারিজাতের সঙ্গে দেখা করুক। ভাল লোক। তা ছাড়া কারবারী জমিদার ওরা। অনেক কিছুর ওপর হাত রাখে, অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। হয়তো খুব সহজেই শিবনাথের একটা সুবিধা করে দিতে পারবে।

শিবনাথ মৃদু ঘাড় নাড়ল।

না, রমেশ আজ বিকেলে চায়ের দোকানে ডেকে এনে শিবনাথকে উপদেশ দিচ্ছে বলে তার রাগ হ'ল না, তার দুঃখ একটু লজ্জাই করছিল। এখানে আসতে না আসতে যে ক'দিনের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, প্রায় সবাই শুনল নিবনাথ বেকার। এবং এটা হয়েছে রুচির জন্য। আজ স্ত্রী সন্তুষ্ট পঞ্চাশটা টাকা হাতে তুলে দেওয়াতে।

কাল। কাল সকালের ব্যাপারটা খারাপ হয়েছে। ও-মাসে তোমার সুবিধা না হলে আমি চলে যাব দিদির কাছে।' রুচি রাগের বশে কথাগুলো বেশ জোরে বলেছিল। কত জোরে বলেছিল শিবনাথ খেয়াল করেনি, এখন বুঝছে।

'আমার তো জানবার কথা নয়। কাল রাত্রে আগুন দেখে ঘরে ফিরে গিন্নী বলছিল। বারো নম্বর ঘরের ভদ্রলোকের চাকরি নেই।'

রমেশ শিবনাথের চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল।

'আমিও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছি গিন্নীর কথার। বারো নম্বর ঘরের বাবুর চাকরি

থাকা না-থাকা প্রশ্নের মধ্যে আসে না, কেননা তাঁর স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট, এবাড়ির সব মেয়ের চেয়ে শিক্ষিতা এবং একটা ইস্কুলে চাকরিও ইনি করছেন।'

শিবনাথ কথা বলল না।

অবশ্য শিবনাথের ভাল লাগল তার এবং তার স্ত্রী সম্পর্কে রমেশ রীতিমত একটা শ্রদ্ধার ভাব রেখে কথা বলছিল। বাড়ির আর পাঁচজন সম্পর্কে কী তাচ্ছিল্যভরে সে এতক্ষণ নানারকম কথা বলেছে শিবনাথ শুনেছে, শুনতে হয়েছে। কেননা রুচির বুদ্ধির দোষে রমেশ শিবনাথের বেকার অবস্থা জেনে প্রায় তার পেটের মধ্যে ঢুকছিল। মেয়েটির কত বয়েস, ব্যাঙ্কে কি তার কোনো একাউণ্ট আছে, লাইফ ইন্সিওর কিছু করা আছে কি? যদি না করে থাকে বেলেঘাটায় তার এক বন্ধু আছে। একটা বড় কোম্পানীর এজেন্ট। শিবনাথ যদি ইচ্ছা করে তো তাকে দিয়ে কালই রমেশ একটা পলিসি করিয়ে দিতে পারে।

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাল কথা দেবে বলে শিবনাথ অল্প হেসে মাথা নেড়েছে।

সেদিকে আর বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে তারপরই রমেশ তুলেছে এবাড়ির আর দশটা পরিবারের কথা। কার কত আয়, কে কি হালে চলছে। আর একটা পরিবার ধাঁ করে ডুবল বলে। বছর বছর মুখ বাড়ছে, উপার্জন করার লোক নেই। বিধু মাস্টার মুখ ফুটে কিছু বলে না, কিন্তু রমেশের সন্দেহ আছে, দরকার হলে মেয়েগুলোকে কাজে পাঠাতে রাজী হবে কিনা মাস্টার। কেবল সরস্বতী সরস্বতী করছে, ওদিকে তো নুন লঙ্কাপোড়া ভাতও নিয়মিত জুটছে না। আর অই খেয়েই বা কোন্ ছেলেমেয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে রমেশের জানা নেই। দু'বেলা যাহোক জুটছে, আরো কিছুদিন টিঁকতে পারে, কিন্তু একেবারেই আর ভরসা নেই, পাঁচ নম্বর, দশ নম্বর আর এগারো নম্বর ঘরে! শিবনাথ ঘরের সঙ্গে চেহারাগুলো মিলিয়ে দেখল। কে. গুপ্ত, বলাই, অমল।

কে. গুপ্ত ও বলাই সম্পর্কে সংক্ষেপে সেরে রমেশ অতক্ষণ দীর্ঘ বক্তৃতা করল অমল সম্পর্কে।

'আচ্ছা আমি এখন উঠি।' চা-খাওয়া বেশ কিছুক্ষণ হয় শেষ হয়েছে। আগের এক পেয়ালা চা-এর দাম এখনকার পয়সা টেবিলের ওপর রেখে শিবনাথ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ক্যাশ বাক্সের সামনে পিতলের রেকাবীতে রমেশ মৌরী রেখে দিয়েছে। চিমটি কেটে খানিকটা মৌরী তুলে মুখে ফেলে দিয়ে শিবনাথ অল্প হাসল, 'ওয়াইফের সঙ্গে কন্সাল্ট করে দেখি, আপনার বন্ধুকে দিয়ে একটা পলিসি করবার ইচ্ছা আমার আছে।'

'ছি ছি ছি!' যেন বেশ লজ্জিত, জিভের আধখানা বার করে তাতে একটা কামড় বসিয়ে রমেশ বলল, আমি আজই এখনি গিয়ে এই নিয়ে মিসেসকে বিরক্ত করতে বলব না। তাছাড়া তিনি এখন খেটেখুটে ফিরছেন। অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আজ কাল পরশু। সুবিধামতন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমায় একবার একটু জানালেই হবে, আমি অমিয়কে খবর দেব। পলিসি করে দিয়ে যাবে। ডাক্তারের ফি এখন আপনার কাছ থেকে নেবে না। ওয়েট কম থাকলে চালিয়ে নেবে। আর বয়েস

পাঁচ বছর কমিয়ে ও আপনার প্রিমিয়াম রেট নিচুতে নামিয়ে দেবে। ঝানু এজেণ্ট মশাই। পনরো মিনিটে ফল্‌স হরোস্কোপ তৈরি করিয়ে দেয়।'

'আচ্ছা আমি মনে রাখব।' শিবনাথ মাথা নাড়ল।

রমেশ বলল, 'ইন্সিওর একটা দু'টো করে রাখা ভাল। যা দিনকাল, যা আমাদের আয়ু। তাছাড়া সবাইকে তো বললে হয় না, সকলের পিছনে ছুটে লাভও নেই। অমিয় তো এ তল্লাটের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে, বলছে সব ছাগল-কুত্তার দল। খেয়ে বাঁচে না তা প্রিমিয়াম চালাবে কি করে? এসব হাঁটুভাঙ্গা কেস অমিয় আজকাল আর হাতে নিতে চায় না। গোড়ায় নিয়ে অনেক ঠকেছে।'

শিবনাথ বলল, 'আচ্ছা আমি চলি।'

রমেশ বলল, 'আর একবার আপনি পারিজাতবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। আমার তো মনে হয়, খুব শীগ্‌গির আপনার কোথাও একটা উনি জুটিয়ে দিতে পারেন।'

'আচ্ছা।' শিবনাথ হেসে ঘাড় নাড়ল।

'না, কারো কারো ধারণা ওঁরা বড়লোক, আমাদের কিছুতেই নেই, বরং দেখা করলে সম্মান রাখবে না। মশাই, সেই টাইপের লোকই নন পারিজাত কি তার বাপ, কি পারিজাতের স্ত্রী। চমৎকার লোক।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

তাছাড়া পান থেকে চুন খসেছে, আমায় রায়সাহেবের পরিবারের লোক চেয়ারে বসতে বলেনি, ব্যস্‌ হয়ে গেল, শালা ক্যাপিটেলিস্ট, শালা দাম্ভিক,—ইত্যাদি।'

রমেশের কথা বলার ধরন দেখে শিবনাথ আর একবার হাসল।

'কথায় বলে কিনা, উপকারীরে বাঘে খায়। রায়সাহেব ঘর দিয়েছে, সস্তায় থাকতে বললে,একমাস দু'মাসের ভাড়া তিনি মাপ করেছেন এমন নজীরও আছে। আর দু'তিনটে কারখানা, এতবড় একটা দোকান, সুযোগ পেলেই এবাড়ি এ পাড়ার লোককেই কাজ দিচ্ছেন। এই তাঁরাই হলেন গিয়ে সবচেয়ে খারাপ। অধার্মিক। সারাদিনই তো বাড়িতে জটলা পাকানো হয়ঃ ইলেকট্রিক নেই, আর একটা কল বসছে না, অথচ মাস মাস ভাড়াটি আদায় করতে সরকারকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নবকে যাবে বাপ ছেলে। মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যারা বড়লোক, তারা কুষ্ঠ হয়ে মরে, যক্ষ্মায় মরে। শোনেননি অমলের লাফালাফি, বলাইর হুঙ্কার?'

'হ্যাঁ, শুনেছি, পরশু রাত্রে যখন ভাড়া আদায় করতে মদন ঘোষ এসেছিল।'

'তা শুনবেন বৈকি। আপনিও তো বারোঘরের এক ঘর।' রমেশ চিবুক নাড়ল। সেই জন্যেই বলছিলাম খুব ভাল লোক। লোকেরা নিজেদের অভাবের জ্বালায় তাঁদের নামে বদনাম দেয়, গালিগালাজ করে। আসলে লোক খুবই ভাল।'

'না, আমি দেখা করব।'

'তাঁরা চাইছেন, আপনদের মত শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী লোকদের আস্তানা গড়ে উঠুক এখানটায়; যারা ভদ্র যারা মার্জিত। তখন বাড়িও ইমপ্রুভ করবে।'

'তা তো করবেই।' শিবনাথ একবার দরজার দিকে তাকাল।

'মান সম্মান।' রমেশ এবার নিজের মনে কথা বলল, 'মাস্টারের ফ্যামিলিটার

কি হাল দাঁড়িয়ে দেখছেন না। ছেলেগুলোর একটার পরণেও ছেঁড়া পেন্টলুন ছাড়া দেখি না। আর মেয়েগুলো কী পোষাক পরে ইস্কুলে ছোটে দেখেন তো রোজই। তবু ইস্কুলে পাঠানো চাই। নইলে সম্মান থাকে না। দু'দিন পর য়ে রাস্তায় দাঁড়াবে, তাই আমি দেখছি।'

দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে রমেশ এমনভাবে বলল, যেন সে আবার জরিপ করছে এবাড়ির এক একটি পরিবারের অবস্থা।

'মাস্টারের জন্যে আমারও কষ্ট হয়।' শিবনাথ বলল, 'ছেলেটাকে নাকি বলছিল আনাজ বিক্রি করতে শেয়ালদায় গিয়ে, রাজী হয়নি।'

'হবে কি করে। যেমন ট্রেনিং পাচ্চে ঘরে।'

'কে, তাঁর স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ, বাড়ির লক্ষ্মীমণি। তিনি বছরের পর বছর হাসপাতালে যাচ্ছেন, আর খান কি না খান গ্রাহ্যি না ক'রে বাচ্চাগুলোকে কবিতা আওড়াতে শেখাচ্ছেন, হাট্টিমা টিম টিম।'

'ভাল না, এরকম আউটলুক রাখা নিবুদ্ধিতা।' গম্ভীরভাবে বলল শিবনাথ।

'তা ছাড়া বড় মেয়ে দু'টোর মাথায় কিছু নেই। আমি বলছিলাম একদিন মাস্টারকে ডেকে, দিন ঢুকিয়ে এপাড়ার কারখানায়। এখানে ঢোকাতে লজ্জা করে, ওপাড়ার মোজার কলে ঢুকিয়ে দিন।'

'রাজী হয়নি বুঝি ?'

'বলল, গিন্নী বারণ করেছে।'

'মুখ' ।' অস্ফুটে বলল শিবনাথ। তারপর যেন কল্পিত বিধুমাস্টারকে অনুকম্পা করছে এমনভাবে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের দেশের লোকের মধ্যে এখনো অনেক গলদ আছে, সেই জন্যেই তো স্বাধীনতা পেয়েও আমরা উঠতে পারছি না—জাতির অগ্রসর নেই।'

বলে শিবনাথ রমেশের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হ'ল। রমেশ হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। তার কথা শুনছে না। যে প্রসঙ্গ চলছিল, তার সঙ্গে আর তার সম্পর্ক নেই যেন।

শিবনাথ তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে চোখ ফেরাতে কারণটা বুঝল।

বেবির চুলে ধরে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসেছে ক্ষিতীশ দোকানের মধ্যে।

ক্ষিতীশের আর এক হাতে একটা থলে। থলের ভিতর চাল কি ডাল আছে বোঝা যায়।

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বেবি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ক্ষিতীশ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, 'চুপ কর হারামজাদী। কাঁদবি তো লাথি মেরে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

'কি ব্যাপার ?'

রমেশ চট করে উঠে দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপার তেমন কিছু না। যেন খুব বিরক্ত হয়ে ক্ষিতীশ তার দাদার কথার উত্তর দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি শিবনাথ উপস্থিত, তাতে তার গ্রাহ্য নাই। গলা বড় করে সে ঘটনাটা বলল।

ক্ষিতীশ যে-থলেটা ধরে রেখেছে, তার ভিতরে চাল। আড়াই সের। তার বেশি হবে না ক্ষিতীশ বলছিল। কিন্তু বেবি বলছে এখানে তিন সের চাল আছে। সে ভাল করে ওজন দেখে এনেছে।

হ্যাঁ, ধাপার বাজারে কেনা চাল।

দোকানীর দাড়িপাল্লার দোষে ওজন কমতে পারে। ধাপার বাজারে ওজনে কম ওঠে। বেবি প্রতিবাদ করতে গিয়ে ক্ষিতীশের কাছে ধমক খেয়েছে এবং ক্ষিতীশ তার চুল ধরেছে।

কেননা, সময়মত রেশনের চাল ধরতে পারেনি বলে ক্ষিতীশ বেবিকে ব্ল্যাকে চাল আনতে ধাপার বাজারে পাঠিয়েছিল। সেখানেও সে চুরি করল।

'যাক যা হবার হয়েছে।' রমেশ ব্যাপারটা মিটমাট করতে চেষ্টা করল। 'অভাবের সংসার, বাপটা তো অকম্মার ঢেঁকি। মুদির দোকানের সামনে বসে রাতদিন আড্ডা দেয় দেখি। তা করবে কি; কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। হাজার হোক মানুষের পেট তো। কত আর না খেয়ে থাকবে। চাল চুরি করুক, কি আধসেরের পয়সা গাপ মারুক, একটা কিছু করেছে। আর কোনদিন করবে না, এখন আবার ভাল করে বলে দে।'

বলে রমেশ লাল চোখে বেবির দিকে তাকাল।

কে. গুপ্তর মেয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ আর হাত দিয়ে ঢাকা নেই এখন। তাই শিবনাথ চোখের চারধারে জলের দাগ দেখতে পেল। যেন বেবি অনেক-ক্ষণ কেঁদেছে।

ক্ষিতীশ ওর চুল থেকে মুঠি আলগা করেছে। কিন্তু মুখের কর্কশ ভাব দূর হয়নি।

'না না, আমি আজই দূর ক'রে দেব। চা চিনি বা দোকানের একটু কেরোসিন চুরি ক'রে এ্যাদ্দিন ক্ষান্ত ছিল, এখন মূল জিনিস পয়সা চুরি আরম্ভ হয়েছে, চালাকি, চুরি। সময় পাই না। মাসের বিশ দিনই আমাকে ব্ল্যাকে চালটা গমটা আনতে হচ্ছে। আর এই করে যদি ও সে-সব থেকে পয়সা খায় তো আমরা দাঁড়াব কোথায় বলতে পার?' ক্ষিতীশ দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

দাদা কথা বলছে না দেখে ক্ষিতীশ বলল, 'তা ছাড়া আরো কথা আছে, আমি ওকে দোকানে রাখব না আরো কয়েকটা কারণে।'

'কি, কি কারণে, তুই আমায় সব খুলে বল না?' রমেশ ক্ষিতীশের চোখের দিকে তাকাল। 'আমি মাথার ওপর আছি যখন, অসুবিধা-টসুবিধাগুলো তো আমার কানে তুলবি। কি হয়েছে বল্।'

ক্ষিতীশ মাথা নাড়ল।

'বলাবলির আর আছে কি। কেন রাখতে চাইছি না ওকে দোকানে তা আমিও

যেমন জানি, তুমিও জান। তা বদনাম উঠলে আমার নামেই আগে উঠবে। তুমি অনেকদিন বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হয়েছ, আমি একটা ব্যাচিলার।'

'আরে ধ্যেৎ, ওসব বাজে কথা কে বলে। বদনামের আছে কি? ওই তো একরত্তি মেয়ে। এখনো ফ্রক ছেড়ে কাপড় ধরেনি।'

'ওই ধরালেই ধরে।' ক্ষিতীশ দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। আমাদের মা-জেঠীদের তো শুনেছি দশ এগারো বছরে পা দিতেই বিয়ে হয়েছিল।'

'তা হয়েছিল যেদিন সেদিন হয়েছিল। দু'টো যুদ্ধের পর দেশের হাওয়া পাল্টে গেছে।' রমেশ এবার শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের শাস্ত্রের বিধান ছিল অষ্টম বয়সে গৌরীদান। কি বলেন মশাই। ওর বয়সে আমাদের মা-মাসীদের গর্ভে আমরা যে এসেই গেছি। এখন আর সে-সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে চলবে কেন?

কথা শেষ করে রমেশ হাসল।

শিবনাথ কথা বলল না।

লক্ষ্য করল বেবির কর্ণমূল লাল না হলেও ঘরের মেঝে থেকে আর চোখ তুলছে না। চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

যেন আবহাওয়া একটু তরল হয়েছে। নরম নিচু গলায় ক্ষিতীশ বলল, 'আমি বলে রাখলাম, শেষটায় না তুমি একদিন আমায় দোষ দাও মাগনা চা-চিনি খাওয়াচ্ছি—'

'আরে না, ও তো দোকানে রীতিমত কাজই করছে, এমনি কি আর,—তবে হ্যাঁ দ্যাখো মেয়ে, চুরিটুরি আমি বরদাস্ত করব না আবার বলে দিচ্ছি। আর একদিন চুরি করেছ শুনতে কি দেখতে পেলে আমি কুকুরের মত লাথি মেরে দোকান থেকে তাড়িয়ে দেব।' রমেশ বেবির দিকে চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে কথা বলছিল। বেবি ঘাড় কাত করে উপদেশ শুনল। 'যাও ভাল ক'রে দু'কাপ চা ক'রে নিয়ে এসো, আপনি কি আর একটু—'

'না না আমাকে একটু বেরোতে হবে কাজে'—শিবনাথ এই ফাঁকে বলে ফেলল।

'আচ্ছা।' রমেশও আর পীড়াপীড়ি করল না। হেসে ঘাড় কাত ক'রে বলল, 'মোটের ওপর আপনি একবার ওদের সঙ্গে— '

'হ্যাঁ, আমি পারিজাতবাবুদের সঙ্গে শীগ্‌গিরই দেখা করব।' বলে শিবনাথ দ্রুত ব্যস্ত পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে নিজের সম্পর্কে যত না চিন্তা করল, লোকটি সম্পর্কে ভাবল অনেক বেশি। ব্যবসায়ী মানুষ। লেখাপড়ার ধার ধারে কম। মনের পালিশ সে-জন্যই বিশেষ নেই। কিন্তু তা হলেও রমেশ খারাপ লোক শিবনাথের মনে হ'ল না। দরকার হলে সে লোকের উপকারই করে। লোকের সম্পর্কে অনেকের চেয়ে বেশি সজাগ, ক'দিনের আলাপে শিবনাথ টের পেয়েছে এবং এটা আজকের দিনে কম কথা কি।

উনিশ

তৃতীয় ব্যক্তি শিবনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে ক্ষিতীশ হাত নেড়ে ফিসফিস ক'রে বেবির ওপর রাগ হওয়ার আসল কারণটা দাদার কাছে প্রকাশ করল।

শুনে রমেশ একটু সময় গুম মেরে থেকে পরে বেবিকে ডাকল।

দু'বাটি চা হাতে ক'রে বেবি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

ক্ষিতীশ হাত বাড়িয়ে চা-টা তুলে দাদাকে একটা দিয়ে এবং নিজে একটা বাটি রেখে রুক্ষ গলায় বলল, 'পই-পই ক'রে হারমজাদীকে আমি বারণ করে দিয়েছি কক্ষনো আমাদের নাম বলবি না। এতে, এটা অবশ্য খোরাকির চাল, আমাকে যত না বেশি পাবে দাদার ক্ষতি হবে অনেক বেশি। চায়ে চুমুক দিয়ে ক্ষিতীশ দাদার দিকে তাকায়।

'পুলিস কোন্‌খানটায় তোকে ধরেছিল ?'

'রেললাইনের ধারে।' বেবি সভয়ে রমেশের দিকে তাকাল।

ক্ষিতীশ বলল, 'শালারা এক আধসের চালও এখন নিতে দিচ্ছে না, ভয়ানক কড়াকাড়ি শুরু করেছে।'

রমেশ কথা বলল না। যেন কি ভাবছে।

ক্ষিতীশ বলল, 'সেজন্যেই আমি নিজে না গিয়ে ওকে পাঠালুম। ভাবছিলাম, আজ সারদা পেট্রল দিতে আসবে।'

'সারদা বুঝি মেয়েছেলের চাল আটকায় না ?' রমেশ ঈষৎ হাসল।

'তা না,' ক্ষিতীশ আড়চোখে একবার বেবিকে দেখে বলল, 'সারদা তো আমার বন্ধু। সেজন্যেই ওকে ততটা ভয় নেই। তাছাড়া খোরাকির চাল দেখলে কোন প্রশ্নই করত না। লোকটা ভাল।'

'কে আজ ডিউটিতে ছিল ?' রমেশ প্রশ্ন করল।

'সেই যে রোগা-মতন লোকটা। আমি নাম জানি না।'

'তুই কোথায় লুকিয়েছিলি ?'

'পুলের ধারে শ্যাওড়া গাছটার আড়ালে।' ক্ষিতীশ বাকি চা-টুকু শেষ করল।

রমেশ চা শেষ ক'রে বাটিটা নামিয়ে টেবিলে রাখল। তারপর বেবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোকে পেট্রলম্যানটা কি জিজ্ঞেস করেছিল ?'

'বলল, কোথায় থাকিস তুই ?'

'কি বললি ?'

বেবি মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

ক্ষিতীশ হুংকার ছেড়ে বলল, 'বললাম তো, ও আমাদের ফাঁসাবে, সেই মতলবে আছে, না হলে হুট ক'রে দোকানের নাম বলে দেয় ? কেন. ওর কি ঘর নেই, বস্তি-বাড়িতে ওরাও তো একটা ঘর নিয়ে আছে, খোরাকির চাল নিয়ে যাচ্ছে বললে ল্যাঠা চুকে যেত। না,—বলল কি না, ক্ষিতীশদার চাল, আমি ক্ষিতীশদার দোকানে থাকি।'

'মুর্খ।' দাঁতে দাঁতে চেপে রমেশ রাগ প্রকাশ করল।

'শুধু কি তাই।' যেন রাগের মাথায় ক্ষিতীশ আর একবার বেবির চুলের মুঠি ধরতে গেল। রমেশ হাত তুলে বারণ করল।

'আলাপটা যে শুধু চাল নিয়ে হয়েছিল, আমার মনে হয় না। গাছের আড়ালে

দাঁড়িয়ে আমি তো লক্ষ্য করলাম। রীতিমত হাসাহাসি করছিল ও পুলিসটার সঙ্গে। যেন কত পীরিত!'

ক্ষিতীশের দিকে না তাকিয়ে রমেশ বেবির চেহারা লক্ষ্য করছিল।

'কেমন, খুব হাসাহাসি হচ্ছিল পুলিসের সঙ্গে?'

বেবি চোখ না তুলে শুধু মাথা নাড়ল।

'আমি হাড় ভেঙে দেব, যদি বাইরের লোকের সঙ্গে বেয়াদবি করতে দেখি বা শুনি।' বলে রমেশ ঘাড় ঘুরিয়ে ক্ষিতীশকে বলল, শালাদের ও-ই কর্ম। ডিউটি আর কি। মেয়েছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা। পরশু ওপাড়ার সনাতন একটা পেট্রলম্যানের নাকের তলা দিয়ে দু'মণ পার করলে। কিছু বললে না। হরিহর এসে আমায় বললে ঘটনাটা।'

'কারণ?'

'খুব সহজ।' রমেশ দাঁত বার করে হাসল। 'পিছনেই পাঁচ দশ সের চাল নিয়ে দু'টো অল্প বয়সের বৌ আসছিল। হারামজাদার চোখ ছিল সেখানে।'

ক্ষিতীশ হাসল না। কটমট ক'রে আবার একটু সময় বেবির দিকে তাকিয়ে থেকে, পরে দাদার দিকে চোখ ফেরাল।

রমেশ হাসিটা নিভিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বেবিকে বলল, 'যাক্‌গে, ওদের সঙ্গে হাসাহাসি বেশি কথা বলা একদম চলবে না। পেট্রলম্যান আসছে দেখলে অন্য রাস্তায় ঘুরে যেতে হবে। তা এক সের সঙ্গে থাকুক, কি দশ সের—মোটের ওপর—'

'ভাল ক'রে কে. গুপ্তর মেয়েকে বলে দাও দাদা, ভাল ক'রে বলে দাও।' ক্ষিতীশ চায়ের বাটি হাতে নিয়ে পর্দার ওপারে সরে গিয়ে গজগজ করতে লাগল। 'আমার কথাবার্তা তো লবাবের মেয়ের কাছে পেচ্ছাব। গ্রাহ্যিই করে না আজকাল। তা না করুক দুঃখু নেই। ভয় তোমাকে নিয়ে দাদা, তোমার জন্যে ভাবনা। না হলে পুলিস কনস্টেবলের সঙ্গে পীরিত করতে, এক কথার জায়গায় একশটা কথা বলতে আপত্তি করার ছিল কি; কিন্তু বলতে গিয়ে গাছেমাছে জড়িয়ে, কি না কি বলে আসেন উনি, সেই ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। গন্ধ পেয়ে ঠিক একদিন এখানে এসে উঠবে, আমি বলে রাখলাম।' ব'লে ক্ষিতীশ একটু থামল। জল পড়ার শব্দ শোনা গেল। যেন কি ধোয়া হচ্ছে। একটু পর আবার তার গলা শোনা যায়। 'তা আসে আসুক, আমার কি, দোকানও আমার নামে না, আর সেই কারবারেরও আমি কিছু নই। আমি ঠিক করেছি ডিগবয় চলে যাব মামার কাছে। সেখানে তেলকলে লোক নিচ্ছে চিঠি পেলাম। মামার চিঠি বুঝি তুমি দ্যাখোনি। এখানে থেকে কি শেষটায় জেলখানায় যাব। আমি পারব না। গুপ্তর মেয়েকে নিয়ে তুমি দোকান চালাও। মামা সুবিধে করে না দেয়, আমি বাটা কোম্পানীতে ঢুকবো। সেখানেও লোক নিচ্ছে।'

'তুই চুপ কর, তুই চুপ করবি?' পর্দার এপারে রমেশ রায় গর্জন ক'রে উঠল। জেলখানায় যাব! জেলে দেওয়া এতই সহজ। কি হয়েছে। খোরাকির চাল ও তো বলেই এসেছে, ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। গন্ধ? গন্ধ পাওয়া এতই সহজ?' রমেশ নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বার করল। 'বলে কিনা হাতি-ঘোড়া গেল তল, পাঁঠা বলে

কত জল'। লেঠেল পেট্রলম্যান এসে হদিস পাবে রায়ের কারবারের। রেখে দে।' রজ্জু দেখে সর্প ভয়। তোর হয়েছে সেই অবস্থা ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেশ বলল, 'আর কথায় কথায় ডিগবয় মামার কাছে চলে যাব বলিস, চাকরিতে ঢুকব—একবার পরের চাকরিতে ঢুকেই দেখ না, কত রস সেখানে। কুত্তার জীবন, বুঝলি ক্ষিতীশ, শেয়ালকুত্তার মত দেখে ওপরওয়ালারা কর্মচারীদের, তোকে আমি কতদিন বোঝাব।'

'তা কি জানি না, ব্যবসা-বাণিজ্যে আমারও শখ কম নেই।' ক্ষিতীশের গলা। 'তা তুমি একবার লবাবের বেটীকে বলে দাও, যেন একটু বুঝেসুঝে চলেন। এর ওর তার সঙ্গে হাজার রকমের কথাবার্তা বলা আমি পছন্দ করি না। লাইনমত যদি চলতে পারে এখানে থাকুক, না পারে চলে যাক্—কাজ নেই আমার চা বানিয়ে।'

'তা চলবে, চলবে, চঞ্চল স্বভাবটি এখনো কাটেনি। ছেলেমানুষ, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।' রমেশের গলা হঠাৎ মোলায়েম হয়ে গেল। পর্দার ওপার থেকে ক্ষিতীশ শুনল দাদার গলা। বুঝল বেবির সঙ্গে কথা বলছে।

'এমন উষ্কখুষ্ক হয়ে থাকিস কেন, চুলে একটু তেলটেল দিতে পারিস না। ঈস্‌ দ্যাখো, হাঁটুর কাছে কত ময়লা লেগে আছে। চান করার সময় গামছা দিয়ে ভাল ক'রে রগড়ালে ত পারিস।'

'গামছা থাকলে তো।' পর্দার ওপারে ক্ষিতীশ বলল।

রমেশ কথা বলল না।

বেবির ভয়ের ভাবটা কেটে গেছে। চেহারা এখন অনেকটা স্বাভাবিক এবং এক দৃষ্টে রমেশ রায় তার হাঁটু দেখছে, টের পেয়ে যেন তাড়াতাড়ি মেঝেয় বসে পড়ে ফ্রকটাকে দু' পায়ের ওপর টেনে দিতে চেষ্টা করল।

'বস্তিতে এসে ঠাঁই নিয়েছে, চাল-চলনও হয়েছে এখন সেরকম।' পর্দার ওপার থেকে ক্ষিতীশ বলল, 'তেল সাবান গামছায় তো আর লাখ টাকা খরচ নেই, আমি দিতেও চেয়েছিলাম। ওর মা নিষেধ করেছে এসব নিতে।'

'কেন ?' এপার থেকে রমেশ প্রশ্ন করল। বেবি মাথা নিচু ক'রে শুনছে, কিছু বলছে না।

'লোকে নিন্দা করবে।' ক্ষিতীশ বলল, 'পরের দেওয়া তেল, সাবান মাখছে মেয়ে, জানাজানি হয়ে গেলে নাকি বাড়িতে, পাড়ায় নানারকম কথা উঠবে।'

'কেন, কে. গুপ্তের ফ্যামিলি তো খুব ফরোয়ার্ড বলে জানতাম। সাহেবী চালে সারাজীবন কাটিয়ে এল।' রমেশের চোখ গোল হয়ে গেল।

'তা হলে হবে কি।' ক্ষিতীশ বলল, 'যখন ছিল তখন ছিল। এখন আর সেই ঠাটঠমক নেই। পয়সার জোর গেছে। একটু এদিক-সেদিক হলে বাকি এগারোটা ঘর হাসাহাসি করবে।'

'বটে! যত দোষ তেল-সাবানের বেলায়।' রমেশ হাসতে চেষ্টা করেও হাসল না, বরং একটু রাগের সুরে বলল, 'মেয়েকে পাঠিয়ে চা, চিনি, কয়লা, কেরোসিন নিতে বুঝি সুপ্রভা দেবীর লাজ নেই, না কি লোকে তখন মুখ বুজে থাকে।'

ক্ষিতীশের গলা আর শোনা গেল না।

মেঝের ওপর নখের আঁচড় কেটে বেবি একটা পাখি আঁকতে চেষ্টা করছিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে রমেশ একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল। 'বুদ্ধির দোষ, বুঝবার ভুল, পারিজাতের খোঁয়াড়ে যে এসে মাথা গলাচ্ছে, তারই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

মাথা খারাপ হয়েছে বেশি বলাইর। না হ'লে শীতের দুপুরে আইসক্রীমের গাড়ি নিয়ে বেরোবে কেন! তা-ও কি আর তিন চাকার সাইকেলে বসানো 'ম্যাগ্নোলিয়া' না 'হ্যাপিবয়'-এর সুন্দর রং করা ছিমছাম বাক্স। সে-সব এখানে চলে না। 'ম্যাগ্নোলিয়া', 'হ্যাপিবয়', 'জলিচ্যাপ', 'সুইটবেবি' যারা খায়, তারা শহরের বুকে থাকে। তাদের গায়ে ঝকমকে জামাকাপড়, সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগে থাকে। কথায় কথায় টুপটাপ সিকি দু'আনি ফেলে দিয়ে শীতের দুপুরেও একটার জায়গায় তিনটে করে 'জলিচ্যাপ' খায় সেখানে ছেলেমেয়েরা।

এ-তল্লাটে অন্য মানুষেরা থাকে। বলাইয়ের ভাল জানা আছে। তাই এক পয়সার জিনিস সে বেছে নিয়েছে। যেমন জলো হলদেটে রং কাঠের বাক্সটার, তেমনি বাক্সের ভিতরের জিনিসের রং। যেন খালের ঘোলাটে জল জমিয়ে তৈরি করা। হয়তো এক ফোঁটা মোষের দুধ থাকবে। স্যাকারিন দিয়ে মিষ্টি করা। তা যত সস্তাই হোক, খেতে মিষ্টি না লাগলে একটু দুধের তার না পেলে একটা পয়সাই বা খরচ করতে যাবে কেন বস্তির ছেলেমেয়েরা।

কিন্তু বেলা বারোটা থেকে ঘুরছে বলাই, চার ছটাও বিক্রি করতে পারে নি।

হাত দিয়ে ঠেলতে হয় বাক্সটা।

দু'টো মাত্র রবারের চাকার ওপর বসানো। হাতল ছেড়ে দিলে বাক্সটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুতরাং গাড়ি সোজা রেখে ক্রমাগত হাঁটার হাঙ্গামাও কম না। শীতের রোদেও সে ঘামছিল। হিউজ রোড পিলখানার ওধার থেকে সে ঠেলতে ঠেলতে আসছে।

হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে বলাইর।

খোয়া-বসানো রাস্তা।

পিচ উঠে গিয়ে পাথরের খোয়াগুলো শিং ও মাথা উঁচিয়ে গাড়ির চাকা ঠুকতে উঠে পড়ে লেগেছে। কর্পোরেশনের কাজের বাপান্ত ক'রে বলাই বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গলিতে ঢোকে।

টিনের বেড়া ঘেরা বস্তি না, মাটির বেড়া ঘেরা ঘর। ঘরগুলোর চেহারা দেখে বলাই বুঝল একটা পয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের আইসক্রিম কিনে খাওয়াবে বাপ দাদাদের ক্ষমতা নেই এখানে। তাই আর 'আইসক্রীমের' বাংলা 'ঠাণ্ডামেঠাই' কথাটা মোলায়েম করে না হেঁকে একরকম চুপচাপ গলি পার হয়ে চলল।

'এই আইসক্রীম দাঁড়াও।'

গলি শেষ হবার মুখে ছোট্ট ছেলেটি কোথা থেকে ছুটে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায়, বলাইর গাড়ির সামনে।

বছর তিন চার বয়স।

তা হ'লেও সে দু' হাত তুলে বলাইর গাড়ি আটকাতে চাইছে।

'পয়সা নিয়ে আয়।'

'পয়সা নেই এমনি দাও।'

হাসল বলাই। হেসে একটু চুপ থেকে পরে পেট-মোটা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাগ্।'

কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা।

'একটাতে কি আর তুমি গরিব হয়ে যাবে। একটা দাও আমাকে। আমার পয়সা নেই।'

'তোর মাকে গিয়ে বল্।' কেন জানি বলল বলাই। বলে চারদিকে তাকাল।

'এই তো আমি এখানে। আমি গাছতলায় বসে আছি বাবা। আমি ওর মা।'

মাটির ঘর থেকে দূরে একটা নিচু জমিতে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে বসে আছে স্ত্রীলোকটি। সামনে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। প্রৌঢ়া বলাইর দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওর খাই-খাই এখনো কমেনি বাবা। অবুঝ। তা তুমি ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দাও। কাঁদবে না।'

যেন পরীক্ষা করবার জন্যে বলাই হেঁচ্‌কা টান মেরে গাড়ির সামনে থেকে ছেলেটাক সরিয়ে দিলে।

কাঁদল না ছেলেটা। দাঁড়িয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে বলাইর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তাকাল গাড়িটার দিকে। যেন গাড়িটার ওপর তার আক্রোশ, রাগ ও অভিমান। আইসক্রীমগুলো ওখানে কেন লুকিয়ে। বাক্সের ওপরে উঠে এসে হাওয়া খাক না। 'এক থাবা মেরে আমি সবগুলো কেড়ে নিয়ে ছুটে পালাই।'

যেন ছেলের চোখের ভাষা পড়তে পেরে আরও একটু মজা দেখতে বলাই হেঁকে উঠল ঃ 'ভাগ্।'

কিন্তু ছেলে নড়ল না। স্ত্রীলোকটি ওধার থেকে বলল, 'দাঁড়াও বাবা। তুমি দু'মিনিট এখানে একটু জিরিয়ে নিতে পার। গাড়িটা গাছের গুঁড়িতে ঠেকিয়ে রাখতে পার।'

বলাই তাই করল।

গাড়িটা এতক্ষণ পর হাতছাড়া করতে পেরে সে একটু হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি ও দেশলাই বার করল। বিড়ি ধরিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সে ছেলে, ছেলের মা আর তার 'হরেকৃষ্ণ' মার্কা হল্‌দে আইসক্রীমের গাড়িটা দেখতে দেখতে নিজের বরাতের কথাই যেন বেশি ভাবল। তার রুজি।

হঠাৎ বলাই লক্ষ্য করল কে একজন ভদ্রলোক। পথচারী, অনুমানে বুঝল।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াতে ছেলের মা উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের সামনে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, আমায় একটা পয়সা দিন। ভিক্ষে চাইছি।'

একবার বলতেই ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ডবল পয়সা তুলে স্ত্রীলোকটির

হাতে ফেলে দিলেন।

ভদ্রলোক একটু দূরে সরে যেতে ছেলেটির মা বলল, 'দাও বাবা। খেতে যখন চাইছে। একবেলা পেট ভরে ভাত খায় না। তা যদি এক পয়সার আইসক্রীম খেয়ে থাকতে পারে, ভুলে থাকে খিদে—থাকুক!'

বলে ডবল পয়সাটা বলাইর বাক্সের ওপর রাখল।

স্ত্রীলোকটির চোখে জল এসে গেছে। বলাই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

'তা এমনি কি আর একটা আমি দিতে পারতাম না। পয়সা লাগবে না, নিয়ে যান।'

বলাই বাক্সের ডালা তুলে একটা আইসক্রীম বার করল।

'নে ধর্।'

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আইসক্রীমের কাঠিটা ধরল।

স্ত্রীলোকটি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল।

'কটা আর বিক্রি হয় সারাদিন ঘুরে। আমি কি জানি না। আমার জানা আছে তোমার ওই ব্যবসা।'

বলাই আকাশের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরে চোখ নামাল।

'থাকতুম বাবা এখানেই। ওই বস্তির একটা ঘরে দেওরকে নিয়ে ছিলাম।' চোখ মোছা শেষ ক'রে স্ত্রীলোকটি আঙুল দিয়ে একটা মাটির ঘর দেখিয়ে দিলে। বলাই পুঁটুলিটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে একটা কিছু অনুমান করল।

'তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'দেওর বার ক'রে দিয়েছে। ওরও ছেলেপুলে আছে। এক হাতের রোজগার। সংসার চালাতে পারছে না। বাড়তি লোক আমরা, ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

বিধবা। যেন এতক্ষণ পর বেশভূষার দিকে নজর পড়তে বলাই কথাটা চিন্তা করার সময় পেল।

'আপনার স্বামী, খোকার বাপ কোথায়?'

স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ কথা না ব'লে আর একবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। মোছা শেষ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্বর্গে গেছেন।'

'অল্প বয়সে মারা গেলেন খোকার বাবা?' বলাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়ল।

'গাড়ি চাপা পড়েছিল।'

'কোথায়—' এর বেশি বলাই প্রশ্ন করতে পারল না। চুপ করে গেল।

'শহরে। আইসক্রীমের গাড়ি চালাচ্ছিল। আর কিছু সুবিধে করতে না পেরে শেষটায় ওই ব্যবসা ধরেছিল।'

টান দিয়ে গাড়িটা গাছের গুঁড়ি থেকে আলগা ক'রে এনে বলাই সামনের দিকে এগোতে লাগল। 'ঠাণ্ডা মেঠাই!' গলায় বেশ জোর দিয়ে মিঠে নরম সুরে সে হাঁকতে হাঁকতে গাড়ি চালায়। হাঁটে জোরে জোরে।

ফিরি নিয়ে বেরিয়ে এরকম অনেক ঘটনা বলাই শুনেছে, দেখেছে। সেজন্য মন খারাপ ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার দিন চলে না। কিন্তু মন খারাপ হওয়ার জিনিসের যেমন দুনিয়ায় অভাব নেই, তেমনি মন খারাপ চাপা দেবার সুযোগ সুবিধাই বা চারদিকে কম ছড়িয়ে আছে কি। গাড়িটা লেভেল ক্রসিং-এর ওপর একটা ধাক্কা মেরে ঠেলে তুলে দিয়ে বলাই হাতল-ধরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখল।

শহরের জঞ্জাল নিয়ে গাড়ি ধাপার মাঠের দিকে ছুটছিল। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে গাড়িটা দাঁড়াল। ইঞ্জিনের কাছে একটা টুকরি হাতে মোবারক দাঁড়িয়ে। কালিঝুলি মাখা শার্ট পেণ্টলুন পরা ড্রাইভার বেলচা নিয়ে ইঞ্জিনের পিছনে টাল ক'রে রাখা কয়লা তুলে মোবারকের টুকরিতে ফেলতে লাগল। টুকরি ভরে মোবারক সেটা মাথায় তুলে লাইনের ওধারে নেমে গেল। ইঞ্জিন তখনও দাঁড়িয়ে। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। কয়লার ধোঁয়ায় আকাশটা কালো হয়ে গেছে। একটু পর মোবারক টুকরিটা হাতে ঝুলিয়ে আবার লাইনের ওপর উঠে এল। ড্রাইভার বেলচা দিয়ে কয়লা কেটে কেটে টুকরিতে ফেলতে লাগল। মোবারক এদিক ওদিক তাকায় কিন্তু যে লোকটি ইঞ্জিন থেকে কয়লা নামিয়ে দিচ্ছে, তার কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। টুকরি ভরে যেতে মোবারক চলে গেল। কয়লা রেখে দিয়ে আবার ফিরে এল। দশবার। বলাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনল দশ টুকরি কয়লা। ইঞ্জিন থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর ড্রাইভার সাহেব সিটি দিয়ে ইঞ্জিন ছেড়ে দিলে। গুমগুম আওয়াজ তুলে ময়লার গাড়ি ধাপার মাঠের দিকে চলে গেল। জায়গাটা এমন ফাঁকা। পাশে বেগুন ক্ষেত থেকে অনেকগুলি শালিক উড়ে এসে রেললাইনের ওপর বসে কি যেন খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল, যেন জঞ্জাল-ভর্তি গাড়িগুলো থেকে হাওয়ায় কি সব খাদ্য নিচে উড়ে পড়েছে। বলাই গামছা দিয়ে কপাল মুছে আবার তার আইসক্রীমের গাড়ি ঠেলতে লাগল। লাইনের ওপারে যেতে মোবারকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মোবারক ঠোঁট টিপে হাসে।

'দশ টুকরি সরানো হ'ল বুঝি ?'

'হুঁ।' মোবারক আর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে এবার শব্দ ক'রে হাসল। 'আমার কি, ওরা যদি গায়ে পড়ে দিতে আসে আমি নেব না কেন ?'

'চুরি না করলে চলবে কেন।' মোবারক আস্তে কথা না বলে বেশ বড় গলায় বলল, 'ক'টাকা মাইনে দেয় শশী ড্রাইভারকে সে খবরটা রাখিস্। যা পায় খেতে পরতে কাবার। বড় সংসার ওর। পাঁচটা বাচ্চা। মেয়েটা তো দেখ্‌-দেখ্‌ ক'রে বড় হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ের ভাবনা হয়েছে শশীর। বাড়তি রোজগার না থাকলে, ক'টা টাকা হাতে না জমালে বিয়ে দিতে পারবে না, বলে শশী।'

'তা কর্পোরেশনের বাবুরা টের পায় না, কয়লার হিসাব রাখে না ?'

মোবারক আরো জোরে হাসল।

'বাবুদের না খাইয়ে কি শশী খায়। গুদামবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে।'

'গুদামবাবুর ওপরে তো বাবু আছে, তারা দেখে না ?' বলাই একটু অবাক।

'তারাও খায়।' মোবারক মাথা নাড়ে আর হাসে। 'বুঝলি বলাই, সেখানে কলমের চুরি। চালাকি চুরি।'

'তা ওরা তো মোটা মাইনে পায়। চুরি করার দরকার কি?'

'চুরি করার দরকার রাজা বাদশারও থাকে। মোটা মাইনেওয়ালাদের মোটা খরচ আছে যে।' একটু চুপ থেকে মোবারক বলল, "তা গত সন দু'জন বাবুর চাকরি গেছে এই ক'রে। কাগজে হিসাবটা দেখ'বার সময় কেমন গোলমাল ক'রে ফেলল, ধরা পড়ে গেল।

বলাই কথা বলল না।

'নে বিড়ি খা। এখন আইসক্রীম ধরলি নাকি?'

'হুঁ।' মোবারকের হাত থেকে বিড়ি তুলে নিয়ে বলাই বলল, 'বাজে মাল, বিক্রি নেই।'

মোবারক কিছু বলল না। তার কাঠ-কয়লার ব্যবসা। কাঁচা কাঠ পুড়িয়ে কয়লা করে। একটু দূরে ওর টালিছাওয়া লম্বা ঘর। ঘরের সামনের জমিতে স্তূপ করে রাখা কাঁচা কাঠ। আর একদিকে টাল দিয়ে রাখা চারকোল। কাঠ পোড়াবার জন্য তার বিস্তর পাথুরে কয়লার দরকার। শশীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে সে সস্তায় এখন ভাল কয়লা পাচ্ছে। বলাই একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

'ফলের ব্যবসাটা আর হাতে আনতে পারলি না?'

'নাঃ।' বলাই মোবারকের দিকে চেয়ে আকাশের দিকে চোখ রাখল। 'ফলের পরে সাবান ধরলাম, বেগুন ধরলাম, একটায়ও সুবিধা হয়নি। আর এ তো শালা ছোট-লোকের খাদ্য। তা-ও কিনে খাবার ক্ষমতা নেই এ তল্লাটের মানুষের।'

মোবারক কিছু বলল না। বলাইর হলদে গাড়িটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে অল্প হাসল শুধু।

'কিছু পুঁজির যোগাড় করতে পারলে ভাল একটা কারবারে হাত দিতাম।' যেন নিজের মনে বলল বলাই।

কিসের কারবার মোবারক প্রশ্ন করল না যদিও। বিড়িটা শেষ করে সে বলল, 'আচ্ছা চলি ভাই।' বলে আর না দাঁড়িয়ে তার ঘরের দিকে চলে গেল। বলাই একটু হাসল। পুঁজির কথায় মোবারকের ভয় হয়েছে পাছে বলাই কিছু টাকা পয়সা চেয়ে বসে। কারবারী লোক, কাজেই সেদিক থেকে বেজায় হুঁশিয়ার।

আর এক ধাক্কায় গাড়িটা লাইন থেকে নামিয়ে বলাই এবার মাঠের রাস্তা ধ'রে চলতে লাগল। কিন্তু চলতে চলতে মোবারক কি শশী ড্রাইভারের কথা ভাবল না সে, কি পিছনে ফেলে আসা রাস্তায় দাঁড়ানো সেই ছোট্ট ছেলে ও তার বিধবা মার কথা। যত সে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে একটা মুখ কেবল চোখের সামনে ভাসছে। 'সন্ধ্যার দিকে আসবি একবার। সারাদিন তোকে চিন্তা করবার সময় দিলাম। যদি বাঁচতে চাস রমেশ রায়ের শেষ উপদেশ নে।' ঘাড় ঘুরিয়ে বলাই দেখল সূর্য ডুবু ডুবু। গাড়িটা বনমালীর দোকানের সামনে রেখে রমেশ রায়ের শেষ পরামর্শ শুনতে বলাই

তার চায়ের দোকানের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু দোকানে বারো নম্বর ঘরের শিবনাথবাবুকে ব'সে থাকতে দেখে বলাই ভিতরে ঢুকল না। এদিকে ওদিকে পায়চারি ক'রে সময় কাটাল। শিবনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল কে. গুপ্তের মেয়েকে নিয়ে দাদা ও ভাই কি সব বলাবলি করছে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটা দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরল। যেন ফ্রকের তলায় লুকিয়ে কি সব নিয়ে যাচ্ছে। বলাই আর সেদিকে তাকিয়ে না থেকে আস্তে আস্তে দোকানে ঢুকে রমেশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কি, মাথা ঠিক করেছিস্ ?'

বলাই শব্দ না করে বেঞ্চের ওপর বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে রমেশ প্রশ্ন করল, 'মন ঠিক ক'রেছিস্, যা বললাম ভেবে দেখেছিস ?'

আর একটু সময় কি ভেবে বলাই রমেশের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। একটা পাংশু হাসি মুখ। 'ভয় করচে যে !' যেন বলতে চেষ্টা করেও বলাই বলতে পারল না।

কুড়ি

কিন্তু পাঁচু ভাদুড়ী রমেশ সম্পর্কে শিবনাথের কাছে আরো কিছু আলোক-সম্পাত করল।

'মশাই, ওর পরামর্শমত কাজ করবেন না। ঘোড়েল লোক, আপনাকে ডুবিয়ে মারবে।'

শিবনাথ ঢোক গিলে চুপ করে কথাগুলি শুনল।

'ওর চা কাঠ ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। ও যে কতখানি শঠ, পাপী, তা দিনে দিনে টের পাবেন, সবুর করুন দেখবেন।'

বিকেলে রায়সাহেবের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার আগে মুখটা ভাল করে কামিয়ে নেবার মতলবে শিবনাথ সেলুনে ঢুকেছিল এবং কথায় কথায় পারিজাত ওরা কেমন লোক প্রশ্ন করার সময় শিবনাথ রমেশের কথাটা তুলল।

'মশাই চোরের সঙ্গে চোরের দোস্তি'। পাঁচু বলল, 'ও তো ওর দলের লোককে আপনার মনিব করতে চাইছে।'

'রমেশের বুঝি অনেক পয়সা আছে ?' শিবনাথ প্রশ্ন করল। প্রসঙ্গটা সে অন্য-দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করল।

'রাতদিন চুরি করলে পয়সা হবে না কেন ?' পাঁচু শিবনাথের গালে সাবান ঘষতে ঘষতে বলল, 'রায়সাহেব আর তার ছেলে রাতদিন চুরি করছে, ও-ও চুরি করছে। ওরা করছে পুকুর চুরি, আর রমেশ করছে খানা ডোবা।' একটু থেমে থেকে পরে পাঁচু আবার বলল, 'যত সব চিটিংবাজ, ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে আপনার কিছুই সুবিধে হবে না, আমি হলপ করে বলতে পারি। মদ খাই, কিন্তু মশাই সৎভাবে রোজগার করে খাই। ওরা অসদুপায়ে পয়সা কামিয়ে আপনার আমার সর্বনাশের চেষ্টা করছে।'

শিবনাথ আর কিছু প্রশ্ন করল না। কেবল সামনের কালো ফ্রেম-বাঁধানো আরশির বুকে পাঁচুর কালো ঠোঁট-কাটা মুখটা রাগে বিশ্বেষে কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে দেখতে লাগল।

ঠোঁটটা কবে কাটা গেছে শিবনাথের এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি এবং কোন-দিন করা হবে না, একটাও মনে মনে সে ধরে রেখেছিল।

'অমলটা ভাড়া দিতে পারছে না বলে ওর ওপর অত্যাচার করছে। বলাইটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। দেখেছেন তো।'

শিবনাথ বলাই বা অমল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করল না।

'আপনি যেতে পারেন দেখা করতে, কিন্তু গিয়ে দেখুন সম্মানে ঘা দিয়ে ওরা কথা বলছে। এই রমেশই একদিন আপনাকে ঘা দিতে থাকবে, বলে রাখলাম। আরো দু'দিন মিশুন না।'

এক গালে সাবান মাখান শেষ ক'রে আর এক গাল ধরল।

'কতক্ষণ বসেছিলেন ওর দোকানে?' ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে পাঁচু হঠাৎ প্রশ্ন করতে শিবনাথ চমকে উঠল।

'দশ-পনরো মিনিট। চা খেতে যতক্ষণ।' শিবনাথ আধঘণ্টা সময় গোপন করল। পাঁচু বলল, 'আমি ওর দোকানে যাওয়া-আসা করি, এটা সে পছন্দ করছে না, তার কারণ আমি তার সব বৃত্তান্ত জেনে ফেলেছি।'

একটু চুপ থেকে পাঁচু বলল, 'নিজের ঘা ঢাকতে পাপ লুকোতে ও আমার বদনাম-গেয়ে বেড়াচ্ছে, আমার নাকি ভেনারেল ডিজিজ।'

ক্ষুরটাও রাগে কাঁপছিল, শিবনাথ গাল দিয়ে তা অনুভব করল।

পাঁচু বলল,—'পাজি-বদমায়েস তুই, আমার নামে বদনাম গাইতে আসিস। আমি যা করি দেখিয়ে করি, যা খাই তা লেবার করে খাই। লোকের মাথায় বাড়ি মারি না।

ক্ষুরটা প্রায় শিবনাথের গালে বসে গিয়েছিল। সবগুলো দাঁত বার করে ঠোঁটকাটা পাঁচু হঠাৎ হাসল: 'ভয়ের কিছু নেই—ও আপনার লাগবে না। আমার হাতে আপনি মরবেন না।

দুটো গাল বেশ পালিশ ক'রে কামিয়ে দিয়ে পাঁচু শিবনাথের মুখে পাউডার মাখাল তারপর চুলটাতে চিরুনি বুলোল। 'কিছু পুঁজি থাকে তো দুটো দিন সবুর করুন। আমি ওপারের দু'খানা কামরাই ভাড়া নিচ্ছি সামনের মাস থেকে। আপনি দোকান-টোকান একটা কিছু খুলে দিন। এই পায়ে-ধরা তোষামোদি করতে যাবেন না। ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। আর, সম্মান নেই।'

কাজ শেষ হয়ে গেছে। শিবনাথ উঁচু চেয়ারটা থেকে নেমে দাঁড়াল। হঠাৎ ভিতরে এসে ঢুকল বিধু মাস্টার। এক মাথা চুল, দাড়ির জঙ্গল গালে।

অসৎ এবং সৎ লোকের তফাতটা দেখাতে পাঁচু যথার্থ লোক হাতের কাছে পেয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সে মাস্টারের দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই ধরুন না আমাদের আর এক ভাড়াটে বিধুবাবু। একটা শিক্ষিত লোক। ইস্কুলের মাস্টার,

মান্যগণ্য ব্যক্তি। রমেশ চণ্ডালটা ওকেই কি বাগে পেলে কম অপমান করে! বলুন না মাস্টার মশাই। সেদিন একটা টাকা ধার চাওয়ার পর রমেশ আপনাকে কি সব শোনাল।'

'ছেড়ে দাও ভাই পাঁচু। মূর্খ আর পশু সমান। আমি রমেশটাকে একটা মানুষের মধ্যেই ধরি না। ওর আবার কথা কি, কি তার মূল্য। আস্ত ছাগল।'

শিবনাথ তৎক্ষণাৎ কাটতে পারল না। কিন্তু চুপ করে রইল। তাদের দুজনের কথায় যোগ দেবে না ঠিক করে আর কিছু প্রশ্ন করল না।

মাস্টার শিবনাথের দিকে তাকাল।

'মশাই, হ্যাভস এণ্ড হ্যাভ-নট্‌স-এর লড়াই চলেছে এখন। বিদ্বান মূর্খের প্রশ্ন আজ অবান্তর। ক্লাশ থ্রি'র বিদ্যে নিয়ে ও আমাকে অপমান করবে না তো কি? চুরি-চামারি ক'রে দুটো পয়সার মালিক হয়েছে যখন।'

একটু চুপ থেকে মাস্টার আবার বলল, 'কিন্তু করুক না অপমান পাঁচু ভায়াকে। সৎপথে থেকে রীতিমত ম্যানুয়েল লেবার করে ভাল রোজগার করছে, ভবিষ্যতে আরো করবে। যদি ড্রিংক করে আর না ওড়ায় তো পাঁচুও এই ক্যানাল সাউথ রোডের কাছাকাছি জায়গা কিনে বাড়ি করতে পারে, সেই ক্ষমতা রাখে।'

'রমেশ জায়গা কিনছে নাকি?' কৌতূহল দমন করতে পারল না বলে নয়, একেবারে চুপ থাকাটা প্রতিপক্ষকে সমর্থন করার অর্থ দাঁড়াতে পারে চিন্তা ক'রে শিবনাথ মুখ খুলল। যদিও রমেশের কাছ থেকে এ-ধরনের ইঙ্গিত সে আগেই পেয়েছে।

কিন্তু বিধু মাস্টার বা পাঁচু শিবনাথের প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'শেখরকেও কিছু করতে পারবে না ও।' কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বিধু মাস্টার বলল, 'ওষুধের নামে জল খাইয়ে হারামজাদা দু'হাতে রোজগার করছে বেশ।' কথা শেষ করে মাস্টার হাসল।

'অসতের শাস্তি আছে, দেখুন না আপনারা। কথায় বলে পাপ বাপকে ছাড়ে না।'

মাস্টার বা শিবনাথ কারো দিকে না তাকিয়ে পাঁচু ক্ষুর, বুরুশ ও নিজের হাত ধুয়ে পরিষ্কার করল। তারপর রাস্তার দিকে চোখ রেখে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল।

রাস্তায় বেরিয়ে দুটো কথা জানতে না পেরে শিবনাথের ভয়ানক আফশোস হ'ল এবং হাসিও পেল।

মাস্টার হ্যাভস-এর দলে রমেশ, শেখর ডাক্তার এবং ভাল অর্থে পাঁচুকে ফেলেছে। হ্যাভ নটস-এর দলে ফেলেছে অমলকে, বলাইকে এবং নিজেকে।

বাড়িতে বাকি ছ'ঘর কোন্ দলে পড়ে? কে· গুপ্ত বেকার সুতরাং নটস-এর দলে। কিন্তু বিমল, কমলা নার্স, প্রীতি-বীথির বাবা ভুবনবাবু, প্রমথদের পরিবার এবং শিবনাথ?

শিবনাথ আর একদিন মাস্টারকে কথাটা জিজ্ঞাসা করবে। করবে কি। লোকটার সঙ্গে বেশি কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। ওর মুখের উৎকট পচা গন্ধটা প্রায়ই এসে নাকে লাগে বলে।

তারপর হাসি পেল মাস্টারের গালভরা পুরু দাড়ির কথা ভেবে। আজ কি ও মুখটা কামাবে, সেই মতলবেই সেলুনে ঢুকল? কিন্তু শিবনাথের মনে হ'ল না শনিবারের আধখানা স্কুল তাড়াতাড়ি শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে বিধু মাস্টার দাড়ি কামাবার তাগিদে পাঁচুর দোকানে এসে ঢুকছে। বরং শিবনাথ যখন বেরিয়ে আসে, তখন পাঁচুর সঙ্গে মাস্টারকে আর একটা বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় ডুবে যেতে দেখেছে। ওপরের দুখানা ঘর নিয়ে পাঁচু কি করছে। 'দোতলায় দোকান খুলে এ-তল্লাটে সুবিধে নেই। চাল ডাল কি মনোহারী দ্রব্য তো নয়ই, চায়ের দোকানও সুবিধা হবে না। ভাতের হোটেল মন্দ হবে না, কিন্তু সেই হিসেবে কামরা দুটো খুবই ছোট। কাজেই—'

'পরিবার নিয়ে লোকে থাকবে সেই হিসেবে ভাড়া দিতে বসছেন আপনি?' পাঁচু মাথা নেড়ে জানিয়েছে সেই লাইনেই সে চিন্তা করছে না। দু'মাস ভাড়া ঠিক পাওয়া যাবে। তারপর আরম্ভ হবে নটখটি। 'হারামী' ব্যাবসা। তার চেয়ে পাঁচু ঘর খালি ফেলে রাখবে, তবু ডেকে এনে সে-ধরনের ভাড়াটে বসাবে না। তা-ছাড়া বড় রাস্তার ওপর ঘর। উঠতি জায়গা। এখন এসব ঘর অন্যভাবে খাটাবার সময় এসেছে। ব্যাবসা-বাণিজ্য করবার মতলবে কেউ যদি ভাড়া নিতে সাহস না পায়, পাঁচু গ্রাহ্য করবে না। তার অন্যরকম ইচ্ছা আছে।

'কি শুনি না?' চোখ দুটো বড় করে মাস্টার মশায়কে পাঁচুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেছে। 'আমার কাছে তুমি ডিসক্লোজ করতে পার পাঁচু।' নীরব থেকে পাঁচু যখন সিগারেট টানছিল বেশ একটু অধৈর্য হয়ে হাত নেড়ে মাস্টার বলছিল,—'গরুগাধা ঠেঙ্গিয়ে মানুষ করার লাইনে আমি আছি সত্য, কিন্তু তোমাদের বলব কি ভাই, যতক্ষণই করি, ততক্ষণই করি, পড়াই, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের চোখে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ফুটাই। কিন্তু কি হয় তাতে, কি হল? এদেশে এই সেক্রিফাইসের কোনো মূল্য নাই। ষোল বছর মাস্টারি করে ক'টাকা মাইনে পাচ্ছি আজ? তাই বলছিলাম, ওই যখন পড়ানো তখনই, তাছাড়া অন্য সময় ঘোড়ার ডিম; আমি এ-বিষয়ে চিন্তাও করি না। বরং বিজনেসের লাইনে মাথাটা একটু আধটু খেলাতে চেষ্টা করি। কিন্তু ক'রে করব কি। আমার পুঁজি নেই। কি মশাই, আপনাকে বলিনি ছেলেটাকে দিয়ে বেগুন কপির ব্যবসা করবার কথা ছিল?' মাস্টার শিবনাথের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে পরে আবার পাঁচুর দিকে তাকিয়েছে। 'মমতা সাধনার পড়াশুনা যে বেশিদিন চালাতে পারব, সেই ভরসাও পাচ্ছি না। অথচ মাথায় তো এক একটি তাল খেজুর গাছ হয়ে উঠল। আমার মনে হয় ছেলেদের চেয়ে মেয়ে সন্তানের গ্রোথ বাংলাদেশে বেশি। আপনার কি মনে হয়?'

আবার শিবনাথের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল বিধু। শিবনাথ কিছু মন্তব্য করেনি।

'তাই এক এক সময় যখন চিন্তা করি মাথা গরম হয়ে যায়। যাকগে—' পাঁচুর চুল কাটার যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে মাস্টার বলছিল, 'ওপরের দু'খানা ঘর রেখে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছ ভায়া। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম যদি আর কোনো ব্যবসা বা দোকান-টোকান স্টার্ট দাও তো বড় ছেলেটাকে ঢুকিয়ে দিই। তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করুক, শিখুক। কি,—না আমার অত সম্মানবোধ নেই। কেন থাকবে। এদিনে থাকা উচিত নয়। কথায় বলে ডিগনিটি অব লেবার। কাগজে দেখছেন তো জহরলাল আজকাল বক্তৃতা দিতে শুরু করেই 'ম্যানুয়েল লেবার' 'ম্যানুয়েল লেবার' বলে চীৎকার করছেন। এটার ওপর আমারও শ্রদ্ধা আছে। দিন দিন যেমন বেকার সমস্যা বাড়ছে, কায়িক শ্রম ছাড়া আমাদের উপায় কি। তা ছাড়া পয়সা রোজগার নিয়ে কথা, কি বলেন আপনি ?'

শিবনাথ নীরব হেসে মাথা নেড়েছে।

পাঁচু একটু অবাক হয়ে মাস্টারের কথা শুনছিল।

'ছুরি-কাঁচি হাতে নিতে ছেলে রাজী হবে তো ?'

'হবে কি না-হবে জানি না। কিন্তু আমি রাজী ছিলাম। রাজী হবে না গিন্নী। ও-ই তো সংসারটাকে ডোবালে আমার।'

পাঁচু হাসল।

'তবে আর একথা বলে লাভ কি ?'

'আহা', প্রবল বেগে মাথা নেড়ে মাস্টার তৎক্ষণাৎ পাঁচুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'সেই জন্যই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম, ছুরি-কাঁচি হাতে নিতে লজ্জা করে, কিন্তু দাঁড়িপাল্লা হাতে নিতে তো লজ্জা করবে না ! যদি তাতেও রাজী না থাকো তো একজনের পিঠে আমি পায়ের খড়ম ভাঙব না ? তখন তোমরা দেখবে। তাই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে ওপরের দু'খানা ঘর নিয়ে কি ধরনের ব্যবসায় হাত দেবার মতলব করছে ভায়া।'

'এখনো পাকাপাকি কিছু ঠিক করিনি। দেখা যাক্।' সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে পাঁচু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করছিল।

ঘোলাটে অপরিচ্ছন্ন চোখ তুলে মাস্টার অত্যন্ত উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পাঁচু কিছুতেই আসল মতলব প্রকাশ করল না। হয়তো শিবনাথকে এখানে দেখে ইতস্ততঃ করছে চিন্তা করে শিবনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

আলাপের এই পর্যন্ত শুনে এসেছে সে।

কিন্তু তারপর যে বিধু মাস্টার শেভ করার কথা তুলবে ভরসা করতে পারছিল না শিবনাথ।

পাঁচুর দোকানের সামনের কাঁচা নর্দমা থেকে একটা ঢাউস মাছি উড়ে এসে বিধু মাস্টারের গালের পুরু গালিচার ওপর চেপে বসেছিল।

তা-ও তখন খেয়াল ছিল না মাস্টারের। দৃশ্যটা মনে পড়ে শিবনাথ হাঁটা অবস্থায় হাসল দু' তিনবার। এসব কথা চিন্তা করে সে খালপারের পিচঢালা ছায়ায় ঢাকা রাস্তাটায় হাঁটল কতক্ষণ। আজ শিবনাথের মন হাল্কা বেশি এই কারণে যে, আগের

এক কাপ চায়ের দাম এবং আজকের চায়ের দাম সব সে মিটিয়ে দিয়ে এসেছে। এবং দু'দিনের দাড়ি কামানোর পয়সা।

পঞ্চাশ টাকা হাতে তুলে দেবার পর শিবনাথ চাকরীর সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে বেরোচ্ছে বলে দু'টো টাকা স্ত্রীর কাছে চেয়ে নিয়েছিল।

শহরে একবার যাবে কিনা ভাবছিল শিবনাথ। শিবনাথের ইচ্ছা করছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল তার খালের বুকের খেলনার টুকরোর মত নীলচে ঢেউগুলো ভেঙে কাঠ-বোঝাই খড়বোঝাই দু'টো বিশালাকৃতি নৌকার গড়িমসি করে শহরের দিকে এগোতে থাকার দৃশ্য দেখে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখা তার হ'ল না।

ঘেচাং করে কালো রঙের বড় একটা গাড়ি তার প্রায় শরীর ঘেঁষে দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল গোলাপের কুঁড়ির মতন ফুটফুটে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে। বলতে গেলে প্রায় একসঙ্গে এতগুলো শিশু প্রকাশিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন বেদনা সহ্য করার পর বাংলাদেশের একটি মেয়ে এমন জীবন্ত সুন্দর থাকে কি করে, সেদিন চিন্তা করল শিবনাথ। পারিজাতের স্ত্রী পারিজাতের পাশে দাঁড়িয়ে। বাচ্চাগুলোকে জলের ধারে পাঠিয়ে দিয়ে কাঠ ও খড়ের বৃত্তান্ত শুনে উৎসাহে বৈশাখী চাঁপার অগ্নিময় বিভা নিয়ে জ্বলছিল মেয়েটি।

পড়ন্ত রোদের আভায় টলমল করছিল দেহের যৌবন। তার চেয়ে ক্ষীণকায় পারিজাত। কিন্তু প্রফুল্ল। শিবনাথের কানের গোড়ায় একটা দু'টো চুল সাদা হয়ে গেছে, পারিজাতের তা-ও না। অত্যন্ত কচি, অফুরন্ত সজীবতা প্রতিটি চুলে।

খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল শিবনাথ, একসময় সঙ্কোচে একটু সরে দাঁড়াল। শিবনাথের মনে হল যেন বৃষ্টিধোয়া সদ্যফোটা কদম ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল তার চারপাশে।

মনিব ও মনিব-পত্নীকে দেখে নৌকার মাঝিরা চিনল। স্ফীতকায় নৌকা দু'টো দাঁড়িয়ে পড়েছিল খালের মাঝখানে।

তারপর নৌকা আবার চলতে লাগল।

শিশুরা জল ছুঁয়ে কলরব করতে করতে ফিরে এল।

পারিজাতগিন্নী যেন এতক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে বলছিলেন, 'চলো চলো, আর পারি না। এদের নিয়ে কি একটু সময় একা থাকা যায়। আমার সব সুখ দস্যির দল কেড়ে নিয়েছে। চলো চলো গাড়ির গর্তে। তারপর গিয়ে ঢুকব তোমার হোটেলখানায়। আমি বলছি এখুনি ওদের পাঠিয়ে দাও একটা কনভেন্টে। আমি দিনকতক হাড় জুড়িয়ে বাঁচি। এরাও মানুষ হোক।' পারিজাত হেসে গিন্নীর ক্লান্তি উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। 'একটা ডজ গাড়ি কেনা হচ্ছে কালপরশু। আর ভাবনা নেই। কাউকে সঙ্গে দিয়ে ওদের এখন থেকে বড় গাড়িতে সকালে বিকালে বেড়াতে পাঠাতে পারবে। ছোটটাকে নিয়ে বেরুব আমি আর তুমি। যতক্ষণ ইচ্ছা দু'জন একলা থাকতে পারব।'

মা ঘাড় ঘুরিয়ে দাসিদের গাড়ির ভিতর ভব্য হয়ে বসা পরীক্ষা করছিলেন। তাই শিবনাথ স্বামীর সান্ত্বনার প্রতিক্রিয়ার ছায়াটা তাঁর মুখে দেখতে পেল না। গাড়িটা চলে যাওয়ারও অনেকক্ষণ পর শিবনাথ গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। একটা মোষের গাড়ি যাচ্ছে তার গা ঘেঁষে। শিবনাথ আর দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে লাগল।

একুশ

রাত্রে প্রস্তাব শুনে রুচি চুপ ক'রে বসে রইল। তার ব্যবসা করা ছাড়া এ দিনে উপায় নেই। শিবনাথ বউবাজারের বন্ধুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল। ঘর অন্ধকার।

মোহিত চাকরি ক'রে করত কি! সামান্য ফেরিওয়ালা থেকে এখন গাড়িবাড়ির মালিক। বন্ধু বেশ্যা নিয়ে থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, এসব প্রকাশ করল না যদিও শিবনাথ।

রুচি বলল, 'হয়তো ছোট ব্যবসাও আরম্ভ করতে যে পুঁজি দরকার, মোহিতের সেটা ছিল, তাই ব্যবসাতে নামতে পেরেছিল। তোমার সে পুঁজিও নেই।'

মঞ্জুর কানে দু'টো রিং এবং রুচির গাত্রাভরণের শেষ চিহ্ন গলার বিছা-হারটা। কিন্তু শিবনাথ মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহস পেল না। একটু সময় চুপ থেকে বলল, 'না, এখন পুঁজি যোগাড় করা এখানে শক্ত। দিনকতক না গেলে, না থাকতে পারলে কারো কাছে লোন্-ফোন্ও পাওয়া যাবে না।'

'তার চেয়ে এখন যদি জোটাতে পার দু'একটা ট্যুইশানিই করতে থাকো। দেখি দু'একমাসের মধ্যে। আমি আর একটা চাকরির দরখাস্ত ক'রে এসেছি আজ।'

'কোথায় ?' শিবনাথ ঢোক গিলল। অন্ধকারে স্ত্রীর চেহারা দেখল না। 'কোথায় ?' আবার সে প্রশ্ন করল।

'আর একটা ইস্কুলে।'

'অ, তোমার ইস্কুলের দিকেই ঝোঁক বেশি।' শিবনাথ হাসল না। হাসির মতন গলার শব্দ হ'ল। 'কোন্ স্কুলে ?'

রুচি তৎক্ষণাৎ কথা কইল না।

শিবনাথও চুপ ক'রে গেল।

'সম্মান রেখে স্কুল ছাড়া আর কোথাও মেয়েরা চাকরি করতে পারে না, কেউ পারছে না, কতদিন তো বক্তৃতা করেছ। এদিকেও। মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাসায়। না কি এখানে এসে মত বদলেছে তোমার ?'

কথাটা সত্য বলে শিবনাথ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারল না। একটু সময় চুপ থেকে পরে গলার সুর নরম ক'রে বলল, 'আশ্চর্য', আমি তো সে-কথাই বলছি। স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও তোমার চেষ্টা করার প্রবৃত্তি হবে না। মরে গেলেও না। আমি এখনো বলছি। সেখানে বুঝি মাইনে বেশি ? কত ?'

'কুড়ি টাকা বেশি।'

'খুব ভাল। হবে কি ?'

'তা বলা যায় না। চাকরি যাওয়া এবং চাকরি হওয়ার অনিশ্চয়তা এক।'

'আমি জানি।' শিবনাথ বলল, 'তবু ধরা যাক সেই চাকরি তোমার হয়েই গেছে। ভালই হবে। আমি ভেবেছি একটা দু'টো ট্যুইশানি করব। এখানে ভালো লোক, বড় লোক অনেক আছে। ভাল পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াতে মাস্টার রাখে। আজ বিকেলে একটা খবর পেয়েছি। রমেশ রায় আমাকে বলল, পারিজাত-গিন্নী একজন প্রাইভেট টিউটর খুঁজছে।'

'দেখা করতে গিয়েছিলে কি ?' রুচি প্রশ্ন করতে শিবনাথ তৎক্ষণাৎ বলল, 'যাব।' কাল আমার জামা-কাপড় ধুয়ে আসবে। ভাল পোশাক ছাড়া ওদের সামনে যেতে লজ্জা করে রীতিমত। কত বড়লোক !'

ব'লে শিবনাথ পারিজাতের সংসারের উচ্ছলতা, স্বাস্থ্য, শ্রী ও সমৃদ্ধির একটি আলেখ্য রুচির সামনে তুলে ধরল।

সন্ধ্যার পর বেড়ানো শেষ ক'রে দ্বিতীয়বার যখন সে রমেশের দোকানে খেতে গিয়েছিল, রমেশ তৎক্ষণাৎ একটা চিঠি লিখে নিজের নামটা তলায় বড় ক'রে সই ক'রে পারিজাত-গিন্নীর কাছে পাঠাতে চেয়েছে। শিবনাথ কাল যাবে বলে এসেছে। ওখানে তার হয়ে যাবে।

রুচি আর কথা বলল না।

শিবনাথ বলল, 'এখন আমার ইচ্ছা ওই ভাল ট্যুইশানিটা যদি পেয়ে যাই এবং তোমারও সেটা হয়ে যায় তো শহরের দিকে আপাততঃ ঘর না খুঁজে ক'দিন কষ্টে-সৃষ্টে এই টিনের ঘরেই চালিয়ে যাব।'

একটু অবাক হয়ে রুচি প্রশ্ন করল, 'তারপর ?'

'অতিরিক্ত ঘরভাড়া বাবদ যে টাকাটা যেত সেটা হাতে জমবে। বছর-খানেকের মধ্যেই ওটা ছোটো-খাটো একটা পুঁজি হয়ে দাঁড়াবে। আমার তো মনে হয়, আমি একটা দোকান-টোকান খুলে বসতে পারব। তাই করা উচিত। মানে বিজনেস্ ছাড়া বুদ্ধিমানেরা এখন অন্য কিছুর চেষ্টাই করছে না।'

কিসের দোকান খোলার মতলব শিবনাথের মাথায় এসেছে রুচি প্রশ্ন করলে না যদিও।

এবং বাকি রাত সে আর কথাই বলল না। শিবনাথের ঘুম পাচ্ছিল না। ছোট্ট ঘরের অন্ধকার মেঝেয় পায়চারি করতে করতে সে ভাবছিল, কাল বিকালে পারিজাতের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। ওদের কথা উঠতেই এখন এই ঘরের গুমোট অন্ধকারেও শিবনাথের নাকে লাগল সদ্য বৃষ্টি-ধোয়া টাট্‌কা কদমের গন্ধটা।

এই গন্ধ তেল, স্নো, পাউডার, সাবান, আতর, এসেন্সে নেই। এ-গন্ধ থাকে ছেলেমেয়েদের জন্মের পরও কদমের মত অটুট-স্বাস্থ্য যুবতীর দেহে। বেগবতী নদীর মত দীপ্তিশালিনী দীপ্তি রায়ের গায়ের মধ্যেও এই গন্ধ এসে বাসা বেঁধেছে। যদি বলতে পারত শিবনাথ রুচিকে শান্তি পেত।

কিন্তু সেই শান্তির পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়ে কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের সেকেণ্ড টিচার ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন। শিক্ষিকার ক্লান্তি, অবসন্নতা ভাঙাতে বিন্দুমাত্র

চেষ্টা না করে এক সময় অন্ধকারে হঠাৎ দাঁড়িয়ে শিবনাথ চিন্তা করল পারিজাত এখন কি করবে। যদি দীপ্তি ঘুমিয়ে পড়ে তো স্ত্রীকে জাগাতে পারিজাত কোন্ 'মেথড্' অবলম্বন করবে। ওর যখন পয়সার অভাব নেই। স্ত্রীর অফুরন্ত যৌবন শেষ করতেও যখন কোনো পন্থাই আর বাকী রাখছে না। তবু শেষ হচ্ছে কই। শিবনাথ মনে মনে হাসল আর ঈর্ষা করল অদৃশ্য দম্পতীকে।

কেবল বারো নম্বর না।

এগারো নম্বর ঘরেও আর একজন রাত জেগে পায়চারি করছিল।

কে. গুপ্তর স্ত্রী সুপ্রভা।

বেবি সন্ধ্যার পর আর বাড়িই ফেরেনি, কাজেই সন্ধ্যার চা-টুকু খাওয়া হয়নি সুপ্রভার। পায়চারি করতে করতে কি যেন নিজের মনে বিড়বিড় করছিল। সুপ্রভার মনে হচ্ছিল ওর জ্বর হয়েছে। নিজের নিশ্বাস নিজের কাছে গরম ও ভারী ঠেকছিল। একটু বাতাস লাগবে আশায় দরজার ছিটকিনি তুলে চৌকাঠের বাইরে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে চুপ ক'রে থাকে। কেউ নেই। উঠোনটা অন্ধকার। কিন্তু কেউ থাকলেও সুপ্রভা কথা বলত না। এ বাড়িতে এসে কারো সঙ্গে কথা না ব'লে কে. গুপ্তর গিন্নী নিজের আভিজাত্য রক্ষা করেছে। সর্বস্ব হারিয়েও। যেন ওর কী আছে এখনো হারায়নি, এমন একটা ভাব ওর চোখে-মুখে দেখছে সবাই। অবশ্য সব সময় তারা তাকে দেখতে পেত না। বস্তির লোককে বার বার তার অসামান্য সুন্দর মুখখানা দেখাতেও ঘৃণা করে বৈকি।

তাই সুপ্রভা আঠারো ঘণ্টা শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। আগে বই পড়ার অভ্যাস ছিল। এখন তা গেছে। এখন রামায়ণ কি মহাভারতের মত একটা কিছু সময় সময় পড়তে খোঁজে। কিন্তু মনে মনেই খোঁজা হয়। এ বাড়ির কাউকে কোনদিন ও জিজ্ঞেস করেনি সে-সব বই কারো ঘরে আছে কিনা। রামায়ণ মহাভারতের অভাবে অগত্যা হাত বাড়িয়ে একটা কাঠের বাক্সের ওপর থেকে বেবির ইস্কুলের পাঠ্য বাংলা বইখানা টেনে নিয়ে রমেশ দত্তের 'সংসার' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত রচনাটা পড়ে। সেই তালগাছ ঘেরা কালো দীঘির জলে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মেয়েকে তীরে দাঁড় করিয়ে জননীর স্নান করা, সর্বাঙ্গ শীতল করা আর জল থেকে মাথা তুলে তালপাতার সাঁই সাঁই শব্দ শোনা। বৈশাখের শুকনো খটখটে বাতাস।

পড়া হয়ে গেলে সুপ্রভা বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাকিয়ে থেকে চিন্তা করে, মনে করতে চেষ্টা করে বেবি কোনদিন এই অংশটা পড়েছিল কিনা। কিন্তু সুপ্রভার মনে হয় পড়েনি। এ বইয়ের প্রথম গল্পটা সবে শুরু করেছিল। তা-ও শেষ হয়নি। তারপর আর বই খোলা হয়নি। বইটা তাই এখনো নতুন আছে। একদিন চাকর বাঞ্ছাকে দিয়ে সুপ্রভা বেবির সবগুলো বইয়ের মলাট লাগিয়ে দিয়েছিল। এবং প্রত্যেকটি মলাটের ওপর সুপ্রভা তার দামী ফাউন্টেন পেন দিয়ে বেবির পুরো নাম লিখে দিয়েছিল।

আর একটাও অবশ্য বই নেই ঘরে। রুণু, বেবি, কি স্বামীর, কারোর না।

এখানে আসার আগে ঘরের সমস্ত কাগজপত্র বই ওজন দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এটাই দেয়নি বিক্রি করতে, ভীষণ আপত্তি করেছিল বেবি। বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া। সেই বই সকলের সঙ্গে বস্তিতে চলে আসে। এখন অবশ্য কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর কে. গুপ্তর রং-চটা অ্যাশ-ট্রে, একটা শূন্যগর্ভ চশমার খোল ও রুণুর কুড়িয়ে পাওয়া শ্বেতপাথরের একটা ভাঙা প্যাগোডার পিছনে শুয়ে থাকা বইটার দিকে ভুলেও বেবি তাকায় না। ভুলে গেছে এমন একটা বই তার ছিল। ওপরে মার হাতের লেখা ওর ইস্কুলের নাম কুমারী শুভ্রা গুপ্ত।

কিছুদিন পর ইস্কুলের জন্যে রাখা নামটাই বেবির মনে থাকবে কি। সুপ্রভা চিন্তা করে। তারপর আলস্যের হাই ভেঙ্গে বইটা বাক্সের ওপর যেমন-তেমন ক'রে রেখে দিয়ে চায়ের তৃষ্ণায় কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে ওরা এল কিনা।

রুণু বেবি ঘরে ফিরলে সুপ্রভা আর এক মিনিট জেগে থাকতে চায় না। অনেক-দিনই তেলের অভাবে ঘরে আলো জ্বলে না। কাজেই আলো নেভানোর দরকার হয় না। দরজার পাল্লা দু'টো ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেই হ'ল।

যেন বেবির ঘরে ফেরাতক চায়ের তৃষ্ণা। তারপর সেই তৃষ্ণা চলে যায়। যেমন রুণুর ওলকপি কি দু'টো বেগুন লোকের ক্ষেত থেকে কুড়িয়ে আনার অপেক্ষায় অনেক রাত জেগে থেকে সুপ্রভা জঠরের মধ্যে জেগে ওঠা ক্ষুধার কামড় গায়ের মাংস পর্যন্ত চিবিয়ে খাচ্ছে অনুভব করে।

তারপর রুণু ফিরে এলে আর সেই ক্ষুধার কামড় থাকে না। এমন কি ছেলে যদি থলে ভর্তি ক'রে বেগুন কি কপিও নিয়ে আসে, সুপ্রভা সেগুলো আর এত রাত্রে সিদ্ধ করতে বসে না। ওরা নুন দিয়ে কাঁচা ওলকপি খেতে পারে ব'লে নিজের জন্য সে আর কিছু সিদ্ধ করে না। যেন রুণুর ছায়া দেখে তার ক্ষুধার ধার মজে যায়। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। রুণু বেবি তার ঘুম।

আজ এত রাত অবধি একটিকেও ফিরতে না দেখে সুপ্রভা ছট্‌ফট্‌ করছিল। শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজার পাল্লা খুলে বাইরে মুখ বাড়িয়েছে। কান পেতে আছে উঠোনে পায়ের শব্দ জাগে কিনা।

আর জেগে আছে ন'নম্বর ঘর।

সেই রাধাবাজারের ঘড়ির দোকানের প্রাক্তন কর্মচারী। আলসার ও বাত ব্যাধিগ্রস্ত ভুবন। প্রীতি-বীথির বাবা। বহুকাল ঘড়ির দোকানে কাজ ক'রে ভুবনের সময়জ্ঞান এ-বাড়ির সকলের চেয়ে বেশি প্রখর। এখনো আছে। নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিয়েছে পর থেকে সময়ের আন্দাজ যেন আরো নির্ভুল হয়েছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ হুট্‌ ক'রে কোন কারণে ঘুম ভেঙ্গে যেতে ভুবন অন্ধকারে বিড় বিড় করছিল। 'রাত বারোটা বাজে, আমি বেশ টের পাচ্ছি, উঠোনেও আর লোকজন নেই। ঘরে ফিরে সবাই দোরে খিল দিচ্ছে। বীথিটাই এলো না।'

'আশ্চর্য', তুমি ওর চাকরির পয়লা দিন থেকেই শুরু করেছ। যেমন করেছিলে প্রীতির বেলায়। কেমন এখন জব্দ তো! ওর পিছনে বেশি লেগেছিলে বলেই তো

আমার মনে হয় তোমার আফিং-এর মাত্রা এক তোলা থেকে সেই যে রাগ ক'রে মেয়ে আধ তোলায় নিয়ে এসেছিল পয়সায় কুলোতে পারছে না বলে, আজও সেই রাগেই ও আর বাড়াচ্ছে না। দৈনিক এক তোলা কেন দুই তোলাও তোমার জন্যে এখন খরচ করতে পারে। কিন্তু তোমার মেয়ের আর ইচ্ছে নেই তোমাকে সুখ দেওয়া। তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত।'

'আহা, আমি কি ওরা বেশি রাত্রি বাইরে থাকে ব'লে সে সব কিছু বলতে চাইছি নাকি। না, ওরা আমার সেই ধরনের মেয়ে। আমি বলছিলাম, বাইরে হিম পড়ছে। তাছাড়া, ট্রাম বাস তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। বোধ করি, অনেক জায়গায় গেছে বন্ধ হয়ে। তাছাড়া, ক্ষুধাও তো পায়। সেই কখন চাকরির আট ঘণ্টা ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে ছাই-ভস্ম যাহোক একটা কিছু মুখে পর্যন্ত না দিয়ে আবার বেরুল। কোথায় গেল। সারাদিনের অভুক্তই বলা চলে মেয়েটাকে। সেই ভাবনায় তো কাঁদছিলাম। বাপ হয়ে মন মানে না।'

কিন্তু স্বামীর এই দুঃখ প্রকাশকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না ক'রে বীথির মা বাড়ির আর পাঁচটা জাগ্রত লোককে শুনিয়ে বলল, 'সিনেমার নেশা ওর ছোটবেলা থেকে নেই। রেস্টুরেণ্টে ওর খেতে ভীষণ ঘৃণা। সাহিত্য কি সংস্কৃতি সম্মেলন-টম্মেলন ছাড়া ও কোনো সভা-টভা পছন্দ করে না। তুমি সব জান। জেনেও এমন বাড়াবাড়ি করছ যখন তখন তার ফল কী হবে জান। বীথিকে বলে রেখেছিলাম, চাকরি হলে, তোর বাবার আফিং-এর নাড়ি, তোর টাকা থেকে একপো করে দুধ রেখে দিস্। রাগ ক'রে তাও করবে না। মনের কষ্টে।

শুনে ভুবনের মনেও কম কষ্ট হ'ল না। বাড়ীর পাঁচটা ঘুমন্ত লোককে জাগিয়ে তোলার মতন গলা বড় ক'রে বলল, 'কী মুশকিল! কী ভীষণ লোক তুমি। আমি কি আমার মেয়ের ঘরে ফেরা তক দুশ্চিন্তা করব না? ট্রাম বাসের অ্যাক্সিডেণ্ট আছে। রায়ট রাহাজানি তো শহরে এবেলা ওবেলা। আমার বীথির মুখখানা না দেখা তক আমি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারব কেন।'

'বেশ এক ঘুম তো ঘুমিয়ে উঠেছ।' প্রীতি-বীথির মা গলাটাকে এতটুকু মোলায়েম হতে, গলতে না দিয়ে রাগের ভঙ্গিতে বলছিল, 'এক বাটি দুধ সুজি খেয়ে সন্ধ্যাসন্ধ্যি যে সুখের ঘুমটি তোমার নিজের চাকরি নেই অবস্থায়ও ঘুমিয়ে উঠেছ, একবার সেইজন্যে মেয়েদের কাছে এতটুকু কৃতজ্ঞতা না থেকে কি করে কেবল তাদের চালচলতির নিন্দা করছ, এইটেই আমি রাতদিন অবাক হয়ে ভাবি। তোমার হ'ল কি। আলসারে আমবাতে তোমার মগজটা এখনো খেতে পারছে না কেন, কোন জন্মের মত নষ্ট করে দিচ্ছে না চোখ কান। গায়ের শুকনো মাংস নিয়ে টানাটানি করে আর লাভ কি। কলে কাজ সারুক। একবারে সব শেষ হয়ে যাক। মেয়ে দু'টোও হাড় জুড়িয়ে বাঁচুক। আমিও বাঁচি। আমারও আর সুখের বন্ধনে এখানে আটকা থেকে নর্দমার পচা গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছা নেই, চলে যাব সেওড়াফুলি না হয় কদমতলায়।'

সেওড়াফুলি ভুবনের স্ত্রীর মাসির বাড়ি, কদমতলায় থাকে দূর-সম্পর্কিত এক খুড়ি। ঝগড়াঝাঁটি বাধলেই স্ত্রী যখন স্থানান্তরে সরে পড়ার বাসনা জানায় ভুবন চুপ

করে এবং তখন তাকে সবচেয়ে বেশি অসহায় অথর্ব মনে হয়।

আর জেগে আছে প্রভাতকণা।

স্বামীকে মাঝখানে দাঁড় না করিয়ে সরাসরি সে গলা বড় ক'রে বাড়ির লোকদের শোনায়, 'বেশ তো, সুধীরের সঙ্গে আমার মেয়ের ভাব ; হ্যাঁ,—সুধীরের সঙ্গেই আমি মেয়ের বিয়ে দেব। দূর-সম্পর্কের মামা। আমার জ্যাঠশ্বশুরের মেজ মেয়ে কামদার মামাতো ভাই। সেই সুবাদে আমার মামাতো ভাই। সেই সুবাদে হ'ল সুনীতির মামা। বিয়ে হ'লে নিন্দের কিছু থাকে না! সুধীর? ওর বাবা শিলচরে মদের দোকান দিয়ে লাখপতি। বালিগঞ্জে জায়গা কিনছে। সুধীর তোদের পাঁচজনের কথায় এবাড়ি আসবে আর আসবে না, কেমন? বড় যে সব নিন্দে-চর্চা শুরু হয়েছে ওকে আর আমার মেয়েকে জড়িয়ে—'

একটু সময় কান পেতে থাকলে বোঝা যায় ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি ক'রে প্রভাতকণা গত রাতের ঝগড়ার জের এ-রাতে টেনে এনে একলা বকবক করছে। এক সঙ্গে চার পাঁচটা কলেরা কেসের খবর পেয়ে বেলা দু'টোয় শেখর সেই যে ওষুধের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে পাগলাডাঙ্গায় ছুটে গেছে, কখন ফেরে ঠিক নেই। হয়ত রাত দু'টো বাজবে। সুনীতি খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে আছে। এখন স্বামী ফেরা তক এই দীর্ঘ অবসর আর কোনোরকমে কাটাবার সুবিধা না পেয়ে প্রভাতকণা পায়চারি ক'রে ক'রে কালকের টিপ্পনিগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিয়ে চলছিল।

কিন্তু কোনো ঘর থেকে আর উত্তর নেই। যেন সব মরে আছে, সবাই ঘুমে অচৈতন্য। কিন্তু এটা অসম্ভব। বাকি এগারো ঘরের কেউ না কেউ রাত্রির এক সময়ে জেগে থাকে। অভিজ্ঞতায় তা জেনে রেখেছে বলে প্রভাতকণা নিশ্চিন্ত হয়ে গলাটা উঠোনের দিকের জানালার কাছে ধরে রেখে আর পালিশ ভাষা না, নিজস্ব খরখরে শব্দগুলো প্রয়োগ ক'রে যে-ই জেগে থাকুক, শুনিয়ে বলল, 'হুঃ, আমার মাইয়্যার তিন কুড়ি বছর অইচে। ত'গ গোষ্ঠীর জন্মের আগে সুনীতির জন্ম কিনা। সেই বুঝ নিয়া তোরা সুখে থাক। আমার সুনীতির বিয়্যা অয় কি না অয় চোখে দেখবি। এই ফাল্গুনে। তোদের গোষ্ঠীর নাকের সামনে দিয়া আমার মাইয়্যা বরের হাত ধইর্যা এখান থন যাবে।'

আর শব্দ হচ্ছিল কমলার ঘরে। ঘরের ভিতর না, ঘরের দরজার মাথায় ঝুলানো তালাটার শব্দ। বাতাসের বাড়ি খেয়ে তালাটা কখনো লাগছিল চৌকাঠে, কখনো পাল্লার গায়ে। আর ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দ করছিল।

যেন কমলার হয়ে ওর ঘরের তালাটাই প্রভাতকণার কথার জবাব দিয়ে চলেছে। 'আমি মাইয়্যার বিয়া দিমু।'

'বিয়েকে আমি কাঁচকলা দেখাই।'

'আমার মেয়ের বিয়ের বয়স কিছু পার হয়ে যায় নি।'

'বিয়ের বয়েসকে আমি বুড়ো আঙুল দেখাই।' যেন তালাটা ঠকাস্ ঠকাস্ ক'রে কথা কয়।

অর্থাৎ আজ সারাদিন এভাবেই কমলা প্রভাতকণাকে জব্দ করেছে। ডিউটি শেষ ক'রে সকালে ঘরে ফিরে কমলা গত-রাত্রির ঝগড়াটা শোনে। অর্থাৎ বীথির কথা শুনে ডাক্তারনী কমলাকেও জড়িয়েছে এবং তার বন্ধু শিশিরকে। সেই বীথিকে নিয়ে শেয়ালদার রেস্টুরেন্টে ব'সে খাওয়া নিয়ে।

কমলা সব শুনে কোনো কথাই বলেনি। তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়ে এক দোকানের টেলিফোন তুলে শিশিরকে ডেকেছে। বস্তির ঘরে এসে কমলার সঙ্গে এক পাতে বসে দুপুরবেলা মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ রইল শিশিরবাবুর। কমলা জ্যান্ত মুরগি না আনিয়ে বাইরে থেকে কাটা মুরগির মাংস এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে স্টোভে রান্না করল। সারাদিন স্নান ছিল না। আলুথালু চুল। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি চোখের কোণায়। সায়া শাড়ি ঢিলেঢালা ক'রে পরা। যত না শিশিরের সঙ্গে ব'সে মাংসভাত খেল তার চেয়ে হাসল বেশি শব্দ ক'রে, বাড়ির বাকি এগারোটা ঘরকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে হাসল। তারপর খাওয়া সেরে মুখ ধুয়ে সেই ভর দুপুরে দরজায় খিল দিল।

সারা দুপুর ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে দু'জনে এক সঙ্গে ব'সে চা খেল। কমলা পাতকুয়ায় স্নান করতে গেল। কমলার তুলে আনা জল দিয়ে শিশিরবাবু কমলার ঘরের সামনে রকে বেতের মোড়ার ওপর বসে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুলেন।

তারপর সাজসজ্জা ক'রে দুজনে সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গেছে। আজ রাত্রে কমলার ডিউটি নেই। ঘরে ফেরাও নেই। সেই আবার কাল সকালে। হেসে শুনিয়ে গেছে সে প্রীতি বীথি ও বাড়ির অন্যান্য সখীদের। বন্ধ দরজার গায়ে ঠকাস্ ঠকাস্ ক'রে তালাটা প্রভাতকণাকে এখন আবার যখন তা-ই জানিয়ে দিচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি খুশি হচ্ছিল প্রীতি বীথির মা। ভুবন-গিন্নী। ভুবনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বীথির মা। তালার খট্‌খটানি শুনে আবার গায়ে-পায়ে শক্তি ফিরে পেল। চীৎকার করে ব'লে উঠল 'প্রীতি-বীথির দরকার ছিল ওদের বাপ, মা বেঁচে না থাকা। আর, এক দঙ্গল ভাই-বোন। গোষ্ঠীর আহার যোগাড় করতে বেরিয়ে মেয়ে দু'টো খেটে খেটে মরতে বসেছে। কী দরকার ছিল। আমার তো মনে হয়, ওরা যদি কমলার মত বাপ-মা মরা মেয়ে হতো তো অনেক বেশি সুখে জীবন কাটাতে পারত। আমি তাই চাই। চাইছি। 'তখন মরে গিয়েও সুখ পাব।'

'একটা বয়েস হলে মেয়েদের সকাল সকাল ঘরে ফেরার সামাজিক দিকটাও দেখতে হবে। ওদের বিয়ের প্রশ্ন আছে। চাকরি করছে বলে তুমি বিয়েটা এখন থেকেই বাদ দিতে পার না।' যেন কমলার তালার মত ঠকাস্ ঠকাস্ করে ভুবনের কথাগুলোকে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিয়ে শেষটায় প্রীতি-বীথির মা শোনায়, 'দেখছ না, মেয়ের বিয়ে বিয়ে ক'রে ঘরে ঘরে কত বাপ মা মাথার চুল ছিঁড়ছে। পারছে কি? পারছে না। কপালে লেখা না থাকলে বিয়ে হয় না। হয়তো যার সাত জন্মে আর বিয়ে হবে বলে তোমরা ভাবতে পারছ না, এই কমলার বিয়ে হয়ে যাবে আগে। বাড়ির সব মেয়ের আগে। এই শিশিরবাবুই বিয়ে করবেন। যুদ্ধের আমল থেকে ডাক্তার। পরিবার আছে। থাক না পরিবার। পরিবার থাকা সত্ত্বেও মানুষ আবার

বিয়ে করে। যে ক্ষমতা রাখে।'

হয়তো রাতজাগা বীথির মার এই উক্তিগুলি শুনে সুনীতির মা, শেখর-গিন্নী, প্রভাতকণা শেষটায় উত্তেজিত হয়ে সুনীতির দূর সম্পর্কীয় মামা সুধীরের সঙ্গে সুনীতির এই ফাল্গুনেই বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বড় গলায় ঘোষণা ক'রে বসল, আর সুধীরের বাবার বিত্তবৈভব বর্ণনা করে এগারোটা ঘরকে শোনাল, যতক্ষণ না কলেরা কেস দেখা সেরে শেখর ডাক্তার ঘরে ফিরল। রাত তখন দেড়টা।

বাইশ

আর রাত জেগে রাগে খনখন করছিল মল্লিকা। বস্তুতঃ মাঝে মাঝে এমন একটা কান্ড করে রমেশ যে মল্লিকার চীৎকাব ক'রে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

এই এত রাতে একটা বড় রুই মাছের মুড়ো পাঠিয়ে দিয়েছে আর সরু চাল। 'মুড়িঘণ্ট রান্না হবে', কর্তা লোক দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠিয়েছে।

এত রাত্রে মাছের মাথা দেখে মল্লিকার মাথা গরম হয়ে গেছে।

'বলি খেতে সখ তো দিনের বেলায় পাঠালেই হয়। এখন আমি রাত দুপুরে মুড়িঘণ্ট চড়াই। বুড়ো হতে চলল জিহ্বা কমছে না। দিনকে দিন লকলকিয়ে বাড়ছেই বাড়ছে। মা—মা আমি কোথায় যাই। এই তো দুপুর বেলা চিংড়ি বাঁধা কপি হ'ল, মুগডাল রাঁধলুম ভেটকির কাঁটাটা দিয়ে, আর বেগুন দিয়ে মাছ। ওমা এর মধ্যেই ভুলে গেছে এত খাওয়া! এ্যাঁ, এখন আবার রুই-মুড়ো আর সরু আতপ চালের ঘণ্ট।' একটু সময় থেমে মল্লিকা আবার বলছে, 'বুঝলাম, কিন্তু এই ঠান্ডার রাত্রে বঁটি দিয়ে এতবড় মুড়ো এখন ফাঁক করে কে! আমার এই সংসার ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।'

মল্লিকা যখন আর্তনাদ ক'রে উঠল, শোনা গেল যেন আর এক ঘর থেকে প্রমথর দিদিমা বলল, 'কাটারি দিয়ে ফাঁক কর হিরুর মা, বঁটি দিয়ে সুবিধে হবে না।'

একটা ঘরের সাড়া পেয়ে মল্লিকা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'দিদি কান্ডটা দ্যাখো না এসে একবার। আমি কি এই ঠান্ডার রাত্রে একটু লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পারব না। অ্যাঁ, এত জ্বালাতন আমার কপালে। একটু সুখ নেই!'

'দিদি, তোমাকে একজন দিচ্ছে তাই পাচ্ছ খাচ্ছ, দশদিক থেকে তোমার আসছে। বলছ জ্বালাতন। এবাড়ি কেন, এ পাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞেস কর মাসে ক'বেলা ক'জন মাছের মুখ দেখছে। আর আমি তো দেখি রুই কই ভেটকি আর ডিম মাংস তোমার ঘরছাড়া হয় না। মিছে বললাম?'

প্রমথর দিদিমার কথায় মল্লিকা আর সাড়া দেয় না। যেন কাটারি দিয়ে মুড়োটা দু'ফাঁক করল। ঘ্যাচাং করে শব্দ হ'ল।

একটু পর আবার গলা শোনা গেল। 'তা না হয় রাঁধলুম বাড়লুম, সময়ে ঘরে ফিরলেই হয়। না সেই রাত দুটো। কী কাজ, কেমন কারবারী হতে পারে একটা

লোক যে মাসের মধ্যে দেড়দিনও সময়মত খাওয়াশোয়া হয় না।'

একথায় বাড়ির লোক আর কেউ সাড়া দেয়নি।

'এমনি তো বুকে একটু কফ জমে বেশি ঠাণ্ডা পড়লে। ডাক্তার ঠাণ্ডাটা না লাগে আমাকে বার বার বলছে, কিন্তু পারলাম না তো কয়ে কয়ে রাত-বেরাতে এই শীতের মধ্যে না বেরোতে, ঘোরাঘুরি না ক'রে একটু ঘরে বসিয়ে রাখতে, কী মানুষ!'

এবারও বাড়ি নীরব।

মল্লিকা কড়াইয়ের গরম তেলে মাছের মুড়ো ছেড়ে দিয়েছে বোঝা গেল।

'হোক নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস। আমি পারব না। আমার গায়ে আর এত বল নেই। অসুখ হলে দেব হাসপাতালে পাঠিয়ে। তখন দেখা যাবে।'

আশ্চর্য, প্রমথর দিদিমা আর কথাই বলছে না। মল্লিকার ভীষণ রাগ হয় এবার। দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে ঃ 'যা যা, যত আপদ এসে জুটবে। কেন, আর ঘর দেখতে পাও না, মুখপুড়ি। গরম খুন্তি দিয়ে চোখ গেলে দেব।'

বোঝা গেল বিড়ালটাকে বকা হচ্ছে।

'মাছ দুধের গন্ধে হারামজাদী পাগল হয়ে ওঠে। আমার ঘর ছাড়া তোমার ঠাঁই নেই কোথাও—যা যা মুখপুড়ি।'

ঝন্ করে খুন্তির আওয়াজ হয়। যেন বিড়ালটাকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারা হয়েছে।

'কপি-পাতা খা গে, বেগুনের বোঁটা চিবিয়ে খাগে, মুলো শাক গিলে পেট ঠাণ্ডা কর গে। মাছ! মাছ খেতে দুপুর রাতে মল্লিকার ঘরে হারামজাদীর মরতে আসা চাই।'

আতপ চাল আর মাছের মুড়ো টগ্‌বগ্ ক'রে কড়াইতে ফুটছে। প্রথমে মল্লিকার ঘর বারান্দা, তারপর সারা উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে মুড়িঘণ্টের সুবাস। একটু পর শোনা যায় শিলনোড়ার প্রচণ্ড শব্দ ক'রে রমেশগিন্নী এলাচ দারুচিনি পিষছে গরম মশলার। যেন প্রমথর দিদিমার ওপর রাগ করে শিলনোড়ার শব্দ করছে বেশি। ঘুমিয়ে পড়েনি বুড়ি, মল্লিকা ঠিক জানে। অথবা ঘুমিয়ে পড়লে, কেবল প্রমথদের ঘর কেন, বাড়ির বাকি দশটা ঘর জেগে উঠুক এরকম একটা আক্রোশ, অদ্ভুত মানসিক আস্ফালন নিয়ে দু'হাতে ষোলটা সোনার চুড়ির রিন্‌ঝিন্ শব্দ তুলে নোড়াটা জোরে শিলের বুকে ঘষতে লাগল ও। আর রাত বাড়তে লাগল।

না, বোঝা গেল পাঁচুর ঘরও জেগে আছে। একটু আগে টলতে টলতে ভাদুড়ী ঘরে ফিরেছে। এসেই ওয়াক্ ওয়াক্ করে ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দিয়েছে। বৌ পিতলের ডাবর নিয়ে ছুটে আসার আগেই ভাদুড়ী ওই কর্ম করেছে। যদিও নতুন কিছু না। কিন্তু রাত দুপুরে হাত দিয়ে বমি কাচতে হবে দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে যশোদা কঁকিয়ে উঠেছে। 'আমায় একটু বিষ দিতে পার গো কেউ, আমি খেয়ে মরে যাই। এই জ্বালা আমি কতকাল পোহাব!'

'এই দ্যাখো, আ-হা-হা তুমি করছ কি, বাড়ির লোক জেগে উঠবে, মাইরি তোমার পায়ে পড়ি মাইরি···এই শোন শোন···'

যশোদা কান্না থামিয়ে চুপ করে।

'কি বলো।'

'মাইরি, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, কাল তোমায় মুর্শিদাবাদী শাড়ি কিনে দেব।'

'ছাই দিয়েছ।' মুখটা বাঁকা করে ঘুরিয়ে নেয় যশোদা।

পাঁচু বমি করলে যশোদা এমন চীৎকার আরম্ভ করে আর এত সব বাজে কথা বলতে আরম্ভ করে দেয় যে বাড়ির লোক হা-হা করে ছুটে আসে। মাতাল মদ খেয়ে এসে আজ আবার বৌ ঠ্যাঙ্গাচ্ছে। বৌটাকে মেরে ফেলল, তোমরা সব বেরিয়ে এসো। ছেলে বুড়ো বৌ ঝি কাঁচা ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে পাঁচুর ঘরে ঢুকতে চায়। যশোদাকে রক্ষা করতে পাঁচুকে তারা রীতিমত কিলঘুষি খামচি মারতে আসে। তার কারণ নেশাগ্রস্ত লোকটাকে এখন মারলেও বিশেষ কিছু এসে যাবে না। এমন কি এই অবস্থায় লোকটাকে পুলিসে দেবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের থাকে।

এই ব্যাপারকে পাঁচু বেশ ভয় করে।

অথচ অন্য সময় বৌকে মেরে দেখেছে কারো ঘর থেকে হাঁচি কি কাশিটিও শোনা যায় না। যশোদা চীৎকার করে তখনও কী না বলে। কিন্তু জানালা খুলেও কেউ দেখে না বৌকে পাঁচু লাঠি মারল কি দা দিয়ে কোপাচ্ছে। তখন কারোর ছুটে গিয়ে বাধা দেওয়া বা দুটো কথা বলা পাঁচুর পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করার সামিল হয়ে দাঁড়াবে। তাই সব চুপ।

এ ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা পাঁচুর অনেক আছে এবং মদের মুখে বৌকে মারতে গিয়ে সে এ-বাড়িতে বেশ বিপদে পড়েছে। তারপর সাবধান হয়ে গেছে।

এখন কথায় বলে অভ্যাস, বাইরে মদ খেয়ে এসে ঘরে বমি করতে না হয় সেজন্যে গ্লাসে মদ ঢালবার আগে ছিপি খুলে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে নেয়। দেশী বিলাতী দুটোতেই এ ওষুধে কাজ দেয়। পাঁচুর কথায় বলতে গেলে বেলেঘাটার কোনো 'শালার' ডিস্‌পেন্‌সারীতে এ ওষুধ পাওয়া যায় না। তাই মানে একদিন সময় ক'রে কোলকাতায় গিয়ে এক সাহেবের দোকান থেকে সে ওষুধটা কিনে নিয়ে আসে। এক শিশিতে একমাস যায়। ইদানীং খাওয়াটা একটু বেশি হচ্ছিল এবং ওষুধও সেই পরিমাণে বেশি খরচ হয়েছে। কাল থেকে আর ওষুধ নেই। আজ সময় করে একবার তার চৌরঙ্গী যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অথচ সন্ধ্যার দিকে খাওয়াও নিতান্ত মন্দ হ'ল না। পাঁচুর নারকেলডাঙ্গার এক ফ্রেন্ড নিজের একটা কাজ হাসিল করতে এসে পুরো দুটো পাঁইট খাইয়ে গেছে ধাপার বাজারের অশ্বিনীর মদের দোকানে।

পারতপক্ষে অবশ্য পাঁচু ধারে কাছে, কি পাড়ার লোক এক আধজনের যাওয়া-আসা আছে এমন দোকানে যায় না। তার প্রিয় আড্ডা খালধারের দোকান। খেয়ে বেরিয়ে এসে ব্রীজের হাওয়াটা গায়ে লাগায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট টানে, তারপর, পা সজুত আছে যখন বোঝে, একটা রিক্সা ডেকে—বা কোন কোন দিন হেঁটে বাড়ি ফেরে।

গত দু'মাসের মধ্যে পাঁচু ঘরে ফিরে বমি করেনি। তাই চেঁচামেচি কম হয়েছে।

হয়ইনি একরকম।

আজ ওষুধ না থাকার দরুন এই কাণ্ডটা ঘটল। তা ছাড়া ওই ধাপার বাজারের সুরেনটার কাঁকড়া ভাজা আর ফুলকো চচ্চড়ি। বহুকাল ওপাড়ার এসব জিনিস খায় না পাঁচু। ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু রাধেশটা জোর করে তাকে খাওয়াল। শেষটায় এতবড় একটা ইলিশমাছের মুড়ো ভাজা। সুরেন শালা এত লঙ্কাবাটা মিশিয়েছিল ফুলকো চচ্চড়িতে, বমি করার পরও গলা জ্বালা করছিল।

'আমায় এক গ্লাশ জল দাও।' অনেকদিন পর হঠাৎ এতগুলি বমি করে একটু নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল পাঁচু। তাই গলাটা নরম শুনে যশোদা আর চীৎকার করল না। কুঁজো থেকে একটা কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে পাঁচুর মুখের সামনে এনে ধরল। সুবোধ ছেলের মত পাঁচু গ্লাসটা যশোদার হাতে ধরা অবস্থায় গলা বাড়িয়ে বেশ সাবধানে এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেলল।

যেন জল খেয়ে বেশ সুস্থ বোধ করল।

তা ছাড়া এতগুলি ভাজাভুজি নিয়ে বেরিয়েছে বলে প্রায় সবটা মালই পেট থেকে উঠে এসেছে।

যেন আর কোন নেশাই রইল না, পাঁচু একটু হাল্কা বোধ করল।

'গামছাটা দাও।'

যশোদা নিজের কাপড়ের আঁচল তুলে পাঁচুর হাতে তুলে দেয়। পাঁচু আঁচলটা দলা পাকিয়ে তাই দিয়ে মুখ মোছে। যশোদা দেখে খুশি হয়। নেশা করা লোকের হঠাৎ নেশা নেই দেখতে পেলে সবাই খুশী জানা আছে বলে যশোদার মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁচু হেসে ফেলল। গলাটা বেশ বড় করে বলল, মাইরি বলছি। কাল আমার শহরে অনেক কাজ। ফেরার সময় একটা মুর্শিদাবাদী আনবই।'

বমিটা কোনরকমে হাত দিয়ে কেচে তুলে জায়গা পরিষ্কার করে যশোদা ভাতের থালা এনে পাঁচুর সামনে রাখল। একে ওষুধ ছাড়া এতগুলো খেয়ে এসে ঘরময় বমি ছড়িয়েও হাঙ্গামাটা বাধতে বাধতে থেমে গেছে তাতে খুশী, তার ওপর নতুন আলু দিয়ে রাঁধা পুরো একবাটি কাছিমের মাংস থালার পাশে দেখে পাঁচু আহ্লাদে চীৎকার করে উঠল।

'আরে করেছ কি তুমি, এত সব খাব। আমার তো ভাল ক্ষিদে নেই। অর্ধেকটা মাংস তুলে নাও।'

'আমার আছে। আমার জন্যে রেখেছি। না রেখে কি আর তোমায় দিলুম।'

'বেশ তো, আছে, আরো খানিকটা তুলে নাও। রেখে দিও। সকালে পান্তাভাত দিয়ে বাসি মাংস খেও। ঠাণ্ডর সময়। নষ্ট হবার ভয় নেই।'

বাটি থেকে খানিকটা তুলে রাখে যশোদা।

'আজ বুঝি খুব খারাপ জিনিস খেয়েছ। সেরকমই তো গন্ধ পেলাম বমির।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে গিন্নী, তোমার নাক নষ্ট হয়ে গেছে।' পাঁচু প্রচণ্ড শব্দ করে হাসল। যখন নেশা থাকে না নেশার কথা বাড়ির এগারোটা ঘরকে শুনিয়ে বড় গলায় বলতে পাঁচু একটুও দ্বিধা করে না। দিশী ছোটলোকের খাদ্য, ও ভদ্দর

লোকে খায় কখনো। আর খায় যারা ধার করে মদ খায়। কেন আমার কি রোজগারে ইয়ে পড়েছে নাকি···হা-হা', ঘর কাঁপিয়ে হাসল পাঁচু। 'হোয়াইট লেবেল, বুঝলে, একটা বোতল কিনতে চল্লিশটা টাকা বেরিয়ে গেল।'

'ওই কর, ছাই-ভস্ম খেয়ে টাকা নষ্ট করছ তো আমার শাড়ি গয়না আর হবে কি দিয়ে?'

'হবে হবে',···পাঁচু ভাদুড়ী আবার গলা নরম করে স্ত্রীকে প্রবোধ দেয়। 'তোমার জন্যে টাকা না রেখে কি আর আমি মদ খাই, না ইয়েতে যাই। কালীমার দিব্যি, কাল শালা মুর্শিদাবাদী না কিনে আমি এক ফোঁটা গলায় ঢালব না।'

'আচ্ছা খাও, খাও। খেতে তো আমি বারণ করছি না। কিন্তু তুমি ইয়েতে যাওয়াটা একবার বন্ধ করো তো। স্বাস্থ্যটা খারাপ হচ্ছে একবার দেখছ না, তাছাড়া লোকে বলে কি!'

এবার পাঁচু শব্দ করে হাসল। এবং বাড়ির আর পাঁচটা ঘর শুনছে বলে মোটেই গ্রাহ্য না করে গলাটা বরং আরো একটু চড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার কাছে ঢাকচাক নেই গিন্নী, আমি কি তোমায় বলিনি আগে।'

চুপ করে রইল যশোদা।

'তাই বলছিলাম, মেহনত ক'রে রোজগার করি, দু'পাঁচ টাকা স্ফূর্তির জন্যে ব্যয় করবই। কোনো শালাকে আমি কেয়ার করি নাকি?' একটু থেমে পাঁচু টেনে টেনে হাসে: 'আরে গিন্নী আমি তো মন্দ আছিই। ইয়ে বাড়ি যাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাওয়া-আসা করে এমন ঢের ঢের লোকও আছে! বলো তো আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'কে কে শুনি না।' গলার স্বর উচ্চগ্রামে তুলে দিয়ে যশোদা হেসে প্রশ্ন করে।

কিন্তু পাঁচু মাথা নাড়ল।

'পাগল হয়েছ, নাম বলব না, নাম বলি আর আমার মাথায় লাঠি পড়ুক।'

'আহা' তুমি আমার কাছে চুপি চুপি বল না, আমি কি আর সেটা বাইরে প্রকাশ করছি, না চিংড়িঘাটা বেলেঘাটার ঘরে ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি, এমন করছ কেন গা, আমার কি একটু জানতে ইচ্ছা করে না।'

যশোদা অভিমান করছে দেখে পাঁচু কথা না বলে কেবল থুতনিটা তুলে ইঙ্গিতে রমেশের ঘর দেখিয়ে দিয়ে কাটা ঠোঁট বিস্ফারিত করে টেনে টেনে হাসে। 'মাছের মুড়ো' 'মাছের মুড়ো' করে চীৎকার করে মল্লিকা তখনও বাড়ি মাথায় করছিল। কিন্তু যশোদার হাসির তোড়ে সেই চিৎকার ভেসে গেল, ডুবে গেল। 'বাইরে থেকে ভদ্দরলোক, কত নাম ডাক, বুঝবার জো আছে কিছু? একাদশী ঠাকুর ডুব দিয়ে জল খায়, অ্যাঁ, এত গুণ তাঁর পেটে পেটে, তুমি আমায় য়্যাদ্দিন না বলে থাকতে পারলে কি করে গো!' বাইরে থেকে দেখা গেল না কিন্তু মনে হল যেন আহ্লাদের আতিশয্যে যশোদা স্বামীর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে।

'এটা ভাল গিন্নী, এটা আমি অপছন্দ করি না।' হেসে কচ্ছপের নরম হাড় কুড়মুড় করে চিবোচ্ছিল পাঁচু।

কান পাতলে বোঝা যায় আরো লোক জেগে আছে। বিমলের গলা। বৌকে ধমকাচ্ছে। পুজোর সময় সুন্দর একখানা ধনেখালি কিনে দিয়েছিল। সেই শাড়ি বৌ এর মধ্যেই যেন কিসের খোঁচা লাগিয়ে ছিঁড়েছে। 'অ্যা, আমি যে শাড়ি কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে গেলাম।' প্রথমে দুঃখ প্রকাশ, তারপর ক্রোধগর্জন ঃ 'বলি কত বড়লোকের ঝি তুমি যে বছরে তিন জোড়া করে কাপড় লাগাচ্ছ, অ্যাঁ, বল তুমি কি ইচ্ছে করে এসব করছ নাকি, পরীক্ষা করছ ভাতার কত শাড়ি কিনে দিতে পারে একবার দেখি ? যাও আশেপাশে আরো ঘর আছে, গিয়ে জিজ্ঞেস কর ক'মাস অন্তর কে ক'খানা শাড়ি পরতে পায়।'

যেন হিরণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

'পুজোর সময় তো কেনা হয়নি, ভাদ্রমাসে এ শাড়ি কেনা হয়েছে।'

'ঐ ভাদ্র আর আশ্বিন একই, লাটসাহেবের ঝি।' বিমল স্বরটাকে আরো বিকৃত করে তুলল। 'ভাদ্র মাসে কেনা হয়েছে বলে কাপড়খানা এর মধ্যেই ফালি ফালি করে ফেলতে হবে, বলি তোমার চার ছ'মাসও একখানা শাড়ি টেঁকে না। আর এদিকে দিনকে দিন কাপড়ের বাজার আগুন হচ্ছে। আমি এখন কাকে বোঝাই, কাকে গিয়ে বলি আমার ঘরের এ-অবস্থা।' একটু থেমে থেমে বিমল পরে শেষ করল, 'এসব মেয়েমানুষকে লোহার জালি পরতে দেওয়া উচিত, নয়তো চট।'

হিরণের কান্না বা কথা আর শোনা যায় না।

আর গোলমাল হচ্ছিল তিন নম্বর ঘরে।

প্রথমে চাপা রকমের, তারপর গোলমালটা বেশ বড় হয়ে উঠল। যেন দরজার ভেজানো পাল্লা ভেদ করে কথাগুলো ছিটকে এসে উঠোনে পড়ছিল।

'অম্বলের বেদনা, স্রেফ্ অম্বলের ব্যথা ওটা, আমি বলছি।'

'অম্বলের ব্যথা কি তলপেটে হয় ? আমার তো মনে হয়—'

'তোমার অনেক কিছুই মনে হয়। তোমার তো আর মনে হওয়ার সময় অসময় থাকে না। বলি আট মাসে কবে তুমি হাসপাতালে গেছ ? বড়খোকা থেকে আরম্ভ ক'রে সাধনা মমতা সন্তু নন্তু সুবু সমীর সুধা এই সেদিনের আন্না পর্যন্ত ঠিক দশ মাস পড়তে তবে হাসপাতালে যাওয়া হয়েছে। এ-যাত্রা আটমাস না পেরোতেই বলছ—'

'আট মাস কে বলল। ন' মাস পূর্ণ হতে আর দশদিন বাকি। তোমার কি আর দিন মাসের হিসাব মনে থাকে। গাধা গরু ছাগল ভেড়া নিয়ে রাতদিন কারবার যার, তার এসব মনে থাকবার কথা নয়। শাস্ত্রের বচন।' কথা শেষ করে লক্ষ্মীমণি আবার যন্ত্রণায় আঃ উঃ করছিল।

'তা ন'মাসেই কবে তুমি হাসপাতালে গেছ, তোমার আর দশটি সন্তানের মধ্যে কোনটি দশমাস না পড়তে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, আমায় একটি একটি করে দৃষ্টান্ত দেখাও তো।'

বিধু মাস্টারের চীৎকারে ঘরের চাল কাঁপছিল।

'এ্যাঁ, তুমি কি আমায় সকল রকমে বিপদে ফেলতে চাইছ নাকি। এতকাল তবু

ধরাবাঁধা একটা সময় ছিল, নিয়ম ছিল। এখন যে আর্লি ইয়ে করতে আরম্ভ করেছ। আমি দাঁড়াই কোথায়। না কি একেবারে খরচপত্র ছাড়াই এ-যাত্রা পরিষ্কার হয়ে আসতে পারবে ভেবে রেখেছ, নাকি বড় যে সোহাগ করে শোনাচ্ছ অম্বলের না অন্যরকম পেইন। এদিকে একটা এক্সট্রা ট্যুইশনি নিলাম। তা মাস পুরলে তো টাকা পাব, নাকি তার আগেই চামেলীর মা—উঃ, আমি কোথায় যাই, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে তোমার কাজকারবার দেখলে।'

লক্ষ্মীমণি আর কথা বলছে না। কিন্তু অন্য একটা ঘরে এক বর্ষীয়সীর গলা শোনা গেল। যেন বিধুমাস্টারের রাগের আগুনে ঠাট্টার ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিতে হেসে বলছে, 'তা ন'মাস না পেরোতে যদি বেদনা ওঠে তো করা কি, বলি আমার কথা শুনছেন সাধনার বাবা, এবছর সব কিছু সকাল সকাল,—দেখচেন তো মাঘ মাসের শুরুতে কেমন গরম পড়ল, গায়ে আর কাঁথাকম্বল ওঠে না, আর আর বছর ফাল্গুন মাসেও আমের গুটি দেখতে পাই না, কাল দেখলাম পুকুরপাড়ের গাছটায় পাতা দেখা যায় না—'

বুড়ির কথা শেষ হবার আগে আর একটা ঘর থেকে কে বলে উঠল, 'হুঁ, দিদি বলছেন আমের গুটি, কোথায় সেই চৈত্রের শেষে শুরু হবার কথা, চিরকাল বেলেঘাটা চিংড়িঘাটায় যা দেখে এলাম, এবছর এখন থেকেই শীতলার কৃপা আরম্ভ,—ঘোলপাড়া ধুবিতলায় তো শুনলাম রোজ দু'জন চারজনের ক'রে হ'চ্ছে, একজন নাকি মারাও গেল।'

'হ হ, এবছর সবই সকাল সকাল, বাঁধাকপিতে এর মধ্যেই পোকা পড়েছে, ফুলকপি ফুরিয়ে গেল, নিতাই কাল এসে বলছে ধাপার বাজারে পুঁই আর ডাঁটাশাকের ছড়াছড়ি দিদিমা এখন থেকেই। তাই বলছিলাম সাধনের বাবাকে, লক্ষ্মীমণি এ-যাত্রা সকাল সকাল হাসপাতালে যাবে।' কথা শেষ করে বর্ষীয়সী খনখনে গলায় হাসছিল।

বিধুমাস্টার অবশ্য এসব কথায় যোগ দেয়নি। চুপ ছিল। এবং আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যখন দেখল স্ত্রী একেবারে নীরব হয়ে গেছে, আস্তে প্রশ্ন করল, 'কেমন, এখন কেমন মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে যেন ব্যথাটা এখন নেই।'

'নেই!' মাস্টার রাগ করল না, যেন আশ্বস্ত হয়ে গলাটা আবার চড়িয়ে দিল। 'আমি বলিনি? অম্বল, স্রেফ অম্বলের পেইন, তা ছাড়া আর কিচ্ছু না। কেমন?'

অপর পক্ষের হুঁ হাঁ কিছু বোঝা গেল না।

এবার বিধুমাস্টার খুশী হয়ে হেসে ঘরের চালা কাঁপিয়ে তুলল। 'এতগুলো সন্তানের মা আজও কোন্‌টা কিসের ব্যথা টের পাও না অবাক লাগে, হা—হা—'

শিবনাথ দরজায় দাঁড়িয়ে শুনল সব। মনে মনে হিসাব করে দেখল সে প্রায় সবগুলো ঘরই জেগে আছে। কথা বলছে হাসছে কাঁদছে ঝগড়া করছে রাঁধছে খাচ্ছে, খাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘুমের উদ্যোগ করছে। বুঝি রমেশ রায়ও ইতিমধ্যে ফিরল। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে একটার বেল্ বাজতে শোনা যায়। অন্ধকার উঠোনের

দিকে তাকিয়ে উঠোন ঘিরে দাঁড়ানো ঘরগুলো শিবনাথকে আবার হ্যাভ-নটস্‌দের মনে পড়িয়ে দেয়। পাঁচু ভাদুড়ীর সেলুনে বিধুমাস্টারের সেই কথা। এবং 'থাকা' ও 'না থাকা নিয়েই সবগুলো ঘর এতক্ষণ বকর বকর করল। একটি ছাড়া।

একটা ঘরের বাসিন্দারা সেই সন্ধ্যা সাতটা থেকে চুপ মেরে আছে। ঘরে কিছু-মাত্র আওয়াজ নেই।

খাওয়া-দাওয়া দুপুরে যদি বা কিছু হয়েছে, সন্ধ্যার দিকে আর হবে না। বাড়ির সবাই জানে। তা হলেও ওঠা-বসা চলা-ফেরা করা, কাশি কি ধমক-টমক দিতেও অমলকে শোনা গেল না আজ। কালও এমন ছিল না। আজ একেবারে চুপ করে আছে।

কিরণ তো জানেই রাগী খুঁতখুঁতে সদা-অসন্তুষ্ট সন্দিগ্ধচরিত্র দুর্বল ভীরু বেকার সব জায়গায় বিফল হয়ে ঘরে-ফেরা স্বামী অন্ততঃ তার ওপর দুটো একটা কথা চালায়, হুকুম শাসন করে এবং কিছু না পেয়ে শেষটায় কুঁজো থেকে একটা ঘটি জল গড়িয়ে ঢকঢক ক'রে সেটা গলায় ঢেলে হয়তো একটা আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে মেঝেয় ছেঁড়া মাদুরের ওপর শোয়া কিরণের পাশে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। আগের সেই তেজ বিক্রম নেই। আজকাল তাই করছিল। কিন্তু আজ তাও করল না। সারাদিন সে বাইরেই গেল না। কিরণ কি অমলকে কেউ দরজা খুলে একবারও বাইরে আসতে দেখেনি। গুম হয়ে ঘরের ভিতর শুয়ে বসে কাটাচ্ছে তারা, বেশ বোঝা গেল। এখন সন্ধ্যার পরও ঘরের ভিতরটা গুম মেরে ছিল।

কাল পারিজাতের দারোয়ান জিনিসপত্র টেনে উঠোনে বার করে দিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম করবে, কথাটা ভেবে অন্ধকার উঠোনটাও যেন এইবার গুম রইল।

কেবল সেই চুপ ক'রে থাকা ঘুমিয়ে থাকা বারোঘরের মাঝখানের মস্ত উঠোনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খটাস্‌ খটাস্‌ আওয়াজ করে কমলার দরজার তালাটা নাড়া-চাড়া করতে লাগল।

তেইশ

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত না।

সকাল বেলায় মদন ঘোষ এসে অমলকে ডেকে বলে গেল যেন সে ও তার পরিবার সব জিনিসপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বেরিয়ে এসে বৌকে নিয়ে উঠোনে দাঁড়াতে বা অন্য ঘরে আশ্রয় নিতে সে পারবে কি না সেকথা উল্লেখ করল না বাড়িওয়ালার সরকার।

'এটা সরকারের মুখের ভদ্রতা, বুঝলেন না, আসলে যখন জিনিসপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরোবে, তখন সোজা আঙুল দেখিয়ে বলবে রাস্তায় নেমে যাও। অর্থাৎ তখন আর একচোট অপমান করার সুযোগ হাতে রেখে মদন ব্যাটা এই বজ্জাতিটুকু করে গেল।'

মন্তব্যটা ঠিক কে করল বোঝা গেল না। দেখা গেল বেশ ভিড় জমেছে বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় বারান্দায়। গলা বাড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে সব। নিজেদের ঘরের সামনের লাগোয়া উঠোনে নেমে এসে অপেক্ষা করছিল কেউ কেউ।

মদন ঘোষ বলে গেছে যদি জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা না হয়ে থাকে, তবে সে দারোয়ানকে দিয়ে দু'টো কুলি পাঠিয়ে দেবে।

হাত চালিয়ে ওরা সব ঠিক করে দেবে। 'অর্থাৎ অমলকে তাড়াতাড়ি ঘরখানা ছেড়ে দিতে সাহায্য করতে মদন দারোয়ান পাঠাচ্ছে।'

একজন কে মন্তব্য করল এবং মন্তব্য শেষ না হতে হনহন করে দ'টো কুলিকে সঙ্গে নিয়ে দারোয়ান ছুটে এলো।

দারোয়ান যে দেখতে একটা খুব ভীষণ দর্শন তা না। বরং কপালে তুলসীর মাটির ছিটা, সিঁদুরের ফোঁটা, রামনাম মুখে, খড়ম পায়ে, আটা দুধ খাওয়া রামসিং-এর ঠাণ্ডা মিঠে চেহারা দেখলে কথা বলতে ইচ্ছা করে। এ বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো পর্যন্ত এমনি রাস্তায় দেখা হলেই রামসিং-এর সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু এখন দেখা গেল রামসিং-এর হাতে লাঠি, গায়ে খাকি উর্দি, পায়ে নাগরা। অর্থাৎ এখন সে কেবল দারোয়ান না, জমিদারের পাইক। পরোয়ানা নিয়ে এসেছে অবাঞ্ছিত বাসিন্দাকে বস্তি থেকে উৎখাত করতে।

অবশ্য খুব একটা হাঁকডাক করল না সে। মনে হল বিড়বিড় ক'রে এখনও সীতারাম আওড়াচ্ছে। আঙুল দিয়ে দশ নম্বর ঘরটা কুলিদের দেখিয়ে দিয়ে রামসিং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ির সবগুলো মানুষের চোখে-মুখে কৌতূহল বিস্ময়। কেননা জেদী একরোখা বোকা বেকার অমল মদন ঘোষের কথামতো তখনো জিনিসপত্র ঘর থেকে বার করেনি। যেন তার বার করার ইচ্ছা নেই। দরজায় পাল্লা ভেজানো।

খোট্টা কুলি দুটো বারান্দায় উঠে 'বাবু', 'বাবু' ক'রে দু'বার হাঁকল। ভিতর থেকে সাড়া না পেয়ে তারা কড়া ধরে নাড়া দিতে অমল দরজা খুলল।

অমলের চেহারা দেখে সকলের বুক ঢিপঢিপ করছিল।

উস্কোখুস্কো চুল। চোখ দুটো লাল। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি এবং বৌয়ের একটা ছেঁড়া শাড়ি লুঙ্গি ক'রে পরা। সকলে অবাক্ হয়ে দেখল, একটা লাঠি হাতে নিয়ে সে ঘরের দরজা আগলাচ্ছে। অমল যে প্রকৃতিস্থ নয়, হাবে ভাবে সেটা খুব বেশি প্রকাশ পাচ্ছিল। সত্যি সে বেপরোয়া হয়ে দরজার পাল্লা আটকাবার কাঠটাকে অবলম্বন করে ঘর সামলাতে রুখে দাঁড়াবে, কেউ কল্পনা করতে পারেনি। 'সাহস রাখে।' বাড়ির লোকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। 'মরদ'। কেউ কেউ বলল।

'তা না করে করবে কি। ঘরে বিয়ে করা বৌ আছে। উপোস থাকুক আর যা-ই করুক, বৌয়ের সম্মান বাঁচাতে লোকের মাথায় বাড়ি দিতে অমল পিছপা হবে না, আমরা জানতাম।'

মন্তব্য শুনে আর একজন হেসে ঘাড় নাড়ল। 'মদন ঘোষ সেজন্যেই দারোয়ান আর কুলি পাঠিয়েছে। আমাদের তো ইচ্ছা ওর মাথায় যদি অমল দু'ঘা বসিয়ে দিত,

কাজের মত কাজ হত।'

'কে কাকে ঘা বসায় মশাই, আগে দেখুন, ওখানে কি কাণ্ডখানা হচ্ছে।'

'এই শালা তোদের মাথা ভেঙে দেব যদি আমার ঘাড়টা ভাঙে। রাসমণির বাজার থেকে আট আনা পয়সা দিয়ে আমি নতুন ঘড়া কিনেছি।'

সবাই চোখ তুলে দেখল কুলিটা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র টেনে টেনে এনে বারান্দায় রাখছে। অমল তেমনি কাঠটা উঁচিয়ে আছে। লাফাচ্ছে, চিৎকার করছে কিন্তু ঘা বসাতে পারছে না।

'দিক না বসিয়ে একটা খোট্টার মাথায়।' একজন বলতে আর একজন রীতিমত ভেংচি কেটে উত্তর করল: 'ত কি করে পারবে মশাই, আপনারা কি ওকে সাপোর্ট করবেন। আপনারা দূরে থেকে দাঁড়িয়ে ঠাট্টাই করতে পারবেন। দিন না সকলে দুটো করে টাকা। আপনারা কিছু চাঁদা দিলে ওর প্রায় দু'মাসের ঘরভাড়া হবে। এখনকার মত তো লোকটা অপমানের হাত থেকে বাঁচুক। বাকি টাকা সে আস্তে আস্তে দিয়ে যাবে। বাড়িওয়ালাকে জানালেই চলবে।'

'আমাদের কারোর একটা পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সংসার-খরচ আছে, ঘরভাড়া দিতে হয়, খেটে খাই, কেউ বসে খাই না। পারেন তো আপনিই সবটা দিয়ে দিন না। আপনার মোটর গাড়ি আছে, সোনার ব্যান্ড ঘড়িতে, জামায় সোনার বোতাম। নিশ্চয়ই বিত্তশালী।'

সকলেই চারু রায়ের মুখের দিকে তাকাল।

অর্থাৎ অমলকে বাড়িওয়ালা দারোয়ান পাঠিয়ে বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে এই দৃশ্য দেখতে মুদি বনমালী, কে. গুপ্ত এবং তার বন্ধু চারু রায় বাড়ির ভিতর ছুটে এসেছে। চারু রায়ের হাতে একটা ক্যামেরা। ফিতে বাঁধা কালো চশমা চোখে, যা অন্য সময় দেখা যায় না।

বিধু মাস্টার, ডাক্তার, পাঁচু, রমেশ রায়, এমন কি লাঠিতে ভর দিয়ে রুগ্ন ভুবন পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসেছে।

চারু রায় পরামর্শ দিতে সবাই একসঙ্গে প্রতিবাদ করছিল। 'ভাড়াবন্ধ হলে আমাদেরও উঠতে হবে, তখন আপনি এসে আমাদের সাহায্য করবেন কি না জানি না।'

বেশ সরস গলায় রমেশ রায় বলল, 'একমাস দিলুম। তারপর? তারপর যদি ওর চাকরি না হয়, তখন কে চালাবে? আবার আসবেন আপনি? মশাই, অনেক হিতোপদেশ দেয়া যায় দূরে থেকে। একবার এবাড়িতে এসে থেকে দেখুন না। মশাই, অনেক জটিলতাময় আমাদের বস্তিবাসীর জীবন। পরোপকার করা এত সোজা না।'

'আপনারা কি কোনদিন ওর ভাল চেয়েছেন? উপদেশ দিয়েছেন, অথচ শোনেনি, এমন হয়েছে কি যে জিনিসটাকে খুব বাঁকা করে ধরে নিচ্ছেন?'

'নিশ্চয়ই করেছি। আলবৎ ওকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওর বৌ আমাদের স্থানীয় কলে ফ্যাক্টরীতে কাজ পায়। আমরা স্থানীয় লোক। পাঁচজন গিয়ে মালিকদের বললেই হয়। কিন্তু তা সে করবে না। প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই বৌকে চাকরি

করতে দেবে না। এই করে করে নিজে তো মরেছেই, কচি মেয়েটাকে পর্যন্ত মারতে বসেছে। খাওয়া নেই দু'জনের কদিন একবার জিজ্ঞেস করুন না।'

সকলেই আবার অমলের ঘরের দিকে তাকাল। আধ-পোড়া সিগারেটটা ঠোঁট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কে. গুপ্ত, বনমালী এবং চারু রায়, অমলের পাশে কিরণকে দেখতে পেল।

কিরণ আর ঘরের ভিতর ছিল না। সব জিনিস ওরা ঘর থেকে টেনে বার করার আগে সে বেরিয়ে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। আজকালকার মেয়ে, তাই ঘোমটা বলতে নাক পর্যন্ত ঢাকা কাপড়। কিরণের সুন্দর কপাল দেখা যাচ্ছিল, টিকোলো নাক আর ভ্রমরের পাখার মত পাত্‌লা মিশমিশে কালো ভুরু ঘেরা চোখ।

যেন বাড়ির সবগুলো পুরুষ একসঙ্গে ঢোক গিলল।

-তা যদি সে না চায় বৌকে ফ্যাক্টরিতে পাঠাতে, তো সেটাও আমি দোষের দেখি না। কেন চাইবে, ও পুরুষ, ডার্লিংকে এ-বয়সে ঘরের বাইরে যেতে দিতে কষ্ট পায়। পাওয়া উচিত।'

কেউ এ কথার উত্তর দিল না। চুপ করে সব চারু রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কাণ্ডটা দেখতে লাগল। চারু রায় পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করল। তারপর একটা লাফ দিয়ে অমলের সামনে গিয়ে বলল, 'আমি তো এসব জানি না, আমার ফ্রেন্ড কে. গুপ্তর মুখে শুনলাম। তা দেখুন মশাই, এই টাকাটা এখন নিন, দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলুন—আপনার জিনিসপত্র ছেড়ে দিক।'

চারুর হাতে নতুন করকরে নোট।

অমল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে যেমন চারু রায়কে দেখছিল, তেমনি মাথার কাপড়টা ঠেলে খোঁপা পর্যন্ত সরিয়ে দিয়ে অবাক উৎসুক চোখে কিরণ টাই-স্যুট পরা পরিচ্ছন্ন কালো ফিতে-আঁটা চশমা-পরা উপকারী ভদ্রলোকটিকে দেখছিল।

চারু রায় কিরণের দিকে আর একবারও তাকাচ্ছিল না। অমলের দিকে মুখ ফেরানো।

'আপনি এখন এই ঘর ছেড়ে দিন। খুঁজলে আরো সস্তামতন ঘর পাওয়া যায় এদিক-ওদিক। সেখানে চলে যান। তারপর দেখা যাক। আজ আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের রিং করে জিজ্ঞেস করব। আপনার নাম তো জানাই রইল। একটা চাকরি আপনাকে জুটিয়ে না দেওয়াতক্‌ নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

অমল কথা বলল না। কিরণ মাটির দিকে তাকিয়ে। ভ্রূ দু'টি স্তব্ধ। চুপ্‌ করে যেন কি ভাবছে বোঝা গেল।

চারু অমলের হাতে নোট ক'খানা গুঁজে দিল। দিয়ে একটা নতুন সিগারেট ধরায়। কে. গুপ্তের দিকে তাকিয়ে কি বলে বোঝা যায় না, অত্যন্ত নিচু গলা। গণ্ডগোল হচ্ছে শুনে বাড়ির সরকার মদন ঘোষ ইতিমধ্যেই ছুটে এসেছিল।

সরকারের হাতে দু'মাসের ভাড়া তুলে দেওয়া মাত্র কুলিরা অমলের জিনিসপত্র ছেড়ে দিল।

যেন কোথায় ঘর ঠিক করা ছিল। টাকা পেতে এখানকার ঘর ভাড়া চুকিয়ে এই

পরিবেশ পরিত্যাগ করতে অমলও এক সেকেণ্ড দেরি করল না। একটা লোক ডেকে জিনিসপত্র তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বৌয়ের হাত ধরে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কে. গুপ্ত এবং বনমালীকে সঙ্গে নিয়ে চারু রায়ও উঠোন ছেড়ে চুপচাপ রাস্তায় নেমে গেল।

'তোমাদের সকলের মুখে কে. গুপ্তর ফ্রেণ্ড জুতো মেরে গেল।'

চুপ ক'রে সবাই দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিধু মাস্টার মন্তব্য করল। মুখটা বিকৃত ক'রে শেখর ডাক্তার বলল, 'শুনেছি ছাত্র পিটিয়ে মাস্টারগুলো কদিন পর গাধা বনে যায়। তোমার কথা শুনে এখন তাই পরিষ্কার চোখে দেখছি।' বলে ডাক্তার মাস্টারের দিকে না তাকিয়ে শিবনাথের দিকে তাকায়।

'কি বলেন মশাই, আমরা কে, আমাদের সঙ্গে অমলের সম্পর্ক কি। বরং বলা চলে বাড়িওলার মুখের উপর ইয়ে মারা হ'ল। দারোয়ান কুলি পাঠিয়ে জাঁক ক'রে অমলকে রাস্তায় নামানোর প্ল্যান ভেস্তে গেল।'

শিবনাথ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

'কিন্তু এই পরোপকারীটি কে? হঠাৎ অমলের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠার কারণটা কি?' রমেশ রায় উত্তরের আশায় সকলের মুখের দিকে তাকায়। পাঁচু মুখ ঘুরিয়ে কাটা ঠোঁট বাঁকা করে কি ভেবে যেন হাসে, লক্ষ্য ক'রে রমেশ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'তা যেখানেই চাঁদ যাক, আমি আমার রেস্টুরেণ্টের পাওনা টাকা আদায় না ক'রে ছাড়ছি না। ইচ্ছে ছিল আজই এখনই লেংটা করিয়ে হারামজাদার পরনের কাপড়খানা খুলে রেখে দিই। জিনিসপত্র ছাই কি আছে চোখে তো দেখলাম। ভাঙা কড়াই আর ফুটো ঘটি একটা। ইশ এতগুলো টাকা আমার'—রাগে দুঃখে রমেশ দাঁত কিড়মিড় করছিল।

কিন্তু দেখা গেল তার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে সেখানে বড় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। পাঁচু সকলের আগে সরে পড়েছে। বিধু যেন এসব কথায় কান নেই, শেখরের উক্তি শুনে অত্যন্ত অপমান বোধ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে করতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেছে। অমল চলে যাওয়ার পর ভুবন লাঠি ভর দিয়ে কষ্ট করে আর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন বোধ করে নি। রমেশের মন্তব্য শুনে হুঁ-হাঁ কিছু না বলে শেখর ডাক্তারও রুগীর বাড়ি যাবার তাড়া আছে জানিয়ে সরে পড়ল। রমেশের পাশে বলাই এবং শিবনাথ ছাড়া আর কেউ রইল না।

উঠোনের আর একদিকে দাঁড়িয়ে মেয়েরা জটলা করছিল। দশ নম্বর ঘরের লোকেরা এভাবে রক্ষা পাবে, তারা একটু আগেও ভাবতে পারে নি। ঘরের দরজা এখনো খোলা পড়ে আছে। হয়তো ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে পরে মদন ঘোষ এসে দরজায় তালা দেবে। নতুন ভাড়াটে আসছে কি না, কবে আসছে এবং ভাড়াটেরা কোথা থেকে আসবে ইত্যাদি আলোচনা এখনো আরম্ভ হয়নি। সেটা পরে হবে। অমল, তার বৌ কিরণ, অমল ও কিরণের উদ্ধারকর্তা চারু রায়, এমন কি কে. গুপ্তকে নিয়ে তাদের কথা হাসি টিপ্পনি ও রসিকতা শেষ হচ্ছিল না। 'মাতালের বন্ধু

মাতাল ছাড়া আর কিছু হবে না, তুমি খোঁজ নিয়ে দেখগে', ঝগড়াঝাঁটি ভুলে গিয়ে সুনীতির মা বীথির মাকে বোঝাচ্ছিল, 'হুট ক'রে পকেট থেকে এতগুলো টাকা বার করে দিলে, বলি বিষয়খানা কি !'

'অমলকে চাকরি দেবে শুনিয়ে গেল তো !'

'চাকরি গাছের ফল না দিদি ।' মল্লিকা মাথা নেড়ে বলছিল, 'আমার বলাটা ঠিক না, কিন্তু না বলে পারলাম না, কিরণের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তোমরা দেখো ।'

'আহা আমি-তো আর কিছু ভাবছি না,' প্রমথর দিদিমা হাত নেড়ে পাশে দাঁড়ানো হিরুর মাকে বোঝায়, 'যেখানে গেছে যদি সুখে থাকে থাকুক, কথায় বলে কুকুর বিড়ালটা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বুকটা খালি খালি ঠেকে, দশ নম্বরের দিকে যেন তাকাতে পারছি না । এমন কষ্ট হচ্ছে ।'

সকলেই অমলের ছেড়ে-যাওয়া শূন্য ঘরের দিকে আর একবার চোখ ফেরায় ।

'মারধর করত, তা হলেও বৌটাকে খুব ভালবাসতো ছোঁড়া ।' বর্ষীয়সী মন্তব্য করল ।

'ওই ভালবাসাই তো হতভাগার মরণ হ'ল গো ।' হেসে লক্ষ্মীমণি প্রমথর দিদিমাকে বোঝায় ঃ 'আর মুখপুড়ির রূপও দিদি ! আমাদের মেয়েদেরই দেখলে গা ছমছম করে । চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স খুব হবে । দেখলে আঠারোর বেশি মনে হয় না । উঠতি বয়স । আজও সেই উঠতি বয়সের লকলকে এক একটা আগুনের শিখা যেন ছুঁড়ির হাত পা, আঙুল, ঘাড়, গলা, কোনটা না !'

'ছোঁড়ার কেবল ভয় ওর বৌকে কে বুঝি ছিনিয়ে নেয় ।' প্রমথর দিদিমা দন্তহীন মাড়ি বার করে হাসল । 'সেদিন ফিরিওয়ালার হাতের সঙ্গে কিরণের হাত ঠেকেছিল কি ? আহা কী মার মা মারল বৌটাকে ধরে ।'

'এ দু'দিন মারধর বন্ধ ছিল ।'

'দু'দিন কি ও ওর মধ্যে ছিল ! ঘর ছাড়তে হবে লোটিশ পাবার পর মুখখানা শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছল ।'

'দিদি বলছেন ভাল ।' মল্লিকার কথায় লক্ষ্মীমণি সায় দিতে পারল না । ছোঁড়া গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেও যখন মারবার বৌকে ধরে মারবে । তা না । মুখ কালো করার অন্য কারণ আপনাদের তো জানায়নি । শনিবার রাত্রে কিরণ আমাকে কথাটা বলল ।'

'কি, কি শুনি ?'

কৌতূহলী মুখগুলি লক্ষ্মীমণিকে দেখছিল ।

'ছেলেপিলে হবে কিরণের ।' লক্ষ্মীমণি ফিক্ ক'রে হাসল ।

ভুরু দুটো কপালে তুলে দিয়ে প্রভাতকণা আর্তনাদ ক'রে উঠল । 'বলেন কি দিদি ! এই বেকার অবস্থায় ! ভাল হাতেই মরতে বসেছে দুটিতে ।'

'আহা, সুনীতির মার কথা শুনলে রাগ ধরে ! ঈশ্বর দিলে করবে কি ? মানুষের হাত আছে নাকি !' রাগ প্রকাশ না করে লক্ষ্মীমণি খিলখিল করে হেসে

উঠল। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে। পড়ল না। জঠরে তারও সন্তানের ভার ছিল।

'হুঁ', রমেশগিন্নী মানে মল্লিকা টিপ্পনি কাটল : 'দিদির জানবার কথা বটে। ফি বছর হাসপাতালে যাচ্ছে আর ফিরে এসে ঈশ্বরের সঙ্গে কোঁদল করছে কিনা।'

কিন্তু লক্ষ্মীমণি তখনো হাসি থামায় নি। ঠোঁটের অদ্ভুত একটা ইঙ্গিত ক'রে প্রভাতকণার নাদুসনুদুস হাতের মাংসে আঙুলের গুঁতো বসিয়ে বলছিল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা দিদি, ঈশ্বরের ইচ্ছা, হি-হি।'

এই লক্ষ্মীমণি আগের রাত্রে অম্বল না কিসের অসহ্য বেদনায় অস্থির হয়ে ছট্‌-ফট্‌ করছিল। এখন দেখলে বিশ্বাস হয় না, কেউ করবে না বিশ্বাস। বলাই ও রমেশ রায় একসঙ্গে উঠোন থেকে বেরিয়ে যাবার পরও একমিনিট একলা উঠোনে দাঁড়িয়ে শিবনাথ লক্ষ্মীমণির কথাবার্তা শুনে ঠোঁট টিপে হাসল। লক্ষ্মীমণি ও আরও কয়েকটি বর্ষীয়সী কথা বলছিল, মার পাশে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় গুঁজে সুনীতি। যেন গভীর মনোযোগ দিয়ে উঠোনের মাটি দেখছিল। পূর্ণযৌবনা কুমারী। হাসি গোপন করে মা ও মাসিদের (এ বাড়িতে কুমারী ছাড়া মার বয়সের প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মাসি ডাকা হয়) সন্তান হওয়ার তত্ত্বালোচনা শুনছে। কাজে বেরিয়ে গেছে বলে কমলা, প্রীতি, বীথি এবং রুচিকে দেখা গেল না। এসব আলোচনা শুনলে ওরা কি বলত চিন্তা করতে করতে শিবনাথ নিজের কাজে রাস্তায় চলে এল।

চব্বিশ

বনমালীর দোকানের সামনে চারু রায় ও কে. গুপ্তকে দেখে গেল। শিবনাথের ইচ্ছা ছিল আড্ডাটা এড়িয়ে যাবে। কিন্তু পারল না। কে. গুপ্ত তার জামার হাতা চেপে ধরল। 'মশাই, সেজেগুঁজে কোথায় বেরোচ্ছেন। বসুন না। না হয় আপনারা কাজের লোক, আমরা অকম্মার ঢেঁকি। কিন্তু লোক নেহাত খারাপ নই। অমলের কত বড় একটা উপকার করে দিলাম। একবার জিজ্ঞাসা করুন না বনমালীকে। দশ টাকায় ঘোলপাড়ায় কেমন ঘর পেয়েছে। ইলেকট্রিক আলো শীগ্‌গির আসছে। টিনের বেড়া, টিনের চাল। গরমের সময় গরম বেশি লাগবে। তা লাগলেও জলের বন্দোবস্ত এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। আর ঘরখানাও ছোটর মধ্যে চমৎকার। জানালা মোটে একটা। তাহলেও—'

'এসোসিয়েশনটা খারাপ।' চারু রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করল। শিবনাথ লক্ষ্য করল চারু রায়ের কপালে স্বেদবিন্দু। যেন এতক্ষণ কি গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিল। পর পর অনেকগুলো সিগারেট খাওয়া হয়েছে। জুতোর আশেপাশে ছড়ানো পোড়া টুকরোর সংখ্যা দেখে শিবনাথ অনুমান করল। এখনও একটা মুখে জ্বলছে।

'এসোসিয়েশন বলতে তুমি কি বোঝ আমি জানি না, রায়।' কে. গুপ্ত বিশেষ সন্তুষ্ট নয় চারুর কথা শুনে। 'কেন খোট্টা-বস্তি বলে? রিক্সাওলা ঠেলাওলারা আশেপাশে আছে এতে আপত্তি?' নাকে শব্দ করে গুপ্ত হাসল। 'এখানকার মানুষ-

গুলো কি শুনি ? চোর, বেশ্যা, সিফিলিটিক পেশেণ্ট, আর আমার মতন পাঁচুর মতন মাতাল আর বনমালীর মতন রমেশের মতন খুনি নিয়ে তো পাড়ার এসোসিয়েশন, কি বলেন মশাই।' প্রথমে শিবনাথ এবং পরে বনমালীর দিকে তাকায় গুপ্ত। 'কথাটা মিথ্যা বললাম বনমালী ?'

'না না, খুনিকে খুনি বলবে তাতে রাগ করার আছে কি।' গুপ্তর কথায় রাগ করেনি প্রতিপন্ন করতে বনমালী হেসে মাথাটা দু'বার নেড়ে একজন খদ্দেরকে বিদায় করতে পেঁয়াজ ও লঙ্কা ওজন শেষ করে তাড়াতাড়ি বার্লির ডিবে খুলল।

চারু রায় বলল, 'চমৎকার চা তৈরি করে দিলে কিরণ।'

'গুণী মেয়ে বাবা, গুণী মেয়ে।' গুপ্ত বলল, 'অদৃষ্টের বিপাকে পড়ে তো এই দশা হয়েছে। তা এর মধ্যেই জিনিসপত্র গুছিয়ে বসতে পেরেছে তুমি দেখে এলে ?'

চারু মাথা নাড়ল। 'বসতে পেরেছে মানে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বাজারে গিয়ে এটা-ওটা কেনাকাটা করে পর্যন্ত দিয়ে আসতে হ'ল।

'তুমি মহাত্মা লোক।' মৃদু হাসল গুপ্ত। 'কিন্তু সাবধান রায়, এখনি মোক্ষম কথাটি ছাড়তে যেও না, অমলটা ভীষণ গোঁয়ার।'

'পাগল।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চারু আকাশের দিকে মুখ তুলল। 'আগে অমলের একটা কাজ জুটিয়ে দিই, তারপর ধীরে-সুস্থে কথাটা না হয়—'

'তাই।' বনমালী সায় দেয়। 'এখন সিনেমা-টিনেমার কথা বলতে গেলে রাগী লোক কি করতে কি করে বসে বুঝলেন না ?'

চারু মাথা নাড়ল। চুপ করে সিগারেট টানল কতক্ষণ। তারপর আড়চোখে শিবনাথের দিকে একবার তাকিয়ে পরে কে. গুপ্তকে প্রশ্ন করল, 'আর কার ওপর নোটিশ হয়েছে ঘর ছাড়বার বললে না তো তখন ?'

'বলাইর ওপর, আমার ওপর।' গুপ্ত হাত বাড়িয়ে বন্ধুর সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট তুলল। 'আমাকে রোজই আলটিমেটাম দিয়ে যাচ্ছে পারিজাতের লোক।'

'তা তুমি যে এখনো বড় টিঁকে আছ !' চারু মৃদু হাসল, 'অন্য রকম বন্দোবস্ত হয়েছে নাকি রায় সাহেবের ছেলের সঙ্গে ? যাওয়া-আসা আছে ?'

'আমি প্রস্রাব করতেও পারিজাতের কুঠিতে যাব না।' মাটিতে থুথু ফেলল গুপ্ত। 'মদন ঘোষের মুখে শুনেছে কে. গুপ্তর একটা এম-এ ডিগ্রী আছে। গত মাসে বলে পাঠিয়েছিল বাচ্চাদের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটার পাচ্ছে না। আমাকে দিয়ে হবে কি না।'

'তা নাও না তুমি ওটা।' সোৎসাহে বনমালী মাথা নাড়ল। 'এমনি তো বসে আছ। ঘরভাড়াটা মাপ পাবে, আর তার ওপর মাস মাস নগদ কিছু দেবেও নিশ্চয়। পারিজাতের তো পয়সার অভাব নেই।'

পরামর্শ শুনে কে. গুপ্ত হঠাৎ কোন কথা বলল না।

'আমি এখন উঠি গুপ্ত।' চারু উঠে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা।' গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'আবার কবে আসছ ?'

'আসব। কবে কখন তার কিছু ঠিক নেই। হয়তো কালই আবার আসছি।

আসতে হবে।' চারুর ঠোঁটে সূক্ষ্ম অর্থব্যঞ্জক হাসি শিবনাথের চোখে এড়াল না।

'চলি মশাই।' শিবনাথের দিকে তাকিয়েও চারু মাথা নাড়ল। শিবনাথ হেসে ঘাড় কাত করল।

অদূরে সুপুরি গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে চারুর হলদে টু-সীটার দাঁড়িয়ে। সেদিকে যেতে যেতে চারু শিস দেয়।

'উদ্যোগী পুরুষ।' বন্ধু দূরে সরে যেতে কে. গুপ্ত হেসে বনমালীর দিকে তাকায়।

'কাপ্তান লোক।' বনমালী হাসে। 'তা তোমার বন্ধু এমনটি না হয়ে যায়।'

'মায়া-কানন ছবিতে আজকের সিনটাও থাকছে নাকি?' শিবনাথ হঠাৎ প্রশ্ন করতে কে. গুপ্ত চমকে উঠল।

'কোন্ সিন্, কিসের সিন্?'

'এই যে অমল আর তার স্ত্রীকে বাড়িওয়ালার লোক এসে অপমান করছিল।' শিবনাথ হাসে।

'হুঁ।' গুপ্ত এবার গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বার করল। 'বলেছি তো মশাই,— আগুন, এপিডেমিক, বলাৎকার, রাহাজানি, খুন, জখম, উচ্ছেদ, উৎপীড়ন বস্তিজীবনের কিছুই বাদ দিচ্চে না চারু। খাওয়া নেই ঘুম নেই, রাতদিন এ পাড়ায় ঘুরঘুর করছে কি ও সাধে! ছবির মালমশলা যোগাড় করছে।'

শিবনাথ প্রকাণ্ড এক ঢোক গিলে চুপ করে রইল। কিন্তু গুপ্ত চুপ ছিল না। যেন চারুর সামনে বনমালীর প্রস্তাবের যোগ্য উত্তর দিতে ইতস্তত করছিল। চারু চলে যেতে খুব এক হাত নিলে বনমালীর ওপর।

'আমি বসে আছি কি ঘাস কাটছি তাতে তোর কি? চারু আমার বন্ধু হলেও এখানে সে তৃতীয় ব্যক্তি, কি বলেন আপনি?' চকিতে শিবনাথকে দেখে কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'আমার ইচ্ছা নেই, তাই পারিজাতের ছেলেমেয়েদের ভালতে আমি সাহায্য করছি না। কী হবে লেখাপড়া শিখিয়ে শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে। গলা পর্যন্ত খায়, খাটপালঙ্কে ঘুমোয়। বেশ আছে। বাপের টাকায় এখন ঘি-দুধ খাচ্ছে, বড় হলে মদ খাবে, মেয়েমানুষ পুষবে। সাবেককালে এই করত সব পয়সাওলা ঘরের ছেলেরা। দেশ ঠাণ্ডা থাকত, শান্তি ছিল ঘরে ঘরে। এখন শালারা লেখাপড়া শিখেই আরম্ভ করে রাজনীতি, ইলেক্শন ফাইট, ধুয়া ধরে সোশ্যাল রিফর্মেশন, সার্ভিস ফর হিউম্যানিটিজ সেক্।'

'মানে লোকের মাথায় বাড়ি দেবার যত ফন্দিফিকির আছে সব শেখে, তুমি বলছ?' ইংরেজী শব্দগুলো না বুঝলেও বনমালী আন্দাজ করে নেয়।

'আলবৎ।' সংক্ষেপে বনমালীর প্রশ্নের জবাব দিয়ে কে. গুপ্ত তৎক্ষণাৎ শিবনাথের দিকে তাকায়। 'মশাই, ব্রিটিশের আমলে 'ড্রাই-ডে' কথাটা শুনেছেন কখনো?'

'না।' শিবনাথ কে. গুপ্তর চেহারা দেখে হাসে।

'হাসবেন না। আরে আহাম্মক, তোরা যে রিফর্মেশন বলতেই সকলের আগে মঙ্গলবারটাকে শুকনো ক'রে দিলি এতে লাভ কি হল?'

'ঐ একটা দিন অন্তত তোমাদের পয়সাটা জলে গেল না এই লাভ, তা ছাড়া হপ্তায় একদিন গলা শ্দকনো রাখলে আস্তে আস্তে যদি তেমাদের স্বভাব পাল্টায়।

'স্বভাব পাল্টায়।' বনমালীর কথা শ্দনে কে. গ্দপ্ত গর্জন করে উঠল। 'খ্দব খবর রাখিস কি না। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ্‌গে ছ' দিনে যে পরিমাণ মদ বিক্রী হয় তার আট গ্দণ বেশি কাটে ঐ ড্রাই-ডেতে। রিফর্মেশন!' কথা শেষ করে কে. গ্দপ্ত শিবনাথের দিকে ম্দখ ফেরায়। কোন কথা না বলে শিবনাথ ম্দদ্দমন্দ হাসে।

'মশাই, এ তল্লাটে এসে বাসা নিয়েছি যেদিন সেদিনই আমি এখানকার ইতিবৃত্ত শ্দনলাম। রায়সাহেবের আমলে আনাচে-কানাচে পাঁচ-সাতটা ঘর ছিল। কমজোরি কেরোসিনের ডিবের মত টিমটিম করে জ্বললেও খেয়ে পরে এক রকম স্দখেই তারা কাটাচ্ছিল, পারিজাত এসে সবগ্দলোকে খেদিয়ে দিয়েছে। কারণ? পাবলিক ওম্যান পাড়ায় থাকলে আমি আপনি খারাপ হয়ে যাব—হা-হা।'

'অত মন খারাপ করছ কেন, একটা পয়সা খরচ করে খেয়া পার হয়ে খালের ওপারে চলে যাও, ডজন ডজন মিলবে। দ্যাখোনি সন্ধ্যাবাতি জ্বলতে তোমার মেনকা রম্ভারা গলির ম্দখে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।'

বনমালীর কথায় কান ছিল না, শিবনাথের চোখে চোখ রেখে কে. গ্দপ্ত বলল, 'এখন পারিজাতের বাচ্চারা লেখাপড়া শিখে আবার কোন্ রিফর্মেশনে হাত দেবে সেই ভয়েই মশাই আমি সারা হয়ে যাচ্ছি। আমি করব ওদের ট্যুইশনি—রাম! এ যে নিজের পায়ে কুড়োল মারার সামিল হবে, কি বলেন মশাই?'

শিবনাথ কিছ্দ বলল না।

'তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে গ্দপ্ত।' হিসেবের খাতা থেকে ম্দখ তুলে বনমালী একটা বিড়ি ধরায়। 'তা নোটিশ যখন হয়ে গেছে, এ মাসে না হোক সামনের মাসে মদন ঘোষ তোমাকে তুলে দেবে ঠিকই। তখন কি করবে,—না কি ঘোলপাড়ায় ঘরটায় ঠিক করা আছে, কিরণদের বস্তিতে ঘর খালি আছে কিনা খোঁজ নিয়েছ?'

যেন এবারও বনমালীর কথায় কান দেবার বিশেষ ইচ্ছা নেই, ম্দখের এমন ভাব করে কে. গ্দপ্ত ওপরের দিকে তাকাল। 'সে যেদিন মদন লোকজন নিয়ে তুলতে আসবে সেদিন ঠিক করা যাবে। আমার শালা পারিজাতের খোঁয়াড়, ঘোলপাড়ার ঘর, গাছতলা আর তোর দোকানের সামনের এই ভাঙা বেঞ্চি সব সমান।'

শিবনাথ একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। স্দর্য ডুবে গেছে। গাছের মাথাগ্দলো কালো। ইস্কুল সেরে র্দচি এখন বাড়ি ফিরবে। মনে পড়তে শিবনাথ চট্ করে উঠে দাঁড়ায়।

'আহা, বস্দন না।' গ্দপ্ত আবার শিবনাথের হাত চেপে ধরল। 'কি এমন হাজারটা কাজ ফেলে এসেছেন যে একট্দ বসে গল্পসল্প করার সময় হয় না আপনার। কেন আমার সঙ্গে আড্ডা মারছেন মহিষী এসে দেখতে পেলে রাগ করবেন? তাঁর কি এখ্দনি ফেরার সময় হল?'

'না না, তা না।' মনে মনে বিরক্ত হলেও শিবনাথ সেটা ম্দখে প্রকাশ করল না।

একটু কাজেই বেরোচ্ছি, সন্ধ্যার পর এসে আবার গল্প করা যাবে।'

গুপ্ত শিবনাথের হাত ছেড়ে দেয়।

'তবে শুনুন।' হাত ছেড়ে দিয়ে চোখের ইঙ্গিতে শিবনাথকে তার মুখটা একটু কাছে সরিয়ে আনতে অনুনয় করে! শিবনাথ গুপ্তর মুখের কাছে গলা বাড়িয়ে দেয়। 'বলুন।'

'আনা চার-ছ পয়সা ধার দিতে পারেন ?'

'ছ' আনা হবে না।' শিবনাথ পকেটে হাত ঢোকায়। 'আনা তিনেক দিতে পারি।'

'তাই দিন তাতেই চলবে।' খসেখসে স্বর কে. গুপ্তর। 'কিছু মুড়ি মুড়কি আর এক পেয়ালা চা দিয়ে শালাকে ঠাণ্ডা করা যাক। সেই সকাল থেকে কিছু পড়েনি আর এমন কাঁইকুঁই করছে।' নিজের পেটের ওপর হাত রেখে কে. গুপ্ত এবার গুজ্‌-গুজ্‌ করে হাসল ঃ 'দিন তিন আনা, দ্যাটস এনাফ্‌। এর বেশি দিতে না পারলে কথা কি।'

শিবনাথ কথা বলল না। কে. গুপ্তর প্রসারিত হাতের তেলোয় একটা দু'আনি ও দুটো ডবল ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

'তা, বুঝলেন মশাই, সন্ধ্যার পর একবার আসুন।' গুপ্ত পিছন থেকে ডাকল, শিবনাথ তাকাল না, ঘাড় কাত করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

'তোমার ওই সোনার চারু বন্ধুর কাছ থেকে এক আধটা টাকা ধার চেয়ে নিয়ে এবেলা চারটি ভাতটাত খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই পারতে, চিনাবাদাম আর মুড়কি চালাবে কত!'

'তুই চুপ কর, তুই থাম গাধা। চারুর কাছে এখন আমি ভাতের পয়সা চাই। কাফে-ডি-রিওতে বসে বারো বছর এক সঙ্গে গ্লাস টেনেছি কি না। মুদির আর বুদ্ধি হবে কত—?'

বনমালী চুপ করে রইল।

'বন্ধু কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি, কথাটা মনে রাখবি। ওর কাছে দু আনা চার আনা কি টাকাটা আধুলিটা ধার চাওয়া যায় না।'

'তাও বটে। মোটা কমিশন পাবে অমলের গিন্নী যদি এক আধটা বইয়ে নামে। এখন আর খুচরো ধার-ফার চেয়ে হাত কালো করে লাভ নেই।'

কে. গুপ্ত কিছু বলল না।

কেননা, হঠাৎ দূরে রুচিকে দেখা গেছে। এক হাতে একটা ব্যাগ আর এক হাতে মেয়ের হাত ধরা। যে-হাতে ব্যাগ সেই হাতে দুটো কমলালেবু।

দোকানের সামনে দিয়ে শিবনাথের স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত হেঁটে রাস্তাটা পার হয় এবং বাড়িতে ঢোকে ততক্ষণ কে. গুপ্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

'অত তাকিয়ে দেখছ কি, গিলে খাবে নাকি।' বনমালী এক সময় হিসাবের খাতা থেকে মুখ তোলে।

কে. গুপ্ত দোকানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

'কি বললি ?'

'বলছিলাম তুমি তো তাকাও, কিন্তু খুকির মা-টি একদিনও তোমার দিকে চোখ ফেরাল না। সোজা অন্দরে চলে যায়।'

গুপ্ত কথা বলল না।

'বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ে কি না তাই অহংকার মনে মনে।' বনমালী বলল, 'আমাদের বিশেষ ভাল চোখে দেখেন না। তোমাকে ভাবে রাস্তার একটা মুদির বন্ধু। অর্ডিনারী লোক।'

'বেশ তো, আমিও ওর চোখে কিছু স্পেশ্যাল হতে চাইনে।' কে. গুপ্ত পায়ের কাছ থেকে বন্ধু চারু রায়ের ফেলে-দেওয়া পোড়া সিগারেটের একটা বড় টুকরো কুড়িয়ে নেয়। সেটা মুখে গুঁজে বলে, 'দে দেশলাই।'

'ইস্কুলের মাস্টারনী তার আবার অত দেমাক।' এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে গুপ্ত বলল, 'আমি মহিলার রূপযৌবন না, লক্ষ্য করছিলাম আজ চেহারাখানা।'

'কি ব্যাপার।' বনমালী ফিসফিস করে উঠল। 'কিছু হয়েছে নাকি?'

'মহাশয়টি বেকার।'

'কে? তার স্বামী? এই যে এখানে এতক্ষণ বসে ছিল, শিবনাথবাবুটি?'

'হ্যাঁ, মহারাজ হ্যাঁ, পরশু দিন কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। এতকাল ঢাকা-চাপা ছিল। তা বেকারি কে কতকাল ঢাকতে পেরেছে। পরশু রাত্রে দু'জনে রীতিমত ঝগড়া, কথা কাটাকাটি। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে বেবির মা আমার ঘরে ঢোকা বন্ধ করে দেয় জানিস তো। পরশু রাত্রে বারান্দার শুয়ে শুয়ে সব শুনলাম। ওদের ঘরের চৌকাঠের কাছে আমার মাথাটা ছিল।'

'কিন্তু ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে তো মনে হয় না যে উনি ইয়ে হয়েছেন?'

'এসব লোক ডেঞ্জারাস, বুঝলি। কে. গুপ্ত অনেকটা নিজের মনে হাসল। 'এরা মুখে তা কখনো প্রকাশ করে না।'

'তাই বলো।' বনমালী সায় দেয়। 'আমি বলি এই আদমি খুন করতে পারবে। এ্যাঁ, দু'বেলা এখানে আসছে বসছে গল্প করছে, মুখ দিয়ে একদিন বার করল না যে চাকরিটি নেই। কই তুমি তো পারনি। প্রথম দিনই তো সব খুলে বললে।'

'বৌ একটাতে লেগে আছে কিনা তাই যা এখনো ঢেকে রাখতে পারছে।'

'কাল যদি বৌয়ের ওটা যায়?'

কে. গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'গেলেও ভান করবে যায়নি।'

'লাভ কি', বনমালী বলল, 'ওরা না বলে, দু-চার ছ'দিন কি ধরো এক মাস, রকম সকম দেখে কারো তো আর বুঝতে বাকি থাকে না?'

'তা না থাকলেও মুখ দিয়ে এটা প্রকাশ না করার মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে বলে ওরা মনে করে—হা-হা।' গুপ্ত এবার জোরে জোরে হাসল। 'অমল ঢাকতে পারেনি, বলাই পারছে না, আমি শর্মা এক বেলাও পারলাম না, কিন্তু উনি পারবেন, ওঁর স্ত্রী পারবেন, এক নম্বর ঘরের, কি নাম হারামজাদীর?—কমলা পারবে, ভুবন-বাবুর মেয়েরাও হয়তো পারতে পারে,—কিন্তু আজ বিধু মাস্টারের চাকরি যাক, দেখবি কাল সকালে পায়খানার কি নর্দমার পিছনের শ্যাওড়া গাছটায় ওর শরীরটা

জ্বলছে।'

'তোমরা সব বলদ কি না, তুমি, অমল, বিধু মাস্টার।' বনমালী দোকানে সন্ধ্যাদীপ দেখায়ঃ 'হরি বোল্ বোল্ হরি, শ্রী প্রেমানন্দে হরি হরি বোল্ হরি।' কাঠের ক্যাশবাক্সের গায়ে মাথাটা তিনবার ঠকাস ঠকাস ঠেকিয়ে ধূপদানিটা হাত থেকে নামিয়ে বনমালী কথাটা শেষ করলেঃ 'ওরা বেশী সেয়ানা, অতি চালাকের দল, ঠেকতে ঠেকতেও চলে যায়, পড়তে পড়তেও উঠে দাঁড়ায়।'

'যা বলেছিস।' শব্দ না করে কে. গুপ্ত হাসল। অন্ধকার। তা হলেও দেখা যাওয়ার মতন একটা দাঁতও গুপ্তর আস্ত ছিল না। স্পিরিটে সবগুলোর মাথা ক্ষয়ে গেছে। মাটিতে থুথু ফেলে বলল, 'আমি বলদের বাড়া। না হলে কি আর একটি বেকারের কাছে চা-মুড়ির পয়সা চাই। যাক্‌গে—তুই যে ধানাই-পানাই নানান কথা শুনিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখছিস, এক আধটা পাঁইট হবে নাকি। আজ সাত দিন বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল,—কই তোর তো কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

ঝিঁঝি ডাকছিল। তা হলেও বনমালীর গলাটা কম স্পষ্ট ছিল না।

'বাজার মন্দা গুপ্ত, বাজার খারাপ। দেখছো তো বেচাকেনার অবস্থা। আমার আরো একটা মোটা টাকা লোকসান হয়েছে অন্য ব্যাপারে। শালা ব্যবসার কারবারের আগা পাছা কিছু বুঝবে না, তবু হাত লাগায়। বখরা পাব আমি। আরে আশ্বিনের আগে পিঁয়াজ পচবে না, আমায় তুই শেখাবি? আমি তো জানি তোর বাণিজ্যের অংশীদার হয়ে ঘরের টাকা আমি খালের জলে ফেললাম ধাপার মাঠের বিষ্ঠায়। হাঁসের গুয়ের বুদ্ধি নেই তোর মাথায়, তুই করবি হাঁসের ডিমের কারবার।'

কবে কার সঙ্গে ডিমের ব্যবসায় টাকা ঢেলে বনমালী বড় রকমের মার খেয়েছে, সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক ভেবে গুপ্ত উঠে দাঁড়াল।

'তোমার ইচ্ছা হয় খাওয়াবে, না হয় খাওয়াবে না। বললাম। হাতি পা ভেঙে তোমার দুয়ারের সামনে হেঁট হয়ে পড়েছে, দেখতেই তো পাচ্ছ। তাই বলে তো আর—'

অস্পষ্ট এবং বেশির ভাগ ইংরেজী শব্দ ছিল বলে বনমালী শেষের দিকের কথাগুলো বুঝল না। তা ছাড়া শুনলও না আর তেমন কিছু। কে. গুপ্ত রাস্তায় নেমে কবিতা আওড়ায়ঃ

Nothing is so beautiful
as spring—
When weeds, in wheels, shoot
long and lovely and lush—

'কে? কে?'

গুপ্তর পিছনে লোক হাঁটছিল।

তারা বলাবলি করছিল, 'নাম কি, কোথায় থাকে?'

'থাকে এখানকার একটা বস্তিতে। ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাস এম-এ।'

'এই অবস্থা কেন?'

'বেকার।'

'ব্যবসাট্যাবসা করতে পারছে না, টুকিটাকি অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ? মাস্টারি? এ্যাঁ কোটটা একেবারে ছেঁড়া।'

বস্তুত কথাগুলো শুনেও গুপ্ত পিছনের দিকে তাকায় না। খালি পা। দুদিন এখন খালি পায়েই চলাফেরা করছে। সেদিন ডোমপাড়ার আগুন দেখতে গিয়ে ছেঁড়া চটির একটি খুইয়েছে। বনমালী বলেছে যে রমেশ রায়ের কুকুরটা তার একপাটি চটি মুখে নিয়ে গেছে সে দেখেছে। কিন্তু গুপ্ত বনমালীর কথায় বিশ্বাস করে না। গুপ্তর সন্দেহ জুতোও ওরা সরিয়ে ফেলে ইত্যাদি। পিছনের লোকটি তার সঙ্গীকে বলছিল 'পুঁথি-পড়া বিদ্যা, প্র্যাক্টিক্যাল নলেজ নেই, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হয়তো কোনোকালেই ছিল না, সুখের চাকরি করত, আজ বেকার হয়ে আর একটা কিছু জোটানোর মত ফন্দিফিকির মাথায় আসছে না, তাই এ-দুরবস্থা।'

লোক দুটিকে এগিয়ে যাবার পথ দিতে কে. গুপ্ত সরু রাস্তার একপাসে সরে বাসকের জঙ্গল ঘেঁষে একটু সময় দাঁড়ায়। ঝিঁঝির ডাকের মতন পুরনো মামুলি একঘেয়ে বচন আওড়াতে আওড়াতে ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পর জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় নেমে আবার হাঁটতে লাগল। 'ননসেন্স।' গুপ্ত নিজের মনে বিড়বিড় করে।

পঁচিশ

রমেশ রায়ের সই-করা চিঠির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে পারিজাত মুখ তুলল। শিবনাথের বুক দুরদুর করছিল। সুশ্রী সুবেশ পরিচ্ছন্ন এবং অতিরিক্ত রকম মার্জিত এই লোকটির সামনে ব'সে শিবনাথের রীতিমত ভয় করছিল পাছে না সে কোনরকম অসৌজন্য, অভদ্রতা, নোংরামি কি কথার উত্তর দিতে গিয়ে নিবুদ্ধিতা প্রকাশ করে।

আর শিবনাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল পারিজাতের ড্রইংরুম।

অতিরিক্ত রকম আধুনিক। পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত তো বটেই।

একটা শোফার ওপর শিবনাথ মেরুদাঁড়া বেঁকিয়ে বসে ছিল। আর পারিজাত তার সুন্দর বাঘছাল চটি পায়ে পায়চারি করছিল। টিন থেকে সিগারেট তুলে পারিজাত মুখে গুঁজল এবং দেশলাই জেলে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। শিবনাথকে সিগারেট অফার করা হ'ল না।

'মশাই আপনারা বি-এ, এম-এ পাশ করেছেন কিন্তু আপনাদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ভাল না।'

'কি রকম?' প্রশ্ন করতে গিয়ে শিবনাথ করল না। কেন না পারিজাতের বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি।

'আপনি কি আট নম্বর বস্তিতে থাকেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'আপনি আর কিছু করেন কি?'

'আমি আপাতত কিছু করছি না। তবে একটু ব্যাবসাট্যাবসা করব ইচ্ছা আছে।'

পারিজাত অল্প শব্দ করে হাসল।

'ব্যবসা করবেন, কিছু টাকা সংগ্রহ হয়েছে বুঝি?'

'ঠিক তা না।' শিবনাথ বলল, 'আমার ওয়াইফও গ্র্যাজুয়েট। তিনি কমলাক্ষী গার্লস হাই ইস্কুলের টিচার। আমার ট্যুইশানির টাকাটা জমিয়ে আমি ছোটখাটো কিছু স্টার্ট দিতে চাই।'

'গুড্ আইডিয়া।'

পারিজাত একসঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া উদ্গিরণ করে শিবনাথের চোখের দিকে এতক্ষণ পর তাকাল। রমেশের সই-করা চিঠিটা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলল।

'না, বলছিলাম আপনাদের বস্তির আর এক ভদ্রলোক সেদিন এসেছিলেন। এম-এ পাশ। উঃ, আমার সাত আট বছরের দু'টো বাচ্চাকে পড়াতে বসে তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যে আশিটা ইংরেজী শব্দ বলে ফেললেন। আমি ওদের পড়ার ঘরেই তখন ছিলাম।'

'কি পড়াচ্ছিলেন?' শিবনাথের হাসি পেল।

'প্রাথমিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।' পারিজাত এখন আর হাসছিল না। 'বাংলা শব্দ-গুলোর বাংলা মানে তিনি ভুলে গেছেন বলে মনে হ'ল। অপরিচ্ছন্ন বোঝাতে ডার্টি, বাষ্প বোঝাতে ভেপার, বীজাণু বোঝাতে ব্যাক্টেরিয়া ইত্যাদি আমদানি করলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে আমার ছেলে দু'টি। একবার চিন্তা করুন।'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

'কি নাম ভদ্রলোকের, হ্যাঁ, কে. গুপ্ত। এককালে তিনি কোন অফিসের ভয়ানক বড় অফিসার ছিলেন শুনেছি।' পারিজাত এবার মৃদু হাসল।

'তারপর!' কৌতূহল দমন করতে না পেরে শিবনাথ বেলে ফেলল, 'তাই বলুন।'

'তারপর আর তাকে আমি আসতে নিষেধ করলাম।' পারিজাত বলল, 'আমার ছেলেরা বাঙালী, সাত থেকে আট বছর ওদের বয়েস। পড়াতে বসে যিনি কথাটা ভুলে যান তাকে আমি শিক্ষক বলি না।'

শিবনাথের হাসি পেল এবং দুঃখও হ'ল। তখন রায় সাহেবের নাতিদের পড়ানোর প্রস্তাবে বনমালীর ওপর কে. গুপ্তর ক্ষিপ্ত হওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়তে শিবনাথ লোকটিকে মনে মনে করুণা না ক'রে পারল না।

'কাজেই বুঝতে পারছেন—' পারিজাত এর অধিক কিছু বলল না।

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'ভাল কথা, আপনি পড়াতে চাইছেন, আমার আপত্তি নেই। আপনি ওদের মার সঙ্গে কথা বলুন। এই ডিপার্টমেণ্ট শ্রীমতীর। হাজার কাজে আমায় এত বেশি এন্‌গেজ্‌ড থাকতে হয় যে এদিকে আর—' বাক্য শেষ না ক'রে পারিজাত স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন। পর্দা সরিয়ে মৃহিষী ড্রইংরুমে এসে ঢুকলেন। যেন পর্দার ওপারে দীপ্ত অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো এতক্ষণ দু'জনের কথাবার্তাও শুনেছেন।

শিবনাথ হাত তুলে নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি স্বামীর পাশে

দাঁড়ান।

'আপনি আমাদের আট নম্বর বস্তিতে থাকেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'আমরা নতুন এসেছি!'

'তা জানি।' দীপ্তি মাত্র একবার শিবনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তারপর আর সেদিকে তাকালেন না।' টেবিলের ফুলদানিটা একদিক থেকে সরিয়ে আর একদিকে রাখেন। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে শিবনাথ অন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়।

'এঁর স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। একটা স্কুলে আছেন।' পারিজাত স্ত্রীকে বলল। কিন্তু দীপ্তি তাতে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। কথাটা তিনি আদৌ শুনলেন কিনা বুঝতে না পেরে শিবনাথ একটু অস্বস্তিবোধই করল। সিগারেট মুখে রেখে পারিজাত কথা বলে।

'চলতি কথায় প্রাইভেট টিউটর বলতে যা বোঝায় আমি আমার ছেলেদের জন্যে সেরকম কিছু চাইছি না।' দীপ্তি এবার মুখ ফেরান। 'আমি জানি, জানতাম এসব জায়গায় এসে বাস করলে আর যা-ই হোক, বাচ্চাদের লেখাপড়া হবে না।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

'কেন, সেই যে, কি নাম? এদের নামগুলো আমি যখন তখন ভুলে যাই,—বুড়ো মাস্টারকে তোমার পছন্দ হ'ল না? ভেটারেন স্কুলমাস্টার শুনেছি।'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে দীপ্তি শিবনাথকে বললেন, 'আপনাদের বাড়ির বিধু-মাস্টারের কথা বলছেন উনি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, পরিচয় মানে একদিন দু, একটা কথা হয়েছে, এই পর্যন্ত।' মহিলার কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য ক'রে শিবনাথ সতর্ক হ'য়ে উঠল। 'এদের কারোর সঙ্গে আমার তেমন—'

'তা তো হবেই, তা তো বটেই।' পারিজাত বলল, 'এদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত তারা তো বটেই, লেখাপড়া-জানা লোকগুলোও কেমন আনকালচার্ড রাস্টিক, কথা-বার্তায় এমন একটা—'

'ব্রুট ব্রুট।' দীপ্তি একটা শোফায় বসে পড়লেন। কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্যের চেয়ে ঘৃণা বেশি, বিরক্তির চেয়ে রাগ। ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের কুঞ্চন প্রসারণ লক্ষ্য করতে গিয়ে একটু বেশি সময় শিবনাথ মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বিধুকে ডাকিয়ে একদিন ট্রায়াল দিয়েছিলাম। উঃ—' দীপ্তি মুখখানা আবার বিকৃত করলেন। 'একে এমন নোংরা বেশভূষা, পড়াতে বসে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল, থুতু ফেলল জানালার গরাদে, সেই কাঠি আবার কানে গুঁজে নোংরা হাত ছেলেদের বই খাতার ওপর রাখল, আপনি কল্পনা করতে পারেন? দাঁড়িয়ে আমি দৃশ্যটা দেখলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। অ্যাঁ, এই লোক আমাদের ছেলেদের মানুষ করবে!'

'তারপর?' শিবনাথও ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করল। 'আমি স্কামটার সঙ্গে কথাই বলি না। মুখে দুর্গন্ধ।'

'বস্তির লোক। এর চেয়ে ওর কাছ থেকে আর কি ভাল আশা করতে পার।' পারিজাত শব্দ ক'রে হাসল। 'সেদিনই মাস্টারকে জানিয়ে দিতে হ'ল আমাদের ছেলেদের পড়াতে হবে না।' পারিজাত শিবনাথের দিকে তাকায়।

শিবনাথের দুই কান লাল হয়ে গেল। কিন্তু মুখের হাসি নিভতে দিল না। 'আমার ধারণা ছিল এখানে,—অবশ্য কম থাক বেশি থাক, সেটা বড় কথা নয়,—চলাফেরায়, কথাবার্তায় অন্তত এরা সভ্য সুশ্রী হবে, কিন্তু এখন দেখছি অন্যরকম।' শিবনাথ পারিজাতকে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'শহরে ঘর একরকম পাওয়াই যাচ্ছে না। ফাইণ্ডিং নো আদার অলটারনেটিভ, বুঝলেন না, নিরুপায় হয়ে আজ এখানে আমি আছি—অন্যত্র সুবিধামতন ঘর পেলেই—'

পারিজাতের আগে দীপ্তি শিবনাথের দুঃখটা বুঝলেন। 'অবশ্য সবাই যে বিধু-মাস্টারের মতন, আমি তা বলব না। ভদ্রসমাজে মিশতে পারে এমন লোকও দু' একজন আছে, এই ধরুন আপনাদের রমেশ। আমার তো বেশ পছন্দ হয় লোকটিকে।'

'ও রমেশ। হি ইজ ওয়াণ্ডারফুল।' পারিজাত মাথা নাড়ল। 'অথচ দেখুন লেখাপড়া একরকম জানে না বললেই চলে। তবু কত সভ্য, মার্জিত।'

'তা ছাড়া যাকে বলে সেলফ-মেড ম্যান। ভয়ানক গরিব ছিল যখন এখানে আসে। আমি শ্বশুরমশায়ের কাছে শুনেছি। কিন্তু মাথা খেলিয়ে এটা-ওটা-করতে করতে বেশ দু'টো পয়সা ক'রে ফেলেছে।'

'আমি শুনেছি, আমায় বলেছেন সব রমেশবাবু।' শিবনাথ গর্বিতভাবে দীপ্তির চোখে চোখ রাখল। 'অবসর সময়টা আমি তাঁর চায়ের দোকানে বসেই কাটাই।'

'আমি তাই ভাবি'। পারিজাত বলল, 'শুনি লোকে উপোস থাকছে, বাড়িভাড়ার টাকা যোগাড় করতে পারে না, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পরনে কাপড় জামা নেই,—কিন্তু কেন এমন হয়, নিশ্চয়ই তাদের বুদ্ধির দোষে এমন হচ্ছে।'

'আরো কারণ আছে।' দীপ্তি একটু বক্তৃতার সুরে বললেন, 'অলসতা, কর্ম-বিমুখতাও দারিদ্র্যের লক্ষণ। না হলে ধরুন, এই অমল, তেমন লেখাপড়াও জানে না, বেশ তো, চাকরি ছিল না, তুমি ফিরি করে এটা-ওটা যেমন লজঞ্চুস বিস্কুট কি তেল সাবান বিক্রি ক'রে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারতে, নিশ্চয়ই তাতে তোমার সম্মান ক্ষয়ে যেতো না।'

পারিজাত বলল, 'যোয়ান ছেলে, রিক্সা টানতে পার, মোট বয়ে পেট চালাতে তোমার মত লোকের আপত্তি করা উচিত না, কি বলুন?'

ক্ষীণ হেসে শিবনাথ বলল, 'এসব ওদের বোঝায় কে বলুন—'

বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে পারিজাত বলল, 'বোঝাতে যাওয়া বিপজ্জনক, সদুপদেশ কেউ দিতে গেলে তারা তার অন্য রকম অর্থ ধরে নেয়। নিয়েছে। এ্যাজ ফর ইনস্ট্যানস, রমেশ বুঝি বলেছিল তার স্ত্রীকে না হয় আমাদের গেঞ্জির কলে কাজ নিতে, অ্যাণ্ড দ্যাট বাগার ওয়েণ্ট আপ টু কিল হিম, অমলকে নাকি ইনসাল্ট করা হয়েছে একথা বলার দরুন,—বুঝুন। মারতে চেয়েছিল সে রমেশকে।'

'শুধু তাই?' শিবনাথ লক্ষ্য করল দীপ্তিও কম উত্তেজিত হন নি। চোখের

ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, 'এপর্যন্ত ওঁর সম্পর্কেও নানারকম কথা বলতে অমল ভ্রূক্ষেপ করেনি,—মোজার কলে গেঞ্জির কলে মেয়েদের ঢোকানো হচ্ছে এটা কিছুতেই অমল আর তার দলের লোকেরা ভাল চোখে দেখছে না—'

'মূর্খ।' অস্ফুটে বলল শিবনাথ।

'এরকম সমস্ত ব্যাপার।' পারিজাত উত্তেজনাটা একটু প্রশমিত করে সিগারেটের পরিবর্তে এবার পাইপ ধরায়। তারপর আস্তে আস্তে পায়চারি করে বলে, 'এদের ভাল করতে যাওয়া উচিত না, ভাল করতে গেলে তাতে মন্দের অংশ কতটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজন করতে বসে, উপকার করতে গেলে তাতে কী পরিমাণ ত্রুটি আছে খুঁজতে আরম্ভ করে। ঘরের অভাব, শহর শহরতলিতে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে, জঙ্গল কেটে খানা ডোবা বুজিয়ে খরচপত্র করে টিনটালি দিয়ে আস্তানা তৈরী করে মানুষকে থাকতে দেওয়া হল, অমনি নিন্দা আরম্ভ হ'ল বস্তি বসানো হয়েছে গরিবদের এক্সপ্লয়েট করতে,— কেপিটেলিস্ট রায় সাহেব আর তার ছেলের আর পাঁচটা কারবারের মত এটাও বড় রকমের একটা বিজনেস।'

পারিজাত চুপ করতে দীপ্তি বললেন, 'এ্যাজ ফর ইনস্ট্যান্‌স, এখানে মেয়েদের একটি সমিতি আছে, সমিতি মানে পাঁচটি মেয়ে একত্র হয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের জমিতে কানামাছি খেলত, এসে দেখেছি, তারপর আমি টাকা দিলাম, বই এল, পাঁচরকমের খেলাধুলোর সরঞ্জাম এল, মেয়েরা নাচ গান, সূচের কাজ, রান্না, রুগীর সেবা শিখতে পারে তার সবরকম ব্যবস্থাই করে দিলাম। কিন্তু অন্যদিক থেকে আরম্ভ হ'ল এডভার্স ক্রিটিসিজম, কি, না—' কথা অসমাপ্ত রেখে দীপ্তি স্বামীর দিকে তাকান। মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে পারিজাত শিবনাথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কথাটা শেষ করল: বড়লোক গরিবদের শোষণ করছে, কিন্তু বড়লোকের গিন্নী সমিতি টমিতি ক'রে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেখাচ্ছেন। মানে ইলেক্‌শন আছে কিনা, স্ত্রীর মারফত্‌ পারিজাত ভোটের অঙ্ক বাড়াবার ফিকিরে আছে—বুঝুন।'

শিবনাথ মৃদু হাসল।

'কাজেই আমিও ঠিক করেছি, ওদের ভালো আর করব না।' প্রায় দাঁতে দাঁত ঘষে পারিজাত বলল, 'ইচ্ছা ছিল আপনাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা পাকা করে দেব, কিন্তু দিলে হবে কি, বলবে বস্তির লোকের সুবিধার জন্য কি আর পারিজাত এটা করছে, জলকাদায় নিজের গাড়ি চালাবার অসুবিধা হয় দেখে এদিকে নজর পড়েছে।'

'তুমি অতি সহজেই ডিসহার্টেন্‌ড্‌ হয়ে পড়ো।' স্বামীর কথা শুনে দীপ্তি রুষ্ট হন। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল। 'শ্বশুরমশায় অসুস্থ। নিজে এসে দেখাশোনা করতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে তুমি যদি হাল ছেড়ে দাও, তবে কিছুই থাকবে না। বস্তি এখন বড় কথা না। ব্যবসা বাণিজ্য ছড়িয়ে আছে, সেগুলো দেখতে হবে; যদি বোঝ বেশি বাড়াবাড়ি করছে আস্তানা ভেঙে দাও, দরকার নেই আমার, বেকার বাউণ্ডুলে সব ভাড়াটে বসিয়ে ফি মাসে ঘরভাড়া আদায়ের হাঙ্গামা পোহানো।'

'না না, তা হবে না।' পারিজাত আবার ধীরে ধীরে পায়চারী করছিল। 'আই হ্যাভ ডিসাইডেড—' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঠারো টাকা ভাড়া দেবার সামর্থ্য

নেই, কিন্তু চল্লিশ টাকা ভাড়া গুনতে পারে এমন লোকেরও অভাব হবে না। বাবার সঙ্গে কনসাল্‌ট করতে পারছি না, কর্পোরেশনের সঙ্গে হাঙ্গামাটা চুকছে না তাই। আরো কিছু টাকা ঢালতে হবে হয়তো। ড্রেনের মামলাটা চুকে গেলে আমি ওখানে পাকা বাড়ি তুলব। বেকার বাউণ্ডুলের বস্তি আর রাখছি না।'

'তাই কর, তাই করা উচিত।' দীপ্তি স্বামীর দিকে না শিবনাথের দিকে তাকান। 'কুৎসিত কদর্য ওয়ান পাইস ফাদার-মাদারদের বাড়ির কাছে রেখে জায়গাটাকে নরক করে রেখো না, কি বলেন?' সুন্দর অধরোষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গিমা শিবনাথকে মুগ্ধ করল। 'নিশ্চয়ই।' মাথা নাড়ল সে।

দীপ্তি আলস্যভঙ্গের হাই তুলে বললেন, 'যাকগে, এখন কাজের কথায় আসা যাক, রমেশ পাঠিয়েছে, তুমি কি এই ভদ্রলোককে ছেলেদের টিউটার রাখবে ঠিক করলে?'

'হ্যাঁ সেজন্যেই তো এত কথাবার্তা।' পারিজাত স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'তুমি কি আজই এঁকে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে চাও?'

'আজ, ও বাবা, ভীষণ টায়ার্ড আমি। তা ছাড়া, ওরা এখন পর্যন্ত ফিরলই না। আসবে, বিশ্রাম করবে, পোশাক বদলাবে, দুধ খাবে—পড়া আরম্ভ করতেই অনেক রাত। ওরা আজ পড়বে না, তা ছাড়া, অতক্ষণ কি উনি বসে থাকবেন?'

চারিদিকে তাকিয়ে যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন শিবনাথ প্রশ্ন করল: 'বাচ্চারা বুঝি এখনো বেড়িয়ে ফেরেনি?'

'হ্যাঁ, ওদের জন্যে নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে আজ। খুব বেড়াচ্ছে, সারাদিন বেড়িয়েছে, একটু আগে সরকারকে সঙ্গে দিয়ে শহরে পাঠালুম। আমার ওষুধও আনা হবে, ওদের বেড়ানো হবে।'

কি ওষুধ, খাওয়ার কি লাগাবার, অসুখটা কোথায় ইত্যাদি জানবার জন্যে শিবনাথ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কৌতূহলবোধ করল, কেননা শোফার ওপর ঈষৎ হেলে বসা পারিজাত-গিন্নীর পেঁয়াজ রঙের একটা ওভারকোটে গলা পর্যন্ত ঢাকা নাতিবৃহৎ তনু, শঙ্খের মত গ্রীবা, আপেলমসৃণ লালাভ গালের কোথাও অসুখ থাকতে পারে শিবনাথ চিন্তা করতে পারল না। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা হীরের আঙটি। উজ্জ্বল কালো চোখের তারা। চোখেরও কোন অসুখ নেই, এ সম্পর্কে শিবনাথ নিশ্চিন্ত ছিল। একবারও চোখের পাতা একত্র না ক'রে শিবনাথ তাঁর দুধে-আলতা রং আঙুলের নখগুলি দেখতে লাগল। প্রসারিত বাঁ হাতটা দীপ্তি একটা হাঁটুর ওপর রেখে পা-টা একটু একটু নাড়ছিলেন।

'আমরাও এই সবে বেড়ানো শেষ করে ঘরে ফিরলাম।' পারিজাত বলল।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' রমেশের চিঠি নিয়ে শিবনাথ বিকেল থেকে এখানে অপেক্ষা করছিল। বাইরে বারান্দায় ব'সে ছিল। তাঁরা বাড়ি ফিরে তাকে ড্রইংরুমে এনে বসিয়েছেন।

'আজ দু'জন একলা বেড়াতে বেরিয়ে আমরাও অনেকদূর গিয়েছিলাম।' দীপ্তি বললেন, 'তা আপনি কাল একবার আসুন।'

'কখন, সকালে না কি—' শিবনাথ মেরুদাঁড়া সোজা করল।

'ও, বাবা, সকালে হবে না, মেয়ের গানের মাস্টার আসে, আমাকেও কাছে থাকতে হয়—'

'বেশ তো, না হয় বিকেলে, মানে সন্ধ্যার পর এমন সময়—' ইতস্তত করছিল শিবনাথ।

'আসুন।'

শিবনাথ উঠে দাঁড়াবে এমন সময় বাইরে কলরব শোনা গেল। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় বোঝা গেল।

'ওরা এসেছে।' পারিজাত ভুরু তুলল।

'এ্যাঁ, বেড়ানো হয়ে গেল!' দীপ্তি তড়াক্ করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। 'বাবলু—মোনা—চন্দন—কেয়া—রেবা—রঞ্জু—শোভন, ওকি এর মধ্যেই তোমাদের হয়ে গেল! সরকার মশায় কোথায়?'

দরজায় দাঁড়িয়ে দীপ্তি রীতিমত হাঁপাতে থাকেন, আর সব ভিড় করে মাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

বড় বড় চোখ, কালো কোঁকড়া চুল, পাকা ডালিমদানার মতন গায়ের রং। ছেলেগুলো সুন্দর কি মেয়েগুলো বলা শক্ত। শিবনাথ হাঁ করে তাকিয়ে দেখল। দেখে যেমন সেদিন খালপাড়ে বিস্মিত অভিভূত হয়েছিল, এখনও তার মনের অবস্থা তাই হল। দীপ্তির দিক থেকে শিবনাথ চোখ ফেরাতে পারছিল না। গর্ভধারিণী। যেন বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে বাধছিল শিবনাথের। হঠাৎ তার খেয়াল হয় সবাই তার দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শিবনাথ লজ্জা পায়।

'কে মা, ইনি কি,—'

'তোমাদের নতুন মাস্টারমশায়—'

'এখনো হয়নি' কাল ঠিক হবে।' পারিজাতের দিকে রুষ্ট ভ্রূভঙ্গি হেনে দীপ্তি বাচ্চাদের বললেন, 'আট নম্বর বাড়িতে থাকেন।'

'ও, সেই বস্তিতে, ধ্যেৎ! বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আপত্তিসূচক মাথা নাড়ল।

বড় মেয়েটি গাল ফোলাবার মতন চেহারা করে বাবার দিকে তাকায়। 'ইস্, মন্টুদার মতন মাস্টার এখানে পাব না বাবা, উনি কি আমার অঙ্ক বোঝাতে পারবেন?'

মেজ ছেলেটি বড় ছেলেটির কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'আপনি কি ফুটবল খেলা দেখেন, বলুন তো এবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কাছে এত মার খেল কেন?'

শিবনাথ অবাক হ'ল এবং খুশিও হ'ল শিশু প্রশ্নকর্তাদের গম্ভীর চেহারা দেখে।

মেজ মেয়েটি বলল, 'আমি জানি, এবার নিউ এম্পায়ারে যে গীটার বাজনা হয়ে গেল, আপনি দেখতে যাননি। লম্বা মেয়েটার দেশ কোথায় আপনি জানেন? জানেন না। নরওয়ে। নরওয়েজিয়ান গার্ল। নাম মিস রুবেলা।'

'আঃ, এত কঠিন প্রশ্নের দরকার কি?' বড় ছেলেটি বোনকে ধমকে দেয়। 'তুই চুপ কর কেয়া, আমি একটা সহজ প্রশ্নে ভদ্দরলোককে কাবু করে দিচ্ছি। আচ্ছা বলুন

তো, একটা পার্টিতে আপনি উপস্থিত আছেন। এক গ্লাস গেলার পর আপনি আর ড্রিংক করতে চাইছেন না। তখন কি করবেন?'

চোখ বড় করে শিবনাথ পারিজাতের বড় ছেলেকে দেখছিল। প্রশ্ন করে ছেলেটি হাতের ঘড়ি দেখছে। আট বছরের ছেলের হাতে সুন্দর রিস্টওয়াচটি দেখে শিবনাথ যত না পুলকিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় তার ঘড়ি দেখার ভঙ্গি দেখে। এক, দুই। দু' মিনিট পার হবার পরও শিবনাথ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না দেখে ছেলেটি মুখ তুলে মার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কিস্‌সু না, বোগাস। জেনারেল নলেজে পণ্ডিত।'

দীপ্তির মুখে এতবড় একটা সিল্কের রুমাল।

অর্থাৎ শিবনাথ বাচ্চাদের হাতে ভীষণ ঘায়েল হচ্ছে দেখে তিনি হাসি লুকোন। পারিজাত পাইপের তামাক পাল্টায়।

'বাবলু, তোমরা ভুলে যাচ্ছ ইনি ব্যারিস্টার হয়ে বিলাত থেকে আসেননি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তা হলেও একজন গ্র্যাজুয়েট। তাঁর স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। আট নম্বর বস্তিতে আছেন এঁরা, কাজেই আমাদের প্রজা বলা চলে। সুতরাং বিলাতী কালচার জানা না থাকলেও আমাদের প্রজা হিসাবে এঁদের যতটা সম্ভব সুযোগ-সুবিধা দেওয়াই আমাদের উচিত। আজ আর সময় হবে না। কাল তোমার মা টেস্ট ক'রে যদি বোঝেন রাখা চলে, তবে আপাতত এঁকেই তোমাদের প্রাইভেট-টিউটার হিসাবে এপয়েন্টমেণ্ট দেয়া হবে, আমরা ঠিক করেছি। এতক্ষণ এই নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

বাবলু অর্থাৎ বড় ছেলেটি বাবার কথা শুনে বিষণ্ণ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপ্তি মুখের রুমাল সরিয়ে শিবনাথকে বলেন, শ্বশুরমশায় বেশি অসুস্থ ছিলেন বলে গত বছর আট ন' মাস আমাকে বাচ্চাদের নিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। সেখানে মণ্টু ব্যানার্জি ওদের মাস্টার ছিল। ব্যারিস্টারি পাশ করে পসার জমাতে পারছিল না বললে ওর ওপর অবিচার করা হয়, আমি বলি পসারের দিকে ওর মন ছিল না, নেই। বাচ্চা পড়িয়ে বেড়ানো হবি। তা-ও কি খুব একটা বেশি টাকা নিত, একশ টাকা। আমার তো মনে হয় সে-টাকায় ওর মাসের সিগারেটের খরচ উঠত না।'

'তিনি এখন কোথায়?' মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল শিবনাথের।

অত্যন্ত করুণ চেহারা ক'রে দীপ্তি বললেন, 'তিনি কি আর বেলেঘাটা চিংড়ি-ঘাটায় আসবেন আমার ছেলেমেয়েদের পড়াতে। তাই তো বলি, এখানে জমিদারী ব্যবসা ফেঁদে সবচেয়ে ক্ষতি হ'ল আমারই, আমার ছেয়েমেয়েদের পড়াশোনার সুবিধা হচ্ছে না।'

'তুমি একটুতেই ডিসহার্টেনড্‌ হয়ে পড়ো, দীপ। শীগ্‌গিরই সবগুলো ইংরেজী বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়া হবে। এখানেও অনেক লেখাপড়া-জানা লোক আছে। আগে এদের চান্স দেবার কারণ টাকার ডিমাণ্ড্‌ এরা খুব একটা করবে না। মণ্টু ব্যানার্জির মত প্রাইভেটদের এখানে আনিয়ে পড়াতে গেলে আড়াই শো হাঁকবে।'

পারিজাত পাইপে আগন্ন দিল।

'তাই তো বলি, টাকা—সন্তানের চেয়েও টাকার মমতা বেশি তোমার, আমি একথা প্রথম থেকে বলে আসছি।' অভিমানাহত কণ্ঠস্বর স্ত্রীর।

'এরকম ধারণা করা তোমার অন্যায় দীপ।' পারিজাত শক্ত ভঙ্গিতে একটা দেয়াল ম্‌খ করে দাঁড়াল। সেখানে একটা বড় চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো আরশি টাঙ্গানো। পারিজাত নিজের চেহারা দেখতে দেখতে বলল, ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি কী করছি, কতটা করছি, তোমার চেয়ে বেশি আর কারো তা জানবার কথা নয়। আমার কথা হচ্ছে মণ্ট্ব ব্যানার্জি তো হাতে আছেই। এরা গরিব।' আয়নার মধ্য দিয়ে শিবনাথের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করল পারিজাত। 'প্রজাদের মধ্যে যদি শিক্ষিত লোক থাকে আর আমি তাদের স্ব্যোগ-স্ব্বিধা না দিই তো ল্যান্ডলর্ড হিসাবে আমার কি বদনাম উঠবে তা তুমি জান।'

'পাক্কা কম্যুনিস্ট বনে গেলেই পার।' হাতের র্‌মালটা দিয়ে দীপ্তি কপাল মোছেন।

গলাবন্ধ ওভারকোটের দর্‌ন এবং পারিজাতের কথার দর্‌ন বিরক্ত হয়ে ঘেমে উঠেছেন তিনি। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছেন। বক্ষস্পন্দন দেখেই শিবনাথ অন্‌মান করল।

'এদিনে একট্ব ডেমোক্রেটিক আইডিয়া নিয়ে চলতে হয় বৈকি। তাছাড়া সামনে ইলেকশন। সবদিক ব্‌ঝে শ্‌নে না চললে বিপদ আছে। স্থানীয় লোকদের সাপোর্ট আমার খ্‌ব বেশি দরকার।'

'যা বোঝ তা-ই করো।' যেন এই নিয়ে বাক্যব্যয় করে দীপ্তি আর ক্লান্ত হতে নারাজ। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তিনি পাশের ঘরে চলে যান।

তিনি চলে যাবার পরও দরজার ঘন নীল ভারি পর্দাটা কাঁপতে থাকে। সেদিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে পারিজাত পরে এদিকে ঘাড় ফেরায়। শিবনাথের দিকে তাকায়। 'দেখেছেন মশাই, আপনারা তো আমাদের--বড়লোকদের মানে ক্যাপিটেলিস্টদের উঠতে বসতে বাপান্ত করছেন। শালারা সমাজের মাথায় বসে কেবল স্‌খ ল্‌টছে। স্বর্গের স্‌খ। কিন্তু এখানেও পাতালের দ্বঃখ, অগাধ অন্ধকার। একবার নিজের চোখে দেখে যান ভিতরটা।'

বলে পারিজাত শিবনাথের চোখে চোখ রেখে দার্শনিকের মত হাসল ও ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল। শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে আস্তে ব্‌দ্ধিমানের মত বলল, 'বালিগঞ্জ ছেড়ে এখানে এসে তাঁর অস্‌বিধা হচ্ছে,—থাকতে।'

'তা তো হবেই। মশাই ব্যারিস্টার মাস্টার রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার মেজাজ তৈরী করে দিয়েছেন দীপ্তির বাপ—মেয়ের। এখানে এলেই তাঁর খ্‌তখ্‌ত আরম্ভ হয়। মানে, শ্বশ্‌রের ওখানে ওটা মিথ্যা কথা, থাকেন তিনি সেখানে তাঁর বাপের বাড়িতেই। বালিগঞ্জে তাঁরও বাপের বাসা। হ্‌ঁ, আমার বাবার চেয়ে ওর বাবার পয়সা বেশি। আর ওবাড়ির সঙ্গেই মণ্ট্ব ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতা।'

শিবনাথ অধোবদন হয়ে শ্‌নল।

পারিজাত, বোঝা গেল, স্ত্রীর ওপর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ আছে কোনো ব্যাপারে। গম্ভীর-ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। একটু পর শিবনাথ মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে বলল, 'আচ্ছা স্যার, আজ চলি, কাল একবার দেখা করব।'

'আসবেন। মহিষী তো জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বলেছি তো আপনাকে এসব আমার ডিপার্টমেণ্ট না। কাল এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তাঁকে প্লিজ করুন। বহাল হয়ে যাবেন। অ—আ, কোনোদিন শিখতে পারবে না যে-সব বখাটে ছেলেমেয়ে, তাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে ভেবে সময় ব্যয় না করে আমাকে অন্য অনেক কিছু করতে হয়।'

পারিজাত আবার দ্রুতভঙ্গিতে পাইপে তামাক পুরল, তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করে এবং এক সেকেন্ডও আর অপেক্ষা না করে ছুটে বাইরে গিয়ে 'গাড়ি', 'গাড়ি' বলে চীৎকার করে উঠল।

যেন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বেরিয়ে এল। পারিজাত গিয়ে গাড়িতে উঠল। শিবনাথ শব্দ শুনে আন্দাজ করল। আরো একটু সময় বসে কান পেতে থেকে পরে পারিজাতের ড্রয়িং-রুম থেকে শিবনাথ যখন রাস্তায় নামল তখন শুনতে পেল বাড়িতে কে পিয়ানো বাজাচ্ছে। এ-বাড়িতে দীপ্তি ছাড়া আর কে পিয়ানো বাজাতে পারে কল্পনা করতে করতে শিবনাথ রাস্তায় নেমে এল। 'আমরাও মশাই শ্রেণী-সংগ্রামের অসহ্য যাতনা ভোগ করছি। আমার বাবার চেয়ে দীপ্তির বাবা বেশী বড়লোক' এই গরমে স্ত্রী স্বামীর জীবন অহরহ পুড়িয়ে মারছে। নিষ্ঠুরা দীপ্তিকে একবার আপনারা চোখে দেখুন।'

রাস্তায় চলতে চলতে পারিজাতের করুণ হা-হুতাশ মাখা চোখ দু'টোর অর্থ শিবনাথ এখন বেশ বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে নিজের মনে ঠোঁট টিপে হাসলো।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—'ওকে প্লিজ করুন, বহাল হয়ে যাবেন।' পারিজাতের সুন্দর উক্তিটা শিবনাথের কানে পাকা হয়ে রইল।

ছাব্বিশ

বলাই ও রমেশ রায় গভীর কোনো বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করছে।

তাই শিবনাথ তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল। কথায় মত্ত বলে রমেশ রায় শিবনাথকে দেখতে পেল না। তাই আর তাকে ডাকল না। না হলে শিবনাথকে আবার রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চা খেতে হ'ত এবং এবাড়িতে আর কে ঘরভাড়া দিতে পারছে না এবং তার সম্পর্কে শীগ্‌গির কি ব্যবস্থা করা হবে ইত্যাদি গল্প শুনে অনেক সময় নষ্ট করতে হত। কিন্তু শিবনাথ এখন আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে রুচিকে খবরটি দিতে চাইছে। একটা সুখবর; হ্যাঁ, এমন ভাল ট্যুইশানিটা তার:হয়ে যাচ্ছে। একজন ব্যারিস্টার এই পদের প্রার্থী। খবরটা বেশ রসালো করে রুচিকে শোনাবার জন্যে শিবনাথের জিহ্বা চুলবুল করছিল। হ্যাঁ, আর একটা কথা। টাকা-পয়সা থাকলেই মানুষ দাম্পত্য জীবনে সুখী হয় না। আজ ক'মাস শিবনাথের

চাকরি নেই বলে রুচির রাগারাগি (তার চাকরি আছে। আজও চারবার করে খাওয়া-দাওয়া চলছে এ-ঘরে)। 'আর ওদিকে বালিগঞ্জ থেকে মণ্টু ব্যারিস্টারকে এখানে আমদানি ক'রে বাড়িতে রেখে ছেলেমেয়েদের মাস্টার হিসাবে পুষবার ক্ষমতা (ইচ্ছা ?) পারিজাতের নেই বলে স্বামীর ওপর দীপ্তির ক্রোধ ও মানাভিমানের জাত এক। এ আর তলিয়ে দেখতে হয় না।' রাস্তায় চলতে চলতে শিবনাথ, রুচিকে বলল মনে মনে।

'মশাই, শুনুন। আপনাকে ডাকছি।'

পিছন থেকে তারা তাকে গলা বড় করে ডাকল। ঘাড় ফিরিয়ে শিবনাথ বনমালী, কে. গুপ্ত ও চারুকে দেখতে পেল।

একটু রাত হয়েছে।

এই মাত্র শিবনাথ ঘরে ফিরছে। আজ তার মেজাজ ভাল। বাড়িওয়ালার বাড়ির প্রাইভেট টিউটার হবে শুনে রুচি পর্যন্ত গলে গেছে।

বলতে কি রাত্রে আজ মাছ খেতে ইচ্ছে রয়েছে শুনে রুচি তার ব্যাগ খুলে তৎক্ষণাৎ একটা দু'টাকার নোট শিবনাথের হাতে তুলে দিয়েছে। শেয়ালদা থেকে ইলিশ মাছ আর বাঁধাকপি নিয়ে আসুক।

আজ এ-বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের ঘরে একটা ভারি খাওয়া-দাওয়া হবে, রুচি ও শিবনাথের চলাবলা দেখে বাড়ির বাকি ঘরগুলো টের পেল। অধিকাংশ দিনই দুবার উনুন ধরে না। কিন্তু আজ রাত্রে রুচি রান্না করবে। কাল একটা পাবলিক হলি-ডে, তাই ইস্কুল নেই। একটু বেশি রাত জেগে খাওয়া-দাওয়া করলেও ক্ষতি হবে না। কাল বেলায় উঠবে বিছানা থেকে। রুচির গলার স্বরে একটা গড়িমসি প্রকাশ পাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি শেয়ালদা ছুটে গিয়ে আস্ত একটা ইলিশ মাছ ও একটা বড় বাঁধাকপি কিনে বাড়ি ফেরে শিবনাথ। বাড়িতে ঢুকবার মুখে বনমালীর দোকানের সামনে তারা তাকে পাকড়াও করল। তিনজন প্রতিবেশীর সম্মিলিত ডাক শিবনাথের উপেক্ষা করবার ক্ষমতা ছিল না। সে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার ?'

'মশাই আছেন সুখে।' কে. গুপ্ত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, 'সন্ধ্যাবেলা যে এ পাড়ায় ভীষণ ঘটনা ঘটল, তার খবর রাখেন কিছু ?'

কিছুই জানে না, শিবনাথ এরূপ চেহারা করতে যাচ্ছিল, তারপর তার মনে পড়ে গেল অমলকে। সকালে অমলকে এ-বাড়ি থেকে তুলে দেবার ঘটনা।

ঘটনাটা সে দেখে গিয়েছে চোখের এমন ভাব ক'রে শিবনাথ সেই সম্বন্ধে বরং আরও নতুন রকম প্রশ্ন করল: 'কেন, দশ নম্বরে মানে অমলের খালি ঘরটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে বুঝি. সেই খবর ?' বলে সে হাসল।

'আরে ধ্যেৎ মশাই, ভাড়াটে!' গুপ্ত রুষ্ট হয়ে উঠল। 'এরকম খবর কি আর আমাদের পার্লামেণ্টে ওঠে যে তাই নিয়ে আমরা সারাদিন মাথা ঘামাব ? অমলের খবর তো দুপুরের পরই বাসি হয়ে গেছে মশাই। অমল এখন ভিজে তুলতুলে হয়ে

আছে। সন্ধ্যাসন্ধি চারু কলকাতা থেকে খবর নিয়ে এসেছে, সাতদিনের মধ্যেই অমলের দেড়শ টাকার চাকরি হচ্ছে। সেই সুবাদে যে মশাই আজ সন্ধ্যায় ঘোলপাড়ায় অমলের বাড়িতে আমাদের বড় রকমের ফিস্টি হয়ে গেল। কিরণ রান্না করেছিল। ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি। দেখুন না চারুর পেটটা কতটা ফুলে উঠেছে। ওকে খাওয়ানো উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠান। খরচটা অবশ্য আজকের মতন চারুই চালিয়েছে। এতটা যখন করল আর এইটুকুন বাদ থাকে কেন। সুতরাং—'

শিবনাথ থলের হাত পাল্টায়।

বনমালী চালাক লোক। শিবনাথকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'বাবা গুপ্ত, ভদ্রলোককে যে কথা বলতে ডেকেছ তাই বলে দাও, তোমাদের অমল-কিরণের কেচ্ছা ওকে শুনিয়ে কি হবে!'

'তুই শালা চুপ কর্।' গুপ্ত বনমালিকে ধমক লাগায়। 'তুই মুদি—লোকের গলায় দা বসাতে এখানে দোকান খুলেছিস। আমাদের, ভদ্রলোকদের চাকরি-সম্বল শিক্ষিত বাঙালী ছেলেদের দুরবস্থা সম্পর্কে এখানে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, বড় যে তোদের এখানকার মনিব পারিজাত অপমান করতে চেয়েছিল অমলকে আর তার বৌকে—এখন ওরা দু'টিতে কেমন কাঁচকলা দেখিয়ে ঘোলপাড়ায় অল্প টাকায় আরো ভাল ঘর পেয়ে বাসা বেঁধেছে, সেই কথাটা ইনিকে শোনাচ্ছিলাম। ধর ইনিরই যদি কাল চাকরি গেল, তখন—'

'ইনির স্ত্রী চাকরি করেন।'

'হ্যাঁ, তা করেন বটে।' বনমালীর যুক্তি তৎক্ষণাৎ কেটে দিলে কে. গুপ্ত। 'স্ত্রীর চাকরি যেতে কতক্ষণ। এক চাকরি চিরকাল থাকবে এতবড় দার্শনিক আমরা বা আমাদের স্ত্রীরা কেউ হ'তে পারি নি, কি বলেন মশাই।'

'হুঁ তা বটে।' শিবনাথ মৃদু ঘাড় নাড়ল।

'তুই মুদি, অশিক্ষিত, তুই কতটা বুঝবি আমাদের শিক্ষিত লোকের দুর্গতি কত, আজ চারু আছে বলে অমল বেঁচে গেল। কাল যখন মদন ঘোষ আমাকে কি বাড়ির আর কোনো ডিফলটার ভাড়াটেকে তুলে দেবে, তখন উপায় হবে কি আমাদের সেই ভাবনা।'

বনমালী আর কথা না বলে হিসাবের খাতার পাতাটা ওলটায়।

শিবনাথ আবার হাত পাল্টায় তার থলের। কপি ও মাছে বেশ ভারি হয়েছে থলেটা।

কে. গুপ্ত চারুর টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে মুখে গুঁজে বলল, 'মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, সেই বাড়িতে গিয়ে একটা বিকেলের মধ্যে কিরণ কতটা ফ্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি এ-বাড়ির পেত্নিগুলো, মানে আমাদের কমলা বীথি প্রীতি মাস্টারের মেয়েগুলো কিরণকে দেখলে খামোকা নাক সিঁটকাতো। অপরাধ? পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, লেখাপড়া জানে না। আরে তোরা যে কিরণের পায়ের দাসী, তোরা যে ওর আঙুলের নখ ছোঁবারও যুগ্যি নস কেউ, সে কথাটাই এ-বাড়ির আর একজন বাসিন্দা হিসাবে আমি আপনাকে শোনাচ্ছিলাম। আপনিও চোখে দেখেছেন

মশাই, অহংকারী পাজী মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে কিরণ কতটা অসুখী ছিল। আজ দূরে সরে যেতে বোঝা গেছে কত সুন্দর ভদ্র ফরোয়ার্ড মেয়ে কিরণ।'

চারু রায় হেসে উঠল। 'থাক। কিরণের প্রশংসা আর ওঁকে শুনিয়ে লাভ নেই; ওঁর স্ত্রী নিশ্চয় কাজ থেকে সবে ঘরে ফিরেছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন, ইনি বাজার নিয়ে গেলে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া হবে। দু'জনেই টায়ার্ড। তোমার মতন তো মুক্তপুরুষ সবাই না। এঁকে এখন ছেড়ে দাও।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দেবই, বৌয়ের হাতের রান্না খাওয়া, তা-ও কপালের ভাগ্যি, আমার তো মশাই বৌ থেকেও সেটি হয় না।' রুক্ষ লম্বা চুলগুলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কে. গুপ্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। কেন হয় না বলল না যদিও।

শিবনাথ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'কি যেন ঘটনার কথা বলছিলেন, বলে ফেলুন।'

'না তেমন কিছু কি'...যেন কথাটা বলবে কিনা ভেবে গুপ্ত ইতস্ততঃ করছিল।

বনমালী বলল, 'তা ছাড়া এই ভদ্রলোককে বলেই বা কি হবে। এ-বাড়ির কোনো ভাড়াটেকে এখন বলে কিছু হবে না। যে যার নিজের মাথা আগলাতে ব্যস্ত। তোমার নিজের মামলা এটি। থানায় গিয়ে ডাইরি করাবে কি না তুমি বুঝে দেখ।' কথা শেষ করে বনমালী একবার শিবনাথকে দেখে পরে আবার কে. গুপ্তর দিকে ঘাড় ফেরায়।

চারু রায় শিবনাথের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মশাই, এই একটু আগে এখানে রাস্তার ওখানটায় অ্যাক্সিডেণ্ট করেছে পারিজাতের গাড়ি। হ্যাঁ, আপনাদের ল্যাণ্ডলর্ড।' কে. গুপ্ত থুতনি দিয়ে বাদামতলাটা দেখিয়ে দিল।

শিবনাথ একটু অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

'আমার ছেলে রুণুকে চেনেন তো? ওই হারামজাদার পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে। পারিজাতের গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরতে গেছল।'

'মরেনি।' বনমালী বলল, 'তখ্খুনি ব্রেক কষতে পেরেছিল পারিজাতের ড্রাইভার। শিখের বাচ্চা, হাত ভাল।'

একটু সময়ের জন্য সবাই চুপ।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে চারু রায় বলল, 'হাসপাতালে আছে কে. গুপ্তর ছেলে কেম্বেলে, আমি গাড়ি করে দিয়ে এলাম।'

'আপনিও কি ঘটনার সময় ছিলেন নাকি?' বুদ্ধিমানের মত শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'না, আমি ছিলাম ঘোলপাড়ায় কিরণের ওখানে, ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে কে. গুপ্ত আমার আগেই এখানে চলে আসে। এসে ওর মুখে শুনলাম এই ঘটনা।'

'দুর্ঘটনার সময় আপনি ছিলেন কি?'

বনমালী মাথা নাড়ল। 'আমি তো এই সবে কোলকাতা থেকে ফিরেছি। এইমাত্র দোকান খুললাম। সওদা আনতে বড়বাজার যেতে হয়েছিল। রাত হ'ল ফিরতে। এসে শুনলাম রমেশ রায় নাকি ছিল তখন।'

'আর বলাই।' কে. গুপ্ত বলল, 'কিন্তু ওরা বলছে অন্যরকম।'

'কি রকম ?' শিবনাথ স্থির হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যেন আরো কি একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে।

'মশাই, সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।' কে. গুপ্ত তাঁর লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকাল। আমি রিপোর্ট পেলাম. আমার পুত্র শ্রীমান রুণু ও বলাইয়ের মেয়ে ময়না হাত ধরাধরি ক'রে মাঠে হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরছিল। ওরা যখন বাদাম গাছটার নীচে তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়। গাড়ির ধাক্কা লেগে রুণু মাটিতে পড়ে যায়। ময়না এমনিও ছেলেমানুষ, তার ওপর মেয়েছেলে,—কি আর করে, ছুটে গিয়ে বাড়িতে নাকি খবর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেখানে রমেশ ও বলাই এসে পড়ল।'

'ও, চাপা পড়েনি, ধাক্কা লেগেছিল ?' প্রশ্নটা ক'রে শিবনাথ কে গুপ্তর দিকে তাকাতে কে. গুপ্ত ধমক দিয়ে উঠল। হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, কিছু না, মাইনর ইঞ্জুরি—রমেশও তাই বলছে।' ব'লে কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে তাকাল। বনমালী বলল, এমন সময় সেখানে চারুবাবু এসে পড়েন। এই তো তিনি রুণুকে হাসপাতালে রেখে ফিরছেন।'

শিবনাথ আবার ঘাড় ফিরিয়ে অদূরে বাদামতলাটা দেখতে চেষ্টা করল। জায়গাটা অন্ধকার। ভাল দেখা যায় না। শিবনাথ আবার এদের দিকে মুখ ফেরায়। 'তা রমেশ বলাই কি বলছে ?'

বনমালী বলল, 'কি বলছিল এঁকে শুনিয়ে দাও গুপ্ত।'

চারু শিবনাথের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'মশাই, রমেশ রায় বলছে অন্যরকম। রুণু ও এ-পাড়ার আরো চার পাঁচটা ছেলে নাকি এ-বাড়ির ভাড়াটে অমলকে তুলে দেয়ার পর থেকেই আজ সারাদিন রাস্তায় মাঠে ঘুরে ঘুরে চেঁচামেচি করছিল। বাড়ি-ওয়ালার জুলুম চলবে না, ঘরভাড়া কমিয়ে দাও,—এইসব। কে. গুপ্ত বলছে, রুণুর সঙ্গে বলাইয়ের মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না, আমি মেয়েটাকে দেখিনি অবশ্য। রুণুটা একলা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে ছিল। রমেশ বলে—রুণু ও তার সঙ্গীরা নাকি পারিজাতের গাড়ীটা আটকাতে গিছল।'

'কী ভীষণ কথা !' যেন নিজের মনের কথা বলল শিবনাথ।

কে. গুপ্ত ও বনমালী চুপ। টিন থেকে চারু রায় আর একটা সিগারেট তুলল। কি একটু ভেবে শিবনাথ পরে প্রশ্ন করল, 'বলাই ? বলাই কি বলছে ?'

'জানি না।' কে. গুপ্ত হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমি তো শালা তখন রাস্তার ওধারটায় ছিলাম। এদিকে নজর দিইনি। দেখছিলাম খুব স্টাইল ক'রে নতুন শাড়ি জুতো পরে ভুবনের মেয়ে বীথিটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা মশাই, ও কি একটা চাকরি পেয়েছে শুনলাম। আপনি শুনেছেন নাকি কিছু। বড় যে রাতারাতি শ্রীমতীর চেহারা পালটে গেল। দেখেছেন ?'

শিবনাথ কিছু বলবার আগে বনমালী কে. গুপ্তকে ধমক লাগায়।

'কোথায় তোমার ছেলে গাড়ি চাপা পড়েছে, থানায় ডাইরি করানো হবে কিনা কথা হচ্ছে, তা না তুমি ভুবনের মেয়ের শাড়ি জুতোর ব্যাখ্যা করছ। তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না।'

'বেশ হয়েছে, মরে যাক ছেলে।' আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে তাকিয়ে একটু সময় কি ভাবল। চারু রায়ের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হারামজাদা শ্লোগান তুলতে গেছল কিনা বাড়িওয়ালার জুলুম চলবে না। তাইতে আমি কেস্ করতে গেলে ওরা উল্টো পলিটিক্যাল কেস্ করবে!'

'না, এভাবে পলিটিক্যাল শ্লোগান তোলা ঠিক হয়নি। এতে কেস্ পারিজাতের ফেভারে যাবে।'—শিবনাথ না বলে পারল না।

'বেশ তো ছিলি বাবা, প্রেম করছিলি ময়নার সঙ্গে কাপ ক্ষেতে বসে। আমি মশাই সব রিপোর্ট পাই। আমি সংসারের দিকে চোখ রাখতে পারছি না ব'লে ছেলেমেয়ে দু'টো একেবারে গোল্লায় যেতে বসেছে।'

বনমালী চুপ ক'রে রইল। চুপ থেকে শিবনাথের চোখে চোখ রাখল।

কে. গুপ্ত বলল, 'সেদিন চায়ের দোকানে রমেশ রায়ের ভাই ক্ষিতীশ বেটিটাকে চুলের মুঠি ধরে খুব মেরেছে।'

'কেন?' শিবনাথ ইচ্ছে ক'রে ঢোক গিলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি ওকে রমেশের দোকানে যেতে এলাউ করেন কেন?'

কে. গুপ্ত চোখ বড় করে শিবনাথের দিকে তাকাল। 'কেন, আপনি কি মশাই বলছেন আমি বারণ করলে বেবি সেখানে যাওয়া বন্ধ করবে?'

'হ্যাঁ করবে, কেন করবে না।' শিবনাথ কণ্ঠস্বর দৃঢ় করল। 'আপনি বাপ, গার্ডিয়ান।'

মাথা নেড়ে বনমালী বলল, 'আপনি মশাই দেখছি পাগলের সঙ্গে কথায় মেতে উঠলেন। যান তো নিজের ঘরে। বৌদিমণি রান্না করবেন বাজারের আশায় ব'সে আছেন। কাকে আপনি উপদেশ দিচ্ছেন। একবেলা খেতে দিতে পারে না, নিজে উপোস থাকছে বেলার পর বেলা। অর্ডার করলে ছেলেমেয়েরা এখন তা শুনবে কেন? তাছাড়া যেমন ছেলেটা তেমনি মেয়েটা। বয়স তো আর একটিরও কম হয়নি। যদি আপানারা দশজনে মিলেও আজ বেবিকে নিষেধ করেন, দরকার নেই মাগনা চা-চিনি এনে, তোদের সংসারের সব খরচ আমরা চালাব, আর রমেশ রায়ের দোকানে গিয়ে কাজ নেই, তবু যাবে। ক্ষিতীশ যদি এখন জুতোও মারে তবু বেবিকে যেতে হবে দু'বেলা ওই দোকানে। মানে সর্বনাশ যতটুকুন হবার হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমি মুখ ভরিয়ে এখন আর করব কি। চুপ থাকুন।'

শিবনাথ একটু স্বস্তিবোধ করে বাড়ির দিকে পা বাড়াবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

চারু রায় বলল, 'মশাই, আমার ইচ্ছা ছিল লালবাজারে একটা ফোন করে দিই। আমার বন্ধু পুলিশের বড়কর্তা। শুনলে অবশ্য এসে স্টেপ নেয়। কিন্তু দেখলাম কে. গুপ্ত নিজেই সাইলেন্ট থাকতে চাইছে। তাছাড়া, তাছাড়া—'

সিগারেটের ছাই জমছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চারু বলল, 'কিন্তু আমার পক্ষেও সেটা সুবিধা বা সম্ভব হয় না। কেননা, এই অঞ্চলে আমাকে ঘনঘন যাওয়া-আসা করতে হচ্ছে। এখানে আমার নিজের ইন্টারেস্ট বেশি না। পাবলিকের প্রতি

দায়িত্বটাই গুরুতর। লিমিটেড কোম্পানী, মাইনে করা চাকর আমি। আজ এখানে ছবির মেটেরিয়েল জোগাড় করতে এসে যদি এখানকার ল্যান্ডলর্ডকে ক্ষেপিয়ে তুলি, তো আমার আসা সকলের আগে বন্ধ হবে। হেভি লস্ হবে কোম্পানীর। কোম্পানী ডুববে। তার অর্থ আপনাদের মত পাবলিক,—এমনি কয়েকটা নিরীহ লোক মারা যাবে। অর্থাৎ যারা দেশের ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রির উন্নতি হবে ভেবে ব্যাঙ্কের জমানো সর্বস্ব আমাদের হাতে দিয়েছে, ওদের ঘুমে মারা হবে।'

কথা শেষ করে চারু রায় ঈষৎ হাসতে শিবনাথও হাসল।

'আরে ছি ছি!' কে. গুপ্ত দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। 'আমিও, রায়, তোমাকে বলব না খামোকা একটা বাজে মামলায় জড়িয়ে শেষটায় তোমাদের কোম্পানী হেভি লস্ খাক। ওই বনমালীই ঠিক বলেছে! আমার সর্বনাশ শুরু যেদিন থেকে পারিজাতের টিনের শেডের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। বাস্তবিকই তো, ক'দিক থেকে লোক এসে আমার ছেলেমেয়েদের রক্ষা করবে! আজ পলিটিক্যাল কেস্ থেকে রুণুকে বাঁচাব। কালই পড়বে হারামজাদা রেপ্ কেসে। রাতদিন বলাইর মেয়েটার পিছনে ঘুরছে, আমি লক্ষ্য করছি।'

এবার অবশ্য শিবনাথ আর বলল না, 'এই মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলেকে মিশতে নিষেধ করুন।'

কেননা, তার আগেই কে. গুপ্ত মাথার লম্বা চুলগুলোর মধ্যে তার রোমশ শীর্ণ হাতখানা ঢুকিয়ে বলেছে, 'আমি খেতে দিতে পারি না তো ওরা এভাবে না হয় সেভাবে মরবে, এটা তো দিনের আলোর মত সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কেন আমি বলব, একে-ওকে মশাই, ওদের পিছনে ঝুপ করে কিছু টাকা ঢালুন। আমি এই বিপদে পড়েছি।'

চারু আনত চোখে হাতঘড়ির কাঁটা দেখছিল।

শিবনাথ সুযোগ বুঝে বলল, 'আচ্ছা আমি চলি মশাই, ওদিকে আবার—'

'হ্যাঁ, আপনার গৃহিণী অধীর হয়ে উঠছেন। জানি আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হবে। সুতরাং আপনাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখব না, আচ্ছা, আপনি কি জানেন, সন্ধ্যার পর পারিজাত বাড়িতে ছিল না গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল? কিছু খবর রাখেন, কারেক্ট ইনফরমেশন দিতে পারেন?'

'কেন বলুন তো?' শিবনাথ প্রশ্ন না ক'রে পারল না। কেননা মদের জিহ্বা ব'লে সব কথাই একটু হিউমার ক'রে বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে এতক্ষণ বলছিল কে. গুপ্ত। তার এই স্বর শুনেই শিবনাথ অভ্যস্ত। এখন হঠাৎ লোকটির মুখে একটু কড়ারকম ভাষা শুনে শিবনাথ চমকে উঠল। কিন্তু কিছুমাত্র ইতস্তত করল না চট ক'রে বলতে, 'আমি কি ক'রে বলব। আমি তো এইমাত্র বাজার সেরে ফিরলাম।'

'তাঁর ঘরভাড়া আটকে থাকে না যে, তিনি পারিজাতের খোঁজ রাখবেন। কখন রায়সাহেবের ছেলে এলো, কখন গেল। নাকি পারিজাত এবার নিজেই জমিদারী রাখতে তোমাদের ভাড়াটেদের শায়েস্তা করতে ছুটে এল। মনিবের চলাফেরার দিকে নজর রাখা তোমাদের কাজ। তোমার, বলাইর। অমল উঠে গেছে, রক্ষা পেয়েছে।'

হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে বনমালী আর একটা ধমক লাগাতে কে. গুপ্ত আকাশের দিকে তাকাল।

চারু রায় উঠে দাঁড়াল এবং আর একবার হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, 'আমি আর ওয়েট্ করতে পারছি না গুপ্ত। তোমরা বসে গল্প করো, আমাকে ছুটি দাও। এখান থেকে গাড়ি নিয়েও বাড়ি ফিরতে বারোটা বাজবে।'

'হ্যাঁ, ব্রাদার, তুমি চলে যাও। আমরা একটু সিরিয়স্ টক্ করছি।'

'বাই—বাই!' শিবনাথের হাতে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে চারু রায় ক্ষিপ্র পায়ে রাস্তায় নেমে তার টু-সীটারের দিকে ছুটল। গাছের অন্ধকারে গাড়ীটা শিবনাথ এতক্ষণ দেখতে পায়নি।

এবার কে. গুপ্ত সিরিয়স্ হওয়ার আগে শিবনাথ কড়া সুরে কথা ব'লে উঠল. 'আমায় ছেড়ে দিন মশাই, ঘরে কাজ আছে।' ব'লে শিবনাথ স্পষ্টত বাড়ির দিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করল।

'আহা, আমি তো ঠিক আপনাকে আটকাচ্ছি না। মশাই, রমেশ রায়ের গলার সুরটা আমার ভাল লাগল না। জিজ্ঞেস করতেই বলল, পারিজাতের তিনদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা। বিছানা থেকেই উঠছে না। সে গাড়ি নিয়ে বেরোবে কি! গাড়িটা রায়সাহেবের ফ্যামিলির হতে পারে। তা সরকার বা ড্রাইভার বা পারিজাতের কোনো আত্মীয় বা কোনো কর্মচারী যে চালিয়ে না যাচ্ছিল তখন. তা কি ক'রে জানলেন। আর তাছাড়া, আপনি যখন নম্বর রাখেন নি। কাজেই কি ক'রেই বা পুলিশকে বোঝাবেন যে ওটা পারিজাতের গাড়ি। এ রাস্তায় উটকো অনেক গাড়ি রাত-বেরাতে ছুটোছুটি করে।

কে. গুপ্ত কথা শেষ করতে শিবনাথ বলল, 'তা হবে, আমি জানি না। আমি তো আর রমেশ রায়ের মত রায়সাহেবের বাড়িতে রাতদিন যাওয়া-আসা করছি না। হয়তো ওরা জানে, হয়তো রমেশ যা বলছে তাই ঠিক। আমি কি ক'রে কারেক্ট ইন্‌ফরমেশন দিই।'

বলে শিবনাথ লম্বা পা ফেলে বাজারের থলে হাতে বাড়ির ভিতর ঢুকল।

সাতাশ

রুচির সঙ্গে এই নিয়ে শিবনাথ খুব বেশি কথা বলল না। এটা তার নিজস্ব চিন্তা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কে. গুপ্তর প্রশ্নটা আর একবার মাথায় নাড়াচাড়া করে শিবনাথ তার ঘরের অন্ধকার জানলায় বাড়ির উঠোনের দিকে চোখ রেখে সিগারেট টানতে লাগল। বিছানায় মঞ্জু ঘুমিয়েছে। রুচি ঘুমিয়ে পড়েছিল। এইমাত্র জেগে উঠে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়েছে। হয়তো ইতিমধ্যে আবার ঘুমিয়ে থাকবে।

আর মস্ত বড় উঠোন বুকে নিয়ে বারোটা ঘর রাত্রির জলে সাঁতার কাটছিল।

আজ সব ঘরেকে টেক্কা দিয়েছে বীথিদের ঘর। অফিস-ফেরতা বীথির সাজসজ্জার

চমক। বীথি একটা নতুন ডিজাইনের ল্যাম্প কিনে এনেছে। কেরোসিনের যদিও। কিন্তু বাতিটার বিচিত্র গড়ন আর হুবহু ডিমের মত দেখতে চিমনিটার স্বচ্ছতা ও দীপ্তি সন্ধ্যা থেকে বাড়ির লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

বলতে কি, আজ উঠোনে বেশি লোকের চলাফেরা নেই। শব্দও কম। তাছাড়া বাড়িতে লোকও কমেছে এই দুদিনে। অমল নেই, তার স্ত্রী।

কমলা আজও রাত্রে বাড়ি ফিরছে না। রমেশের ঘরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে ঘুমিয়েছে। ডাক্তারের ঘর চুপচাপ। বিধুমাস্টার এতক্ষণ তার দুই মেয়ের চলাফেরা এবং কথাবার্তা সংশোধন ক'রে দিতে দিতে বলছিল, 'কানুর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া ও পুরুষ, ধৈর্য কম। ভেঙে পড়ে ওরা সহজে। মানে বাজে দেমাক আছে, আসল কাজে মর্জি নেই। কোনখান থেকে টাকা রোজগার করে আনবি, আমার জানা আছে। যদি ঘরে কিছু আসে, যদি বুড়ো বাপ-মাকে দুটি খেতে দিতে পারে এদিনে তো সে ছেলেরা না, মেয়েরা। এটা মেয়ের যুগ। এখন আর এত মান-সম্মান লাজ-লজ্জা নিয়ে বসে থাকলে চলে না। কারোর মেয়েই থাকতে পারছে না। কাজ করতে হবে, বিয়ে যদ্দিন না হচ্ছে। গৌরীদানের যুগ চলে গেছে, কথাটা মনে রাখবি।'

বিধুমাস্টারের স্ত্রী কথা বলছিল না।

তেমনি সংশোধন করা হচ্ছিল আর এক ঘরের মেয়েকে। বড় গলা ক'রে বলাই বলছিল, 'তুই, কথায় বলে সমর্থ মেয়ে আমার ঘরে। হুট্-হাট্ ঘর থেকে বেরিয়ে যাস্ কোন্ আক্কেলে? কপি, মুলো? কেন ক'বেলা ভাত খাস না যে, লোকের ক্ষেতে চুরি করতে যাস্। আমার কি হাতে বাত নেমেছে যে, তুই রোজগার ক'রে আনবি আর তাই পেটে দিয়ে আমার জীবন কাটাব। আজ থেকে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ। এইটুকুন বলে রাখলাম। ঘরে থেকে মার কাজে সাহায্য করবি, তবেই আমার চলবে।' যেন চাকা ঘুরে গেছে, উপার্জনের ভাল রাস্তা বলাই খুঁজে পেয়েছে।

শিবনাথ কান পেতে রইল।

যেন ময়না হুস-হুস্ করে কাঁদছিল। বলাই আবার বলছিল, 'দিন কারোর সমান যায় না। শনির চক্র য'দিন থাকে মানুষকে ঘোরাবেই। আমারও শনির দশা ছিল। না হলে আর টিনের ঘরে মাথা গুঁজব কেন। কিন্তু দশা এবার কাটল।'

শিবনাথ চমকে উঠল।

বলাইকে কাল বাড়ি থেকে তুলে দেবার কথা। সে এমন কি রাতারাতি সুবিধা করে ফেলল যে আর সে কিছু ভয় করছে না? খচ্ ক'রে কথাটা মনে পড়তে শিবনাথ বেশ কিছুক্ষণ বলাইর ঘরটার দিকে চোখ রেখে অন্ধকারে গলা বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে রইল।

'সব শালা এ-বাড়িতে, এ-পাড়ায় স্বার্থপর। বনমালী দেখল না, কে. গুপ্ত নিজে দেখল না, চারু রায় পরে এসেছে। তবে কে দেখতে পেয়েছে শুনি কে. গুপ্তর ছেলের সঙ্গে ময়না ছিল? যে-শালা একথা বলে, আমি তাকে মজা দেখাচ্ছি, আর দুটো দিন সবুর।'

বলাইর গলার স্বরে সারা বাড়িটা গমগম করছিল। যেন এ-কথার উত্তর দিতে কেউ নেই। সব চুপ।

প্রতিবাদ করতে গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। বস্তিবাড়ির দস্তুর। শিবনাথ ক'দিন অনেক ঝগড়া দেখেছে। তাই আর কোন ঘরে কথা নেই।

অবশ্য রুণুর, এ-বাড়ির একটি কিশোরের হঠাৎ এই দুরদৃষ্টের সংবাদ পেয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে, এমন লোকও আছে।

আত্মীয় না। অপর লোক। একটা উঠোনের ওপর আজ কতদিন একত্রে আছে এই সম্পর্ক,—পরমাত্মীয়ের মতন কেঁদে উঠেছিল বষীয়সী। প্রমথর দিদিমা।

প্রমথ রুণুর সমবয়সী, সাথী, সেই সুবাদে রুণুরও দিদিমা। গত আশ্বিন মাসে সব ছেলের মধ্যে অগ্রণী হয়ে রুণু বাড়ন্ত লাউ গাছটা প্রমথদের দরজার ওপর ঘরের চালে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করছিল। সেই স্মৃতি বুড়ীর মনে আছে। আজ সন্ধ্যা-বেলা রুণুকে ওরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং অক্সিজেনের জোরে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে, সংবাদটা বুড়ীর কানে পৌঁছে গেছল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠেছিল।

কিন্তু ডুকরে বেশিক্ষণ কাঁদতে পারেনি প্রমথর দিদিমা। সেই ঘরের পুরুষ বুড়ীকে সাবধান করে দিয়েছে ঃ 'দরকার নেই অত আত্মীয়তা ফলিয়ে। গেছে অমুক নম্বর ঘরের লোক গেছে, আমাদের কি—শহরে, শহরতলিতে রাতদিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। যাদের ঘরে আজ হল না, কাল তাদের ঘরে হবে। আফসোসের কিছু নেই। কাজেই এত কাঁদাকাটা করে একদিনে সব ফুরিয়ে লাভ নেই জেঠী। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে পুলিস এনকোয়ারি আছে, জিজ্ঞাসাবাদ আছে, অমুক ঘরের ছেলে, তোমার কে হয়, তুমি কে,—ওদের সংসারে রোজগেরে নেই, তো দিনের পর দিন খাচ্ছে কি, উপার্জনের রাস্তা কোনটা—'

পুরুষ গলা বড় ক'রে বার বার ঘরের জ্যাঠাইমাকে বোঝাচ্ছিল, প্রতিবেশীর জন্য এতটা শোকবিহ্বল হতে গেলে ঘরে বিপদ ডেকে আনা হবে। কেননা, রুণুর সমান বয়সের আর একটি ছেলে প্রমথ। এ-ঘরের বাসিন্দা। কাজেই 'বাড়িওয়ালার জুলুম চলবে না'—দলে কে কে ছিল ইত্যাদির এনকোয়ারি শেষটায় এখানে আসবে। সুতরাং চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রমথর দিদিমা আর কাঁদেনি। অল্পবিস্তর সব ঘরই রুণু সম্পর্কে এরকম নিস্পৃহ থাকার মনোভাব দেখাচ্ছে, বাড়িতে পা দিয়ে শিবনাথ টের পেয়েছে এবং এতটা রাত অবধি জেগে সে সব শুনছে।

প্রমথদের ঘরই সবচেয়ে স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাষায় জানিয়ে দিলে ঃ 'না রুণুর সঙ্গে প্রমথ ছিল না। কোনদিন মেশে না। রুণু ছেলেটা চিরকালই বদ এবং শহরের ছেলেদের সঙ্গে ওর আড্ডা। পার্ক সার্কাসের দুটো-একটা বন্ধু এখনো মাঝে মাঝে এখানে আসে আড্ডা দিতে। হয়তো ও ওদের শলাতে পড়ে পারিজাতের গাড়ি আটকে মারতে ছুটেছিল। তাই না এই অনর্থ ঘটল। এখন? ঠ্যালা শামলাও। কে দেখে, কে যায় হাসপাতালে দুবেলা খবর নিতে—খাবার দিতে। এই রকম ছেলে ঘরে না

থাকা ভাল। বংশের কুলাঙ্গার। ওদিকে বাপ তো 'বোতল', 'বোতল' ক'রে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে।'

বলে প্রমথর বাবা সজোরে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করেছিল। বাড়িটা কাঁপছিল সেই শব্দে।

বলাইর মত প্রমথর বাবাও বড় গলায় বলছিল, 'আমার ছেলে দলে ছিল কেউ বললে আমি তার ঠ্যাং ভেঙে দেব, দিয়ে বুড়ো বয়সে জেলে যাব'—ইত্যাদি।

তারপর আর বারো ঘরে এ সম্পর্কে কথা শোনা যায়নি।

কেবল প্রমথর বাবার হুকো টানার ঘড়াৎ ঘড়াৎ আওয়াজ।

অর্থাৎ এ-বাড়িতে আসার পর যত ঘটনা ঘটেছে, এটাই সবচেয়ে বড় এবং বিশ্রী এবং এর জন্য প্রত্যেকটি ঘর এখন সতর্ক। ফিরিওয়ালার পয়সা চুরি যাওয়ার পর থেকে ডোমপাড়ার মস্ত বড় আগুন, বৌকে ধরে অমলের রাত দুপুরে মার, কি রাত দুটোয় কলেরা কেস সেরে এসে শেখর ডাক্তারের স্ত্রী প্রভাতকণাকে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ বা অমলকে বাড়ি থেকে তুলে দেওয়ার কাহিনী বা হঠাৎ অবিশ্বাস্য রকম বীথির একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাওয়ার সংবাদের সঙ্গে এ-ঘটনার একেবারে মিল নেই।

সে-সব ঘটনায় এ ওর পক্ষ নিয়েছে এবং আর একদল গেছে বিপক্ষে। কিন্তু আজ প্রায় সবাই নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করছে।

আর আর প্রত্যেকটা ঘটনায় ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, কথা কাটাকাটি হয়েছে। প্রভাতকণার মেয়ে সুনীতি সেদিন এ-বাড়ির সকলকে দেখিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে, রেস্টুরেণ্টে খেয়ে এসেছে,—ঘটা ক'রে সবিস্তারে যা সব বলছিল—এবাড়ির আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কম ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

অর্থাৎ প্রভাতকণা স্থির করে ফেলেছে সুধীর তার ভাবি জামাতা। কিন্তু শেখর ডাক্তার বাইরে থেকে একটা 'কারেক্ট ইনফরমেশন' নিয়ে আসে, সেজন্য সুধীরকে আর কোনমতেই বর করা চলে না। এমনকি, তার সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দেওয়াও অনুচিত।

বিকেলে মেয়েকে সিনেমা দেখাতে পাঠিয়েছিল প্রভাতকণা সুধীরের সঙ্গে। যে গহনাগুলো সুনীতির বিয়েতে দেবার জন্যে গড়ানো, সেগুলো পরে সুনীতি সুধীর মামার সঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরোয় আর সেই রাত্রে খবর নিয়ে আসে সুনীতির বাবা। শেখর ডাক্তার পামারবাজার রোডে তার বন্ধু উমাপদবাবুর কাছে সুধীরের সব বৃত্তান্ত জেনে এসেছে। শিলচরের লোক উমাপদ ভট্টাচার্য। ডাক্তার। এলোপ্যাথ। এখানে কলকাতায় এসে একটা সূত্রে পরিচয় ঘটেছে শেখরের সঙ্গে।

'বুড়ো মানুষ—মিথ্যা কথা বলেন না। আর তা-ছাড়া সুধীরের বাবার সঙ্গে তার শত্রুতাও নাই। দেশে থাকতে সুধীর উমাপদবাবুর কাছে তার অসুখের চিকিৎসা করায়। বড়লোকের ছেলে বেশ পয়সা খরচ করতে পেরেছিল তখন নিজের ব্যাধিটি সারাতে। প্রায় সেরে এসেছিল। বাপের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে হুট্ করে হঠাৎ চলে আসে কলকাতায়। অসুখটি জটিল। সম্পূর্ণরূপে আজও আরোগ্য হয়েছে

কিনা উমাপদবাবু ব্লাড এগজামিন না করে বলতে পারেন না। তবে ছেলে বুদ্ধিমান। বাপের সম্পত্তি বাড়াতে না পারলেও কমতে দেবে না, এইটুকুন গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। এই হিসাবে পাত্র খারাপ না,—ইত্যাদি।

'এখন কর্তব্য কি ?

সব বলা শেষ করে শেখর ডাক্তার রাত্রে স্ত্রীকে প্রশ্ন করল। শুনে প্রভাতকণা চুপ করে থাকে।

কিন্তু খবর সেখানেই চাপা থাকে না। কুয়োতলায় যাবার সময় ডাক্তারের ঘরের ভেজানো পাল্লার সামনে একটু সময়ের জন্যে আড়ি পেতে থেকে প্রীতি-বীথির মা সব শুনে ফেলেছে।

ঘরে এসে বলেছে সে মেয়েদের কাছে।

তাই নিয়ে দু'বোন সারা রাত বিছানায় শুয়ে থেকে-থেকে হেসে উঠেছে। বেশ জোরে। অর্থাৎ উত্তরের অপেক্ষায় তখন সুনীতির বাবা প্রভাতকণার মুখের দিকে তাকিয়ে ঃ এই অবস্থায় সুধীরের হাতে মেয়েকে দেওয়া উচিত হবে কি না, তুমিই বল। সুনীতির সর্বনাশ হবে, ভবিষ্যতে ওর গর্ভে যে সন্তানটি আসবে, তারও সর্বনাশ হবে।'

মুখ অন্ধকার করে প্রভাতকণা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সেই সময় প্রীতি ও বীথির খলখল হাসি তার কানে যায়।

তখনই একটা কিছু সন্দহ করেছে। পরদিন সকালে প্রভাতকণার বুঝতে বাকি থাকে না। সুনীতি কুয়োতলায় মুখ ধুচ্ছে, এমন সময় বীথি গিয়ে সেখানে পড়ে। সুনীতিকে দেখে গত রাত্রির কথা মনে পড়তে বীথি খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠে। ঘরে ফিরে সুনীতি মাকে কথাটা বলতে প্রভাতকণা তৎক্ষণাৎ আঁশবঁটি নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বীথিদের ঘরের দরজায় ঃ 'আপিসে নাম লেখাইয়া আইছিস, তুই আমার মাইয়ার সুখ দেইখ্যা হিংসায় মরবি না তো মরবে কে, হারামজাদী—আয় তর নাক কাটুম, আয় পোড়ারমুখী—'

হাতের বঁটি আন্দোলিত করে রণমূর্তি প্রভাতকণা আস্ফালন করছিল আর চিৎকারে বারোটা ঘরের চালা কাঁপিয়ে তুলছিল। বীথি ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে আশ্রয় নেয়, কিন্তু বড়বোন প্রীতি ছুটে এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ায়। 'আমি থানায় খবর দেব, তোমাকে পুলিশে দেব, বজ্জাত মাগি।' প্রীতির গলা ও কিছু কম যায় না ঃ তোমার মেয়েকে দেখে বীথি হেসেছে বেশ করেছে, আমি হাসব, পাশের ঘরের লক্ষ্মীদি হাসবে, হিরণ বৌদি হাসবে, কমলা হাসবে, রুচিদি হাসবে। সবাই হাসবে। বড় যে মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে তড়পাচ্ছ, দাও না এখন সুধীরমামার সাথে বিয়ে। সুধীরের কি রোগখানা আছে, এখনো খবর পাওনি বুঝি। আঁশবঁটি নিয়ে ছুটে এসেছ এখানে, কত বড় বুকের পাটা—' প্রীতি দম নিচ্ছিল, আর সেই ফাঁকে প্রভাত-কণা বুঝি তার ফুসফুস ফেটে যায়, এমন জোরে চিৎকার করে বলছিল ঃ 'আয় কুত্তি, আগে তর গলা কাটি—টেলিফুন আপিসের রোজগার খাইয়্যা গতরে তর চর্বি জমছে বেশি, আয় চর্বি চাইছা দেই বঁটি দিয়া—' ইত্যাদি—

প্রীতি দরজার কাঠ নিয়ে ছুটে এসেছিল প্রভাতকণাকে মারতে। একটা রক্তারক্তি হত কিন্তু বিধুমাস্টারের স্ত্রী, রুচি এবং আরও দু' একজন গিয়ে দু-পক্ষকে থামিয়ে দেয়।

আজকের ঘটনায় রক্তপাত আছে, কিন্তু এই জন্যই কি তার গুরুত্ব বেশি। কথাটা চিন্তা করছিল শিবনাথ। রক্তপাত ছাড়াও অন্য জিনিস আছে। রাজনীতি, পুলিসের তদন্ত, মামলা মকদ্দমা, ক্ষতিপূরণ, জেল। অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। শিবনাথ চিরকাল এগুলিকে ঘৃণা করে। তার সাদামাঠা জীবনে এসবের স্থান নেই। চিরকাল সে এ সব থেকে দূরে থেকেছে। বোধ করি, বাড়ির বাকি ঘরগুলোর এ সমস্ত ভয় আছে বলেই চুপ করে আছে, এখন বুঝতে কষ্ট হল না তার। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে শিবনাথ নিশ্চুপ বসে থেকে তাই লক্ষ্য করছিল। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়ে সে দেখল, যাদের ছেলেকে নিয়ে এই হাঙ্গামা, তারা যেন সকলের চেয়ে বেশি নীরব। বনমালীর দোকানের সামনে বেঞ্চে বসা কে. গুপ্তর চেহারা মনে পড়ে শিবনাথের হাসি পেল এই কারণে যে, না হলে না হয়, জিজ্ঞেস না করে নিতান্ত খারাপ দেখায় তাই কে. গুপ্ত তাকে তখন উটকো প্রশ্নটা করে বসল। 'মশাই, পারিজাত গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, আপনি জানেন কিছু?'

প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে রমেশের কথার নড়চড় থাকতে পারে আশঙ্কা ক'রে যে কে. গুপ্ত এ প্রশ্ন করছিল না, শিবনাথ এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল।

মোটর অ্যাক্‌সিডেণ্টের প্রসঙ্গটা ওঠার আগে তখন কি নিয়ে কে. গুপ্ত তার চারু বন্ধুর সঙ্গে আলাপে মগ্ন ছিল চিন্তা করে শিবনাথ এখন অন্ধকারে নিজের মনে হাসল। আর ঘাড় ফিরিয়ে কে. গুপ্তর ঘরখানা দেখতে লাগল। এ-বাড়ির সবচেয়ে নীরব ঘর।

ঘরে আলো নেই। কেউ জেগে আছে কি না, তাও বোঝা যায় না। দরজার পাল্লার একটা খোলা, একটা ভেজানো।

যেন এইমাত্র হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে বেবি ঘরে ফিরেছে। হয়তো হাসপাতাল থেকে। কেননা, বাড়িতে ঢুকে শিবনাথ রুচির কাছে জানতে পারে, ছেলের গাড়িচাপা পড়ার পর খবর শুনে রুণুর মা সুপ্রভা চুপ করে অনেকক্ষণ চৌকাঠ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কে কাউকে আর কোন প্রশ্ন করেনি। যেন নিজের মনে কি চিন্তা করল। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে আর তাকে কেউ বেরোতে দেখেনি। এত রাত অবধি শিবনাথও দেখল না। বেবীকে ক্ষিতীশ দোকান থেকে ছুটি দিয়েছিল রুণুর সঙ্গে হাসপাতালে যেতে। সম্ভবত ও এই হাসপাতাল থেকে ফিরে এল।

শিবনাথ অনুমান করল, হাসপাতালের খবর তেমন খারাপ হলে ঘরে অন্তত এখন একটা কান্নাকাটি শোনা যাবে। কিন্তু তা শোনা না যাওয়াতে সে নিশ্চিন্ত হল। বেবি পায়ে হেঁটে শেয়ালদার ক্যাম্বেল হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরছে। তাই পায়ে ধুলো। বীথিদের জানালার আলোটা বেবীদের বারান্দায় এসে পড়েছিল বলে

শিবনাথ ধুলোটা দেখতে পায়। সম্ভবত বাস পাওয়া যায়নি। বাস পেলেও বেবীকে হেঁটে হাসপাতাল থেকে ফিরতে হত কিনা চিন্তা করে শিবনাথের পয়সার প্রশ্নটা মনে ওঠে।

রমেশ বা ক্ষিতীশ এই সময় দু'চার-আনা মেয়েটাকে সাহায্য করবার মত সদয় ছিল কিনা, শিবনাথের সংশয় ছিল।

পারিজাত নিজে সেই গাড়িতে ছিল না—তিন-দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত। যদি কে. গুপ্তকে রমেশ এই মিথ্যা সংবাদটা বলে থাকে তো কেন রমেশ তা করল বুঝতে শিবনাথের খুব বেশি ভাবতে হল না।

পারিজাত রমেশের একদিকে মনিব, অন্যদিকে বন্ধু। বড়লোক বন্ধু হলে রমেশ রায়ের মত 'করে খাওয়ার' লোকেরা বন্ধু বিপদে পড়েছে দেখলে বন্ধুকে সাহায্য করে। কে. গুপ্ত বুঝতে না পারলেও শিবনাথ এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। হয়তো ইতিমধ্যে বনমালীও এক-আধটা পাঁইট দিয়ে কে. গুপ্তকে একটু ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করবে। কেন বনমালী তা করবে, শিবনাথ তা-ও বেশ বুঝতে পারছিল।

বনমালীর এই দোকান-ঘর এখনি ডবল টাকায় ভাড়া দেওয়া যায়, যদি তাকে এখন তুলে দেওয়া হয়। মুখে সে যতই পারিজাতের নিন্দাবাদ করুক, উচ্ছেদের মামলায় টাকা ঢালাঢালির প্রতিযোগিতায় সে যে কোনমতেই পারিজাতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না, বনমালী এ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। তাই এ ব্যাপারে সেও নীরব। নিজের চোখে অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছে এবং কে রুনুকে গাড়ি চাপা দিলে সত্য কথা পুলিসকে বললে বিপদ হবে চিন্তা করে যে বনমালী 'বড়বাজারের মাল কিনতে গিয়েছিল' মিথ্যা কথাটা বলেছে, শিবনাথের মনে তা-ও ইশারা দিয়ে গেল। আর থাকে চারু রায়। চারু-রায় পরিষ্কার খুলেই বলেছে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ আছে এ-তল্লাটে। সন্ধ্যার দিকে যখন ঝিঁঝি ডাকছিল, বাদাম গাছের নিচে যে জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শিবনাথ দেখে এসেছে সেই জায়গা। বেশ অন্ধকার থাকে তখন ওধারটা। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। তারপর অবশ্য কর্পোরেশনের লোক গ্যাসের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এই আলো জ্বলবার পর রাস্তাটা ভাল দেখা যায় বলে আবার লোকজনের চলাফেরা আরম্ভ হয়। বাড়ির অধিকাংশ লোক তখনই ঘরে ফেরে। রুচি ফেরে, প্রীতি ফেরে। কমলা কোনদিন ফেরে, কোনদিন না। রুচি এবং ভুবনবাবুর দুই মেয়ে আজ দুর্ঘটনার আগেই বাড়ি ফিরেছে। কমলা ফেরেনি। আর ফিরলেও যদি সে স্বচক্ষে দুর্ঘটনা দেখত, ঘরে এসে রুণুর মা সুপ্রভাকে এসে ঠিক কি বলতো চিন্তা করল শিবনাথ।

শিবনাথ প্রত্যেকের বিষয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করল এজন্য যে, এ-বাড়ির রুণুর গাড়িচাপা পড়াও পারিজাতের হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টের মামলায় জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে শিবনাথের ঠিক কালই ও-বাড়ির ট্যুইশানি পাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এর জন্য, এই গোলমালে পড়ে পারিজাত কি তাঁর স্ত্রী হয়তো শিবনাথের সঙ্গে কাল কথাই বলবে না। অর্থাৎ সবটা জিনিস পিছিয়ে যাবে। হয়তো ট্যুইশানিটা সে আর পাবেই না। তার কারণ রমেশ যেখানে বলছে পারিজাত অসুস্থ, তিন দিন শয্যাশায়ী,

শিবনাথ বলবে ঘটনার একটু আগে, বিকেলে সে পারিজাতের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটারের পদপ্রার্থী হয়ে রায় সাহেবের বাংলোয় ছিল এবং তখন সে দেখে এসেছে, পারিজাত গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। অর্থাৎ রমেশের রিপোর্ট ভুল। কিন্তু—

আবার এ-ও চিন্তা করল শিবনাথ, সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে পরে সে বাজারে যায়। হয়তো সে যখন বাজারে ছিল, তখন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়। কিন্তু সে সময়ে, অর্থাৎ বৌয়ের সঙ্গে রাগ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে মাঝ রাস্তা থেকে আবার যে পারিজাত বৌয়ের মান ভাঙাতে তখন ঘরে ফিরে যায়নি, তা-ই বা কে জানে। অর্থাৎ একটা পিঁপড়েকেও চাপা না দিয়ে? কিন্তু রমেশের ইনফ্লুয়েঞ্জার বর্ণনাটাই সব গোলমাল করে দিচ্ছিল।

একটা মিথ্যা অনেক মিথ্যাকে টেনে আনে।

বস্তুত বলতে কি, কে. গুপ্তকে হুট করে মিথ্যা কথাটা বলে এসে শিবনাথের মন খুঁতখুঁত করছিল।

করছিল আর যেন কেমন একটু অপরাধীর চোখে সে কে. গুপ্তর ঘর দেখছিল।

রাত্রে ওদের খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি অনুমান করা শক্ত না; কেননা, এখানে এসেছে পর থেকে শিবনাথ শুনছে পাশের ঘরে রুণু কিছু শাকসবজি সংগ্রহ করে আনলে তবে সেটা দিয়ে রাত্রির পর্ব সারা হয়। সিদ্ধ বা কাঁচা।

আজ রুণু অনুপস্থিত।

বেবি যে হাসপাতালে যাবার আগে মাকে একটু চা-বিস্কুট খাইয়ে গেছে, সেটাও বিশেষ ভরসা করা যায় না।

সারা বাড়ি নিঝুম।

এক বীথি যদি ওধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর ভিজে তোয়ালের জল ঝাড়তে ফটাস্ করে একটা শব্দ না করত, তো শিবনাথের মনে হ'ত সারাটা বাড়িই বুঝি হাসপাতালে রুণুর অবস্থা এখন কিরকম ভাবনা-চিন্তায় বিষণ্ণ মৃতপ্রায়।

কিন্তু তা না, শিবনাথ হৃষ্টমনে ন'নম্বর ঘরে নতুন কিনে-আনা ল্যাম্পটার স্বচ্ছ আলো বিভাসিত আঠারো বসন্তঘেরা একটি যুবতীর বক্ষ দেখে শিউরে উঠল।

এক সেকেণ্ড। এক সেকেণ্ড কাপড়টা বুক থেকে সরিয়ে বীথি আর একবার তোয়ালেটা চেপে ধরে বাকি জলটুকু শুষতে চাইল, কিন্তু অন্ধকারে কেউ তাকিয়ে দেখছে, কোনো ঘরের খোলা জানালায় পুরুষ দাঁড়িয়ে, টের পেয়ে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বীথি বারান্দা ছেড়ে এক ঝটকায় ঘরের ভিতর অদৃশ্য হল। আলোটা নিভল। কেউ ওদের তাকিয়ে দেখছে টের পেতে সংসারে মেয়েদের জুড়ি নেই। যেন গন্ধে ওরা টের পায়। শিবনাথ নিজের মনে হাসল এবং চাপা রুদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেলে তার জানালার পাল্লা দুটোও ভেজিয়ে দিল। রাত বেশি হয়েছে। না, বিছানায় শুয়ে শিবনাথ এটাকে একটা কিছু অপমান বলে মনে করল না। এবং তার নিজের দিক থেকেও এভাবে চুরি করে বীথিকে দেখাটা অপরাধ বলেই গণ্য করতে পারল না। বরং যেন শিবনাথের মনে একটা তুলনামূলক সমালোচনা এল। যেমন জীবনের তীব্র ট্র্যাজেডি ভুলতে বড়লোক মোহিত বেশ্যাসক্ত হয়েছে বা জীবনের চরম ব্যর্থতা ভুলতে

কে. গুপ্ত মদের আশ্রয় নিয়েছে, তেমনি শিবনাথও যেন একটা অস্বস্তিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলতে কতক্ষণের জন্য মনটাকে অন্যদিকে ব্যাপৃত রাখতে চাইল। এই অন্ধকার একটা ঘরে হাতের কাছে সে আর কী নেশা পাচ্ছিল যে, পাশের ঘরের ছেলেটির গাড়িচাপা পড়ার দুঃসংবাদ পেয়ে এবং এই নিয়ে বনমালীর দোকানের সামনে সে নিজেও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এসে এখানে অনিদ্রার বিশ্রী অবাঞ্ছিত সময়টা কাটাতে পারতো।

এদিক থেকে শিবনাথ দুঃখী বৈকি।

রাত্রির এই গাঢ় প্রহরে স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে মন হাল্কা করার ভাগ্য শিবনাথের নেই। কেননা, রুচিকে ঘুমোতে না দিলে কাল সারাদিন স্কুলে ওর শরীর মেজাজ ভাল থাকবে না। তার ঘুমের দরকার। বস্তুত আয়তনে ছোট হলেও শিবনাথের একটা দুঃখ তো বটেই।

এবং বড় দুঃখ ভুলতে বড় বড় নেশার যেমন দরকার, তেমনি ছোট দুঃখ, একটু আধটু ব্যথা ভুলতে হাত বাড়ালেই অনেক ছোটখাটো নেশার দ্রব্য পাওয়া যায় জীবনে, এই অভিজ্ঞতা নতুন না হলেও শিবনাথ আর একবার তার স্বাদ অনুভব করে রোমাঞ্চিত হল। এবং অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘুমোতে চেষ্টা করেও যখন ঘুমের পরিবর্তে বীথির নগ্ন সুডোল কুমারী বুকের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, তখন অতি সন্তর্পণে সেই অদ্ভুত জ্বলন্ত নেশা ভুলতে ভয়ে ভয়ে নিজের হাতখানা বাড়িয়ে রুচির (তখন মৃতপ্রায় বলা চলে) এখানে ওখানে একটু আধটু হাড় বের-হওয়া কোমরের ওপর সেটা রাখল ও ঘুমোতে চেষ্টা করল।

আটাশ

এ সম্পর্কে খুব বেশি কৌতূহল কি জিজ্ঞাসাবাদ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে চিন্তা করে শিবনাথ পরদিন প্রায় সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাল। মনে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা হ'ত যদি সে বাড়িতে বসে থাকত। তার হাতে কাজ নেই, তা ছাড়া কে. গুপ্তর ঘর তার ঘরের লাগোয়া, এ সম্পর্কে একটা দু'টো কথাও তার কানে এলে খামোকা মনটা খারাপ হ'তে পারে চিন্তা করে যেন শিবনাথ রুচি বেরোবার প্রায় পিঠেই পাঞ্জাবি ও একটা র‍্যাপার গায়ে চড়িয়ে অতিরিক্ত দুটো টাকা পকেটে পুরে সোজা শেয়ালদার বাসে চাপল।

হ্যাঁ, অনেকদিন পর সে লাইটহাউসে একটি ছবি দেখল। ভাল একটা দোকানে একটু চা খেল এবং হাতে আরো দু'টো একটা টাকা থাকলে সে লাইটহাউসের পাশের দোকানের সেই পিতলের ওপর কাজ-করা সুন্দর ফ্লাওয়ার-ভাসটা কিনতে পারত। কিন্তু টাকার অভাবে কিনতে না পারলেও বেশ কিছুক্ষণ দোকানের শো-কেস-এর সামনে দাঁড়িয়ে চীনা শিল্পীর হাতের তৈরী জিনিসটি দেখতে অবহেলা করল না। এবং সেটা দেখতে দেখতে শিবনাথ এইটুকু প্রমাণ করল যে, কোন এক ট্যাংরা-বেলে-ঘাটায় বস্তিবাসী হয়েছে বলে সে তার শিল্পবোধ, শিক্ষিত রুচিসম্মত সুন্দর মনটাকে

বিসর্জন দেয়নি।

ফুলদানি দেখা শেষ করে সে ঘড়ি দেখল। সন্ধ্যাসন্ধি সে বাড়ি ফিরতে চায়। মানে এখান থেকে এখন রওনা হলে এক ঘণ্টার মধ্যে সে ওখানে গিয়ে পৌঁছবে। বেড়ানো শেষ করে ইতিমধ্যে পারিজাত, দীপ্তি ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় ঘরে ফিরবেন। শিবনাথ একান্তভাবে আশা করছিল যদি এই ট্যুইশানি হয়ে যায় তবে তার সংসার মোটামুটি স্বচ্ছল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য তার মনের কথা। যদি সেটা সম্ভব না-ও হয়, ওবাড়িতে যাওয়া-আসা, পারিজাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা মূল্য আছে বৈকি! চাটে পাট—বড়লোকের সঙ্গ রাখা ভাল। রমেশ রায়ের কথাটা তার মনে আছে।

দোকানের সামনে থেকে সরে এসে শিবনাথ বাস ধরতে বড় রাস্তার দিকে এগোয়। এমন সময় আর একটা দোকান থেকে বেরিয়ে প্রায় লাফিয়ে পেভমেণ্ট-এর ওপর এসে দাঁড়ায়, হাঁ, শিবনাথের সঙ্গে তেমন মাখামাখি না থাকলেও ক'দিনে অনেক রকম কথাবার্তা হয়েছে লোকটির সঙ্গে, কে. গুপ্তর বন্ধু, চারু রায়।

'আপনি এখানে?'

'হ্যাঁ, এই বইটা দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।' শিবনাথ আজ চারু রায়কে সিগারেট অফার করল।

ওয়াণ্ডারফুল! চারু রায় আড়চোখে আলোর ফুলকি-পরা লাইটহাউসের আকাশস্পর্শী গম্বুজের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসল। 'আমি দেখব—আমার দেখার ইচ্ছা আছে, সময় ক'রে উঠতে পারছি না।'

'এখানে, এই দোকানে?'

চারু রায়ের সুন্দর বেশভূষা ও মেয়েলি মুখখানা আবার ভালো ক'রে দেখল শিবনাথ! 'মার্কেটিং?'

'হ্যাঁ, তা,—' পকেট থেকে লাইটার বের করে সেটা সিগারেটের আগায় ধরাল।

'অন্য কিছু না।' মুখ থেকে বাড়তি ধোঁয়াটা বের করে দিয়ে চারু বলল, 'আমার ক্যামেরার ফিল্ম ফুরিয়েছে তাই কিনতে এসেছিলাম।'

যেন একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ল শিবনাথের। কিন্তু সে-সব সম্পর্কে এখন আর একটিও প্রশ্ন না ক'রে বলল, 'যে তল্লাটে বাসা নিয়েছি সেখানে ভাল হাউস নেই এবং যে-সব ছবি সে-অঞ্চলে দেখানো হয় তা কোন রুচিসম্পন্ন লোক বসে দেখতে পারে না।'

'বটেই তো।' চারু ঘাড় নাড়ল। এবং যেন কি ভাবল। তারপর মেয়েদের মত সবগুলো নির্মল পরিচ্ছন্ন দাঁত একসঙ্গে বের ক'রে দিয়ে হাসল। 'তা বড় যে একলা? মানে আমি ওদের—আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কথাই বলছিলাম। না কি তিনি—আপনার ওয়াইফ বিলাতী ছবি দেখতে ভালবাসেন না?'

'বাসেন না মানে?' শিবনাথের নাক দিয়ে হাসির মৃদুরকম শব্দ বার করল। 'দেশী ছবিতে কিচ্ছু থাকে না, রাতদিন তো কম্‌প্লেন্ করে শুনি এবং ছ'মাসের মধ্যে সে কোন বাংলা কি হিন্দী বই দেখেছে বলে আমার মনে পড়ে না। আমিও দেখি না।

অন্য আরো দু'টো একটা কাজে আমাকে এদিকে আসতে হয়েছিল। বইটা দেখে ফেললাম। তা ছাড়া স্কুল সেরে এখানে এসে তার সিনেমা দেখা সম্ভব হয় না। বেশ দূরে পড়ে যায়। ছুটির দিন ও দেখবে।'

চারু রায় সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। 'প্লিজ এক্সকিউজ মি।' যেন কি মনে ক'রে হাসল। 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আই হ্যাভ সিন সো মেনি পিপল্। যাঁরা, কেন জানি ফ্যামিলিম্যান হওয়া সত্ত্বেও, এমন কি অত্যন্ত সলভেণ্ট যারা তাঁরাও, ভীষণ একলা একলা ছবি দেখতে ভালবাসেন কেন বলুন তো?'

'মানে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে স্বার্থপরের মত তাঁরা এই আমোদটি উপভোগ করেন। তখন দারা-পুত্র-পরিবার কেউ না।' শিবনাথও ঘাড় দুলিয়ে হাসল।

'ইয়েস এক্‌জ্যাক্টি্‌লি সো। কেন এমন হয় বলুন তো? আমি তো, আমার অবশ্য ছবি তোলাই পেশা। কিন্তু যখন বসে দেখি তখন বৌ ছেলেমেয়েরা ডাইনে বাঁয়ে না থাকলে বোরিং মনে হয়,—তা যত ভাল ছবি হোক না—'

'আমি পারি না, আমারও ভাল লাগে না।' হাসিটাকে না নিভিয়ে শিবনাথ বলল, 'টু স্পীক দি ট্রুথ, রোড্ টু হোপ দেখতে দেখতে আমি, ওরা আজ সঙ্গে ছিল না বলে নিরাশই হচ্ছিলাম। ছুটির দিন ওদের নিয়ে এসে আবার দেখতে হবে, সকলে মিলে আবার দেখব এ-বই।'

'দি আইডিয়া!' চারু চোখ বুজে যেন স্বগতোক্তি করল। তারপর শিবনাথের মুখের ওপর সবটা দৃষ্টি মেলে ধরে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা যত খুশি এখন দেখুন ইংরেজি ছবি। বাংলা ভাল ছবি যখন আজো তৈরী হ'ল না তো করা কি। কিন্তু বলে রাখছি 'মায়াকানন' যেদিন রিলিজড্ হবে সেদিন আবার আপনাকে সপরিবারে সে বই দেখতে হবে,—না দেখে শান্তি নেই, হা—হা।' কথা শেষ করে চারু শব্দ ক'রে হাসল।

'নিশ্চয় দেখব। এবং আমি আশা করছি দ্যাট উইল বি এ গ্রেট পিক্‌চার। হা-হা। আপনি সত্যিকারের একটা বড় জিনিসে হাত দিয়েছেন, এ আমি সর্বদাই ভাবছি।' শব্দ করে শিবনাথও হাসল।

দু'জনের হাসির শব্দে পথচারীরা ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকাল। এক তরুণী মেমসাহেব দুটি বাচ্চার হাত ধরে গুটি গুটি চলে যাচ্ছিল। যেন অবাক চোখে বাঙালী ভদ্রলোক দু'জনকে সাহেবপাড়ায় দাঁড়িয়ে এতটা প্রগলভভাবে কথা বলতে, উচ্চরবে হাসতে দেখে মেয়েটি একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়ল এং তারা যে উচ্চাঙ্গের শিল্প নিয়ে আলোচনা করছে বিদেশিনীর তা-ও বুঝি বুঝতে কষ্ট হল না অনুমান করে শিবনাথ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত গর্ববোধ করল। চাকা ঘুরে গেছে, শ্রীমতী বুঝুক, কেবল যে দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে বাঙালী ছেলেরা চৌরঙ্গীর ছবিঘরগুলোতে ইংরেজী ছবি দেখতে এসে আজ ভিড় করছে, তা নয়, তাদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, ফিল্ম আর্ট সম্পর্কে চিন্তাধারা কতটা অগ্রসর—শিবনাথের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'আচ্ছা, চলি নমস্কার।'

'নমস্কার।' শিবনাথ দু'হাত একত্র করল।

আর কোন কথা না ব'লে নীরব মেয়েলী হাসিটা ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে চারু পেভমেণ্ট ছেড়ে রাস্তায় নামল এবং এতক্ষণ পর শিবনাথের চোখে পড়ল সেখানে হলদে টু-সীটার দাঁড়িয়ে। হাজারটা গাড়ি ভিড়ের মাঝখান দিয়ে পথ ক'রে ক'রে কেমন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে চারু রায় বেরিয়ে গেল চুপ করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে শিবনাথ দেখল। ছোট্ট হলুদে গাড়িটা অদৃশ্য হ'তে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কত ভদ্র কত মার্জিত রুচি! মনে মনে বলল শিবনাথ। এত কথা এতটা আলোচনার মধ্যে একবারও যে চারু ট্যাংরা-বেলেঘাটা বস্তি, বনমালীর দোকান, এমন কি কে. গুপ্তর প্রসঙ্গ তোলেনি সেজন্য শিবনাথ মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল লোকটিকে। সত্যিই তো, এখানে এই বিলাসী পাড়ায় এমন গমগমে আবহাওয়ায়, যেখানে শুধু হাসি, বিলিতি বাজনা, বর্ণাঢ্য পোশাকের চমক, আর প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে, সেখানে হঠাৎ বেকার বাউণ্ডুলে হতভাগ্য কে. গুপ্ত'র কথা কেমন বেমানান ঠেকত। যেন চারুর সঙ্গে একটু সময়ের আলাপের পর তার শরীর মন আরো ঝরঝরে প্রফুল্ল হয়ে গেছে। প্রায় শিস দিয়ে উঠল শিবনাথ এবং বাস ধরতে সামনের দিকে এগোতো লাগল। ফুরফুরে মিষ্টি গন্ধটা কিসের, চিন্তা করতে করতে পরে শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না হেয়ার অয়েল, প্যারিসিয়ান পপি। কে মেখেছে, কার মাথায়, ভাবল সে. ভেবে পরে অনুমান করল নিশ্চয় সেই মেয়েটি। বাচ্চা দুটোর হাত ধরে বিদেশিনী তরুণী কেন জানি এবার এই ফুটে এসে শিবনাথের আগে আগে চলেছে। অনেকদিন পর বুক ভরে শিবনাথ প্যারিসিয়ান পপি মাখা চুলের গন্ধ নিল। বিয়ের সময় আরো হাজারটা প্রসাধন সামগ্রীর সঙ্গে দু'শিশি পপি উপহার পেয়েছিল রুচি। সেই থেকে শিবনাথ ওটার প্রেমে পড়ে যায়।

বলতে কি বাস-এ উঠে আবার একটা অস্বস্তির কাঁটা তার বুকের মধ্যে খচ্খচ্ করছিল। আবার সেই মুখগুলি—বলাই, পাঁচু, বিধুমাস্টার, শেখর ডাক্তার, কে. গুপ্ত, নর্দমা, ময়লা, মোষের গাড়ি, ধোঁয়া ও ধুলোর ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে শিবনাথের কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করছিল। সেখানে সে ফিরে যাচ্ছে।

মন খারাপ করে বাসের বাইরে চোখ রেখে চুপ করে বসে রইল শিবনাথ। ধৈর্য-ধারণ করা ছাড়া এখন তার কাছে আর কিছুই নেই, সুযোগ এবং সময় যতদিন না আসে। না কি আজ সে পারিজাত ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে এখান থেকেই সুসময়ের আরম্ভ। এই সুযোগ? সিগারেট খেতে ভীষণ ইচ্ছা হ'ল শিবনাথের। কিন্তু সঙ্গে আর নেই বলে তৃষ্ণাটা দমন করল। যেন বেলেঘাটায় ফিরে যাওয়ার মত এখন এই ব্যাপারে সে নিরুপায়। উপমাটা মনে পড়তে শিবনাথ নিজের মনে হাসল, কিন্তু হাসিটা তার তৎক্ষণাৎ থেমে যায়। হাঁ ওটাই ক্যাম্বেল হাসপাতাল। গাড়ি চাপা পড়ে, ঠ্যাং ভেঙে কে. গুপ্তর ছেলে ওই লাল বাড়ির কোনও এক কামরায় শুয়ে আছে। ঘটনাটা যতই মর্মান্তিক হোক শিবনাথের পক্ষে অপ্রীতিকর, অশুভ। দু'দিন আগে হতে পারত, পরে হতে পারত দুর্ঘটনা। আধ মিনিট সময় স্টপেজে বাস্ দাঁড়ায় আর আধ মিনিট সময়ই হাজারটা দুশ্চিন্তায় শিবনাথের মন কালো হয়ে যায়। হাজার দুর্ভাবনা এসে ভিড় করে দাঁড়ায় সামনে।

ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে আছে না পারিজাতকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে ? অবশ্য বেলা দশটা পর্যন্ত এই নিয়ে সাড়াশব্দ বা উচ্চবাচ্য হয়নি পাড়ায় শিবনাথ দেখে এসেছে। কিন্তু দুপুরের পর, এবেলা, এখন ?

স্টপেজ ছেড়ে বাস্ হাসপাতাল পিছনে রেখে চলতে আরম্ভ করার পর তবে শিবনাথ স্বস্তিবোধ করে। কিছুই হয়নি, কিছুই হবে না। ভাবতে চেষ্টা করল সে। তা ছাড়া রমেশ রায় যে আসলে পারিজাতের হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে তার প্রমাণ কি ? ইনফ্লুয়েঞ্জা ? গাড়ির ভিতর পঞ্চাশটা মুখের দিকে যেন কতক্ষণ হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শিবনাথ ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ কি, রোগ কতটা প্রবল হলে পীড়িত ব্যক্তি শয্যা নেয়, ঠিক কত দিন কত ঘণ্টা শুয়ে বিশ্রাম নেবার পর আবার সে কর্মক্ষম হয়, কথা বলে, হাঁটে, কাজ করে এবং নিজের গাড়ি থাকলে তাতে চেপে বেড়াতে বেরোয় ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিবনাথ চিন্তা করল বৈ কি।

একটা দু'টো কথা কয়ে শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে গেল। দীপ্তির ব্যবহারে বিস্মিত হ'ল।

চারিদিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে পরে সতর্কভাবে প্রশ্ন করল, 'তিনি কি তা'লে আজ একেবারেই ফিরছেন না ?'

'না।'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

পারিজাতের বাচ্চারা সামনের লনে হুটোপুটি করে খেলা করছে। অদূরে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে মদন ঘোষ মেথরকে দিয়ে গ্যারেজের ভিতরটা সাফ করাচ্ছে, তেল মাখা তুলো, কালিভুসো মাখা ন্যাকড়ার পিণ্ড।

গাড়ি নেই। গাড়ি নিয়ে পারিজাত সেই সকালে আরামবাগ চলে গেছে। সামনে ইলেক্শন। সেখানে তার রাজনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ চলেছে রাতদিন।

দীপ্তি তার লাল ফোলা ফোলা চোখ তুলে বলল, 'আপনারা ভাবেন রায় সাহেবের বাড়ির বৌ দীপ্তিরাণী অগাধ সুখে ডুব মেরে আছে। এখন সুখটা দেখে যান।'

শিবনাথ চোখ নামাল।

'আপনি কি মনে করেন আমিও খুব বেশি ভাবি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে, একটুও না। যেদিন এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে পা দিয়েছি, সেদিন জেনেছি এখানে আমার গর্ভে যে-সব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তারা আর যা-ই করুক, লেখাপড়া শিখে সাধারণ মানুষের মত থাকতে চাইবে না।'

দীপ্তি বারান্দায় পায়চারি করতে থাকেন। এ্যাঁ, আমার বেলায় দোষ, আমি মণ্টু আর মণ্টুর বন্ধুদের নিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলি, আর লেকের জলে নৌকা ভাসাই। এখানে এসে তো পর পর আমি অনেকগুলো রিপোর্ট পেলাম। আরামবাগের কুঞ্জে যখন বোতল আর পলিটিক্স চলে তখন ষোল আর সতেরো বছরের দু'টি নাবালিকা এক একটি বুড়ো ধাড়ির মুখের কাট্লেট কেড়ে খায়।'

দীপ্তি ঠিক শিবনাথের দিকে তাকায় না, পায়চারি বন্ধ ক'রে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বারান্দার লাগোয়া একটা স্বর্ণচাঁপা গাছকে লক্ষ্য ক'রে তর্জনী তুলে প্রায় চিৎকার

করে বলেন, 'তার চেয়ে একশগুণে ভাল মস্তানরা, আমাদের পাড়ায় বড়লোক ছেলেরা পলিটিক্স-এর মুখোশ পরে রাত্রে প্রস্টিটিউট নিয়ে ফুর্তি করে না। তারা ঘরে থাকে। খাঁটি গৃহস্থের জীবনযাপন ক'রে সংসারের সুখদুঃখ ভালবাসা বিচ্ছেদকে অনুভব করে। তারা অনেক বেশি ভদ্র, নিরীহ। তোমাদের মত নারীমাংসলোলুপ কুকুর নয়। রাতারাতি যারা বড়লোক হয় তারা, তাদের ছেলেরা এই শ্রেণীর আমি কি জানতাম না, আমি কি তখনি চিন্তা করিনি—'

হঠাৎ এত জোরে দীপ্তি চিৎকার করে উঠল যে শিবনাথ হতভম্ব হয়ে গেল, ভয় পেল।

বাইরে শিশুগুলো খেলা ফেলে ছুটে এসে সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়াল। গ্যারেজ ঝাঁট দিচ্ছিল ঝাড়ুদার, চমকে মুখ তুলে এদিকে তাকাল। আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল বাড়ির সরকার মদন ঘোষ। 'তা আপনি এদের সামনে এসব বলছেন কেন, এরা বাবুর প্রজা, ভাড়াটে। এতে তো আপনারও সম্মান যাবে। আপনি ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।'

মদন ঘোষ শিবনাথের দিকে তাকাল। শিবনাথ নীরবে মুখ নামিয়ে হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

দীপ্তি চুপ করলেন। কিন্তু ক্রোধ চাপতে গিয়ে বুকটা একবার পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠে তারপর লম্বা একটা নিশ্বাসের সঙ্গে সেটা নেমে গেল। শিবনাথ লক্ষ্য করল।

যেন মা এক্ষুণি আবার উত্তেজিত হচ্ছে না, চেহারা দেখে বুঝতে পেরে বাচ্চারা এবার সাহস করে ঘাস ছেড়ে বারান্দায় উঠে মার হাত ধরে বলল, 'আমরা খাব মা, আমাদের খিদে পেয়েছে।'

ওদের হাত ধরে নিঃশব্দে দীপ্তি ভিতরে চলে গেলেন। ফুল ও পাখি-আঁকা পর্দাটা শিবনাথের চোখের সামনে দুলতে থাকে।

শিবনাথের স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা, ইস্কুলে চাকরি করছেন, এই হিসাবে মদন ঘোষ গোড়া থেকেই শিবনাথকেও একটু সমীহ করে আসছে। মদন চোখের ইশারায় শিবনাথকে ডাকতে সে উঠল এবং সরকারের সঙ্গে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল।

'কি ব্যাপার?'

গলা পরিষ্কার করে শিবনাথ প্রশ্ন করতে মদন ঘোষ অল্প শব্দ করে হাসল।

'ব্যাপার তো চোখে দেখে এলেন। কানে শুনলেন স্যার।'

'কিন্তু আমার সেই ব্যাপারের কিছু যে—'

শিবনাথ চিন্তিত এবং চাপা গলায় সে কথাটা তুলতেই মদন মাথা নাড়ল ও খুক্ করে কাশবার মতন শব্দ করে হেসে নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে আর একবার পারিজাতের বাংলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে শিবনাথের কাছে মুখটা সরিয়ে আনল। 'মশাই, আপনি দেখছি, ওই যে কথায় বলে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে চাল কিনতে এলাম বাজারে, সবুর সয় না।'

শিবনাথ লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।

'রাগ করলেন।' মদন নিজেও লজ্জা পেল যেন বেমক্কা কথাটা বলে ফেলে। খাতির দেখাবার জন্য একটা হাত শিবনাথের কাঁধের ওপর রাখল। শিবনাথ রাগ করল না বা হাতটা সরাল না। টের পেয়ে মদন ঘোষ হেসে বলল,--

—'মশাই, বড়লোকের বাড়ির কাজ, বুঝতে পারছেন না? আপনাকে তিনি কি বললেন? কর্তা আরামবাগে গেছেন, কখন ফিরবেন জানি না—এই তো?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'মশাই, কাল থেকে ভয়ানক হুলুস্থুল বাড়িতে। হ্যাঁ, আণ্ডাবাচ্চাগুলোর প্রাইভেট মাস্টার রাখা নিয়ে। কর্তা চাইছেন এখানকার লেখাপড়া জানা লোককে দিয়ে কাজ চালাতে, গিন্নীর শখ তাঁর ও-পাড়ার মানে বালিগঞ্জের ছোকরা কেউ এসে পড়াক।'

একটা তিক্ত ঢোক গিলে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'তাই নাকি তা কিছু মীমাংসা হ'ল এর?'

'জানি না,' তেমনি বিরসকণ্ঠে মদন বলল, 'শুনছিলাম সকালে চায়ের টেবিলে বসে দু'জনার ঝগড়া। আরে মশাই, আপনি শিক্ষিত মানুষ আমাদের বস্তিবাড়িতে, আপনাকে বললে কথাটার মানে ধরতে পারবেন। অর্থাৎ আসলে বড়মানুষ হলে কি হবে। এঁরা আমাদের মতন গরিবলোকের ঘরে যে-সুখ আছে, তার ছটাকও পায় না। মশাই বললে বিশ্বাস করবেন না, বাচ্চাগুলোর সামনেই, তর্কাতর্কি করতে করতে দু'জন দু'জনকে মারতে বুখেছিল।'

অধৈর্য হয়ে শিবনাথ বলল, 'তা তো হবেই, এখানে আইডিয়ার প্রশ্ন। দু'জনেই বড় মানুষের সন্তান। কেউ কারো কাছে নিচু হতে চায় না। তারপর, ঝগড়ার শেষে কি স্থির হ'ল? কর্তা রাজী হলেন বালিগঞ্জের মণ্টু ব্যানার্জিকেই আমদানি করতে?'

'ক্ষেপেছেন?' ঝুপ্ করে আবার মাথাটা নিচু করে' মদন ফিসফিস করে বলল, 'আপনার হাত ধরে বলছি মশাই, কাউকে যেন কথাটা প্রকাশ করবেন না।'

'ক্ষেপেছেন?' শিবনাথ বলল, 'আমাদের কি, ওরা ঘরে বসে এ-কারণে সে-কারণে রাতদিন ঝগড়া কি মারামারি করুক। আমরা তৃতীয় লোক, কেন সে-সব প্রকাশ করতে যাব, শুনি কি ব্যাপার?'

'আর, ব্যাপার!' মদন ঘোষ এবার নাকে শব্দ করে হাসল। 'তা আমি অবশ্য বৌদিমণির তেমন দোষও দেখি না, দেখছেন তো, এতগুলো বাচ্চার পরও যৌবন যেন এখনো সারা শরীরে খিলখিল করে হাসছে। তা আরামবাগের আমোদ-ফুর্তির কথাটি জেনেছেন পর থেকে তো আর কথাটিই নেই। তিনিও সুবিধা পেয়েছেন। মণ্টুকে এখানে এনে রাখতে দিতে পারিজাতের যদি আপত্তি তো সে-ও আরামবাগে যাতায়াত বন্ধ রাখুক, গিন্নীর এই শর্ত।'

'এই নিয়ে বুঝি সকালে খুব একচোট—'

'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, প্রায় চুল ছেঁড়াছিঁড়ি। তা উনি জেদ ক'রে করবেন কি। বলে কিনা যার জোরে পারিজাতের জোর, রাজনীতির আসরে গদি পেতে যার তোয়াজ না করলে রায়সাহেবের ছেলে কালই গলা জলে ডুবে যাবে, বৌয়ের বায়না সে শুনবে

কেন। আরামবাগের শশাঙ্ক বাগচির নাম শোনেন নি? তেরো বার জার্মানীতে আর ন'বার রাশিয়ায় ঘুরে এসেছে? যার দাপটে এখন এদেশের ঘাটে ঘাটে বাঘে-গরুতে একত্র জল খায়।

'কি জানি, কাগজে হয়ত দেখে থাকব নাম,—তেমন চিনি না।'

'তা চিনে কাজ নেই আমার-আপনার। এখন কথা হচ্ছে বৌদিমণি যতই রাগারাগি ঝাঁপাঝাঁপি করুক, শশাঙ্ক বাগচির আরামবাগের পার্টিতে গিয়ে দু'চার পাত্র গলায় না ঢেলে একটু ইয়েটিয়ে নিয়ে ফুর্তি-টুর্তি না করে পারিজাত এখানে বসে বৌয়ের মান ভাঙাবে সে ছেলেই নয়। আমি তো কর্তার আমল থেকে এবাড়িতে—'

অস্বস্তি বোধ করছিল শিবনাথ কিন্তু মদন ঘোষ তা গ্রাহ্য না ক'রে বলল, 'এটা ভাল, আমি এইজন্য পারিজাতের প্রশংসা করি, মশাই, মেয়েমানুষকে যে-পুরুষ আস্কারা দেয়, জীবনে তার উন্নতি নেই—হা-হা। খাওয়া পরা কোনটির অভাব রাখছে পারিজাত যে বৌদিমণির এই আখ্‌খুটেপনা?'

'আমাকে তা হলে এখন কি করতে হবে,—কাজের কথাটা যে ভাল করে তোলাই হ'ল না।'

'হবে হবে, তাইতো বলছিলাম মশাই, দুটো দিন যেতে দিন, রাগটা একটু পড়ুক। বাচ্চাদের মাস্টার তো রাখতেই হবে। মণ্টু ব্যানার্জি এখানে আসছে না আপনি ধরে রেখে দিন।'

একটা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল দুজন। অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে শিবনাথ একবার রায়সাহেবের বাড়িটা দেখল। সেখানে তেমন ভাল আলো-টালো যেন জ্বলছে না আজ।

'কে. গুপ্ত এসেছিল তিনি পছন্দ করলেন না, বিধুমাস্টার এসেছিল তিনি পছন্দ করলেন না।'

'আমাকেও তো মনে হয়—' শিবনাথ অস্ফুটস্বরে বলতে যাচ্ছিল, মদন ঘোষ মাথা নাড়ল।

'তা কি আর বারবার এসব চলে, উঁহু পারিজাত তো মশাই আজ পষ্টাপষ্টি বলে গেল শুনলাম, যদি এখানকার কাউকে মাস্টার রাখা হয় ভাল, না হয় বাচ্চাদেব আর লেখাপড়া শেখাবে না সে, একটু বড় হলে সবগুলোকে কারখানায় ঢুকিয়ে দেবে।' কথা শেষ করে মদন হাসল।

শিবনাথ একচা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

'তাতে আপনার বৌদিমণি কি বললেন?'

'কি আর বলবেন, পারিজাত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর খুব খানিকটা হৈ-চৈ করলেন, চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনি ভাঙলেন, বাচ্চাগুলোকে মারধর করলেন, টেবিলের ফুলদানিটা ভাঙলেন, কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মারলেন দু'বার দুটো।'

'খুব অশান্তি এদের মধ্যে,' শিবনাথ বলল, 'মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েগুলোর কষ্ট।'

'তাইতো বলছিলাম স্যার,—আমরা খাটো কাপড় পরে শাকভাত খেয়ে এর চেয়ে

ঢের বেশি শান্তিতে আছি, অনেক বেশি সুখে আছে আমাদের বাচ্চারা।'

'আমি কি পরে আর একবার এ-বাড়িতে এসে দেখা—'

হ্যাঁ, সেকথাই তো আপনাকে বলতে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম, স্যার। আপনি এর মধ্যে নিরাশ হয়ে পড়েছেন দেখে অবাক লাগছে। শুনুন শুনুন, কথায় বলে বাড়ির গরু ঘাটের ঘাস খায় না, তা খাবে, পারিজাত শক্ত ছেলে, কে. গুপ্ত কি বিধুকে পছন্দ হয়নি বলে যে গিন্নীর কাছে নিত্য নূতন মাস্টার এনে হাজির করাবে সে পাত্রই সে নয়। বললাম তো বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কি মোক্ষম কথাটাই আজ সে শুনিয়ে গেল গিন্নীকে—হা-হা। তা ছাড়া—' গলার স্বরটাকে হঠাৎ খাদে নামিয়ে মদন বলল, 'তা ছাড়া আপনাকে যে বৌদিমণির খুব একটা অপছন্দ হয়েছে আমার কিন্তু মনে হয় না।'

'কি রকম?' এই প্রথম আশার আলোকবর্তিকা দেখল যেন শিবনাথ। প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে মদনের মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকাল।

'বড় চাকরি পেয়ে ভুবনবাবুর মেয়ে বীথি সমিতির সেক্রেটারীর পদ ছেড়ে দিতে চাইছে। দিয়েছে। কাল পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিল এবাড়ি। এখন সেই পদের জন্য লোক খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বৌদিমণি হঠাৎ আপনার স্ত্রীর কথা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বলছিলেন তাঁকে দীপালী সঙ্ঘের সম্পাদিকার পদটা নিতে অনুরোধ করা যায় কিনা, তাঁর কি সময় হবে। যদিও অনারারী পোস্ট, তা হলেও—'

পর পর দুটো ঢোঁক গিলে শিবনাথ বলল, 'কি বললেন আপনি?'

'হেঁ হেঁ, আমি তো মশাই কত বড় সার্টিফিকেট দিলাম, তা আপনি যদি তখন কাছে থাকতেন শুনতে পেতেন। আমি বললাম, 'এইরকম একটা দায়িত্ব-সম্পন্ন কাজের ভার যারা সত্যিকারের শিক্ষিতা, ভদ্র এবং উন্নতমনা—সেই সব মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বললাম, আট নম্বরের বস্তি কেন, এ তল্লাটে এমন উপযুক্ত লোক আছে কি না সন্দেহ।'

'কি বললেন তিনি?' রুদ্ধস্বরে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'এ সম্পর্কে কি দীপ্তিরাণী কিছু সেটেল্ করলেন, মানে পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্ত?'

'না হয়নি করা, যদ্দুর মনে হল, তারপরই শুরু হ'ল কি না প্রাইভেট টিউটার রাখা নিয়ে ঝগড়া,—হবে, হয়ে যাবে, আমি খুব করে বলে দিয়েছি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে।'

এতক্ষণ পর শিবনাথ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলল। 'চলবে নাকি একটা সরকার মশাই।' একটা সিগারেট মুখে গুঁজে শিবনাথ প্যাকেটটা মদন ঘোষের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'সিগারেট আবার কেন, আমি তো বিড়িতেই সন্তুষ্ট মশাই। দিশি জিনিস। তা দিন আদরের ধন ঠেলতে নেই।'

সিগারেট ধরিয়ে মদন ঘোষ বলল ঃ 'এই বেলা দামী কথাটা বলছি শুনুন। হাল ছাড়বেন না। চুলে পাক ধরেছে মশাই আমার, তা ছাড়া অনেকদিন [illegible] হয়ে গেল এ বাড়ির চাকরি, হাবভাব, রকমসকম দেখে পারিজাত কি [illegible], এমন কি

বাচ্চাগুলোর চরিত্রও কিছু কিছু বুঝতে শিখেছি। ঠিক হয়ে যাবে আপনার এখানে দেখুন। কাল আপনার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলেন, আজ আপনি এখানে পা না দিতে কেমন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে হৃদয়ের কথাগুলো বলে ফেলল। বড়লোকের বাড়ির মেয়েদের দস্তুরই ওটা যদিও মশাই, তারা, আমি অর্থাৎ বাড়ির সরকার কাছে থাকলে তার কাছে, চাকর বাকর কি বামুনঠাকুর থাকলে তাদের কাছে, আরদালি-পিওন কি বাড়িতে মাস্টার থাকলে তার কাছে, অক্লেশে মনের কান্না বলে যায়। মানে আপনপর জ্ঞানই কম। পুরুষ হলেই হ'ল। ওকি আপনি মাথা নোয়াচ্ছেন কেন? না না মশাই, এটা যে আমি মনিব-পত্নীর নিন্দা করছি তা না, আপনি ভেবে দেখুন, তারা তোয়াক্কা করে না সুনামের। ধরুন কাল যদি দীপ্তিরাণী এই আস্তানা ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান তো আর আপনার তেমন সুযোগ আসবেই না। কি মাইনের কথাও যদি ওঠে আমি বলতে পারি পারিজাত বারো বারো চব্বিশ আর বলে-কয়ে যদি ত্রিশ করা যায় তো ঐ। আর কিছু না। এক বাটি চা না। আর আপনি যদি অন্দরমহল দিয়ে ঢোকেন, হ্যাঁ, বৌদিমণির কথা বলছি, তাঁর মন ভিজিয়ে কাজটি বাগিয়ে ফেলতে পারেন তো পঞ্চাশ টাকা মাইনে ঠিক করবেন উনি আপনার। রোজ চা পাবেন হালুয়া পাবেন। টিফিন,—বিকেলে গেলে গরম সিঙাড়া খেতে পাবেন। মশাই, চুলগুলো পেকে গেছে। তা ছাড়া আই-এ, বি-এ পাশ করিনি। বিদ্যে কম। মাস্টার হবার যুগ্যি নই। নয়তো এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতুম নাকি।'

'না, ব্যারিস্টার যেখানে ক্যান্ডিডেট্।' শিবনাথ স্বগতোক্তির মত খেদ প্রকাশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। 'আমার হবে না।'

'আরে ধ্যেৎ মশাই, ব্যারিস্টার! ব্যারিস্টার রাখবার পারিজাতের এখন ক্ষমতা কই।' মদন ঘোষ আচমকা ধমক দিয়ে উঠল। 'ইলেক্‌শন ইলেক্‌শন করে ও এখন পাগল। জলের মত টাকা ঢালছে শশাঙ্ক বাগচির পায়ে। মদে আর মেয়েমানুষে দুজনে লেপালেপি। আপনি মশাই সুরুৎ করে এই ছিদ্র দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ুন। আপনার কাছে আজ যেমন মনের কথা খুলে বলেছে, এমন আর কারো কাছে বলতে শুনিনি বৌদিমণিকে। তাই বলছি আপনার হবে। কেন বলছি বুঝতে পারছেন? জমিদার বাড়ির সরকারি করে খাই মশাই, মাথায় বৈষয়িক বুদ্ধি একটু রাখি। কই বার করুন তো আর একটা সিগারেট।' সরকার এবার গুজগুজ করে হাসল।

শিবনাথ নিঃশব্দে প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে মদন ঘোষ বলল, 'কে. গুপ্তটা পাগল, বিধুটাকে তো দেখলে এখন জঙ্গল থেকে উঠে এসেছে বলে মনে হয়। এই বড় বড় চুল মাথায়, দাড়ির ঝোপ মুখে। আচ্ছা মশাই, আপনাদের বাড়ির বীথিরাণী কি চাকরিটি পেয়েছেন বলতে পারেন? এ্যাঁ, এটি দেখছি পোশাক-আশাকে আমার এবাড়ির বৌদিমণিকে টেক্কা দিতে চলল, কি মশাই, চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন।'

শিবনাথ চুপ থাকলেও মদন চুপ করে রইল না। 'আহা, তখন দেখলাম আপনার স্ত্রীকে। একেবারে ছেলেমানুষ। ইস্কুল সেরে বুঝি ফিরছিলেন। সঙ্গে মেয়েটি। না, আপনার মেয়ে মার মতন শরীরের গড়ন পায়নি, তেমন চেহারারই না। আহা, দেখে

কষ্ট হচ্ছিল ! আপনার একটা সুবিধাটুবিধা হয়ে যাক । একটা চাকর কি বাঁধা ঝি রাখবার অবস্থা হলে খুকির মার একটু এদিকের কাজের সুবিধা হয়, কি বলেন ?' বলে মদন ঘোষ প্যাকেট থেকে পরে খাবে বলে অতিরিক্ত একটা সিগারেট তুলে আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল । 'কথাটা, মনে রাখবেন কিন্তু ।' যেতে যেতে দু'বার ঘাড় ফিরিয়ে বলল ঘোষ । শিবনাথ ঘাড় কাত করল ।

'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, গায়ে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নেই' । ঝিঁঝির ডাকের মত দু'কানে কথাগুলো বাজছিল শিবনাথের । আমতলা পার হয়ে সে রাস্তায় নামল । জায়গাটা এখানেও অন্ধকার । পারিজাতের আম-জাম-সুপারির বাগান এই অবধি চলে এসেছিল বলে গাছের ঘন পাতার আড়ালে রাস্তার গ্যাসের ডোমটা ঢেকে গেছে ।

শিবনাথ এখানে এসে আর একবার মন্টু-বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস ছাওয়া অন্ধকার পুরীর দিকে কতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে পরে সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে চলল । যেন মদন ঘোষের বৈষয়িক বুদ্ধির কথা মনে হতে শিবনাথ এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেদিকে এখন কেবল চেয়ে থাকলে কাজ অগ্রসর হবে না, চিন্তা ক'রে আপাতত এক কাপ চা খাওয়া ও বিশ্রাম করার উদ্দেশ্যে রমেশের চায়ের দোকানের দিকে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল । চলতে চলতে সে পারিজাতের ছেলেমেয়েদের আজকের দুরবস্থার কথাটাই চিন্তা করল বেশি । আজ বাপমা'র মধ্যে প্রেম জমেনি বলে তাদের কেউ গাড়িতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়নি । বেচারারা অনাথা হয়ে সারাটা বিকেল লনে গড়াগড়ি করছিল । ওদের এক একটি প্রশ্নের ঠেলায় সেদিন শিবনাথ কেমন নাস্তানাবুদ হয়েছিল, তা-ও তার এখন মনে হ'ল । আর মনে হতে নিজের মনে হেসে সিগারেটের শূন্য প্যাকেটটা ছুঁড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিল । মদন শেষ সিগারেটটি তুলে খালি বাক্সটাই শিবনাথের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল ।

ঊনত্রিশ

রাস্তায় শিবনাথকে শেখর ডাক্তার আটকায়, তার ডিস্পেনসারীর দরজা হনহন করে সে পার হচ্ছিল ।

যেন ডিস্পেনসারীর ভিতর চেয়ারে বসা ছিল ডাক্তার । শিবনাথকে দেখে লাফিয়ে রাস্তায় নামল । 'আপনাকেই আমি খুঁজছি মশায়, সেই সন্ধ্যা থেকে । কোথায় ছিলেন সারাদিন ? ছুটি ফুরিয়ে গেছে নাকি ?'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শিবনাথ, যেন অনেকটা ধৈর্যসংবরণের মত গলার স্বর গম্ভীর করে আস্তে আস্তে বলল, 'কেন ? আমাকে আপনার কিসের দরকার ?'

'অনেক দরকার মশায়, এক জায়গায় আছি, এক বাড়িতে খাওয়া-শোয়া হয় দু'জনের, সকালে ঘুম ভাঙলেই দরজা খুলে আপনার মুখদর্শন । আপনাকে এড়িয়ে চলবে সেই সাধ্য কোথায় ? আসুন তামাক খেয়ে যান ।'

যেন ডাক্তার বুঝতে পেরেছেন এভাবে ছুটে এসে হঠাৎ হাত চেপে ধরায় শিবনাথ রুষ্ট হয়েছে । একটু লজ্জা পেয়ে শেখর প্রশ্ন করল, 'বিশেষ ব্যস্ত নাকি ?'

'না।'

শিবনাথ অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলল। অর্থাৎ বিরক্তি গোপন করল। 'তবে স্যার ভিতরে আসুন, বড় বিপদে পড়ে গেছি, আপনার সঙ্গে একটু কনসাল্ট করার দরকার হয়ে পড়েছে।'

হঠাৎ এ-রকম করুণ স্বর শুনে শিবনাথ চমকে উঠল। 'কি হয়েছে আপনার?' ঘাড় ফেরাল সে ডাক্তারের দিকে।

'আসুন স্যার, ভেতরে আসুন। না বসে বলতে পারব না।' শেখর আবার শিবনাথের হাত ধরল।

শিবনাথ বুঝল নিছক বসে গালগল্প করতে লোকটা ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরেনি। একটা উঠোনের ওপর আছে সেই আত্মীয়তার দাবীতে বিপদে পরামর্শ চাইতে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'বসুন বসুন'। ডাক্তার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। শিবনাথ এই প্রথম ডিস্পেনসারীর ভিতর ঢুকল। চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না শেখর। নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়ে চেয়ারের ধুলো মুছে দিল। 'বসুন।'

চেয়ারে বসে লক্ষ্য করল শিবনাথ টেবিল, আলমারির কাচ, এমন কি ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত ধুলোয় আচ্ছন্ন।

'এত ধুলো আসে কোথা থেকে?'

'রাস্তার। শালার রাতদিন লরী আর মোষ চলছে। আমরা কি আর এখানে মানুষের মত বাস করছি!'

ডাক্তারের এই উক্তিতে শিবনাথ কিছু মন্তব্য করল না। আলমারির মাথায় বসানো টাইমপীসটায় সময় দেখছিল সে। সেটাও ধুলোতে ঢাকা। ময়লা কাচের মধ্য দিয়ে অনেক কষ্টে সে সময়টা দেখতে পেল। সাতটা দশ।

সময় দেখে শিবনাথ এদিকে ঘাড় ফেরাল।

'কি বলুন?'

যেন ডাক্তার মাটির দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। যখন মুখ তুলল শিবনাথ দেখে বুঝল লোকটি খুবই চিন্তান্বিত।

কিন্তু ডাক্তারের দিক থেকে সরে তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি বাঁ-দিকে চলে গেল কোণার দিকে বেঞ্চটায় একটি ছেলে বসে আছে মুখ গুঁজে। জায়গাটা একটা বাক্সের আড়ালে আছে বলে অন্ধকারমতন। এতক্ষণ পর শিবনাথ ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে চিনল।

'এর নাম সুধীর। আমাদের বাড়িতে দেখেছেন।'

ডাক্তারের দিকে চোখ রেখে শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'এবং ছেলেটি সম্পর্কে অনেক কথা কানে এসেছে আমার'—বলা উচিত ছিল শিবনাথের, কিন্তু বলল না। গম্ভীর-ভাবে শুধু আর একবার সুধীরের দিকে তাকাল।'

'আর এঁর নাম শিবনাথবাবু, ইনি একজন গ্র্যাজুয়েট, তাঁর স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। হাইলি কালচার্ড ফ্যামিলী।'

ডাক্তার পরিচয় দিতে সুধীর হুট্ করে একবারটি শিবনাথের আপাদমস্তক লক্ষ্য

করে ফের মাটির দিকে চোখ নামাল এবং পূর্ববৎ কাঠের মত স্থির ও শক্ত হয়ে চুপ করে বসে রইল। যেন চিন্তান্বিত না, সুধীর রাগান্বিত।

'বাড়িতে আরো পাঁচটা লোক আছে।' ডাক্তার সুধীরের দিকে তাকাল না, শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু সেগুলোকে আমি কুকুর ভেড়ার মতন দেখি। কে. গুপ্তটার বেকার থেকে থেকে মাথা খারাপ। বিধুটা বাচ্চা পয়দা করে আর ছেলে ঠেঙিয়ে নিজে একটা জন্তুতে পরিণত হয়েছে। পাঁচুটা মদে বেশ্যায় নিমগ্ন। বলাই মূর্খ, বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। রমেশটা চোর, ওর ভাই ক্ষিতীশটা ডাকাত। অমলটা ছিল বৌ-পাগলা বাউণ্ডুলে, বৌ ছাড়া সাতও চিনত না পাঁচও চিনত না, আর বিমলটা ফাজিল চালিয়াত। কাজেই এদের কাউকে ডেকে এনে তো আর আমি এ-মামলার বিচারক সাজাতে পারি না, এদের কি-ই-বা বুদ্ধি বিবেচনা, আর আমায় পরামর্শই বা দেবে কি ছাই। তাই অনেক চিন্তা করে আপনাকে ডাকলুম।'

'বলুন।' শিবনাথ আর একবার ধুলোর পলেস্তারার ভিতর দিয়ে ঘড়ির কাঁটা দুটো দেখতে চেষ্টা করল।

'আমি পারব না শিবনাথবাবু, আপনি বলুন, আপনি চেষ্টা ক'রে যদি এই মূর্খকে বোঝাতে পারেন যে, নিজের ব্লাড শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এটা জেনে নিয়ে বিবাহ এবং তারপর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রশ্ন এখানে ওঠে কি না?'

'কি ব্যাপার?' শিবনাথ এই প্রথম শুনছে এসব কথা, মুখের এমন ভান করে অত্যধিক গম্ভীরভাবে আড়চোখে আর একবার সুধীরকে দেখে নিল।

'এটি আপনার কে হয়?'

'দূর সম্পর্কে শালা,' ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, 'অবশ্য এই আত্মীয়তায় বিবাহ আটকায় না। কিন্তু যে স্থলে তোমার এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি ছিল, এখন সেটা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছ কিনা, আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেবার আগে একথা জানবার রাইট আমার আছে কিনা আপনি বলুন, আপনি এই মহামান্য জ্ঞানীগুণী আসামের শিলচর নিবাসী সুধীরবাবুকে বলে বোঝান।'

'কি রোগ?' শিবনাথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং আড়চোখে আরো একবার সুধীরকে দেখল।

'অতি বিশ্রী রোগ!' শেখর ডাক্তার ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল। 'মশাই, ভাগ্যিস পামারবাজারের ইয়ে ডাক্তার আমায় খবরটি বলল—'

'আপনি যা-তা কথা বলবেন না, আমি বলে দিচ্ছি। ওধার থেকে যেন বারুদের মত জ্বলে উঠল সুধীর। আমার কোনোদিন এসব অসুখ ছিল না। ইয়ে ডাক্তার মিথ্যাবাদী।'

'কিন্তু সেইজন্যেই তো বলেছিলাম, বাপু একটা ব্লাড এগজামিন করিয়ে নাও, তা'তে তোমার আপত্তি কি?' শেখরও জোরে ধমক দিয়ে উঠল সুধীরকে।

'বেশ তো! যদি মনে করেন আমার ইয়ে ব্যারাম আছে, আমি আসব না, আমি তো চাই না আপনার বাড়ীতে আসতে, আপনারা ডাকেন।'

যেন রাগটা চাপতে শেখর কতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে পরে প্রশ্ন করল, 'কে ডাকে

তোমাকে শুনি ?'

'সুনীতি, সুনীতির মা।' সুধীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কি খুঁজছিল। 'এই দেখুন কালকে সকালে আপনার ওয়াইফ চিঠি দিয়েছে ঃ 'ভাই সুধীর, বিকেলে সময় পেলে একবারটি অবশ্যই এসো। তোমার জন্যে পেঁপের মোহনভোগ তৈরী ক'রে রেখেছি।' বলে সুধীর পকেট থেকে ডাকঘরের ছাপমারা একটা খাম বার করল। 'দেখুন বিশ্বাস না হয়।'

প্রভাতকণার হাতের লেখা। শেখর ডাক্তার দূরে থেকে দেখে চিনল। খামটি আর হাতে নিল না। যেন আর একটু কি ভেবে পরে বলল, 'না, আর চিঠি যাবে না, আমি ওদের সব বলে দিয়েছি, হ্যাঁ, সুধীরের ইয়ে আছে—'

আর বসে থাকা প্রয়োজন মনে না ক'রে যেন সুধীর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু সময় গুম মেরে থেকে পরে ডাক্তারের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বলল, 'ইডিয়েট, আপনাকে একটা ইডিয়েট পেয়ে পামারবাজারের ইয়ে ডাক্তার ধাপ্পা মেরেছে—' ব'লে পরে মুখটাকে বিকৃত ক'রে সুধীর হাসল।

'বটে!' শেখর ডাক্তার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। 'কী স্বার্থ তার! তোমার নামে ভদ্রলোক কি খামোকা ?—যা ফ্যাক্ট তাই বলেছেন।'

'স্বার্থ আছে বৈকি।' প্রকাণ্ড একটা ঠাট্টা দুই ঠোঁটে ধরে রেখে সুধীর হাতের আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা ছবি আঁকল। 'পামারবাজারের ইয়ে ডাক্তারের সুনীতিকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে। সেদিন যখন সুনীতিকে নিয়ে আমি সিনেমায় যাচ্ছি, বাসে আপনার সেই বিখ্যাত বন্ধুটির সাথে দেখা, তিনি বাসে উঠে আমাকে ধাক্কা মেরে সিটটা থেকে তুলে দিয়ে সুনীতির পাশে ব'সে পড়েন আর সারা রাস্তা সুনীতির ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বললেন—মা মা, তুই আমার বাড়িতে একবারটি যাবি মা, আহা তুই আমার বন্ধু শেখরের মেয়ে, আমার কত আদরের জন। তোর জ্যাঠাইমা তোকে দেখতে পাগল। কুলিয়া-ট্যাংরা থেকে পামারবাজার তো খুব বেশি দূরে না পাগলী—ইত্যাদি—'

বলে সুধীর খুক্ ক'রে হেসে ফেলল।

'মিথ্যাবাদী, লায়ার! ইয়ে ডাক্তার কখনই এতবড় মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে কথা কইবে না। তুমি স্কাউণ্ড্রেল, এমন বানানো কথা বললেই আমি বিশ্বাস করব ?'

'স্কাউণ্ড্রেল, ইডিয়েট', সুধীরও চোখ লাল করল ঃ 'তুমি গিয়ে সুনীতিকে একবার জিজ্ঞেস করো, বুড়ো তার কাঁধে হাত রেখেছিল কিনা শেয়ালদা পর্যন্ত। গাড়ি থেকে নেমেই সুনীতি আমাকে কথাটা বলল।' বলেই সুধীর সুনীতির মার নিমন্ত্রণ-পত্রটা পকেটে পুরে নতুন বার্মিজ স্যাণ্ডেলের মচ্ মচ্ আওয়াজ তুলে ও কড়া একটা সেণ্টের গন্ধে ঘরের বাতাসকে ভারাক্রান্ত ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শেখর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দেখলেন তো কেমন গোঁয়ার, কী সব কথাবার্তা, ওই পাজি হারামজাদা হবে আমার মেয়ের জামাই, রাস্তার গুণ্ডার শ্বশুর হব আমি ?'

শিবনাথ বলল, 'আর আসবে না। ব'লে দিয়েছেন যখন লজ্জায় আর হয়তো—'

'ছাই বুঝেছেন আপনি। আপনি হারামজাদাকে কন্দুর চিনলেন শিবনাথবাবু! আপনি আসবার আগে ও কী সব কথাবার্তা বলছিল আমাকে, শুনলে আপনি কানে আঙুল দিতেন!'

শিবনাথ মাথা নত করল।

'আবার আসবে। ও আমার সর্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে এখানে মাথা ঢুকিয়েছিল।'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

ডাক্তার পায়চারি করছিল।

'আবার আসবে। জানেন? আপনি আসবার আগে আমায় সে প্রেমতত্ত্ব শোনাচ্ছিল। বলছিল, আমি মূর্খ, বলছিল সুনীতি যদি তার অসুখ আছে জেনেও তার পত্নী হ'তে স্বীকার করে তো আমি বাধা দেবার কেউ নই। সুনীতির বয়েস অনেকদিন আঠারো পার হ'য়েছে।'

ঘড়ি দেখতে ঘাড় ফেরাতে শিবনাথ বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করছিল, কিন্তু ডাক্তার এমন সব হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনাচ্ছিল যে, যেন অনেকটা লজ্জা ও ভদ্রতার খাতিরে সে একটু সময়ের জন্য ওদিকে তাকানো মুলতুবী রাখল এবং মনোযোগ সহকারে সুধীরের কাহিনী শুনল।

'কিউপিড ইজ ব্লাইন্ড। হারামজাদা আমায় বোঝাচ্ছিল, আমি সেক্সপীয়র পড়িনি একটা অকাট মূর্খ। মেটিরিয়া মেডিকা মুখস্থ করা লোক মানুষের মনের কামনা বাসনার তথ্য বুঝতে পারে না। বলছিল, আগেই নাকি সুনীতিকে এসব কথা বলা-টলা হয়ে আছে এবং সুধীরের যে আর অসুখের চিহ্নটি নেই সুনীতি তার বড় প্রমাণ, তার অধিক কিছু নাকি এ সম্পর্কে আমাকে আর বলার নেই।'

শিবনাথ জোর ক'রে ঘড়ি দেখতে ঘাড় ফেরাল।

'কই শিবনাথবাবু, আপনি আমাকে বুদ্ধি দিন, আমাকে পরামর্শ দিন। এই বিপদ থেকে আমি কী ক'রে উদ্ধার পাব, বিদ্বান শিক্ষিত মানুষ আপনি যদি আমাকে এড়িয়ে যান আমি কোথায় দাঁড়াই বলুন।'

খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদিকে তাকাল শিবনাথ এবং অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আর কিছু বলেছে আমি আসার আগে?'

'বলেছে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি যদি এখন সুনীতিকে বাধা দিই বাড়াবাড়ি করি সুধীরের সঙ্গে মেলামেশা না করতে তো ফর লাইফ্ আমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

আপনি সুনীতিকে বুঝিয়ে বলুন যে, সুধীরের অসুখ আছে কি নেই—না জানা পর্যন্ত যাতে সে তার নিজের দিক থেকে অন্তত সাবধান থাকে। বিয়েতে তার অনিচ্ছা থাকাটাই এখন বড় কথা।'

'মশাই!' শেখর ডাক্তারের গলা দিয়ে যেন শব্দ বেরোচ্ছিল না, খসখস করছিল কথাগুলো। 'বেশি সর্বনাশ করেছে সুনীতির মা। বিয়ে বিয়ে ক'রে মেয়ের কানের ফুলকা দু'টো উনি ঝাঁজরা ক'রে ফেলেছেন। মানে, সর্বনাশ শুরু হয়ে গেছে আমি

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, শিবনাথবাবু। তাই তো ডেকে এনেছি আপনাকে কী বলছি এসব।'

'সুনীতি আপনাকে কিছু বলেছে?'

'আমার সঙ্গে কথা বলছে না। কাল রাত্রে খায়ওনি। আজও এখন পর্যন্ত উপবাস।'

অত্যন্ত অপ্রিয় প্রসঙ্গ।

কিন্তু বাধ্য হয়ে শিবনাথকে ফের প্রশ্ন করতে হল: 'মা? আপনার স্ত্রী কি বলছেন? সুধীর সম্পর্কে কিছু বুঝিয়েছিলেন কি তাঁকে?'

'ফেলিয়োর হয়েছি মশায়, ব্যর্থকাম হয়েছি বোঝাতে গিয়ে। কী বলতে তবে আপনাকে আমি ডেকে আনলাম ডিস্পেনসারীতে। আমাদের হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে মশায় এ ধরনের রোগিণীও আছে। হু লাভস্ হার ডটার্স লাভার। দ্যাট্ টাইপ প্রভাতকণা, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী দ্যাট টাইপ অব উম্যান. আপনাকে বলতে পেরে আমার বুকটা হাল্কা হয়েছে, ধ'রে দেখুন শিবনাথবাবু।'

ব'লে থপ্ ক'রে শিবনাথের হাত চেপে ধ'রে শেখর প্রায় জোর ক'রে সেটা টেনে তার বুকের কাছে নিয়ে যেতেই শিবনাথ হাত সরিয়ে আনল।

'আমায় মশায় যেতে দিন কাজ আছে। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি!'

যেন লজ্জিত হ'ল শেখর ডাক্তার, ঘরের বাতাসে সুধীরের পরিত্যক্ত সেন্টের গন্ধটা টেনে নেবার মত ক'রে জোরে নিশ্বাস টেনে বলল, 'না, আমার এটা প্রাইভেট লাইফের কথা। লোকে টাকাপয়সার অভাবে ভোগে, আমি ভুগছি বাড়ির যিনি কর্ত্রী, ঘরের গৃহিণী তিনি একটা মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগছেন দেখে।'

ব'লে ডাক্তার হাতের দু টো আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরল।

টাইমপীস্ ঘড়িটার টিক্ টিক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। যেন আজ ঠাণ্ডাটা খুব কম। গুমোট। কতক্ষণ স্থির হয়ে ভেবে নিয়ে কথাটা চিন্তা করার পর ডাক্তার বলল, 'আমার ব্যক্তিগত জীবন কত দুঃখের তাই আপনাকে শোনাচ্ছিলাম।' ব'লে ডাক্তার সুধীর সম্পর্কে নিজের স্ত্রীর কথাবার্তা ও ব্যবহারগুলো একটা একটা ক'রে খুলে বলল। ছেলের অসুখ আছে কথাটাই প্রভাতকণা বিশ্বাস করতে চাইছে না। কেন? তার কারণ কি শুনতে গিয়ে প্রশ্নটা করামাত্র শেখর স্ত্রীর কাছে ধমক খেয়েছে। বলছে, মেয়ের বয়স হয়ে গেছে। তা অসুখে ওরা ভুগুক। তোমার কি, ছেড়ে দাও। সুনীতি যখন মাথা পেতে সব ঝুঁকি নিতে চাইছে, তখন তুমি আর অমত করো না।' ইত্যাদি।

বলা শেষ ক'রে ডাক্তার বলল, 'বুঝেছেন মশায়, এটা হ'ল ক্যান্থারিসের লক্ষণ। সেদিন ভাতের গরম ফ্যান পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর হাতে এতবড় ফোস্কা পড়ে যায়। ঝোঁকের মাথায় আমি তাড়াতাড়ি এক কাপ জলের সঙ্গে খানিকটা স্ট্রং টিংচার ওকে খাইয়ে দিলাম। তার জের চলছে। ফোস্কাটি সারল, কিন্তু ওই যে, ক্যান্থারিসের যা সিম্প্টম, বুড়ো বয়সে প্রভাতকণা আজ তাতেই ভুগছে। স্ট্রং সেক্সুয়্যাল ডিজায়ার,

অত্যধিক সেক্স-কন্সাসনেস। হ্যাঁ, প্রভাতকণা তার সন্তানের বয়স বলুন, যৌবন বলুন, মা হয়ে আগেভাগে মাথা পেতে, বলতে গেলে গায়ে পড়ে যেন অনুভব করতে চাইছে। ফিলিং। দ্যাট্ ব্লাডি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর অস্থিরতা বা ক্ষুধাতৃষ্ণা যাই বলুন বেড়ে গেছে ওর। অ্যাণ্টিডোট? ছিল—আছে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, এর পর কিছুতেই বলে কয়ে আর এক ফোঁটা ওষুধ সুনীতির মাকে গেলাতে পারলাম না মশায়। ভগবান বিরূপ। না হলে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের ওপর ওর বিতৃষ্ণা জাগবে কেন। ন্যাশ্ বলেন—'

'আচ্ছা, আমি উঠি।'

শিবনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'না মশায়, আপনাকে বিরক্ত করলুম। পার্ডন মি, ক্ষমা চাইছি। আসল কথা হচ্ছে, শালা—হ্যাঁ ওই সুধীর ছোকরা, আস্ত গুণ্ডা। আমি যদি বাড়ির মেয়েদের ওপর আরো বেশি কড়াকড়ি করি এবং তার এখানে আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিই, তো স্কাউণ্ড্রেল আমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে মারতে পারে। সেই আশঙ্কা আছে।'

'তা আমি করব কি।' অসহিষ্ণু হয়ে শিবনাথ রাস্তা করতে ডাক্তারকে হাত দিয়ে সরাতে গেল। হাতখানা ডাক্তার এবারও খপ্ ক'রে ধরে ফেলে অস্থিরভাবে বলল, 'আমি তাই আপনার সাজেশন্ চাইছি, স্যার! এ বাড়িতে ছাগল গোরুকে তো আর ডেকে এনে সব সিক্রেসি আউট করা যায় না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম থানায় একটা ডাইরী ক'রে রাখব কি? যে একটা গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে। আমি নিষেধ করলেও মানছে না। কিছু বলতে গেলে উল্টে ধমক দেয়?'

'তা করতে পারেন।' শিবনাথ এবার না হেসে পারল না। অবশ্য শব্দ করল না। ঠোঁট মুচড়ে হেসে বলল, 'বাড়িতে সুধীর ঘোষ কার কাছে আসে, কেন আসে, থানায় কিন্তু তা আপনি গোপন করতে পারবেন না। সিক্রেসি সেখানে আউট করতেই হবে—'

'তা হোক গে, তাতে আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আপনাকে আমি ব'লে রাখছি, আই শ্যাল টিচ্ দ্যাট্ রাস্কেল এ গুড্ লেসন! দরকার হলে আপনি উইটনেস্ হবেন। থানার লোক যদি এসে জিজ্ঞেস করে পাড়াপ্রতিবেশী কাউকে তো—আমি আঙুল দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বলব, এঁকে প্রশ্ন করুন। প্রতিবেশী হিসাবে আমি এঁকে সবচেয়ে উচ্চ সম্মান দিই। কি বলেন? স্কাউণ্ড্রেলটা যে সুনীতিকে না পেলে আমার মাথা দু'ফাঁক ক'রে দেবে তার চেহারা, চাউনি, কথাবার্তায় আপনার সেই ধারণা জন্মাতে তো আর বাকি নেই; সুতরাং এখন আমাকে সেভ্ করুন স্যার।'

'সে দেখা যাবে।' ব'লে শিবনাথ শেখরকে রীতিমত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এল।

থানা আর পুলিশ। আসামী। সাক্ষী। অর্থাৎ আর একটি দুশ্চিন্তা। কে. গুপ্তর ছেলে রুণু গাড়ী চাপা পড়েছে সেই মামলায় দারোগার কাছে রায় সাহেবের ছেলে পারিজাত ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাতর হয়ে তিনদিন বিছানায় পড়ে আছে কিনা সত্য সাক্ষী

হ'তে কাল শিবনাথকে যেমন কে. গুপ্ত অনুরোধ জানিয়েছিল। আজ ডাক্তার তাকে 'রিকোয়েস্ট' করছেন মেয়ের সঙ্গে মিশতে সুধীরকে নিষেধ করা হয়েছে, এখন সুধীর গুণ্ডা লেলিয়ে তাকে মারধর করবে, এমন কি 'মার্ডার' করতেও পারে, দারোগা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে শিবনাথ এসব নিজের কানে শুনেছে যেন বলে দেয়। যত সব মাথাখারাপ! রাস্তায় চলতে চলতে শিবনাথ নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে উঠল। তা ছাড়া লোকটাকে, তার চালচলন, বেশভূষা এখানে এসে পা দেওয়ার পর থেকে দেখে দেখে এতটুকু সহানুভূতি শিবনাথের মনে সৃষ্টি হয়নি। সে পারতপক্ষে শেখর ডাক্তারকে এড়িয়ে চলছিল। কী সব ঘটনা! পাত্রের কুৎসিত রোগ। বাপ সন্দেহ করছে। মা মেয়ে কথা শুনছে না। গুণ্ডা। মারামারি। তুমি তার সাক্ষী থাকবে।

কাঁধ থেকে ধুলো ঝাড়ার মতন শিবনাথ হোমিওপ্যাথের প্রস্তাবগুলোকে মন থেকে তাড়িয়ে দিলে। কী কদর্য পরিবেশের সৃষ্টি করে সুধীরজাতীয় প্রেমিক ও সুনীতি-জাতীয় প্রেমিকারা সমাজে। চিন্তা ক'রে ও তাদের মনে মনে অনুকম্পা ক'রে লম্বা নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে শিবনাথ ছাড়তে পারল না। এখানে নিশ্বাস ফেলে জিরোবার, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবার সময় নেই বুঝল সে।

তিরিশ

'মশাই দেখছি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছেন। সেই যে গালটি একবার দেখিয়ে সরে পড়লেন আর দর্শন নেই।'

পাঁচু ভাদুড়ী শিবনাথের হাত চেপে ধরে জোরে। তার দরজার সামনে দিয়ে শিবনাথ বাঁ-দিকের গলিতে রমেশের চা-এর দোকানে চা খেতে যাচ্ছিল।

'না ভেবেছি, আজ আর না, কাল সন্ধ্যার দিকে এসে মাথা ও মুখটা সাফ করব।'

'আচ্ছা লোক আপনি!' আক্ষেপের সুরে পাঁচু ভাদুড়ী বলল, 'আমরা সেলুন খুলেছি ব'লে কি সারাক্ষণ ঐসব চিন্তা করছি ঠাউরেছেন নাকি। কেন, দেশের কথা, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে দু'টো চারটে কথা বলার উপযুক্ত নই ব'লে ঘেন্না করেন বুঝি।'

'না না, ছি!' শিবনাথ এভাবে আক্রান্ত হবে বুঝতে পারেনি। 'কাজে কর্মে ব্যস্ত তাই—'

'সকালে ডেলি পেপারখানা আমরাও একটু আধটু দেখি স্যার, একেবারে ক্ষুর কাঁচি নিয়ে পড়ে থাকি যদি মনে করেন অবিচার করা হবে, হা হা—' পাঁচু হাসল।

'না না, সে আমি কখনো মনে করি না। কি ব্যাপার?' শিবনাথ আর হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করল না।

'আসুন স্যার, ভিতরে আসুন। আপনাকে একটু দরকার।'

শিবনাথ প্রায় ঘেমে উঠল। কিন্তু উপায় নেই। এই পরিবেশে যতক্ষণ আছে এদের এড়িয়ে চলা শক্ত। পাঁচুর সঙ্গে সে 'উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুনে' ঢুকল।

'বসুন স্যার, এই চেয়ারটায় বসুন।'

পাঁচু আঙুল দিয়ে যে চেয়ারে বসে লোকে চুল কাটে, দাড়ি কামায়, তারই একটা দেখিয়ে দিল। শিবনাথ বসে লক্ষ্য করল ওধারে আর একটা উঁচু চেয়ারে বিধু মাস্টার বসে আছে। মাথায় হাত দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে মনে হয়।

'সিগারেট খান।'

পাঁচুর বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে শিবনাথ একটা সিগারেট তুলল। 'কি খবর, কি ব্যাপার, আমাকে দরকার হল হঠাৎ?'

ওধার থেকে বিধু বলল, 'আর কে আছে বাড়িতে বলুন। এসব বিষয়ে কন্সাল্ট করতে কি আর ছাগল গোরুকে ডাকব। তাছাড়া শেখর ডাক্তার তো মেয়ের মামলা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, শুনেছেন?'

'হ্যাঁ একটু একটু কানে এসেছে—' শিবনাথের বলার ইচ্ছা ছিল না তবু তাকে বলতে হল। এধার থেকে পাঁচু বলল, 'অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমি রমেশের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারতাম, কিন্তু জানেন তো, বলেছি আপনাকে হারামজাদার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। শালার ছায়া মাড়াতে আমার ঘেন্না হয়, মশায় বলব কি—'

'আহা তুমি ওর কথা আবার তুলছ কেন? চোর। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নাম্বার ওয়ান। যদি মহা সদ্ভাবও থাকত তোমাদের মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু দিত না পাঁচু; আমি হলপ করে বলতে পারি।'

পাঁচু কথা বলল না।

'আপনি কি বলাইকে দেখেছেন আজ বা কাল? রাতারাতি ব্যাটার চেহারা পাল্টে গেছে লক্ষ্য করেন নি?'

'না তো!' শিবনাথ একটা শুকনো ঢোক গিলল ও মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, 'কাজকর্মের কিছু সুবিধা করেছে বুঝি?'

'বলছে না। কিন্তু আই ডাউট সামথিং, বুঝলেন মশায়। ওর গায়ে নতুন শার্ট, পায়ে নতুন চটি। পরশু ছেঁড়া গেঞ্জি ছেঁড়া লুঙ্গি ছিল, আপনার চোখে পড়েছে নিশ্চয়।' বিধু মাস্টার তার দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে বলল, 'দুদিন ধরে দেখছি তৃপ্তি নিকেতনের সামনে দিয়ে যেতে আসতে বলাইটা রমেশের সঙ্গে কি যেন ফিসফাস গুজুর গাজুর করছে।'

'মাস্টারের যেমন কথা।' এবার পাঁচু মুখ খুলল: 'এ বাজারে দু চার আনার সাবান বেগুন বেচে কেউ পেট চালাতে পারে না। তা-ও কি একটা। তিনটে মুখ। তা রমেশ যদি ওকে বড়রকমের একটা ব্যবসা-বাণিজ্যে টেনে নেয় তো হিংসা করার আছে কি? তবু খেয়ে বাঁচুক। অমলের যেমন দশা হয়েছে। কোথায় গেছে ও ঘোলপাড়ায়। বলাইচরণকেও আমরা হারাতুম। তা ওর রমেশবাবা যদি ওকে রক্ষা করে মন্দ কি, কি বলেন স্যার?' কাটা ঠোঁট ফাঁক করে পাঁচু হাসে। শিবনাথ নীরব। ক্লান্ত, সত্যি ভীষণ ক্লান্তিবোধ করছিল সে এদের এ সমস্ত কথাবার্তা, অমল, বলাই কি রমেশ সংক্রান্ত নিন্দাবাদ শুনে। কিন্তু হুট করে উঠে পড়ার উপায়ও ছিল না।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে সে সময় দেখতে এদিক ওদিক তাকায়। পাঁচুর সেলুনে সব আছে, ঘড়ি নেই।

'মশায় সে-কথাই এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম পাঁচু ভায়াকে। ওপরের ঘরখানা কাউকে ভাড়াটাড়া না দিয়ে সে নিজেই রাখুক। এবং আমি ক্রমাগত দুদিন চিন্তা করে ওকে যে বুদ্ধিটা দিলুম তাতে সে মোটেই সাহস পাচ্ছে না। বলছে চলবে না—'

কি বুদ্ধি—প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বার করল না শিবনাথ। একটু উৎসুকভাবে সে মাস্টারের মুখের দিকে তাকাল। পাঁচু শিবনাথের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। 'আমি কি আর কাউকে ডেকে আনছি ঘরভাড়া দিতে, বুঝেছেন স্যার? যেন খবর পেয়ে মাছির মত সব উড়ে এসে আমায় ছেঁকে ধরছে। পঞ্চানন তলার রাখহরি সরখেল বলছিল আমায় দাও, ষাট টাকা সেলামী নাও, আমি আমার বেহালা হারমোনিয়ামের দোকান ওদিক থেকে তুলে এদিকে নিয়ে আসি, সেখানে সুবিধা হচ্ছে না: চিংড়িঘাটার তারিণী চক্রবর্তী চেয়েছিল এ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকান খুলতে, নব্বুই টাকা সেলামী সাধল; মঠপুকুরের মোহন চাইছে এটাকে তার দাঁত তোলাই বাঁধাই-এর চেম্বার করতে; পাগলডাঙ্গার সেই চাঁদসীর ডাক্তার কি যেন নাম, ওপরের একখানা ঘরের জন্যে তিনবার এসে ঘুরে গেছে দুমাসের এ্যাডভান্স ভাড়া নিয়ে!'

পাঁচু থামতে বিধু মাস্টার বলল, 'আরো বল, থামলে কেন, সেই যে চীনা-বাজারের সোনার দাঁত পরা বুড়ো চীনাটা কত টাকা যেন সেলামী সেধেছিল? সলভেন্ট পার্টি, কিন্তু পাঁচু ভায়া তাকেও বিদায় করে দিলে এক কথা বলে।'

কি কথা, যেন জানতে উৎসুকভাবে শিবনাথ পাঁচুর দিকে তাকায়। পাঁচু কিছু বলে না। নতুন সিগারেট ধরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে কি ভাবে। পাঁচুর হয়ে বিধু বলল, 'এক কথা ভায়ার আমার ঃ সেলামীর টাকা বিষ্ঠা, ও আমি হাত দিয়ে ছুঁই না। আমার কি রোজগারে ভাঁটা পড়েছে যে, ইয়ে নিয়ে হাত কালো করব। দেখুন দেখুন, শিবনাথবাবু, আজও যে পৃথিবীতে ধর্ম আছে, চন্দ্র-সূর্য ওঠে পাঁচু তার বড় প্রমাণ। না, পাঁচুর সামনেই আমি বলি, মদ খাক আর ইয়ে বাড়ি যাক, পাঁচুর অন্তরটা মহৎ, সে কত খাঁটি আমি তার পরিচয় পেয়েছি। চোখের সামনে তো দেখলাম, সাধারণ একটা ঘরভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে—'

যেন প্রসংসার উচ্ছ্বাসে মাস্টারের চোখে জল এসে গেল। দরজা থেকে স'রে এসে পাঁচু শিবনাথের সামনে দাঁড়ায়। শিবনাথ উঠি উঠি ক'রে উঠতে পারছে না।

'যাকগে, আসল কথা বলি আপনাকে শিবনাথবাবু, পাঁচু যদি একান্তই এখন কাউকে ঘর না দেয়, আমি বলছিলাম কি, উঠতি অঞ্চল, লোকজনের বিলাস-ব্যসনও বেড়েছে খুব, শহরে অবশ্য এর অভাব নেই, ক্যানেল সাউথ রোডে আজ যদি একটা ম্যাসেজ-ক্লিনিক খোলা যায় ভাল চলে। এ-সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?'

শিবনাথ ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে বুড়ো মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল। বিধু মাস্টার হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'কাল রাত্রে আইডিয়াটা আমার মাথায় এল। চামেলীকে পড়িয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে, বুঝলেন শিবনাথবাবু, খালপার ধ'রে হাঁটছি আর প্রবলেম্স অব প্রেজেন্ট ডেজ্—এই ধরুন খাওয়া-পরার কষ্ট, জিনিসপত্রের

মহার্ঘতা, দেশের বেকার সমস্যা, কুটির-শিল্প ইত্যাদি হাজারটা ভাবনা আমার মাথায় কুট কুট করছিল, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হ'ল আমাদের এ-অঞ্চলে ডাইং ক্লিনিং চুল কাটার সেলুন আছে, সিনেমা-হাউস, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদিও দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু অবশ্য আমি পাঁচুকে বলছি না যে, আমার সাজেশানটা চূড়ান্ত, এসম্পর্কে তুমি আরো দু' একজন ভাল লোকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দ্যাখো, আমার তো মনে হয় ওপরের কামরাটায় একটা ম্যাসেজ-ক্লিনিক স্টার্ট দিলে ভাল চলে, আপনার কি মত ?'

শিবনাথ কথা বলার আগে পাঁচু হাসল।

'মাস্টার তো ব'লে খালাস, কিন্তু ম্যাও ধরে কে। ক্লিনিক খোলার হাঙ্গামা অনেক দাদা।'

'কেন, হাঙ্গামাটা কি ?' বিধু মাস্টার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিছু হাঙ্গামা নেই, এ তোমার রেস্টুরেন্ট কি হোটেল না যে, চিনি বা চালের জন্যে পারমিট যোগাড় করতে হাঁটাহাঁটি ক'রে পায়ের ছাল তুলতে হবে,—ভাল ক'রে একখানা সাইনবোর্ড করাতে হবে আর যৎসামান্য ফার্নিচার। খুব যে একটা মোটারকমের ক্যাপিটেলের দরকার আমার তো তা মনে হয় না, কি বলেন স্যার ?'

শিবনাথ একটুখানি 'হুঁ' শব্দ ক'রে শুধু মাথা নাড়ল। যেন কি ভেবে ঈষৎ হেসে ঠাট্টার সুরে পাঁচু বলল, কিন্তু তাতে মাস্টারের যে খুব একটা সুবিধা হবে আমার তো মনে হয় না, আপনি বলুন শিবনাথবাবু, দোকান টোকান হ'লে কানু না হয় দাঁড়িপাল্লা ধ'রে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারত ; আমাকে মেয়েমানুষ রাখতে হবে বাবুদের গায়ে তেল মাখাতে, নরম হাতের ব্যবস্থা না রাখলে এই শহরতলীতেও আমি ম্যাসেজ-ক্লিনিক চালাতে পারব না। লস্ খাব।'

কথা শেষ ক'রে পাঁচু টেনে টেনে হাসতে লাগল। শিবনাথের কপালের দু' দিকের রগ টিপটিপ করছিল। কিন্তু তা হলেও এমন একটা সুযোগ উপস্থিত হচ্ছিল না যে, এই প্রসঙ্গের ইতি জানিয়ে 'আচ্ছা উঠি আমি, কাজ আছে—' বলে উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুনের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় নামবে।

অসহায় চোখে তাকিয়ে থেকে শিবনাথ বিধু মাস্টারের উত্তর শুনল।

'পাঁচু, তুমি কারবারে হাত দিয়েছ আর আমার ছেলেকে প্রভাইড করার দরুন তা অমনি ফেল্ পড়ল, অন্তত আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি হ'তে দেব না। জান তো আমার পেশা গুরুগিরি। মাস্টারি। শিল্পে, সংস্কৃতিতে জাতি যাতে উন্নতির পথে চলে, মানুষকে সেই শিক্ষা ও প্রস্তাব দেওয়াই আমার কাজ। আমি কানু সম্পর্কে অন্যরকম চিন্তা ক'রে রেখেছি। রাত্রে ভেবে সব প্ল্যান ঠিক করেছি। কানুকে মালিশের কাজে রাখা হবে না। ও থাকবে বাইরে। বাবুদের ডেকে আনবে। এই খোট্টা পাড়ায় এখনো যেখানে অসভ্য অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি, ডোম আর ধোপাদের প্রাধান্য, আজ হঠাৎ সেখানে যে তুমি চমৎকার একটি ম্যাসেজ-ক্লিনিক, যার আর এক নাম হেলথ-ক্লিনিক, খুলে বসেছ তা একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ভদ্রলোকদের না জানিয়ে দিলে তাঁরা টের পাবেন কেন, আসছেনই বা কি ক'রে, কি বলেন শিবনাথ বাবু, আপনি রেগুলারলি কাগজ পড়েন। হেলথ-ক্লিনিকের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

কথা শেষ ক'রে মাস্টার টেনে টেনে হাসতে লাগল।

পাঁচু কথা না ব'লে দরজায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানল।

বিধু মাস্টার ঘাড়টা সেদিকে ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, না হয় সেভাবে কানুকে প্রভাইড করা হোক, বাঁধা মাইনে দিতে তোমার আপত্তি, না হয় কমিশন বেসিসে কাজ করুক, কি বলেন মশাই, আপনি চুপ ক'রে আছেন কেন, পাঁচুকে পরামর্শ দিন।

শিবনাথের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। এখানে অবশ্য ছেলের গাড়ি-চাপা পড়া, কি মেয়ের ভাবি বরের হাতে ছোরা খাওয়ার আশঙ্কার মামলা না। ছেলের চাকরির প্রশ্ন।

'কি মশাই বলুন!' বিধু অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল।

শিবনাথ বলল, 'মন্দ কি।'

উত্তেজিত হয়ে বিধু মাস্টার বলল, 'না, একেবারে সবগুলো ম্যাসেজ-ক্লিনিক খারাপ ব'লে যে কাগজে আজকাল লেখালেখি হ'চ্ছে তা আমি বিশ্বাস করছি না, এখানে আদার পার্টির এই ইণ্ডাস্ট্রিটা নষ্ট করার অথবা এই ইণ্ডাস্ট্রির মিথ্যা বদনাম তুলে প্রেজেন্ট গভর্নমেণ্টকে ঘায়েল করার চেষ্টা আছে। সব আইনই আইন না, সব আনন্দই খারাপ না। স্ট্যাণ্ডার্ড হেল্‌থ ক্লিনিক ব'লে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ডে, এমন কি এত যে প্রগতিশীল দেশ রাশিয়া সেখানেও প্রচুর আছে। এবং আর পাঁচজন পারছে না ব'লে পাঁচুও যে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক রেখে এই অঞ্চলে একটা হেল্‌থ ক্লিনিক চালাতে পারবে না, আমি তা বিশ্বাস করি না। ওর সেলুনখানা দেখুন কত সুন্দর। কত ভদ্র। একটা ভদ্রলোকের ড্রইংরুম ব'লে মনে হয়।'

পাঁচু কথা বলছে না।

শিবনাথ এবার সুযোগ পেল: হ্যাঁ, ওটা আপনাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা ব'লে ঠিক ক'রে নিন, এ-সম্পর্কে আর কি বলব, তা'ছাড়া---'

'হেল্‌থ ক্লিনিক সম্পর্কে আপনার আইডিয়া কম, এই তো বলতে চান।' দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে মাস্টার বলল, 'আমার একেবারেই নেই। তবে পাঁচু—আমিও কথার কথা বলছি, একটা বুদ্ধি দিচ্ছি শুধু। যদি এরকম একটা কিছু খোলা যায় তো মন্দ হয় না। এবং খুললে কানুকেও কাজে লাগানো যায়, হ্যাঁ ফর দি ডেভলাপমেণ্ট অব্ দি ইণ্ডাস্ট্রি। বাবুদের ডেকে আনা মানে ম্যাসেজ-ক্লিনিকের একটা পাবলিসিটি দেওয়া। না মশাই, আমার অত প্রেজুডিস নেই। আমার ছেলে যদি ম্যাসেজ ক্লিনিকের, কি হোটেলের কি রেস্টুরেণ্টের কি অন্য কোনরকম এস্টাবলিসমেণ্টের বয়গিরি ক'রে দু'টো পয়সা ঘরে আনতে পারে, আমি তা'তে তাকে নিরুৎসাহ করব না। কে. গুপ্ত যে তার মেয়েটাকে রেস্টুরেণ্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে এইজন্য পাগল ছাগল হ'লেও কে-গুপ্তর স্পিরিটটাকে আমি প্রশংসা করি। তবু তো রমেশ ক্ষিতীশের অনুকম্পা বা দয়ায় যা-ই বলুন, পরিবারটা, এখনো দাঁড়িয়ে আছে। যা দিনকাল পড়েছে। মা জগদম্বা!'

বলতে বলতে মাস্টার দুই হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। পাঁচু ভাবছে আর সিগারেট টানছে আর তার কপালের রগ দু'টো এক একবার

ফুলে ফুলে উঠছে লক্ষ্য ক'রে 'আচ্ছা চলি' বলে শিবনাথ সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

শিবনাথ দ্রুত হাঁটছিল। বিধু মাস্টার পিছন থেকে এসে সজোরে তার হাত চেপে ধরল। একটু অভদ্রের মতই শিবনাথ হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রে বলল, 'আবার কি, আমার কাজ আছে দেখতে পাচ্ছেন।'

'শুনুন শুনুন। পাঁচুর সামনে তো আর বলতে পারিনি। আসল কথা হল কি—'

মাস্টারের মুখের পচা ভ্যাপসা গন্ধটা শিবনাথের নাকে লাগতে তাড়াতাড়ি সে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে নাকের ওপর চেপে ধ'রে বলল, 'আমি তো বলেছি, এসব আপনাদের ব্যাপার, আমাকে আর এর মধ্যে ডেকে নিয়ে—'

'আচ্ছা, আপনি রাগ করছেন।' মাস্টার নাছোড়বান্দা। 'শুনুন স্যার, আসল কথা হ'ল কি, পাঁচু ঘর দু'টো অমনি ফেলে রাখবে, দেখবেন, বাড়তি কিছু টাকাপয়সা খাটিয়ে যে একটা কারবার টারবার খুলবে তাকে দিয়ে তা আশা করা যায় না। বলবেন কেন? আপনি নিশ্চয় খোঁজ রাখেন, সন্ধ্যে হতে ব্যাটা গিয়ে শুঁড়িখানায় ঢোকে, সেখান থেকে বেরিয়ে বাজারে মেয়ে-মানুষের ঘরে যায়,—অর্থাৎ মেজর পোর্শন অব হিজ ইনকাম এভাবেই সে নষ্ট ক'রে ফেলছে। এদিকে কিছু করব করব ক'রে কাউকে ভাড়া দিচ্ছে না ঘর দু'টো। এখন আমার কথা হচ্ছে কি, ওই যে বললাম ম্যাসেজ-ক্লিনিক—'

নোংরা দাঁতগুলো বার ক'রে বিধু মাস্টার হাসতে লাগল। যেন নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে শিবনাথ সেই হাসি দেখল।

মাস্টার বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমি তাকে এ ধরনের একটা সাজেশান দিলাম? হা—হা। এখানে অপজিট সেক্স নিয়ে কারবার। বলতেই পাঁচু নিমরাজী হয়েছে। না হয়ে উপায় কি। কথায় বলে যেমন দেবতা তেমন তার নৈবেদ্য সাজাতে হয়, তবেই দেবতা সন্তুষ্ট থাকে—হা হা। এখন নিশ্চয়ই আপনি পাঁচু ভায়াকে এ ধরনের একটা প্রস্তাব দেয়ার তাৎপর্য রিয়েলাইজ করতে পারছেন।' একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাস্টার ফিসফিস করে বলল, 'ক্লিনিক খুলে ও তার ভেতর যা খুশি তা করুক, আমার কি, আমার ছেলেকে তো আর রাখা হচ্ছে না। বাইরে থেকে ও কাজ করবে। মানে যে দিনকাল পড়েছে। এনি হাউ পাঁচু একটা কিছু আরম্ভ করলে কানুটার যদি একটা প্রভিশন হয়ে যায়, তাই এত কথা—'

'ভাল।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে শিবনাথ হাঁটবার উপক্রম করল। কিন্তু মাস্টার সঙ্গ ছাড়ল না। হাঁটা অবস্থায় বলল, 'আগেও বলেছি আপনাকে, মান সম্মান বোধটা আমার একটু কম। আমার কেন, আমার মত অবস্থায় পড়লে সকলেরই কমে যাওয়া উচিত এদিনে, কি বলেন?'

কিছু বলল না শিবনাথ এবং মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক রেখেই সে বিধু মাস্টারের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। কিছুমাত্র হতোদ্যম না হয়ে মাস্টার জঙ্গলে ভর্তি মুখটা ওদিকে ফিরিয়ে রেখে বলে চলল, 'তার ওপর মশাই বুঝতে পারছেন, আমার

ওয়াইফ, অর্থাৎ লক্ষ্মী এবার বিট্রে করবে বলে মনে হচ্ছে। ওই যে বলে বাঘ এলো, বাঘ এলো, এবং বাঘ এলো যেদিন সেদিন আর কেউ গেল না। ঠিক সেই অবস্থায় পড়বে সাধনার মা, দেখবেন আপনারা স্বচক্ষে। অম্বলের বেদনা উঠতেই ব্যথা উঠেছে চিৎকার করতে করতেই একদিন ঠিক ডেলিভারী পেনটি ডেকে আনবে। অর্থাৎ যেদিন আমার হাতে একটি আধলাও থাকবে না। এবং এ-বাড়িতে এমন একটি লোক নেই জানেন যে পাঁচ আনা পয়সা কর্জ চেয়ে পেয়ে পরে তা দিয়ে আমি এম্বুলেন্স ডাকতে টেলিফোন করব। কি বলেন?'

একত্রিশ

একটা বাক্স বোঝাই মোষের গাড়িকে আড়াল ক'রে শিবনাথ তাড়াতাড়ি বাঁদিকের গলিতে ঢুকে পড়ল। লক্ষ্মীমণির ব্যথা-বেদনার কথা বলছিল যখন, তখন প্যাকিং-বাক্স বোঝাই গাড়িটা বিপরীত দিক থেকে এসে মাস্টারকে আড়াল করে দিয়ে শিবনাথকে রক্ষা করল। 'আচ্ছা চলি'-টা আর শিবনাথকে বলতে হ'ল না।

জন্তু জানোয়ার! মাস্টারের চেহারা, চুল দাড়ি পোশাকের সঙ্গে ম্যাসেজ ক্লিনিকের প্রস্তাবটার সামঞ্জস্য কোথায় যেন মনে মনে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে সে রমেশের রেস্টুরেণ্টে এসে ঢুকল।

'আসুন স্যার, আসুন। সারাদিন ছিলেন কোথায়?' গুমোট থাকাতে রমেশের মাথায় টুপি কি হাতে দস্তানা নেই।

'এই নানা কাজে ঘোরাঘুরি।' শিবনাথ সরাসরি চায়ের কথা বলতে গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

'বসুন স্যার, জলটা ফুটছে।'

শিবনাথের চায়ের নেশা পেয়েছে লক্ষ্য করে রমেশ খুশি হয়ে বলল, 'আমিও একটু খাব।' বলে ঠিক এক মিনিট অপেক্ষা করার পর উঠে পর্দার ওপারে চলে গেল। শিবনাথ একমিনিট সময় চেয়ারে একলা বসে পিছনে ফেলে আসা শেখর ও বিধু-মাস্টারের কথা চিন্তা করল না, কেননা সেখানেই সে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে এসেছে, নিজের একটু বিশেষ দরকারী কাজে সে এত রাত্রে রেস্টুরেণ্টে ঢুকেছে। তা ছাড়া চা। 'দোকান আরো খোলা রাখবেন নাকি?'

রমেশ নিজের হাতে দু'বাটি চা ক'রে নিয়ে আসতে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'ওরা কোথায়? আপনার ভাই, বৌবি, কাউকে দেখছি না।'

'আপনি কি মনে করেন যে, কর্মচারীরা না থাকলে মালিক ম্যানেজাররা চুপ করে বসে খদ্দের এসে চা না খেয়ে ফিরে যাচ্ছে চোখের ওপর দেখতে পারে? তা, তাহলে গণেশ ওল্টাতেও বেশিদিন বাকী থাকে না।'

'না না, তা না!' শিবনাথ একটু লজ্জিত হ'ল। হাত বাড়িয়ে রমেশের হাত থেকে চা-টা তুলে নিল।

'তারপর আপনি দেখা করেছিলেন?'

শিবনাথ চায়ে চুমুক দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

উত্তম চা। আপনি দেখছি মশাই সকল রকমে গুণী।'

'হতে হয় স্যার, দিনকাল যেমন খারাপ পড়েছে ভাল চা করাটা শেখা থাকলে বেগতিক দেখলে কোনো রেস্টুরেণ্টে চাকরি নিয়ে পেট চালাতে পারব।' কথা শেষ করে দুবার টেনে টেনে হেসে রমেশ পরে গম্ভীর হয়ে গেল।

শিবনাথও গম্ভীর হয়ে রইল।

'তারপর, আপনার কদ্দুর, কিছু সুবিধা হবে বলে সেখানে মনে করেন?'

শিবনাথ ইতস্তত করল প্রথমটায়, তারপর দীপ্তিরাণীর সঙ্গে আলাপের আদ্যোপান্ত গল্পটা রমেশের কাছে বলে ফেলল।

'তবে আর কি।' রমেশ চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলে, 'যখন অন্তরের কথাগুলো আপনাকে বলে ফেলেছেন তখন জানবেন যে, আপনাকেই পছন্দ ঠিক হয়েছে। দেখবেন ও-বাড়ির পার্মানেণ্ট প্রাইভেট ট্যুইশানি আপনি ক'রে যাচ্ছেন, বছরের পর বছর। টাকা-পয়সা কোনদিক থেকে কোনদিন আটকাবে না। অর্থাৎ আপনি এখানেই আমাদের সঙ্গে একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। তা ভদ্রলোকরা থাকতে আরম্ভ করেছেন যখন জায়গাটা খুব খারাপ না। শুনতে খারাপ শোনায় আর কি। কুলিয়াটেংরা। যেন সব কুলি থাকে। আর ওরা মরা টেংরা মাছ খায়।

শিবনাথ চুপ করে রইল।

পুরু ঠোঁট দুটো টিপে হেসে রমেশ আবার প্রশ্ন করল, 'কতক্ষণ ছিলেন ওখানে?'

'আধঘণ্টা।'

'এই ফিরলেন বুঝি?'

'না, মশাই, আপনাদের এখানে এত বিচিত্র রকমের মানুষও আছে', বলে আর একটু ইতস্তত করতে করতে শিবনাথ হাসল।

'বলুন না, আমি সব জানি, এখানকার ইতিবৃত্তান্ত আপনি আমাকে কিছু নতুন শোনাবেন কি?'

রমেশ তার কোটের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করল। রুপোর। শিবনাথ আজ এই প্রথম লক্ষ্য করল ওটা।

ডাক্তারের মেয়ে-সংক্রান্ত গল্পটা শিবনাথ বলতে রমেশ দাঁতে এবং নাকে একসঙ্গে হাসল।

'মশাই, ওসব হবে আমি জানি। এক উঠোনের উপর আছি। সহ্যও করা যায় না, আবার বলতে যাওয়াও বিপদ। স্বয়ং প্রভাতকণা ওই ছোকরাটাকে পেয়ে প্রথম থেকে যেমন ঢলাঢলি করছিল, তখনই জানি এ প্রেমবন্যার পরিণতি সাংঘাতিক।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে চা-টা শেষ করে পরে চোখ দুটো বড় ক'রে রমেশ প্রশ্ন করল, 'বলেন কি? স্ট্যাব্ করবে সুনীতিকে না পেলে? সুধীর শাসিয়ে গেছে বুঝি শেখরকে?'

'শুনছি তো।'

রমেশ রায় কিছু মন্তব্য করল না।

শিবনাথ বলল, 'তা সব বস্তিতেই এরকম একটা দু'টো পরিবার থাকে।'

'আপনি জানবেন এর মূলে কারণটা অর্থনৈতিক।' বড় বড় চোখে রমেশ শিবনাথের দিকে তাকায়। 'মশাই, এখন যে সুনীতির মারও না করবার উপায়টি নেই। এখন সুধীরকে না করতে গেলে সুধীর সব ফাঁস ক'রে দেবে।'

'কি রকম ?'

'অনেক তেল খেয়েছে ডাক্তারের গিন্নী। বুঝেছেন মশাই। জামাইয়ের আদর দেখিয়ে সুধীরের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক তেল শুষে নিয়েছে চালাক মেয়ে প্রভাতকণা। আর সেই তেল দিয়ে ভেট্‌কি মাছ আর ধাপার বাজারের বড় বড় গলদা চিংড়ি ভেজেছেন।'

একটু চুপ থেকে শিবনাথ বলল, 'তবে যে শুনেছি ডাক্তারের রোজগার ভাল, তেলিপাড়ায় জেলেপাড়ায় ওর মেলাই পয়সাওয়ালা পেসেণ্ট।'

'ওই শুনতেই সোনার গাঁ, কে মশায় তলায় আর হাত দিয়ে দেখতে গেছে কা'র কত মাসিক ইনকাম। এসব গুহ্য খবর। দেখে আমাদের পরিবারের চোখ টাটাবে। তাই সুধীরের কাছ থেকে টাকা কর্জ চেয়ে নিয়ে মা মেয়ে সুধীরকে দিয়েই দ্বারিক আর ভীমনাগের সন্দেশ আর বড়বাজারের আপেল আতা আনিয়ে খেয়ে খেয়ে ধ্বংস করেছে। শুনলাম আমার স্ত্রীর কাছে সব। ভুবনবাবুর ওয়াইফ ওকে বলেছে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।' দুই চোখ বিস্ফারিত করে রমেশ নাসারন্ধ্র স্ফীত করল এবং এতটা নস্যি নিল।

নস্যি নেওয়া শেষ করে বলল, 'কাজেই টাকা আদায় না-করা পর্যন্ত সুধীর এখান থেকে নড়ছে না, আর সুনীতির গা থেকে হাত নামাচ্ছে না। এখন বাধা দিতে গেলেই রক্তারক্তি।'

'কি বিশ্রী ব্যাপার !'

শিবনাথ নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল। এবং আবহাওয়াকে একটু তরল করার চেষ্টায় সে বিধুমাস্টারের গল্পটা তুলল।

বলা শেষ করতে রমেশ খুক করে হেসে বলল, 'আমি শুনেছি। আমার কাছে ক'দিন ইতিমধ্যে ঘুর ঘুর করছিল টাকার জন্যে। ছেলেকে দিয়ে কী ব্যবসা খোলার ইচ্ছা। আমি স্রেফ না বলে দিয়েছি। কেন দেব বলুন, ব্যবসা তো করবে না, টাকা-গুলো জলে ফেলে দেবে পুত্রধন কানু।

'চরিত্র-টরিত্র ?' শিবনাথ প্রশ্ন করতে রমেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা নেড়ে বলল, 'সেদিক থেকে এখন কিছু বলব না। আসলে ওই টাকা পেয়ে লক্ষ্মীমণির ছেলে বাবাজীবন কানু কি করবে তাই বলছি শুনুন। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর পুরো সেট কিনিয়ে ফেলাবে ছেলেকে দিয়ে লক্ষ্মীমণি, হ্যাঁ, সব কবিতার বই।'

'লক্ষ্মীমণির বুঝি খুব কবিতা পড়ার শখ ?'

'হ্যাঁ, বিয়ের আগে থাকতে। বিধু সেদিন আমায় তার স্ত্রীর গল্প শোনাচ্ছিল।'

রমেশ ব্যঙ্গের সুরে হেসে উঠল। 'সেই শখ বিয়ের পর এবং এখনো পুরোমাত্রায় আছে। বলছিল, বিধু। এতগুলো গর্ভে এসেছে বলে লম্বা কবিতা মুখস্ত করার এখন সময় পান না। তাই ছোট ছোট ছড়া মুখস্ত করে রেখেছে গিন্নী। ভোরবেলা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এক কুড়ি বাচ্চা নিয়ে সেগুলোর চর্চা করে।'

'না না, এতগুলো হবে না।' শিবনাথ 'কুড়ি' কথাটায় আপত্তি জানিয়ে মৃদু হাসল।

'আহা যা-ই হোক, না হয় চৌদ্দটা। কিন্তু মাস্টারের আয়টা কি? গিন্নী যে বড় সবগুলোকে ইস্কুলে পাঠিয়ে সরস্বতী গণেশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে আর কবিতার বই কিনছে, ওদিকে যে মাস্টার হালে পানি পাচ্ছে না।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

'আর একবার কার কাছ থেকে গোটা ত্রিশ টাকা এনেছিল বিধু, সব বলল আমায়, ছোটটাকে একটা বিস্কুট পাঁউরুটি লজেঞ্জুস বাতাসা এবং সম্ভব হলে তার সঙ্গে একটা তেলেভাজার দোকান খুলে পাড়ার মধ্যে কোথাও এক জায়গায় বসিয়ে দেবে।'

'তারপর?'

রমেশ বলল, "কিন্তু ঢাকা বারান্দায় সুবিধামত জায়গা পাওয়া গেল না। কে দেবে, কার ক'খানা পাকা ঘর আছে এ পাড়ায়। কাজেই—'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিবনাথ আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'ওদিকে রাস্তার ধারে একটা গোটা কামরা ভাড়া নেবারও ক্ষমতা নেই।'

'সেই টাকাটা ঘরে রেখে মধুসূদন গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের কাব্য, আরও কি কি সব কাব্যের বই কিনে লক্ষ্মীমণি খরচ করে ফেললেন।'

'রুচিটা মন্দ ছিল না।' যেন কি আর একটু বলতে গিয়ে শিবনাথ রমেশের দিকে তাকিয়ে হাসল। রমেশ চোখ দুটো বড় করে বলল, 'হ্যাঁ, এখন সব কাব্য ঘরে রেখে তিনি যাচ্ছেন হাসপাতালে, কাজেই পয়সার ধান্দায় বিধু এখন ছেলেকে তাড়াতাড়ি একটা কিছুতে লাগাবার জন্যে পাঁচুকে ওই ধরনের একটা কিছু খুলে বসতে পরামর্শ দেবে বৈকি।'

শিবনাথ কিছু বলবার আগে রমেশ দাঁতের আগায় হিস্হিস করে উঠল:

'মাস্টার শেষ পর্যন্ত জুটেছে ভাল লোকের সঙ্গেই। পাঁচুর একটা ঠোঁট কাটা, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'বাজারের কামিনী ওর ঠোঁট কেটে দিয়েছিল।' রমেশ ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, পাঁচু ভায়া আমাদের টাকা-পয়সাটা বেশি চেনে কিনা, তাই একটা পয়সার জন্যে ও হাতের ক্ষুরখানা কারো গলায় বসাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।'

শিবনাথ ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে রমেশকে দেখছিল।

'একদিন পাঁচু আট বোতল কালিমার্কা কামিনীর ঘরে বসে খেয়ে কামিনীকে বেহুঁশ করে দিয়ে ওর গলার সাড়ে পাঁচশ' টাকার বিছা হারখানা চুরি ক'রে নিয়ে সরে পড়েছিল।'

'তারপর ?'

'সেই টাকায় পাঁচুর সেলুন। যান নি কোনোদিন ? ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখে। খুব সাজানো গোছানো দোকান।'

একটু ভেবে পরে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'তা কামিনী এখন কোথায় ? পাঁচুর ঠোঁট কাটল কখন ?'

'তখনই। দুদিনের মধ্যেই হারের শোকে কামিনী পাগল হয়ে যায়। এ-সব গরীব অঞ্চল। কত টাকাই বা উপায় করে একটা মেয়ে, তা যত সুন্দরী হোক, ঘর থেকে কারোর পাঁচশ টাকার হার চুরি গেলে তার মাথা ঠিক রাখা কঠিন, বুঝেছেন।'

'ভীষণ লোক ভাদুড়ী।' শিবনাথ বিড় বিড় করে উঠল।

'কাজেই সাহায্যের জন্যে বিধু পাঁচুকে ধরবে না তো ধরবে কাকে ?'

রমেশ আবার নস্যি টিপ নিল।

শিবনাথ কিছু বলল না।

এবার চোখ দুটো ছোট করে রমেশ প্রশ্ন করল, 'কানুকে কি কাজে লাগাবে বললে। মাসাজ ক্লিনিক তো মেয়েমানুষ দিয়ে চালাতে হয়। আপনি গিয়েছেন কি এক আধটাতে ? আমার বন্ধু রাসমণিবাজারের রমণী রায় একবার একটাতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। কাজেই এ সম্পর্কে এক-আধটু আইডিয়া রাখি।'

'আমি যাইনি', ঈষৎ হেসে শিবনাথ বলল, 'কানুকে কমিশন্ বেসিসে কাজ করানোর প্রস্তাব। খদ্দের ডেকে আনবে।'

'ভাল, আনুক।' রমেশ রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জন্তু জানোয়ারগুলোর কথা আমায় বলবেন না। মাস্টার হলে কি হবে। বিধুটার মাথায় পদার্থ বলে কিছু নেই। আর থাকবেই বা কি করে। ইস্কুলের চাকরি ছাড়াও যদি আট টাকা, ছ' টাকায় রাত বারোটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ট্যুইশানি করতে হয় তো মাথা খারাপ হবে না তো কি ?'

'তরকারির ব্যবসা করতে বলেছিল মাস্টার ছেলেকে। কথা শোনে নি।' শিবনাথ বলল, 'তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধিটাই একটু বাঁকা ; কারুকে তিনি নিষেধ করেন।'

'আর নিষেধ শুনবে না। সেদিন মাস্টার আমার কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে রাগ করে প্রতিজ্ঞা করে গেছে। অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যে-কোন মেহনতির কাজে ছেলেকে ঢুকিয়ে দেবে। লোকের নিন্দাবাদ কানে তুলবে না। আর যদি গিন্নী বাড়াবাড়ি করে তো হাসপাতালে যাত্রা করার আগে পেটে লাথি মেরে গিন্নীকে যমালয়ে পাঠাবে।'

'হ্যাঁ-ওই এক খেয়াল মাথায় চেপেছে বিধু মাস্টারের। সেদিন হঠাৎ কি একটা কারণে আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ম্যানুয়েল লেবার ম্যানুয়েল লেবার বলে খুব চেঁচাচ্ছিল।'

আলাপটা বাধা পেল।

বলাই কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। শিবনাথকে দেখা সত্ত্বেও বলাই এমন ভান

করল যেন দেখেনি। ভিতরে ঢুকে সোজা রমেশের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড়টা নামিয়ে রমেশের কানে কানে ফিসফিস ক'রে কথা বলে অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে আবার গটগট ক'রে বেরিয়ে যায়।

চামড়ার পেটে লাগিয়ে ক্ষুর দিয়ে ঘাড়টা চেঁছে পালিশ করা হয়েছে বলে এবং চমৎকার রঙের নতুন একটা হাফশার্ট গায়ে ও পকেটে নীল একখানা রুমাল থাকাতে এবং পায়ে কালো ভেলভেটের চটি দেখে শিবনাথের প্রথম চিনতে কষ্ট হচ্ছিল বলাইকে। যেন বাকি চুলে অনেকটা তেল ঢেলে স্নান করা হয়েছে। মাথায় অতিরিক্ত তেলটা চাঁছা ঘাড় চুঁইয়ে সার্টের মধ্যে ঢুকছিল। সেইজন্যে নতুন সার্টের কলারে একদিনেই দাগ ধরে গেছে।

বলাইকে ডেকে শিবনাথের বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল যেন কলারের চারদিকে রুমালটা সে এই বেলা জড়িয়ে নেয়। তবে আর তেলের হলদে দাগ ধরবে না জামায়। কিন্তু সেরকম কোন কথা বলতে দেবার সুযোগ না দিয়ে অতি পরিচিত বলাই যখন রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে গেল, তখন রমেশ বলল, 'মশাই দেখেছেন। সংসারে সকলেই অক্ষম না। সক্ষম লোকও আছে। কে. গুপ্তর কথা ছেড়ে দিন। ওটা পাগলের পর্যায়ে পড়ে। পড়ে কেন, পাগলই বলুন। মাথার ঠিক নেই। আপনার এই পোস্টের জন্যে বিধু মাস্টারকেও পাঠিয়েছিলাম। হয়নি। কেন হয়নি শুনেছেন বোধ করি?'

'হ্যাঁ'। শিবনাথ ঘাড় নেড়ে বলল, 'ভয়ানক ডার্টি'। দীপ্তি বলছিলেন।' শিবনাথ হাসল।

'কে. গুপ্তও প্রার্থী হয়েছিল।'

রমেশ বলল, 'অমলকেও গোড়ায় আর একটা সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু নিতে পারল না, জানেন বোধ হয়। কোথায় আছে হতভাগাটা এখন? শুনেছেন কিছু?'

'ঘোলপাড়ায়।'

'মরুক গে। যত ঝি ক্লাসের মেয়েছেলে আর গাঁটকাটা পকেটকাটার দল থাকে বাড়িটায়। আমি শুনেছি।' রমেশ শিবনাথের দিকে না তাকিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, 'দেখুন, এখন কাজের মানুষ কে। কথাটা বলতে চট্‌ করে ধরে ফেলেছে বলাই এবং সেটা কাজে লাগিয়ে কাল রাত্রেই একটা ভাল প্রফিট পেয়েছে?'

শিবনাথ রমেশের চোখে চোখে তাকাতে রমেশ চোখ দুটো গোল করে ফেলল, 'বুঝতে পেরেছেন?' দাঁতে হিস হিস করে রমেশ শোনায়ঃ 'চোখ-কান একটু সজাগ রেখে চললে এদিনে ঠকতে হয় না। অন্তত উপোসে মরতে হয় না। মিছা বলছি?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'বলাই কি কোন বস্ত্র ব্যবসা-ট্যাবসা?'

'তা বলতে পারেন; হ্যাঁ, ব্যবসা ছাড়া কি।'

শিবনাথের চোখে কৌতূহল।

'মশাই, চশমখোর হাড়কিপ্টে বলে আমার অনেক বদনামই আছে। আমি দুমুঠো ভাত খেয়ে আছি তাই এর-ওর চোখ টাটায়। টাটাবেই। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য করব কেন। কিন্তু এ-ও আপনাকে বলে রাখছি, দান-খয়রাত, সাহায্য, সহানুভূতি অপাত্রে

ঢেলে পরে সেটা জলে গেল বলে হায়-আপসোস করব, সে-পাত্র আমি না।'

শিবনাথ কথা বলল না।

রমেশ শূন্যে হাত ঘুরিয়ে বলল, 'ব্যবসা করতে বিধু টাকা চেয়েছিল। কি ব্যবসা করবে তুমি? তা-ও বলেছি তো আপনাকে, টাকাটা একবার ঘরে গেলে ওটা তার গিন্নী হাত করতো। আর যদি বা মাস্টার গিন্নীকে ফাঁকি দিয়ে সরাসরি সেটা খাটিয়ে কিছু আরম্ভ করে দেয়, ঐ তো বললাম, গাছতলায় তেলে-ভাজা দোকান, নয়তো, ধাপার বাজারের লাউ কুমড়ো কিনে নিয়ে আর এক বাজারে বসে তার দোকানদারী। ক পয়সা আয় তাতে, কত মুনাফা থাকে?'

শিবনাথ ঠোঁট টিপে হাসল।

'ও লোকটার দৃষ্টিভঙ্গীই এমন অথচ রাতদিন গালভরা কথা—বিজনেস, বিজনেস।'

রমেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কাজেই ব্যবসার জাত আছে, কারবারের রকম আছে। আপনাকে আমি অবশ্য সব এখন ডিসক্লোজ করব না; কিন্তু কাল বিকেলে বলাই যখন এসে বলল, দাদা মাথা ঠিক করেছি, এই এই বিষয়, কাজেই কিছু টাকা না হলে কারবারে হাত দিতে পারছিনে। শুনে মনটা এত ভাল লাগল, তখনই বুঝলাম, শক্ত ধাত। কে. গুপ্ত না, অমল না, বিধু না—মাথাটা ঠিক রেখে চলে। না হলে, চোখের ওপর তো দেখছিলেন, উপোসে কি ও আর ওর পরিবার কম থেকেছে।'

'তা তো বটেই।' শিবনাথ ঘাড় কাত করল।

যেন কি একটু চিন্তা করে রমেশ পরে বলল, 'আমার কানে সবই আসে। এখন থেকেই নাকি বলাইর নামে বাড়ির মাতব্বররা বদনাম গাইতে শুরু করেছে। আপনি শুনেছেন কিছু?'

'না।'

শিবনাথ এদের সব ব্যাপার থেকে দূরে থাকতে চায়। সেইজন্য তার সতর্কতাও কম না। আছে এদের মধ্যে, কাজেই একথা সেকথা শুনতে হয়। শুনে ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিটো' দিয়ে যাওয়া—হুঁ-হাঁ করে, তারপর সুযোগ বুঝে সরে আসে। কাজেই তখন সেলুনে পাঁচু ভাদুড়ী কি বিধু রমেশ বা বলাই সম্পর্কে কি সব কথা-বার্তা বলছিল, এখন এখানে শিবনাথ তার বিন্দু-বিসর্গও প্রকাশ করল না। কেবল আগের মত ঘাড় কাত করে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমার তেমন কথাবার্তাই বা কি হয়। তখন হঠাৎ রাস্তায় বিধুর সঙ্গে দেখা হল, আর বকর বকর করে সাত-পাঁচ কত কি বললে সব মনেও নেই।'

রমেশ কতক্ষণ আর কিছু বলল না।

শিবনাথ উঠি-উঠি করছিল, এমন সময় দোকানে ক্ষিতীশ ঢুকল। সঙ্গে বেবি।

ক্ষিতীশ একটি কথা না বলে সরাসরি পর্দার ওপারে চলে গেল। বেবি, যেন খুব ক্লান্ত, মেঝের ওপর বসে পড়ল। উষ্কখুষ্ক চুল। হাত-পাগুলো দুদিনে আরও শীর্ণ হয়ে পড়েছে শিবনাথ লক্ষ্য করল।

'কি ব্যাপার, ভাইকে দেখে এলি, এবেলা কেমন আছে?' রমেশ প্রশ্ন করল।

বেবি মুখ তুলল না। 'ভাল না।' বলল ও অস্পষ্ট গলায়।

'ভাল মন্দ যেন তুই কত বুঝিস।' রমেশ অল্প হেসে শিবনাথের দিকে ঘাড় ফেরায়। শিবনাথ কিছু প্রশ্ন করবার আগে পর্দার ওপার থেকে ক্ষিতীশ বলল, 'যেন ভাইকে কত ও দেখে এসেছে ; ভাইকে দেখতে হাসপাতালে যাবে বলে বেলা দুটো না বাজতে দোকান থেকে বেরিয়ে শেয়ালদা ছুটে গেলেন তিনি। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

ক্ষিতীশ থামতে রমেশ একবার পর্দার দিকে তাকিয়ে পরে মাটিতে মুখ গুঁজে বসা বেবির দিকে চোখ রাখল।

'কিরে, রুণুকে দেখিসনি ?'

'দেখেছি।' ভয়কাতর বিমর্ষ মুখখানা একবার একটু সময়ের জন্য কে. গুপ্তর মেয়ে তুলে ধরল। বেবির চোখের কোণা চিকচিক করছে।

'আজ আবার মারধর করেছিলি নাকি ?' পর্দার দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল রমেশ রায়। 'কি ব্যাপার ! তুই কি চা করছিস নাকি ?'

'হুঁ।' রুক্ষ অপ্রসন্ন স্বর ক্ষিতীশের। বাটির মধ্যে চামচ নাড়ার দ্রুত কঠিন শব্দ হল দু-তিনবার। তারপর ক্ষিতীশ বেরিয়ে এল।

'কি হয়েছে তুই আমায় পরিষ্কার করে বল্ না।' রমেশ সোজা হয়ে বসল।

'কি হয়েছে তুমিই জিজ্ঞেস কর না। আদর দিয়ে তুমিই তো ওর ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছ।' ক্ষিতীশ গরম চা-য়ে ফুঁক দিতে দিতে দরজার কাছে সরে গেল। চাপা একটা নিশ্বাস ফেলল রমেশ। এবার শিবনাথের নজরে পড়ল বেবির ফ্রকটা পিঠের দিকে একটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। যেন কিসের সঙ্গে খোঁচা লেগে সম্পূর্ণ নীরব ও নিরপেক্ষ থেকে সে দু'ভায়ের কথা শুনল।

দরজা থেকে সরে এসে ক্ষিতীশ বেবি ও রমেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিকৃতকণ্ঠে বলল, 'তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। হাসপাতাল খোলে বেলা চারটেয়। হেঁটে গেলেও শেয়ালদা যেতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না। আর তিনি সেই ভরদুপুরে ছুটলেন, মনে মনে ভাবি বিষয় কি—' কথা শেষ না করে ক্ষিতীশ কটমট করে আনতমুখী বেবির দিকে তাকাল।

রমেশ অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'কী হয়েছে, কি করেছে ওখানে গিয়ে, তুই কি আমায় জানাবি না ?'

বাকি চা-টা গলায় ঢেলে বাটিটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর রেখে ক্ষিতীশ বলল, 'আমি পৌনে চারটেয় এখান থেকে বেরোই। একপেটি চা ও আমার নিজের জন্যে একটা গামছা কিনতে এমনিও আজ আমাকে শেয়ালদা যেতে হত। ভাবলাম, অমনি কে. গুপ্তর ছেলেকেও একবার দেখে আসব। এক উঠোনে আছি, এক ইঁদারার জল খাই। তাছাড়া বেবি আমাদের দোকানে আছে, এদিক থেকেও ওদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে বৈকি। কী বলব দাদা তোমাকে, হাসপাতালের উল্টো দিকে হ্যাঁ, ঠিক সার্কুলার রোডের ওপর একটা বেশ বড়সড় নতুন চায়ের দোকান হয়েছে— তুমি খেয়াল করেছ কি না, জানি না, হ্যাঁ শিখের রেস্টুরেণ্ট ওটা। তখন ক'টা, এই ধরো সাড়ে পাঁচটা, চা ও গামছা কিনে আমি তাড়াতাড়ি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি,

উল্টো দিকের ফুটপাথে দেখলাম ফ্রক-পরা একটা মেয়ে। বেশ বড়, হ্যাঁ, আমাদের রুণুর চেয়ে মাথায় লম্বা, সুটফুট পরা ভারি কেতাদুরস্ত কোন ছেলের হাত ধরে গুটগুট করে যেন সেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। কত গণ্ডা মেয়েছেলে রাস্তায় চলে, হঠাৎ তো আর পিছনটা দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু দোকানের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকবার সময়, ওই যে কথায় বলে দুর্বল মন, কুকাজ করবার আগে ভয় পাচ্ছে কেউ দেখেছে কি না, গলাটা ঘুরিয়ে বেবি যখন টুক করে রাস্তার লোকজন দেখে নিচ্ছিল, তখনই আমি চিনে ফেললাম বজ্জাত মেয়েকে।'

'তারপর!' রুদ্ধশ্বাস হয়ে রমেশ ভাইয়ের কথা শুনছিল। 'তারপর?'

'তারপর তুমি বুঝতেই পারছ আমার রক্ত মাথায় উঠে গেল। হাসপাতালে আর যাব কি, লাফিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমি সেই শিখের চায়ের দোকানে ঢুকলাম।'

'গিয়ে কি দেখলি, ছেলেটার সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল? শুধু চা, না আর কিছু?' রমেশ বেবির দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরে শিবনাথের দিকে তাকায়। 'কি রকম বোঝেন মশাই।'

ক্ষিতীশ গলার অদ্ভুত শব্দ করে বলল, 'তুমিও যেমন পাঁচটা খদ্দেরকে না দেখিয়ে চা খাবে বলে কে. গুপ্তর মেমসাহেবের ইস্কুলে পড়া গুণী মেয়ে বন্ধুর হাত ধরে বেছে বেছে ওই পর্দা-খাটানো খুপরি-করা রেস্টুরেন্টেই ঢোকে। নইলে আর পীরিত জমবে কেন?'

'কতক্ষণ ছিল? ছেলেটা কোথায় থাকে, কে হয় ওর?'

'কেউ না।' ক্ষিতীশ হাতের দুটো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এক বাটি চা নিয়ে ঠায় দু ঘণ্টা বসে থেকে ওখানে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে ফেলেছি। তা কি আর বেরোয় খুপরি থেকে। পর্দার এপিঠ থেকে আমি ওধারে হারামজাদীর খিলখিল হাসির শব্দ শুনেছি। তুমি এবার জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো না কি বলে?'

'এই, ওই ছেলের সঙ্গে তোর জানাশোনা কবে থেকে? কোথায় থাকে ও?' চোখ লাল করে রমেশ প্রশ্ন করল।

'কথা বলছিস না কেন, উত্তর দে। কোথায় থাকে ছোঁড়া?'

'পার্ক স্ট্রীট।'

'তোর সঙ্গে কোথায় দেখা, আগে পরিচয় ছিল?'

বেবি মাথা নাড়ল।

'হাসপাতালে দাদাকে দেখতে এসেছিল সন্তোষ। দাদার ফ্রেন্ড। ওদের পাড়ায় আমরা ছিলাম।'

'তা তো ছিলিই, কিন্তু এতক্ষণ চায়ের দোকানের খুপরির মধ্যে বসে দুজন করছিলি কি? দাদার ফ্রেন্ড।' বিশ্রী একটা শব্দ করল রমেশ গলার।

বেবি নীরব।

'দাদার ফেরেন্ড, কাজেই ইনিরও বন্ধু। সহজ কথাটা তুমি ধরতে পারছ না কেন।' ক্ষিতীশ রমেশের দিকে না তাকিয়ে বেবিকে দেখছিল। 'এ্যাঁ, আমার চোখে ধুলো! তুই আমায় অন্ধকারে রেখে তোর পার্ক স্ট্রীটের সন্তোষকে নিয়ে চায়ের

দোকানে বসে ঢলাঢলি করবি। এত বড় বুকের পাটা! বেরিয়ে যা এখান থেকে—আমি—আমি—'

ক্রুদ্ধ ক্ষিতীশকে শান্ত করতে রমেশ একটা হাত শূন্যে বাড়িয়ে দিল। 'আহা, তুই এত বেসামাল হয়ে পড়লে চলবে কেন। দাঁড়া আমি বলছি, আমি বোঝাই—'

'তুমি বুঝিয়েছ! তোমার বোঝানোর বড় তোয়াক্কা করে সেয়ানা মেয়ে। ও যে দিনকে দিন কত বড় বজ্জাত, বদমাশ হচ্ছে চলেছে, তা তুমি টের পাবে কি করে। আমাকে তোমাকে ঘুমে রেখে ও ওর কাজগুলি ঠিক করে যাচ্ছে।'

'কথা বলছিস না কেন?' রমেশ আর বসে নেই। উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। 'কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ পার্ক স্ট্রীটের সেই ছোকরার সঙ্গে। কি নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল?'

বেবি নখ খুটছিল। মুখ তুলে আস্তে বলল, 'হাসিনি তো।'

'আলবৎ হেসেছিলি।' ক্ষিতীশ চিৎকার করে উঠল। 'আবার মিথ্যে কথা বলবি তো কিলিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব। আমার কানকে ফাঁকি। তুই ডালে ডালে চলিস, আমি চলি পাতায় পাতায়। অ্যাঁ, হাসিসনি! কানে আমি তুলো গুঁজে বসেছিলাম সেখানে।'

বেবি চুপ করে কাঁদছিল।

রমেশ আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

শিবনাথ একদিন কাপিক্ষেতে বেড়াতে গিয়ে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে বলাইর মেয়ে মালা ও রুণুকে পার্ক স্ট্রীটের টাই স্যুট-পরা সন্তোষকে নিয়ে কথা বলতে শুনেছিল, আজ তার মনে পড়ল। এবং সন্তোষ মাঝে মাঝে রুণুর সঙ্গে দেখা করতে এ-বাড়িতে এসেছে। আজ রুণুকে হাসপাতালে দেখতে আসা অস্বাভাবিক না এবং বেবিকে নিয়ে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে চা খাওয়াও অসম্ভব না। কিন্তু সেখানে দু ঘণ্টা বসে দুজনে গল্পসল্প না হাসাহাসি সত্য কি মিথ্যা বুঝতে না পেরে শিবনাথ শুধু হাঁ করে তাকিয়ে বেবির কান্না, ক্ষিতীশের আস্ফালন এবং রমেশের কখনো গর্জন করে ওঠা, কখনো শান্ত হয়ে থাকার ছবি দেখতে লাগল।

'বোঝাও. তুমি বুঝিয়ে দেখ কে. গুপ্তর মেয়েকে যদি লাইনে আনতে পার। আমার দোকানও না, কর্মচারীও না। ঠেকতে তুমিই ঠেকবে, আমার কি।' বলে ক্ষিতীশ পেরেকে ঝোলানো একটা র‍্যাপার টেনে নিয়ে সেটা গায়ে জড়াতে জড়াতে আরো কি নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে দোকান থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

'বুঝলেন, মশাই, আমার হয়েছে সব দিকে বিপদ।'

রমেশের কথায় শিবনাথ চোখ তুলল শুধু, কথা বলল না। রমেশ অনেকটা নিজের মনে ভাবতে লাগল। 'ঘরে হাঁড়ি চড়ে না দিনের পর দিন উপোস থাকা হয়, ভাল মনে আমি জায়গা দিলুম এখানে, তা এরকম করলে, চলাফেরা সংশোধন না করলে বাধ্য হয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

বেবি চোখ মুছছিল।

'তা তুই মনে মনে কি ঠিক করেছিস?'

'এখন আমি বাড়ি যাব। মা চিন্তা করছে।'

রমেশ সজোরে মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, তা তো যাবিই। আমিও এইবেলা দোকান বন্ধ করব। তা এখন নিয়ে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে প্রত্যেক দিন নিয়ে। ভাইকে দেখতে গেলি হাসপাতালে। গিয়ে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারা হ'ল একটা বাঁদরের সঙ্গে। এসব একেবারে বন্ধ করতে হবে যদি আমার কাছে থাকতে চাও। আর তাছাড়া,—একটা ঢোক গিলে আপাদমস্তক বেবিকে দু'তিনবার লক্ষ্য করে রমেশ শিবনাথের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'তুমি যে এখনো কচি খুকিটি আছ সেকথা ভুলে যাও। রীতিমত বড় মেয়ে হয়ে গেছ, কি বলেন ?'

শিবনাথ নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে রমেশকে সমর্থন করল। বেবি গায়ের ফ্রকটা হাঁটুর নিচে টেনে দিয়ে তেমনি মুখ গুঁজে বসে।

'যাও আজ ঘরে যাও। যে কথাগুলো বললাম মনে রেখো। ক্ষিতীশ আজ আবার ভয়ানক চটেছে তোমার ওপর। কেন ও মাঝে মাঝে এমন চটে নিশ্চয়ই বুঝতে পার। তুমি ছোট না।'

রমেশ থামতে বেবি আস্তে আস্তে উঠে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

রাস্তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রমেশ কি যেন ভাবে।

শিবনাথ ভাবছিল। হঠাৎ আপনা থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'কে. গুপ্তর ছেলে কি শীগ্‌গির সেরে উঠবে ?'

প্রশ্নটা রমেশের কানে যেতে সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দার্শনিকের মত একটুখানি হাসল। 'জানি না, ও ছেড়ে দিন মশাই, যাদের ছেলে তারা কত খোঁজ রাখছে দেখছেন তো, আর খোঁজ রেখে হবেই বা কি ?' রমেশ আর হাসল না। চোখ দুটো গোল করে গলার স্বর ফিসফিস করে তুলল। 'আপনিতো ভিতরের খবর জানেন না। বাড়িওয়ালার জুলুম চলবে না, বাড়িওয়ালার গাড়ি রুখতে যাওয়া এসব হ'ল বানানো কথা, সাজানো গল্প। আসলে ব্যাপার আরও গুরুতর।'

'কি রকম ?' শিবনাথ দম বন্ধ করে রমেশের কথা শুনছিল।

'হারামজাদা, হ্যাঁ, কে. গুপ্তর ওই অতটুকুন ছেলে আরো কতগুলো গুণ্ডার সঙ্গে মিশে গাড়িটা আটকাতে গেছল অন্যরকম উদ্দেশ্য নিয়ে, পারিজাত গাড়িতে ছিল না। ছিল তার দারোয়ান আর তার এখানকার কারবারের আমদানী নগদ হাজার ত্রিশেক টাকা। জায়গা ভাল না, তাই টাকাটা এখানে না রেখে পারিজাত রামসিংকে দিয়ে বালিগঞ্জে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, কাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে বলে।'

'রামসিং বলল একথা ?' চোখ গোল করল শিবনাথ : 'পলিটিক্যাল রবারি ?'

'পলিটিক্যাল কি না জানি না মশাই।' রমেশ বিশেষ প্রসন্ন হ'ল না শিবনাথের কথা শুনে। বরং চেহারাটা আরো বিকৃত করে বলল, চারদিকে বেকার-সমস্যা, ভাতের সমস্যা, রুজি আছে তো তার সঙ্গে টেক্‌কো দিয়ে চলতে পারছে না মানুষ। জিনিসপত্র দিনকে দিন আক্রা হচ্ছে। অভাব মশাই, সর্বত্র অভাব। আর তার ফলে চোরের সংখ্যা বাড়ছে, গাঁটকাটার দল বাড়ছে, ডাকাতি, রাহাজানি রাতদিন লেগেই আছে।'

যেন দম দিতে একটু থেমে পরে রমেশ বলল, 'এই বেলেঘাটা চিংড়িঘাটা টেংরা নারকেলডাঙ্গায় মিলিয়ে না হলেও কমসে কম পঞ্চাশটা গ্যাঙ আছে, তার খবর রাখেন কিছু?' রমেশ টেবিলের ওপর আঙুলের বাড়ি দিয়ে বলল, 'পলিটিক্যাল বলছেন, সেসব মশাই আগে ছিল, যবে ব্রিটিশ ছিল, এখন স্রেফ খাদ্য-সমস্যা মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে দেখুন না, আরো দুদিন সবুর করুন না।'

কথাটা বলে ভুল করেছে বুঝতে পেরে শিবনাথ লজ্জায় ঈষৎ হাসল। 'হ্যাঁ, সেসব এখন এক রকম নেই। অবাক লাগছে এই বয়সে রুণুটা কেমন ক'রে এসব দলে গিয়ে মিশল।'

রমেশ হঠাৎ কথা বলল না। রাস্তার দিকে চোখ রেখে গভীরভাবে আবার যেন কি চিন্তা করল। তারপর এক সময় ঘাড় ফিরিয়ে সতর্ক চাপা গলায় বলল, 'কি ক'রে মিশল, কখন মিশল সেসব তো পরের কথা, রাম সিং ইচ্ছা করে চাপা দিয়েছে, না বেমক্কা ছুটতে গিয়ে ছোঁড়া গাড়িচাপা পড়ল, সেসব আলোচনা পর্যন্ত এখন বন্ধ রাখুন। আমি আজ সকালে কে. গুপ্তকেও এখানে ডেকে এনে বুঝিয়েছি। কেন আপনি বুঝতে পারছেন? এসব নিয়ে এখন বেশি নাড়াচাড়া করতে গেলে বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াবে। যতটা সম্ভব চুপচাপ থাকা ভাল, হ্যাঁ, আমাদের সকলের। আমরা সবাই এক বাড়িতে আছি, এটা তো আর অস্বীকার করা যায় না। একটা ডাকাতি মামলায় ছোঁড়া জড়িয়ে পড়লে আমাদের পাঁচজনাকে পুলিস টানা-হেঁচড়া করবে।'

'তা তো বটেই, তা খুবই সত্য।' শিবনাথ ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে দু'বার মাথা নাড়ল।

'পলিটিক্যাল আন্দোলন, এই ধরুন যেমন ভাড়া-বন্ধ-কর, বাড়িওয়ালার জুলুম চলবে না, ট্যাক্স-দান রহিত কর—এসব কেস্ বরং পুলিশ আজকাল একটু নরম চোখেই দেখছে, কেন-না কেবল এই ধুয়া খেয়ে সরকারের গায়ের চুল চাঁদো খুব কমই ছিঁড়তে পারছে। কিন্তু ডাকাতি-ফাকাতি উঁহু—দেখলেন তো পর পর কলকাতা শহরের ওপর ভরদুপুরে ক'টা লুঠ হয়ে গেল। পুলিস হদিসই পেলে না কিছু। কাজেই এখন আমাদের পাড়ায় এরকম একটার চেষ্টা হয়েছে এবং এক আসামী পালাবে দূরে থাক, জখম হয়ে হাসপাতালে আছে জানতে পারলে পুলিস সব ব্যাপারটা কেমন কড়া হাতে চেপে ধরবে খেয়াল রাখেন?'

'তা তো বটেই।' শিবনাথ আবার মাথা নাড়াল। 'পারিজাত কি পাল্টা কেস্-ফেস্—'

কথা শেষ হবার আগে রমেশ মাথা নাড়ল। 'পারিজাত সেই ছেলেই না মশাই, পাক্কা জেন্টেলম্যান, ওর তো আর ঘরে খাওয়ার অভাব নেই যে একটা কথা শুনে অমনি হুট করে মেজাজ খারাপ করবে। তা ছাড়া, আপনারা তার প্রজা, রুণু এ-বাড়ির ছেলে ভাল ভাবে জানে সে। যা হবার হয়েছে। হ্যাঁ, তবে যদি গুপ্ত এই নিয়ে থানা-পুলিস করতে যায় তো বিপদ আছে। পারিজাত কিছুতেই ছাড়বে না। কাজেই ও যখন চুপ করে গেছে, আমাদেরও এই নিয়ে আর—'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

রমেশ লম্বা একটা নিশ্বাস ছাড়ল। 'যাকগে অনেক বাজে কথা হ'ল। কি যেন তখন বলছিলাম হ্যাঁ, বলাই ব্ল্যাকমার্কেটের ব্যবসায় নেমেছে, পাঁচু শালা নিন্দাবাদ শুরু করেছে। আরে চুরি কে না করে, তোরা করিস, আমি, আপনি করেন, সুবিধা পেলে। আমি মিথ্যা বললাম? জিজ্ঞেস করবেন, কি রকম? ধরুন, আজ রাস্তায় বেরোলেন। পকেটে পয়সা শর্ট আছে। ট্রাম কি বাস-এ চলতে গিয়ে দেখলেন কণ্ডাক্টার ভুলে পয়সাটা আর চাইলে না। নামবার সময় মনে পড়ল, টিকিট কাটা হয়নি, তখন কি আর ডেকে কণ্ডাক্টারকে পয়সাটা দিয়ে দেবেন আপনি, আমি তো দিই না, কেউ দেয় না। সুবিধে পেলে, বুঝেছেন, পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরে হোক, কি বেগুন ফিরি করে খাক, সবাই গাঁটের পয়সাটা ধরে রাখতে চায়। একটা নকল দু'আনি হাতে এসে গেলে আপনি সেটা জলে ফেলে দেন কখনো? আমি তো দিই না। কেউ দেয় না। বরং ফাঁকে-ফিকিরে দু'পাঁচ জায়গায় চেষ্টা করে ওটা চালিয়ে দেবার দিকেই আমাদের নজর থাকে; এগুলো কি চুরি না, আইনকে ফাঁকি দেওয়া না? বলুন, চুপ করে আছেন কেন?' কথার শেষে রমেশ মৃদুমন্দ হাসল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শিবনাথের দিকে তাকাল।

যুক্তিগুলো সরাসরি অস্বীকার করতে পারল না শিবনাথ। সামান্য হেসে সেও মাথা নাড়ল।

রমেশ বলল, 'রায় সাহেবের বাড়ির ছেলেপুলেকে পড়াতে গিয়ে সেখান থেকে গলাধাক্কা খেয়ে বিদায় হয়ে এসে বিধু এখন লোকের নামে নিন্দা গাইবে, পাঁচুর সেলুনে বসে ওকে, নিজের ছেলে খেটে পয়সা আনবে বলে তাড়াতাড়ি একটা তেল-মালিশের দোকান খুলতে পরামর্শ দেবে, এ তো জানা কথা। উল্লুকটাকে দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে মশাই।'

বলাই ও রমেশ সম্পর্কে নিন্দাবাদটা ইদানীং একটু বেশি আরম্ভ করেছে বলে বিধু মাস্টারের ওপর রমেশ ভীষণ চটে আছে, শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু প্রসঙ্গটা এখানে শেষ হলে ভাল হয় এবং শিবনাথও উঠতে পারে চিন্তা করে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে যখন উসখুস করছিল, রমেশ হঠাৎ মুখটা সরিয়ে এনে মোলায়েম গলায় বলল, 'ভাল কথা, দীপ্তি কি আপনাকে চা টা দিয়েছিল?'

শব্দ না করে শিবনাথ হাসল। নিজের পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, হাত-পা নখ, নতুন রং-করা জুতোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ও হাত দিয়ে দাড়ি-কামানো পালিশ গালটা অনুভব করে শিবনাথ বলল, 'না, বলেছি আপনাকে আজ পারিজাতের মহিষীর মেজাজ খুব ভাল ছিল না: গিয়ে বসতেই সে-সব কথা শুরু করে কাঁদাকাটা করলেন।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, শুনলাম তো বললেন তখন। তবে এটা সাময়িক। টেম্পোরারি অশান্তি বড়লোকের ঘরেও থাকে বৈকি। যাকগে, চিন্তা করবেন না, আপনার সেখানে হয়ে যাবে। হয়ে গেছে ধরে নিন। কেন বললাম, বুঝতে পারছেন, নিশ্চয়।' একটা চোখ বুজে রমেশ হাসতে শিবনাথ ঠোঁটবাঁকা করে হাসল। 'আচ্ছা, চলি

'আসুন।'

রাস্তায় বেরিয়ে শিবনাথ রমেশের অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে দু'টো কথাই চিন্তা করল বেশি। নোংরা বিধুকে পারিজাত-গিন্নী অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করেছেন, আর শিবনাথ সেখানে পা দিতে না দিতে তার কাছে অন্তরের সব কথা খুলে বলেছেন। শিবনাথকে চা খেতে দেওয়া হয়েছিল কি—রমেশের এই প্রশ্নটাও বার বার তার ছোটখাটো কথা সাধারণ এক একটা ঘটনা কত বেশি সাহায্য করে, অন্ধকারে রাস্তায় চলতে চলতে শিবনাথ ভাবল। ভাবনায় ছেদ পড়ল তার বাদামগাছের তলায় এসে। এখানেই কে. গুপ্তর ছেলে কাল গাড়ি চাপা পড়ে। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। অল্প হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো খসখস করছিল। যতটা সম্ভব দ্রুত বাস্ত পায়ে শিবনাথ গাছটা পার হয়ে গেল। আজ গ্যাসের বাতিটা কেন জ্বালানো হয়নি, নাকি জ্বালানো হয়েছিল নিভে গেছে, চিন্তা করল সে।

বত্রিশ

'অ-মশাই, একবারে রাজ্য জয় করে ফিরছেন বলে মনে হয়। শুনুন।'

এখানেও অন্ধকার। আজ শিবনাথ এই প্রথম দেখল রাত ন'টা না বাজতে বনমালীর দোকানের ঝাপ বন্ধ। দোকানের আলো পড়ে সামনেটা যা-হোক খানিকটা ফরসা থাকে। এখন দেখা গেল আবছা অন্ধকারে পায়া-ভাঙা বেঞ্চটায় কে. গুপ্ত একলা চুপচাপ ভূতের মত বসে।

'কি বলুন?' বেশ একটু বিরক্ত হয়ে শিবনাথ দাঁড়ায়। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঢোকার সময় লোকটা ডেকে বাধা দিচ্ছে, মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও শিবনাথ মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়। আজ এমনি তার এখানে ওখানে বসে দেরি হয়ে গেছে।

মশাই, এদিকে যে ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল।'

'কি ঘটনা?' শিবনাথ খুব একটা কৌতূহল প্রকাশ করল না। এমন কি হাসপাতালে রুণু কেমন আছে সেই প্রশ্নটাও সে সতর্কতার সঙ্গে চেপে যায়।

'পাখি আমাদের মায়া কাটাল।' গুপ্ত হালকা গলায় হাসল। 'ভয়াবহ কিছু না তবে আকস্মিক। হি-হি।'

পাগলটা কি বলতে চাইছে, কার কথা বলছে ভাবতে গিয়ে শিবনাথের একটা কথা মনে পড়তে হুট করে তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করল, 'সেই পাখি তো কালই মায়া কাটিয়ে ঘোলপাড়ায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে, সেই খবর তো স্যার পুরোনো হয়ে গেছে। আপনার বন্ধুর বইয়ের নায়িকা কিরণের কথা বলছেন তো।'

'হোপলেস।' গুপ্ত আর হাসল না। 'আপনি দেখছি রসের র-ও বোঝেন না। পাঠ্যাবস্থায় কি করে কবিতা লিখতেন?'

শিবনাথ নীরব।

'মশাই কিরণ মায়া কাটায়নি। তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজও সে আপনার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলে, এ-বাড়ির বারো ঘরের আরো পাঁচজনের খোঁজ খবর

নিলে। তার কথা আপনি আমায় বলবেন কি। কমলা। ইয়েস, দ্যাট্ হোর্। বলিনি আপনাকে কবে একদিন? এইমাত্র ভাড়াটাড়া চুকিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে সুটকেস বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'কোথায় গেল?'

'সে আপনি ওই যে কী নাম, মুর্গির মাংস দিয়ে ভাতটাত খেয়ে কমলার বিছানায় সারা দুপুর গড়িয়ে গেল, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। কোথায় গেছে সে-খবর দিয়ে কাজ কি, কার সঙ্গে গেছে সেটাই বরং জেনে রাখুন।'

'শিশিরবাবু, ভদ্রলোকের নাম।'

শিবনাথ বলল, 'কমলা তাঁর সঙ্গে গেছে কি করে জানলেন!'

'জানব কি, চোখে দেখলাম মশাই। কর্তা স্বয়ং এসেছিলেন। এই তো ট্যাক্সিতে করে দুজন বেরিয়ে গেল।'

শিবনাথ একটু সময় কথা বলল না। ভদ্রলোক বিবাহিত, এবাড়ির কা'র মুখে সে শুনেছিল। কিন্তু সেসব আলোচনা চাপা দেবার জন্য ইচ্ছা করে সে হেসে বলল, 'তা গেছে ভালই হয়েছে। হয়তো ভাল ঘর পেয়েছে। বস্তিতে চিরকাল পড়ে থাকবে তার কি মানে আছে। সুযোগ পেলে এঘর ছেড়ে দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

'যাক্‌গে মশাই, আপনার সঙ্গে কথা বলা আর গাছের সঙ্গে কথা বলা এক।' গুপ্ত আক্ষেপের সুর বার করল, 'যাওয়ায় যাওয়ায় বেশ-কম আছে, ছাড়ায় ছাড়ায় তফাৎ আছে। নতুন ঘর পেয়েছে আপনাকে কে বললে। আমি তো এখানে সন্ধ্যা থেকে বসা। শুনলাম ট্যাক্সিতে উঠে বাবুটি শেয়ালদার একটা হোটেলের নাম করলে। আজ সেখানে রাত্রিবাস।'

শিবনাথ কি বলতে যাচ্ছিল, গুপ্ত বাধা দিল।

'আমি, গোড়া থেকে বলে আসছি দাদা, শী ইজ ব্যাড্ টাইপ। আপনারা তো আর আমার কথায় বিশ্বাস করেন না। এই বেলা দেখুন। আরে চালচলন দেখলে বোঝা যায় না? আর, তা ছাড়া হারামজাদী যে ভদ্রলোকের ঘরের সন্তান না, সেতো আমি ওর হাতঘড়ি পরার কায়দা আর জুতো পরে হাঁটার নমুনা দেখেই বুঝেছি। হ্যাঁ, এখানে পা দিয়ে আমি বনমালীকে প্রথম দিন বলেছিলাম। দাসীর মেয়ে ধোবা নাপিতের মেয়ে। শহরে এসে নার্সগিরির চাকরি নিয়ে এখন খুব তড়পাচ্ছে আর খোলা হাত-পা ছুঁড়ে মেলা জল ছিটোচ্ছে। কত দেখলাম এ-টাইপের মেয়ে।'

একটু থেমে গুপ্ত লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কথা তো সেটা নয়। দুঃখ হয় ওই কি যেন নামটা বললেন, ছাগলটার জন্যে। বৌ-বাচ্চা আছে শুনছি। আরে মেয়েমানুষ আমরাও এ-জীবনে কম দেখিনি। তা বলে কি তুই একেবারে গলায় গেঁথে নিবি। আহাম্মক। মদ খাবি, গ্লাসটা দাঁত দিয়ে চিবোবি কেন, সিগারেট খা যত খুশি, জিহ্বায় ছাই মাখাবি কেন, জল খেতে গিয়ে পুকুরে নেবে কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে দেওয়া, তুই দেখছি সেই রাস্তার পথিক। ইডিয়েট। বুঝেছেন, কাল কমলার ঘরে খাওয়া-দাওয়া ধুমধুম দেখেই তো আমি বুঝলাম শালার হয়ে গেছে।'

'যাকগে, এই নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।' শিবনাথ বলল, 'যদি

তাই হয় তো আপনার আমার মাথা গরম না করাই ভাল।'

'ভাল-মন্দর কথা হচ্ছে না, বলছিলাম, আমি অবশ্য পয়লা দিন এই উঠোনে পা দিয়েই মেয়েটাকে দেখে ধরে ফেলেছিলাম, ভেরি ব্যাড্ টাইপ। ঐ যে বলে ছুঁচ হয়ে ঢোকে লাঙলের ফাল হয়ে বেরোয়। শিশিরকে শুষে ছিবড়ে বার করে তারপর আমের আঁটির মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর একজনকে ধরবে। এই ওরা করে, এ-ই ওদের পেশা। কতখানি পাজি হলে কত বড় জিহ্বা হলে একটা ম্যারেড ম্যানকে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে টেনে নিতে পারে আপনি পুরুষ হয়ে কি বুঝতে পারছেন না। এর চেয়ে বাজারের ওরা অনেক ভাল, অনেক ধার্মিক।'

বক্তৃতা শুনে শিবনাথ হাসল।

'তবু ভাল যে এবাড়ির কোনো পুরুষের ওপর কমলার লোভ জাগেনি।'

'জাগলে কি আর রক্ষে থাকত, জুতোর বাড়ি খেতো. আমিই জুতো মারতাম। ধরুন, আপনাকে নিয়ে যদি এরকম লটখটি বেঁধেছে দেখতাম, আর ওদিকে ঘরে আপনার ওয়াইফ আপনার মেয়ে কাঁদাকাটা করছে, কেটে ফেলতুম ওকে। কে. গুপ্ত পাগল, কিন্তু এসব বিষয়ে ভয়ানক পার্টিকুলার। একবার জিজ্ঞেস করে আসুন বেবির মাকে। মেয়েমানুষ পিঁপড়ের মত গায়ে হাঁটত। কিন্তু ঐ রাত ন'টা অবধি। দশটার মধ্যে আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে বেবির মার হাতের বাড়া ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছি। রোজ।'

শিবনাথ একটা নিশ্বাস ফেলল।

'আচ্ছা চলি আমি।'

গুপ্ত হঠাৎ কথা বলল না।

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে বসে আছেন কেন, বাড়ি গিয়ে—' শিবনাথ কেটে পড়ার মতন একটা কথা বলে পা বাড়াতে চেষ্টা করতে গুপ্ত বলল, 'শুনুন।'

'কি ?'

'আনা দুয়েক পয়সা হবে ?'

শিবনাথ অবাক হয় না। আকাশের দিকে চোখ তুলে একটু চিন্তা করে শুধু। ফিরে আসবে না পয়সাগুলো ঠিক। কিন্তু তবু, তা হলেও এই সামান্য কয়েক আনা পয়সার তুলনায় তার সম্মান ভদ্রতা আভিজাত্য—আর না ভেবে চট করে পকেট থেকে একটা দু'আনি তুলে সে হাসল। 'সিগারেট ফুরিয়েছে বুঝি।' ইচ্ছা করেই সিগারেটের কথাটা বলল যদিও।

'না, মশাই।' কে. গুপ্ত পয়সা হাতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। 'দুপুর থেকে শালা এমন কাঁইকুঁই করছে। বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত কিন্তু আজ খুবই ঠাণ্ডা ছিল। কাল রাত্রে কিরণের বাড়িতে আমাদের ভারি রকমের ফিষ্টি হয়েছিল, শুনছেন তো।'

'শুনেছি, বলেছেন।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে শিবনাথ এবার লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। এবং ইতিপূর্বে আরো বহুবার যেমন করা হয়েছে তেমনি এখন কে. গুপ্তকে আর একবার গম্ভীরভাবে অনুকম্পা করতে সে ভুলল না। কি হ'ত ভাবল সে কমলার

জঘন্য চরিত্রের কথা চিন্তা করে কে. গুপ্ত মনমেজাজ খারাপ করে অন্ধকারে একলা বসে রাত্রির প্রহর গুনছে,—এই অবস্থায় তার ছেলে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবে কি আসবে না বা এ-সম্পর্কে আর কিছু করা উচিত ভেবে দেখেছে কিনা, শিবনাথ যদি প্রশ্ন করতে কে. গুপ্ত চটে গিয়ে হয়তো গালিগালাজ আরম্ভ করত ঃ 'বেরসিক, মশাই, আপনি রসের বুকে ছুরি বসাতে ওস্তাদ,—এ যে দেখছি ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করছেন।' ইত্যাদি।

নীরব থেকে শিবনাথ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে ভাবল। তা ছাড়া রমেশ রায়ের মুখ থেকে বৃত্তান্ত শোনার পর এই ব্যাপারে মুখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি।

ঘরে এসে শিবনাথের মনমেজাজ অবশ্য প্রফুল্ল হয়ে উঠল। মনে মনে সে হিসাব করে দেখল দীপ্তির ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর রাস্তায় এই আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা বিধু পাঁচু ক্ষিতীশ (রমেশকে অবশ্য সে এ-দলে ফেলে না) কে. গুপ্ত ইত্যাদি অনেকগুলো কদর্য চেহারার সামনে প্রায় উপর্যুপরি কয়েকবার দাঁড়াতে হয়েছে এবং নানারকম অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা।

মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠার বিশেষ কারণ শিবনাথ ঘরে পা দিয়েই বীথিকে দেখল। রুচির সঙ্গে কথা বলছে। বীথি এ-ঘরে আসুক, রুচির সঙ্গে একটু মেলামেশা করুক—কেন জানি প্রথম থেকেই শিবনাথের এই ইচ্ছা। ইচ্ছাটা গোপন। এবং বীথির সম্পর্কে আজ পর্যন্ত রুচির কাছে সে কোনরকম কথা বলেনি যদিও। এক উঠোনের ওপর বাস করে দূরে থেকে যতটুকু দেখার শিবনাথ চোখ ভরে সুশ্রী সুঠাম যৌবন-বতী এই কুমারীকে চলতে ফিরতে কথা বলতে হাসতে ঝগড়া করতে, বেলা নটা বাজতে স্নান করে খেয়ে সেজেগুজে কাজে বেরিয়ে যেতে এবং সন্ধ্যার পর কোনো-দিন একটু শুকনো মুখে কোনো দিন বা একটু বেশি হাসিখুশি হয়ে ঘরে ফিরতে দেখেছে। দেখছে, আর বহুকাল আগের পড়া সুন্দর একটা কবিতার লাইন তার বুকের মধ্যে গুনগুন করে উঠছে ঃ 'আঠারোটি বসন্ত দিয়ে ঘেরা যে যৌবন কেমনে নিন্দিব তারে।' এটা যে কিছু দোষের শিবনাথের মনে হয় না। হত, যদি তার মনে প্রশ্ন জাগত বীথি তার সম্পর্কে উৎসুক কিনা এবং প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় সারাক্ষণ সে বিব্রত বোধ করত। সে-সব কিছুই না। কেবল যতক্ষণ দেখার সেই সময়টুকু সে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। একটা ফুল, একটা পাখির দিকে মানুষ যে চোখে তাকায়।

রুচি খাটের ওপর বসা। বীথি পাশে দাঁড়িয়ে। এতবড় একটা রিবন, বেণীর মাঝামাঝি জায়গায় প্রজাপতির মত সুন্দর করে বাঁধা। বেণীটা যতখানি চওড়া ওর শাড়ির কালো পাড়টাও ততখানি চওড়া। একটু বেশি না কম না। সাদা জুতো হাতে ছোট্ট ব্যাগ, মিশমিশে কালো বেণী, কালো রিবন ও লম্বা পালক ঘেরা কালো চোখে পরনের সাদা শাড়ি ব্লাউস ও জুতোর সাদাটাকে আরো বেশি উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে। শিবনাথ, বলতে কি, কেমন একটা পবিত্রতা বোধ করছিল কুমারী

মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে। আর সে সবচেয়ে বেশি অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হ'ল ওর চুলের গন্ধে। বিকেলে চৌরঙ্গির রাস্তায় বিদেশিনীর মাথার চুল থেকে চুরি করে যে গন্ধ সে খানিকটা বুকে পুরে নিয়েছিল, তাই-ই যেন বীথি অকৃপণ হাতে ঢেলে দিতে এসেছে তার ঘরে, ঘরের বাতাসে। উত্তেজনায় শিবনাথ প্রায় বিড়বিড় করে ওঠে।

'চলি এখন!'

'কেন, এত তাড়া কি।' রুচি বলল, 'একটু বসবে না।'

'না, বৌদি।' ঘাড়টা ঠিক ঘোরালো না বীথি, যেন অত্যন্ত সতর্কভাবে আড়-চোখে শিবনাথকে একবার দেখে নিয়ে খাটের এ-পাশে ঘুমন্ত মঞ্জুকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

'একটু রোগা হয়ে গেছে মনে হয়।'

'না শরীর ভালো যাচ্ছে না তেমন। সর্দি কাশিতে খুব ভুগছে মেয়েটা।'

'আমার তো মনে হয় কডলিভার অয়েল টয়েলের মত একটা কিছু ওকে ঠাণ্ডার সময়টা দিতে পারেন। তাতে সর্দি কাশি তো বটেই, জেনারেল হেলথটাও ভাল করবে।'

রুচি বীথির এই প্রস্তাবে কোন মন্তব্য করল না। আড়চোখে না, পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলেই সে বীথির পিছনে দাঁড়ানো শিবনাথকে দেখল।

শিবনাথ কথা না কয়ে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

'তোমার বাবার শরীরটা একটু ভালর দিকে?'

'না, ঐ-তো বুড়ো হয়েছে, এখন আর—' একটু থেমে মঞ্জুর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বীথি রুচির দিকে তাকাল। 'ওই শুয়ে শুয়েই কাটবে আর কি, যে ক'দিন আছেন। চলি!'

রুচি ঘাড় নাড়ল।

শিবনাথ দরজা ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। বীথি মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

'কেন এসেছিল?' রুচির চোখের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ অল্প হাসে।

'একটা ইংরেজী শব্দের মানে জানতে এসেছিল।'

'কি শব্দ।' হাসি না নিভিয়ে শিবনাথ ভুরু কুঁচকোয়।

রুচি কথা বলল না। মঞ্জুর মশারি খাটাতে ব্যস্ত। মশারি খাটানো শেষ করে সে খাট থেকে নামল।

'দেরি করে ফিরলে?'

'হ্যাঁ, দু'চার জায়গায় বসতে হল, কথায় কথায় রাত হয়ে গেল।' শিবনাথ কোথায় কার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে বলল না যদিও।

'জামাকাপড় ছেড়ে খেয়ে নাও।' ব'লে রুচি এক পাশে সরে গিয়ে থালা গ্লাস ধুয়ে শিবনাথকে ঠাঁই করে দেয়। যেন আজ আবার একটু বেশি গম্ভীর ও। খেতে বসে আবহাওয়াটা তরল করার লোভে শিবনাথ বলল, 'আজ পারিজাতের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। চমৎকার মানুষ।'

রুচিও খাচ্ছিল। কথা না কয়ে ও জলের গ্লাস মুখে তুলল। যেন কথা বলবে না বলে মুখটা ও আড়াল করল। পিছনে টিনের বেড়ায় রুচির মাথার ছায়াটার দিকে চোখ রেখে শিবনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল: 'ওখানে হয়ে যাবে। তাঁর কথায় বুঝলাম।'

রুচি চোখ বড় করল।

'তা হলে আজো পাকাপাকি কোনো কথা পাওনি?'

'হ্যাঁ, একরকম—' এবার শিবনাথ মুখের কাছে জলের গ্লাস তুলল। একটু পর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে নিচু গলায় বলল, 'ওই ওদের মানে পারিজাতের সামনে ইলেকশন আসছে, তাই খুব ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। আজ সে বাড়িতেই ছিল না। দেখি কাল একবার গিয়ে—'

রুচি নীরব।

'ও, আর একটা কথাই তোমাকে বলা হয়নি।' শিবনাথ একবার জোর করে একটুখানি শব্দ করে হাসল। 'বীথি তোমায় বলেছে কিছু?'

'কি?'

তেমনি বড় বড় চোখ রুচির।

শিবনাথ আবার দমে যায় কিন্তু তা হলেও সে চুপ করে রইল না। 'নতুন চাকরি পেয়ে বীথি দীপালি সঙ্ঘের সেক্রেটারী পদে রিজাইন দিয়েছে। দীপ্তি এখন মুশকিলে পড়েছেন। তেমন কাউকে পাচ্ছেন না, যাকে আবার সেক্রেটারী করা যায়।'

'তা ওটা তো মেয়েদের সংঘ, তোমার কি।' কেমন একটু রূঢ় গলায় কথাটা বলল রুচি। শিবনাথ আহত হল। যেন আঘাত ঢাকতে তাড়াতাড়ি সে হেসে ফেলল। 'দীপ্তির ইচ্ছা তোমাকে এই পোস্ট দেয়।'

খাওয়া শেষ হয়েছে রুচির। হাত ধুয়ে সে উঠে পড়ে।

'আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।' মুখ মুছতে মুছতে বলল সে, 'তা ছাড়া ওটা পারিজাতের গিন্নীর আর পাঁচটা খেয়ালের একটা খেয়াল। সমিতি না ছাই। কিছু কাজ হয়? আমার কানে সবই আসে। একটা শো দাঁড় করিয়ে রেখেছেন বড়লোকের বৌ। দু'চার আনা চাঁদা চাইলে দেওয়া যায়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওখানে যাওয়া-আসা করা আর দীপ্তিরাণীর পায়ে তেল মাখান আমার পোষাবে না।'

শিবনাথ রীতিমত জব্দ হয়ে গেল।

'তোমায় বলছিল নাকি আমাকে সেক্রেটারী করবেন?' রুচি প্রশ্ন করল।

'না, ঠিক আমার কাছে এখনো কথাটা তোলেননি। মদন ঘোষ বলছিল। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে।' শিবনাথ বিরক্ত। প্রসঙ্গটা তুলতে না তুলতে রুচি এতটা কড়া মেজাজ দেখাবে সে ভাবেনি। উঠে সে হাত মুখ ধুয়ে মুছে সিগারেট ধরায় এবং কি একটু ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলে, 'সমিতির সেক্রেটারী হলে দীপ্তির পায়ে তেল মাখাতে হবে এটা আমি ঠিক বুঝলাম না কিন্তু।'

'তা ছাড়া কি, আমি বস্তিতে থাকি, তিনি প্রাসাদে থাকেন, আমাদের কী চোখে

দেখেন সহজেই বুঝতে পার।'

'না, না,—অ সেই চিন্তা, রিয়্যালি, দীপ্তি সে-ধরনের মেয়ে না, অন্তত আমার তো তাই মনে হল। খুব ভদ্র মার্জিত অমায়িক।'

'যাকগে, তোমার কাছে যখন তিনি এখনো প্রস্তাব তোলেননি, এ নিয়ে এখন গবেষণা করে লাভ কি। তুমি কি শুয়ে পড়বে?'

'হ্যাঁ, না, ভাল কথা—' শিবনাথ এতক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হতে পারল। বীথি যেন কি জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, ইংরেজী শব্দের মানে, কি শব্দ বললে না তো।'

'লিউক-ওয়ার্ম।'

'খুব সাধারণ কথা।' শিবনাথ হাসল। 'অবশ্য ওয়ার্ম ও লিউক-ওয়ার্ম নিয়ে অনেকেই গোলমালে পড়ে। লিউক-ওয়ার্ম মানে টেপিড অর্থাৎ আমরা যাকে বলি কুসুম কুসুম গরম, খুব গরম না, বলে দাওনি?'

রুচি মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জাতে মাস্টারনী ভুলে যাচ্ছ কেন। যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে শব্দের অর্থ বোঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করি না।'

'তা তো বটেই।' শিবনাথ আর হাসল না। আজ আবার স্ত্রীর কথায় ব্যবহারে এতটা ঝাঁজ অসন্তোষ ফুটে ওঠার কারণ কি ভাবে সে। কিন্তু একেবারে চুপ করে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ না, চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, 'আর আর কি জিজ্ঞেস করছিল?'

'ডিজার্ট-স্পুন বলতে ঠিক কত বড় চামচ বোঝায়।'

'ওরে বাবা, সব যে ডাক্তারি ব্যাপার দেখছি।' শিবনাথ হাসবার মতন গলায় খুক করে একটা শব্দ করল। 'টি-স্পুন, ডিজার্ট-স্পুন, হ্যাঁ, একটু গোলমেলেই, আমার, —আমারও খুব ভাল জানা নেই ওটা ঠিক কাকে বলে।'

'ডিজার্ট মানে খাওয়ার পর যে প্যাস্ট্রি পুডিং ফলটল খেতে দেওয়া হয়, তাকে বলে। এবং সেসব সার্ভ করার জন্যে যে চামচ ব্যবহার করা হয়, ইংরেজীতে তাকেই ডিজার্ট-স্পুন বলে। ওটা সাহেবসুবোর ব্যাপার।'

'তার মানে সাধারণ চামচ না, বড় সাইজের।' শিবনাথ এবার শব্দ ক'রে হাল্কা গলায় হাসল। 'তা বীথির হঠাৎ এত সব শব্দের মানে জানতে আসার কারণ?'

'আমি কি ক'রে বলব। আমি এবাড়িতে থাকি কতক্ষণ।' আরও খানিকটা ঝাঁজ। 'হয়তো নতুন চাকরি করতে গিয়ে এসব শব্দের মানে জানার দরকার হচ্ছে।' কথাটা বলে রুচি জানালার কাছে সরে গিয়ে চুলে চিরুনি চালাতে আরম্ভ করল।

শিবনাথের বুকে দুরদুর করছিল। বীথি কোথায় চাকরি করছে, কি ধরনের কাজ রুচি জানে না নিশ্চয়। শিবনাথ জানে। এক রাত্রে ডোম-পাড়ার আগুন দেখতে গিয়ে সে বীথি ও কমলার কথাবার্তা চুরি করে শুনে প্রায় সবই জেনেছে। এখন রুচি না হুট্ করে শিবনাথকে প্রশ্ন করে বসে বীথির চাকরিটা কি—এই আশঙ্কায় সে ভিতরে ভিতরে বিব্রতবোধ করছিল বৈকি। বীথির কাজটা একটু অদ্ভুত রকমের। রুচি কোনমতেই তা সহজভাবে নিতে পারবে না শিবনাথ বেশ বুঝতে পারে।

কিন্তু শিবনাথের আশঙ্কা তৎক্ষণাৎ দূর হয়। রুচি এই নিয়ে মাথা ঘামায় না, তার পরের কথা থেকে বোঝা গেল। 'দুটো ইংরেজী শব্দের মানে জানতে এসেছিল, তার অর্থ ভাল একখানা শাড়ি পরেছে, নতুন জুতো পায়ে উঠেছে, মাথায় দামী তেল মেখেছে আমাকে জানিয়ে গেল, দেখিয়ে গেল।'

একটু নিশ্চিন্ত হল শিবনাথ। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে আস্তে হেসে মাথা নাড়ল। 'না, আমার মনে হয় না। জানি না অবশ্য।' মুখে বলল, একথা আর স্ত্রীর দিকে বেশ একটু অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে সে মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল: 'কমপ্লেক্স, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। দীপ্তির সমিতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে রুচির আপত্তি করার মূলেও তাই—এই মনোভাব।'

'কে?'

'আমি।'

'বেবি! কি চাই?'

'বৌদিকে।'

শিবনাথ দরজা থেকে চোখ সরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়। চিরুনি রেখে রুচি মাথায় কাপড় তুলল। 'আমার হয়ে গেছে, এখুনি যাচ্ছি। তোমার মা'র জ্বরটা এখন কেমন?'

'আছে, কমেনি।' বেবি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। যেন শিবনাথকে ঘরে দেখতে পেয়ে চট করে ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না। তেমনি মাথায় চুল উস্কখুস্ক আছে, হাত পা এখনো অপরিচ্ছন্ন, গায়ে সেই ছেঁড়া ফ্রকটা। ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ।

'তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।'

কি একটু কাজ সারতে রুচি খাটের উল্টোদিকে মাটিতে রাখা বাসন-কোসনের কাছে সরে গেল।

বেবিও আর দাঁড়ায় না। শিবনাথের দিকে আর একবারও চোখ না তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে ও আস্তে আস্তে দরজা ছেড়ে চলে গেল। অনুকম্পার আর একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে অস্ফুট-গলায় শিবনাথ বলল, 'কী দুরবস্থায় পড়েছে পরিবারটা।'

কথাটা রুচি শুনল কিনা বোঝা গেল না। কেননা, তার মুখের কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করল না শিবনাথ। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে রুচি শিবনাথের পাশে কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর রাখল। একটা পুরোনো পোস্টকার্ড গ্লাসের মুখে চাপা দিয়ে বলল, 'আমি একটু বেবিদের ঘরে যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে শিবনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়।

'বেবির মা'র অসুখ করেছে বুঝি। জ্বর, কবে হ'ল?'

'জানি না, সম্ভবত আজই হয়েছে।'

'এখন পক্স ফক্স-এর দিন।' চিন্তান্বিত শিবনাথ। 'গা হাত পায়ে ব্যথা নেই তো।' হঠাৎ তোমাকে?'

'রুণু হাসপাতালে।'

'হ্যাঁ, ও তো, কি সব ছেলে! তুমি ভিতরের ব্যাপার জানো? আমি সব শুনে

এলাম বাইরে।'

'পারিজাত গাড়ি চাপা দিয়েছে।'

'কে বললে?' শিবনাথ প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। 'আসল খবর তুমি শোননি।'

'ময়না সঙ্গে ছিল। মাঠ থেকে ফিরছিল দু'জন। ময়নার চেয়ে বড় সাক্ষী কে। বাদামগাছের নিচে পারিজাত অ্যাক্‌সিডেণ্ট করেছে।' রুচি এক নিশ্বাসে বলল।

'ধ্যেৎ!' ফিসফিসে গলায় শিবনাথ ধমক দিয়ে উঠল। 'বলাইর মেয়েটা একটা লায়ার। আসলে আমি জানি, আমি নিজের চোখে দেখেছি দু'টিকে একসঙ্গে, ময়নার লাভার রুণু, হ্যাঁ কে. গুপ্তর ছেলেটা। পারিজাত চাপা দিয়েছে এসব বানানো কথা। সাংঘাতিক কাজ করতে গেছিল বেবির ভাই, অতটুকুন ছেলে, বুঝলে।'

রুচি ভুরু কুঁচকোয়।

শিবনাথ চোখ বড় ক'রে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ দু'জন কথা বলল না।

'যাকগে।' ঢোক গিলে, কি একটু ভেবে পরে রুচি বলল, 'ভদ্রমহিলা দু'বার খবর দিয়েছেন, যাইনি, এখন একবার দেখা ক'রে আসি।'

'দরকার নেই।' শিবনাথ ব্যস্তভাবে মাথা নাড়ল। 'প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, থাকবে। কিন্তু এখন না, দু'চার দিন ওই ঘরে যাওয়া-আসা স্রেফ বন্ধ রাখতে হবে।'

'কেন?' রুচি গলার স্বর কঠিন করল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ। কি করেছে রুণু। কা'র মুখে শুনলে সব? পারিজাতের স্ত্রী বলছিল বুঝি?'

গম্ভীর হয়ে শিবনাথ বলল, 'পারিজাতের স্ত্রীর অন্য চিন্তা, এসব ছাই-ভস্ম নিয়ে তার মাথা ঘামাবার মোটেই সময় নেই। তা ছাড়া বিশ ত্রিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি এক রাত্রে লুঠ হয়, খুব বেশি ওরা মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। পারিজাতের চেয়েও দীপ্তির বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল। আঙুলে এত বড় একটা হীরের আঙটি। তুমি তো কোনোদিন ওর সামনে যাওনি, কাছে দাঁড়িয়ে দেখোনি দীপ্তিকে। মেয়েদের গায়ের চামড়া এত সফ্‌ট পালিশ, এমন সুন্দর, আমি কিন্তু আগে আর দেখিনি। হ্যাঁ, ঐ যে বলে আপেল-আপেলের মতন চামড়া আর রং। তা ছাড়া আজো, এখনো বয়েস খুব বেশী না যদিও, কিন্তু এতগুলো বাচ্চা হয়েছে এটা তো ঠিক। বোঝা যায় কত সুখ বিলাসের মধ্যে বড় হয়েছে সে।'

রুচির চোখের তারা দু'টো একবার জ্বলে উঠল, শিবনাথ লক্ষ্য করল না, আর রুচিও তৎক্ষণাৎ সামলে নেয়। না কি শিবনাথ লক্ষ্য করেছে কিনা বাজিয়ে নিতে রুচি ঠাট্টার সুরে ব'লে উঠল, 'সেজন্যেই কি পারিজাতের ছেলেমেয়েদের ট্যুইশনটা পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ—রোজ একবার বাচ্চাদের মা-টিকেও দেখা চলবে।'

'কী যে বল তুমি।' শিবনাথ রাগ করল না, হাসল। 'আমার সম্পর্কে এ-ধরনের রিমার্ক, কই আগে তো তুমি কোনোদিন করনি—'

'না, এখন করছি।' হঠাৎ আবার শক্ত গলায় রুচি উত্তর করল।

শিবনাথ কথা বলল না।

'তুমি শুয়ে পড়তে পার, দোরে খিল দেবে না, এখনি ফিরছি আমি, পাল্লা দুটো ভেজিয়ে রাখো।'

'অর্থাৎ তুমি বৌদিদের ঘরে যাবেই?'

'হ্যাঁ।' রুচি চৌকাঠের দিকে পা বাড়ায়। শিবনাথ তার হাত চেপে ধরে।

'তুমি এখন মাঝরাত্রে কে. গুপ্তর ঘরে গেলে কী ব্যাপার দাঁড়াবে জানো?'

'কি?'

'কাল আমাদের ঘরে পুলিশ আসবে। তোমার কি, তুমি তো কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের টিচারি করছ, বড় সার্টিফিকেট। মুশকিল বাধবে আমাকে নিয়ে। কে. গুপ্তর ছেলে রুণু একটা মস্ত বড় গ্যাঙে আছে। পারিজাতের গাড়ি আটকে টাকা লুট করতে গেছল। এখন সে-ঘরে বেশি যাওয়া-আসার অর্থ দাঁড়াবে আমার সঙ্গেও দলের যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া আমি—আমার চাকরি-বাকরি নেই, বেকার, কথাটা তেমন চাপা নেই।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো ব'লে শিবনাথ হাঁপায়।

'মিথ্যা কথা।' রুচি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'আমি জানি, শুনেছি সব, আসল ঘটনা চাপা দিতে অনেকরকম মিথ্যা গল্প এখন সাজানো হচ্ছে, যা হয়।'

'মোটেই মিথ্যা নয়। খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে এ-খবর পাওয়া গেছে।' আর ফিসফিস ক'রে না, উত্তেজনায় রীতিমত বড় গলায় শিবনাথ বলল, 'তা সত্যি মিথ্যা এসব আমাদের যাচাই ক'রে লাভ নেই,—আমাদের কথা, ওঘরে তুমি যেতে পারবে না। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।' রুচির হাত আর ধ'রে রাখার প্রয়োজন বোধ না ক'রে শিবনাথ বিরক্ত হয়ে ঝাড়া দিয়ে তা সরিয়ে দেয়। ফলে রুচির হাতটা বাক্সের ওপর রাখা কাচের গ্লাসে লাগতে সেটা উল্টে নিচে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় আর বিশ্রী ঝনঝন শব্দ হয়।

রুচিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'একটু ভদ্র হ'তে শেখ। আর একটা গ্লাস কিনতে ছ' আনা খরচ করতে হবে ভুলে যেও না।'

'ভারি তো একটা কাঁচের গ্লাস।' শিবনাথ ঠোঁট উল্টোয়। 'অ, তোমার পয়সায় কেনা বলে এত লাগছে। মনে ছিল না, মাপ করো।'

'আমার পয়সা শুধু কেন, তুমিও তো সেদিন ধার ক'রে পঞ্চাশ টাকা এনে সংসারে সাহায্য করেছ, দরকার হলে আবার ধার করবে।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে রুচি নুয়ে কাচের টুকরোগুলো একত্র ক'রে তুলে একটা কাগজে মুড়ে একপাশে সরিয়ে রাখে।

একটা বড় রকমের খোঁচা খেয়ে শিবনাথ কতক্ষণ চুপ থাকে। রুচি ফের দরজার দিকে এগোয়।

'অভদ্র আমি না, অভদ্র তুমি। বস্তিতে এসে কথা ব্যবহার দিনদিন সেরকমই হচ্ছে।' রুচি না বলে পারল না।

'বটে।' শিবনাথ উত্তর করল, 'তার প্রমাণ দিচ্ছ রাত দুপুরে একটা লোফার একটা

পাগলের ঘরে তোমার যাওয়া চাইই।'

রুচি ঘুরে দাঁড়ায়। চট্ ক'রে কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'বেশিদিন বেকার গরিব থাকলে মানুষ লোফার হয়, পাগল হয় হয়তো। আমি ঠিক জানি না কে. গুপ্ত পাগল কি না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেবির মা অপ্রকৃতিস্থ নন। ভদ্রমহিলা অসুস্থ, তার ওপর তাঁর এই বিপদ। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারব না জানি। কিন্তু তিনি দু'বার ডেকেছেন, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে থানা পুলিশের বিপদ আছে, আর সেই ভয়ে আমি চুপ করে ঘরে বসে থাকব—এতটা কাপুরুষ তুমি হ'তে পার, আমি নই।' রুচি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবার উপক্রম করল।

শিবনাথ বলল, 'আহা, থানা পুলিশের ভয় হয়তো এখনও তেমন নেই, কেন-না এ-পক্ষ যখন চুপ ক'রে আছে, চেপে গেছে, তখন পুলিশ গায়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্টের তদন্ত করতে আসবে না ঠিক। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। আফ্‌টার অল একটা আনপ্লেজেণ্ট ব্যাপার। পারিজাতের দোষ কি রুণুর দোষ তার প্রমাণ যারা ঘটনা চোখে দেখেছে তারা। কিন্তু এখন কে. গুপ্তর ফ্যামিলির সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে গেলে আমি ও-বাড়ির ট্যুইশনিটা পাব না। এটা সত্য কথা। কাজেই—'

'তাই বলো, সেই দুশ্চিন্তায় তুমি সারা হয়ে যাচ্ছ, পারিজাতের বাচ্চাদের পড়াতে পারব না, দীপ্তিকে রোজ একবার দেখা হবে না, মরুক না কে. গুপ্তর ছেলে হাসপাতালে পচে,—ছি ছি—' বলে দরজায় শব্দ ক'রে দ্রুত পায়ে রুচি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ছোটলোক, মিন্, লো-হার্টেড ক্রিচার—' উত্তেজনায় শিবনাথ স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে চৌকাঠ পর্যন্ত ছুটে গেল, তারপর থমকে দাঁড়াল। পাশের কোন্ ঘরে যেন হাসির রোল উঠেছে। হাসিটা যখন বন্ধ হ'ল কথাগুলি পরিষ্কার বোঝা গেল।

'অশান্তি আবার কি নিয়ে হয়, টাকাপয়সা দিদি, রূপচাঁদ। ওতে টান ধরলে সব প্রেমেই ভাঁটা পড়ে, চারদিক দেখেশুনে এখনো কি তোমার বুঝতে বাকি রইল?'

'কি ভাঙল, কাঁসার থালা না কাঁচের বোয়ম। জোর আওয়াজ হ'ল।' যেন অন্য ঘর নিচু গলায় মন্তব্য করল।

'দেখিনি, কারো ঘরে চুপি দেয়া স্বভাব না বোন। আছি নিজের ঘরেই আছি, শাকভাত মাছভাত যেদিন যেমন জোটে খাই। পরের ফুটোয় চোখ গলিয়ে করব কি।'

অন্য ঘর কি বলে আর বোঝা গেল না। 'আরাম হারাম হ্যায়।' বিধু মাস্টার গলা বড় ক'রে ছেলেমেয়েদের বোঝাচ্ছিল। 'নেহরুর কথাগুলো দামী। আমিও অবশ্য গোড়া থেকে তোমাদের বলে আসছি—অলস্য করো না। অলসতায় বৃথা কালক্ষেপ করলে অশেষ দুর্গতি থাকে কপালে। আলস্য পাপ।' বিধুর গলাও অবশ্য দেখতে দেখতে চাপা পড়ে গেল ভুবনের চিৎকারে। খুশি গলা: 'না না, দেড়পো আমি হজম করতে পারব না। ঐ একপো দুধ যথেষ্ট, তিন ছটাকও রাখতে পারিস, বরং তুই তোর গলাটা একবার ডাক্তারকে দেখা মা পয়লা মাসের মাইনেটা পেয়ে, বলছিলি দু'দিন পর পর সর্দি-কাশি হয়।' বীথি কি বলল শোনা গেল না। মেয়ের হয়ে ভুবনের স্ত্রী চড়া গলায় উত্তর দেয়, 'ও গলা-ফলার দোষ এখন এমনিতে সেরে

যাবে। দু'দিন একটু নিয়ম ক'রে মাছটা ডিমটা খাক না। থাকবে না এসব। প্রীতির মাইনের টাকায় তো আর আমি সবাইকে নিত্য মাছ খাওয়াতে পারিনি। দশদিকের খরচ মিটিয়ে আর কুলানো যাচ্ছিল না।'

দেখতে দেখতে ভুবনগিন্নীও চাপা পড়ে গেল। রমেশগিন্নী মানে মল্লিকার খিলখিল হাসি বাড়ির উঠোনকে ততক্ষণে পুলকিত করে তুলেছে। 'সিবিল মারিজ' খাতায় নাম লিখিয়ে কমলা শিশিরবাবুকে বিয়ে করছেন, প্রমথর দিদিমা, আমাদের হিন্দুদের মত ছাদনাতলায় সাতপাক খাওয়া বিয়ে না। এখন বুঝতে পারলেন ?'

'শিশিরের না স্ত্রী আছে শুনলাম ?' পাশের ঘর থেকে প্রমথর বুড়ী দিদিমা, খনখনে গলায় হাসে। 'তা এখানেই তো ভাল ছিল, ডুব দিয়ে দিয়ে একাদশী ঠাকুর জল খেতে আসত। এখন বিয়ে করলে জানাজানি হবে কোঁদল বাধবে যে আগের পক্ষের সঙ্গে।'

'তা বলে কমলা শুনবে কেন। ধান খেলি মুর্গি যাবি কোথা। সেয়ানা মেয়ে। ব্যাঙ্কে মোটা টাকা আছে শিশিরের, পরশু দুপুরে ভাত রেঁধে খাইয়ে কমলা পেটের ভিতরের কথা টেনে বার করেছে, তারপর সোজা বিয়ের প্রস্তাব। নিজেই হেসে হেসে সব বলল রওনা হবার আগে।'

'হরি হরি!' প্রমথর দিদিমা আর হাসে না। লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে দেবতার নাম নিয়ে বলে, 'যা করেছে ভালই করেছে, কোনরকমে ঝুলে পড়া নিয়ে কথা। মেয়েছেলের আইবুড়ো হয়ে থাকার মত অশান্তি আছে নাকি কিছু। আমাদের কমলা পাকা কাজ করেছে। দোজবরে কী আসে যায়। এখন সতীনের সাথে মিলে-মিশে ঘর করুক, কি বলো বোন ?'

মল্লিকা চুপ। শিশির কমলাকে নিয়ে হোটেলে তুলবে, তারপর সুবিধামত ছোট-খাট একটা ঘর নেবে কোথাও, আগের পক্ষকে বিন্দুবিসর্গও জানানো হবে না—ইত্যাদি কোন কথা বুড়ীর কাছে হুট্ করে প্রকাশ করতে যেন মল্লিকার বাধল। দিনকাল ঘুরে গেছে ; পুরুষ মেয়ের মেজাজমর্জি আর আগের মতন নেই বললেও বুড়ী মানবে না ·বরং কমলার এ-প্রস্তাব শুনলে আবার হাউ হাউ করে উঠবে চিন্তা করে মল্লিকা আর কথা বলল না।

'হরি হরি!' ও-ঘরে বুড়ী পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলল। 'দুদিনের মধ্যে দুটো ঘর খালি হয়ে গেল। কাল পরশু আবার কোন্ ঘরের লোক আমাদের মায়া কাটাবে কে জানে।'

বলতে বলতে মনে হল টুপ্ করে যেন প্রমথর দিদিমা একসময় ঘুমে তলিয়ে গেল।

তারপর সারা বাড়ি নিঃসাড়। অমল ও কমলার ঘরের তালা দুটো দু'বার অল্প বাতাসে নাড়া খেয়ে ঠুকুস ঠুকুস শব্দ করে থেমে যেতে বারো ঘরের উঠোনে পায়ের শব্দ হয়। যেন কে বাড়িতে ঢুকল। প্রথমে বুঝা যায় না কোন্ ঘরের বাসিন্দা। কান খাড়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে টের পাওয়া যায় চার নম্বর ঘরের দরজার হুড়কা খোলা হয়েছে। অর্থাৎ শেখর ডাক্তার ঘরে ফিরেছে। আজ আর প্রভাতকণার

সাড়াশব্দ নেই। সন্ধ্যা থেকে নীরব। ডাক্তারও এত রাত অবধি ডিসপেন্সারীতে বসে সুধীরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি তর্কবিতর্ক করে এসে ঘরে ঢুকে কারো সঙ্গে একটা কথা না বলে এক ঘটি জল খেয়ে সোজা নিজের বিছানায় চলে গেল। প্রভাতকণা মেঝের একধারে আলাদা শয্যা নিয়েছে। কেবল একলা জেগে আছে সুনীতি। পড়ার টেবিলে হ্যারিকেনের আলোয় মাথা গুঁজে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন আঁকাআঁকি করছিল। পাখি, একটা সুপুরি গাছ? কিন্তু আঁকতে গিয়ে সুনীতি লক্ষ্য করল কোনোটাই ঠিক হচ্ছে না। কোনদিন সে ছবি আঁকতে পারবে না বুঝতে পেরে হতাশ হয়ে একসময় পেন্সিলটা কাগজ থেকে তুলে সেটা গালে ঠেকিয়ে সুনীতি বেড়ার টিনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। একটু আগে ও-ঘরের মল্লিকা যখন প্রমথর দিদিমাকে 'সিবিলি মারিজ' ব্যাখ্যা ক'রে শোনাচ্ছিল, সুনীতি কান খাড়া রেখে সব শুনেছে। তারপর বড় বড় চোখ মেলে চাদর মুড়ি দিয়ে মেঝেয় শুয়ে থাকা মা'র দিকে তাকিয়েছে। অন্যদিন হ'লে কমলার এই ধরনের বিয়ের গল্প শুনে প্রভাতকণা শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁত বার করে হি-হি করে হাসত আর সুনীতিকে তার বিয়ের পিঁড়িতে কোন্ 'ফুল চিত্রি করা' হবে তাই ব্যাখ্যা করে শোনাত। আজ প্রভাতকণার মনের অবস্থা অন্যরকম। যেন কথাটা বুঝতে পেরে সুনীতি একসময় বেড়ার টিন থেকে চোখ সরিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে তক্তাপোশের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা বাবার দিকে তাকিয়ে কি ভাবে। এদিকে হ্যারিকেনের তেল ফুরিয়ে গিয়ে সলতের আগুন থেকে থেকে লাফিয়ে উঠে ফুট্‌ফাট শব্দ করছে।

তেত্রিশ

আর ঘুম নেই প্রীতি ও বীথির চোখে।

তিনদিন চাকরি করার পর বড় বোন প্রীতির কাছে বীথি তার কাজের ধরনটা আজ বর্ণনা না ক'রে পারল না। কমলা থাকলে হয়তো তার কাছেই বলত, হ্যাঁ, যে তাকে এমন চমৎকার কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। নাকে মুখে ভাত গুঁজে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা মিলিয়ে ছুটে গিয়ে হাজিরা খাতায় নাম সই করার বালাই নেই। কি মেরুদাঁড়া সটান রেখে সারাক্ষণ ত্রস্ত আঙুলে টেলিফোন বোর্ডের চাবি টেপা। আর একটু এদিক-সেদিক হ'লে পান থেকে চুন খসলে ওপরওয়ালার ধমক, নয়তো যে বাবুটি লাইনের ওপর থেকে নম্বর চাইলেন, তাঁর ব্যস্ত অধৈর্য গলায় হুংকার, কুৎসিত গালি। 'ছুঁড়িগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না···হ্যালো মিস টু নাইন জিরো টু নাইন জিরো···সারাদিন বসে মাগীগুলো গল্প করবে তো কারেক্ট নাম্বার দেবে কখন, যতসব···' ইত্যাদি। পিঠ ব্যথা করে, হাতের আঙুল টনটন করে, চোখের জল আসে, কানের ভিতর ঝিঁ ঝিঁ ডাকার মতন শব্দ হ'তে থাকে কাজ সেরে অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পরও। একদিন না, অনেক দিন প্রীতি ছোট বোন বীথির কাছে, মা'র কাছে নিজের চাকরির অবস্থা ব্যাখ্যা ক'রে শুনিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। হাড়-

ভাঙা খাটুনি। সুযোগ পেলে সে আজই একাজ ছেড়ে দেয়।

তা তো বটেই। সেই তুলনায় বীথি কত সুখী।

'কি বলছিল মিহিরবাবু,—মিহির ঘোষাল তো ভদ্রলোকের নাম?' আধবোজা চোখে বীথির গালের কাছে মুখটা সরিয়ে নিয়ে প্রীতি কথাটা আবার শুনতে চায়। পাশাপাশি শুয়ে দুই বোন। সেই ছোটবেলা থেকে একটা কম্বল ভাগাভাগি ক'রে গায়ে দিয়ে এসেছে। আজ অবশ্য আর কম্বল না। শীতের রাত্রে টিনের ঘরে ঠাণ্ডা লাগে। প্রীতি গত বছর তাদের দু'জনের জন্য এবং বাবার জন্য লেপ তৈরি করে-ছিল। মা আর ছোট ভাই-বোনগুলোর মেঝের ওধারে ভুবনের বিছানার পাশাপাশি আলাদা বিছানায় শোয়। দু'টো কাঁথা এবং প্রীতি বীথির পুরোনো কম্বলটা এখন ওরা ব্যবহার করছে। ঠাণ্ডাটা একেবারে নেই, বরং কেমন গুমোট লাগছিল ব'লে বীথি লেপটা পায়ের কাছে ঠেলে দিয়েছে। প্রীতি অবশ্য ওটা এখনো গলা পর্যন্ত জড়িয়ে আছে। 'মিহির ঘোষাল আজ বলেছে তোকে এ-কথা, না কাল?'

'আজ।'

একটু চুপ থেকে প্রীতি বলল, 'তা করবেন কি ভদ্রলোক। মা-মরা ছেলে নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন। ছেলেটা এমনিতে কেমন খুব দুষ্টু,—কি নাম যেন?'

'টুটুল।' বীথি বলল, 'এমনি খুব ঠাণ্ডা, শান্ত ছেলে। কিন্তু আমি একটু বাথরুমে গেছি কি অন্যমনস্কও হয়েছি তো চিৎকার। সে কী ভীষণ কান্না! আধ ঘণ্টা কোলে নিয়ে আদর করব, পায়চারি করব, এটা ওটা মুখে তুলে দেব, ছড়া কাটব তারপর যদি ঠাণ্ডা হয়।'

'কি খায়?'

'টিনের দুধ।' বীথি বলল, 'দুধ, কোয়েকার ওটস্, সুজি, নেবুর রস, টমেটোর রস। এক চামচ ক'রে ডিমের কুসুমও দিতে হয়। আর একটু তরকারির জুস্। মশলা ছাড়া।'

'দাঁত উঠেছে?'

'একটা।'

'তবে দু'টো দু'টো ভাত দিলেই পারিস? অবশ্য যতটা হজম করতে পারে।'

বীথি অল্প হাসল।

'এ কি আর আমাদের ঘরের বাচ্চা দিদি। বড়লোকের ছেলে। মিহিরবাবু তো স্রেফ দুধ আর নেবুর রস এ্যাদ্দিন চালিয়ে আসছিলেন। অতটুকুন বাচ্চাকে ভাত দেবার কথা ভদ্রলোক হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তবু তো শুনলাম, এদিকে খুব কাঁদাকাটা করত ব'লে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। কিছু অসুখ নেই ডাক্তার বলেছে। কেবল খাওয়াটার পরিবর্তন করে দিয়েছে। দুধ ছাড়াও সুজি, ওটস্, ডিম, একটু সেদ্ধ আলু, তরকারির জুস্, টমেটোর রস মিলিয়ে এতবড় এক ফর্দ তৈরি ক'রে দিয়েছে। এবং কখন কোনটা খাবে তার ঘড়ি ধরা সময়। একটু নড়চড় হ'লে চলবে না।'

'মা-মরা ছেলে বড় বড় ক'রে তোলা শক্ত কাজ।' প্রীতি মন্তব্য করল। দু' বোনের

কথাবার্তা শুনে মা'র ঘুম ভেঙে গেছে। ভুবনগিন্নী একবার কাশল। কিন্তু প্রীতি বীথি তা গ্রাহ্য না ক'রে কথা বলতে লাগল। তা ছাড়া বীথি কাল মাকেও তার কাজটা কোথায়, কি ধরনের বলেছে। বলেছে এবং বুঝিয়েছে। অফিসে এক গাদা পুরুষের সঙ্গে ব'সে কাজ করার চেয়ে বরং এটা অনেক ভাল। আর কত নির্দোষ কাজ। একটি মা-হারা শিশুকে মানুষ করার দায়িত্ব এবং মহত্ব সন্তানের জননী হয়ে ভুবনগিন্নী অস্বীকার করতে পারেনি। শুনে এ সম্পর্কে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য করা দূরে থাক, বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বড় বোনের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলছে শুনে মা আরো বেশী নিশ্চিন্ত হয়। এবং আরো একটু সময় দু' মেয়ের কথায় কান পেতে থেকে পরে গলা পরিষ্কার ক'রে আস্তে আস্তে বলল, 'নিয়মিত তেলটেল মাখাস তো খোকার গায়ে ?'

'ধোৎ।' মা'র কথা শুনে বীথি শব্দ ক'রে হাসল। 'কি তেল, সর্ষের তেল ? হি-হি। মিহিরবাবু যদি তোমাকে এ-কাজে বহাল করত তবেই হয়েছিল আর কি। গাদা গাদা তেল মাখিয়ে আর তেলতেলে কাজল পরিয়ে ছেলেটাকে সারাদিন সঙ সাজিয়ে রাখতে।'

'রমেশের ঘরের বাচ্চাটাকে যেমন রাখা হয়।' প্রীতি একটা দৃষ্টান্ত তুলল।

ভুবনগিন্নী একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোদেরও রেখেছি ছোট বেলায়। তখন দিনকাল ভাল ছিল, টাকায় তিন সের সর্ষের তেল পাওয়া গেছে। এখন তোদের ছোট ভাই ষষ্ঠীটার সময়ই তো আর তেলটেল মাখাতে পারলাম না। সর্দিতে ভুগছে সারা বছর।'

বীথি বলল, 'না মা, বড়লোকের বাচ্চা। মিহিরবাবু সর্ষের তেলের পক্ষপাতী না। অলিভ অয়েল এনেছেন বাচ্চার জন্যে, দু'রকমের পাউডার, দু' বাক্স সাবান। আধ ডজন তোয়ালে তো কেবল ওই বাচ্চাটার জন্যেই সর্বদা ধুইয়ে মজুত রাখা হয় দেখছি। আমাকে পরশু খোকার জিনিস-পত্র সব বুঝিয়ে দিতে চোখে পড়ল!'

কথা বলল না ভুবনের স্ত্রী।

প্রীতি ছোটবোনের পেটে আঙুলের ছোট একটা গুঁতো দিয়ে বলল, 'মাকে বলু না, মিহিরবাবু আজ তোকে আসবার সময় কি বলছিল।'

বীথি হঠাৎ কথা বলল না।

লজ্জা পেয়ে কথাটা প্রকাশ করছে না অনুমান ক'রে মা বলল, 'কি বল্ না। খেতে টেতে বলছিল ? ফাজিল ফক্কর লোক না, কাল তোর কথা থেকে বুঝলাম। চলাবলায় ভদ্রলোকের সন্তান। কি আরো শাড়িটাড়ি কিনতে মাস না পুরতেই আবার কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল নাকি ?'

বীথির হয়ে প্রীতি বলল, 'রাতে ওখানে থাকতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করছিল। অবশ্য এটা তোমাদের অনুমতি নিয়েই হবে। তোমার আর বাবার। আলাদা কামরা আছে, মানে বীথি যে ঘরে থাকবে। ভিতর থেকে চাবি আটকাবার ব্যবস্থা। সেদিক থেকে ভয়ের কিছু নেই।'

ভুবন-গিন্নী হঠাৎ কথা বলল না। •

বীথি বলল, কেবল তাই না। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ি তার দাদার শ্বশুরের। মিহিরবাবু,—মানে আমি যদি ইচ্ছা করি সেখানেও রাত্রে শুতে পারেন। সেদিক থেকে সমস্ত রকম বন্দোবস্তই আছে। তারাও মস্ত বড়লোক, কামরার পর কামরা খালি পড়ে থাকে। লোক নেই থাকবার।'

'তা তুই কি বলে এলি?' ভুবন-গিন্নী প্রশ্ন করল।

'বা-রে! তোমাদের অনুমতি না নিয়ে আমি এ-কথার কি জবাব দিই?'

'প্রীতি কি বলছিস্?'

'আমি কি বলব।' প্রীতি মাকে বোঝায়, 'তুমি মা, তুমি বলবে বীথির এখন এ-কথার রাজী হওয়া উচিত হবে কি না। তবে আমার বোন। এই হিসাবে বলতে পারি, শক্ত মেয়ে, সেদিক থেকে ভাবনার নেই। এখন ছেলে যদি বেশি কাঁদাকাটা করে। মিহিরবাবুর যদি একেবারেই না রাখতে পারেন তবে ভদ্রলোক রাত্রে থাকতে পারে বাড়িতে এমন নার্সই হয়তো রাখতে চেষ্টা করবেন পরে। কি করে বলি এখন?'

'কান্না ব'লে কান্না', বীথি মাকে শোনাল, 'আমার ব্লাউজ কামড়ে ধরে কাঁদছিল অতটুকুন বাচ্চা যখন কোল থেকে নামিয়ে তাঁর হাতে দিই। আসতে পারি না।'

প্রীতি বলল, 'আমি হলে এতটা হ'ত না। আমি দু'দিনেই অত আদর ঢালতে পারতাম না আর এক বাড়ির বাচ্চা ছেলের ওপর। অর্থাৎ ভিতর বার দু'টোই আমার একটু বেশি শক্ত। বীথির এদিকটা চিরকালই কেমন কাঁচা। দাঁখোনা কতদিন আমাদের ষষ্ঠীটাকে নিয়ে কী হৈ-চৈ করে।'

'হ্যাঁ, মা হওয়ার ধাত কারো কারো একটু বেশি থাকে। বীথির মধ্যে এটা বেশি আমি স্বীকার করি।' ভুবন-গিন্নী লম্বা নিশ্বাস ফেলল, 'এখন ভদ্রলোকের ছেলেকে আড়াই দিনেই এমন মায়া ধরিয়ে দিলি। রাত্রে তিনি শিশু রাখার কি ব্যবস্থা করেন। বিপদের কথা বৈকি।'

'ভেবে দ্যাখো।' বীথি দিদির গলা জড়িয়ে ধরল। 'যদি বোঝ দিদি এখন যে টাকা পাচ্ছে তা দিয়েই আমাদের বড় সংসারের সব খরচ চলে যাবে আর টাকার দরকার নেই বা এই নিয়ে দিনরাত মাথা ফাটাফাটি চিৎকার হল্লা করবে না, তবে কাল আমি 'না' বলে আসি। কেননা আমারও এভাবে সারাদিন আদর ক'রে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কোলে রেখে তারপর সন্ধ্যাবাতি লাগতে একটা শিশুকে একলা ফেলে রেখে আসতে খুব কষ্ট হয়। পুরুষমানুষ বাচ্চাকে কতটা আদর দিতে পারে তা তুমিও ভাল জান। আড়াই দিনে আমার ওপর মায়া ধরেছে। আর দু'দিন না গেলে সেটা ভুলে যাবে। ভাল নার্স পাওয়া গেলে এবং রাত্রে কাছে শুতে পারলে মিহিরবাবুর ছেলের স্বাস্থ্য আরো ভাল হবে, আমি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই কাল টের পেয়েছি।'

ভুবন-গিন্নী নীরব।

এবং আমারও আর ঠিক কবে কোথায় চাকরি হবে তার কিছু ঠিক নেই। এখন কমলাদিও এবাড়ি ছেড়েছে। কাজেই কেবল দিদির দিকে তাকিয়ে আমার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করবে বাকি রাত ভেবে ঠিক কর। দিদির কানে সেজন্যেই একটু আগে

কথাটা তুলেছিলাম।'

প্রীতি বালিশের মধ্যে মাথা গংজল। যেমন ঘমে পেয়েছে। চোখ দ'টো একেবারে বজে বড় রকমের একটা হাই তুলে বলল, 'বিশ্বাস মা, বিশ্বাস। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখেই তো তুমি আমাদের এতগলো ভাইবোনকে জন্ম দিয়েছিলে। ভরসা ক'রে এসেছ, তোমরা যদি খাওয়াতে না পারো তো ঈশ্বর এদের কাউকে উপোস রেখে মরতে দেবেন না। একভাবে তিনি-চালিয়ে নেবেনই—'

যেন ভুবন-গিন্নী কি বলতে চাইল। কিন্তু আরম্ভ করার আগেই প্রীতি বলল, 'সেই ভগবানকে ডেকে প্রথমদিন আমায় বাইরে পাঠিয়েছিলে চাকরি করতে মনে আছে? তা-ও দেখতে দেখতে তিন বছর ঘরল। অঘটন যখন ঘটাইনি, বীথিও তা করবে না। রাত্রে থাকাটা তো বড় কথা না। খারাপ রাস্তায় যে যাবার দিনের বেলাও তার রাস্তা খোলা থাকে।'

প্রীতি শেষবারের মত চোখ খলে বেশ একটু বড় গলায় মাকে বলল, 'বীথিকে কালই আবার কাজ ছাড়িয়ে বাড়িতে বসাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি সামনের মাস থেকে ষাট টাকা ক'রে দিতে পারব না ব'লে রাখছি। গত মাসেই কথাটা বলব ভেবেছিলাম। অন্তত পাঁচটা টাকা ক'রে রাখতে না পারলে আমার পলিসির প্রিমিয়াম চালাতে পারব না। অন্তত কিছুদিন তো দিই, দিয়ে না হয় পরে পেড্-আপ ক'রে রাখা যাবে। না, না, ইন্সিওর যখন করিয়েছি, সামান্য ক'টা টাকার জন্যে সেটা নষ্ট হ'তে দেব না।'

'না, কেন নষ্ট হ'তে দিবি।' ভুবন-গিন্নী নিশ্বাস ফেলল। 'ভারি তো দ'টি হাজার টাকা। তা-ও যদি ভবিষ্যতের মতন নিজের একটা সম্বল ক'রে না রাখবি তো উপায়ই বা কি। বিয়ে থা তো আর শীগগির হবে এমন আশা দেখছি না। তব না হয় ভাবতাম একটা খটি থাকবে আপদে বিপদে।'

বীথি লেপের বাইরে মখ এনে বলল, 'থাক মা, রাত দপরে তুমি এখন প্রজাপতির বিলাপ গাইতে শর করো না। বিয়ে বিয়ে ক'রে ওঘরের ডাক্তারনী সনীতিকে কি অবস্থায় এনে ফেলেছে শনলে তো সব। এখন আমি কাল গিয়ে ভদ্রলোককে কি বলব, সেটা ঠিক কর।'

কথাটা শেষ করার সময় বীথি হাল্কা গলায় একটু হাসল। প্রীতি হাসল। মা হাসল। হেসে বলল, 'সত্যি প্রভাতকণার না হয় মাথা খারাপ, কিন্তু সনীতিটা কী! তুই রোজগেরে বাপের মেয়ে। তুই যদি বিয়ের নামে অইটকুন বয়েস থেকে অজ্ঞান হ'তে আরম্ভ করিস তো মশকিলের কথা।'

'চাবক মারতে হয় এসব মেয়েকে।' প্রীতি দাঁতে দাঁত ঘষল। 'টাইপ বস্তির মেয়ে। ঘরে থেকে এরা যত দর্নাম, কেলেঙ্কারি ছড়াচ্ছে, যারা চাকরি করতে গেল তাদের দিয়ে তার ছটাকও হচ্ছে না। তারাই বরং এখন ভাল।'

'সনীতিটাকে দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।' বীথি দিদির কোমরে হাত রাখল। 'এত বড় একটা খোঁপা। আলতা। রঙিন সায়া। চুড়ি। মাকড়ি। ওয়াক থঃ, সারাক্ষণ বিয়ের কনেটি সেজে আছে।'

'ওই থাকে এক এক জাতের মেয়ে।' প্রীতি আর চোখ খুলল না। 'খেয়ে আর বিয়ে ক'রে কতকগুলো শেয়ালকুকুরের জন্ম দিতে কেবল সংসারে বেঁচে থাকতে চায়। এখন বড় হয়েছিস। একটু একটু ক'রে চিনতে পারবি, চেহারা দেখলে বুঝবি কোন্ মেয়ের কি চরিত্র।'

বীথি কথা না ব'লে কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে অনেকটা নিজের মনে এক সময় বলল, 'ইস ভুলে গেছি। টড্‌লার কথাটার মানে জিজ্ঞেস করা হ'ল না। তোর মনে আছে দিদি।'

'না…না।' প্রীতির ভীষণ ঘুম পেয়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলল, 'কি হবে ওই শব্দ দিয়ে, কোথায় পেলি ?'

'আর বলো না। টুটুলের বিলিতি দুধের টিনে ব্যাটারা এমন সব লম্বা লম্বা কাগজ ঢুকিয়ে রাখে, অবশ্য ওগুলো দেখে সেই নিয়মে বাচ্চাদের ফুড্ খাওয়াতে হয়। সব কটা ইংরেজী শব্দের মানে বুঝতে পারিনি। আজ এসেই বারো নম্বরের রুচিদিকে জিজ্ঞেস ক'রে দু'টো শব্দের মানে জেনে নিয়েছি। টড্‌লার আর জিজ্ঞেস করা হ'ল না।'

'কে রুচিদি ? ইংরেজী ভাল জানেন বুঝি ?'

'অই তো সেদিন এল স্বামী-স্ত্রী। একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। বৌ-টা মাস্টারি করে। ভদ্রলোক খুব সম্ভব বেকার।' বীথি ভয়ে ভয়ে বাবার প্রশ্নের জবাব দিল। মেয়েদের কথাবার্তায় ভুবনের ঘুম ভেঙেছে বোঝা গেল। এই মাত্র তার হাই তোলার শব্দ হল। 'বুঝেছি বুঝেছি, এখন বুঝতে পেরেছি।' ভুবন অন্ধকারে মাথা নাড়ল।

এতক্ষণ পর ভুবন-গিন্নী কথা বলল।

'বেশ আছে ভদ্রলোক। খুকির বাবা। বৌয়ের রোজগারে খায় দায়। ফরসা কাপড় জামা পরে বেড়ায়। দাড়িগোঁফ কামায়, মুখখানা আয়নার মত ক'রে রাখে। সিগারেটও মুখে দেখি। কাচ্চাবাচ্চা বেশি নেই। অই একটা মোটে মেয়ে। তাই বৌ যা আনছে কুলিয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট কম। সন্তান বেশি থাকলে আমাদের মত ঠেকত। ইস্কুলের মাস্টারের চেয়ে টেলিফোন অফিসের মাইনে বেশি। প্রীতি কি আমার কম আনছে। কিন্তু কুলাতে পারছি কই। বীথিটাকেও লেখাপড়া সাঙ্গ দিয়ে চাকরিতে ঠেলতে হ'ল। উপায় কি। কিন্তু বীথিরটা যোগ করলেও এই রাবণে সংসারের সব দিকের অভাব যে আমি মেটাতে পারব মনে তো হয় না।'

ভুবন আর কথা বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন না, সে একটা কথা বললে স্ত্রী এখন আটটা কথা বলবে। চাল ডাল ঘরভাড়া ঘুটে কয়লা কেরোসিন ইত্যাদি মাসের মোটা মোটা খরচ থেকে হিসাবটা গিয়ে ভুবনের আফিং এবং সামান্য এক-পো দুধের ওপর গিয়ে চড়াও হবে ভয়ে ভুবন চুপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তার সকল অসহায়তা ঘোষণা করল।

বীথি লেপের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে চুপ ক'রে রইল। মা-বাবার কথা আরম্ভ হলে তারা কথা বলে না। প্রীতির রীতিমত নাক ডাকছিল।

পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত আকাশ ঘোলাটে হ'য়ে রইল। পাতলা মেঘ তার কুয়াশায় মিলে বিশ্রী আবহাওয়া। না, এই কুয়াশায় ঘাস ভিজে না, গাছের পাতা শুকনো থাকে। কুয়াশার ধার কমে গেছে। আর কি, এইবেলা ছেঁড়া লেপ-কম্বল-কাঁথা গুটিয়ে ফেল, আর পাঁচ সাত দিন। ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা, টিন তেতে এমন হয়ে থাকবে যে, লেপ কম্বল কাঁথার দিকে চোখ গেলে গা বমি-বমি করবে। তা'ছাড়া তেলে ময়লায় ধোঁয়ায় ধুলোয় এক এক ঘরে বিছানার চেহারা এমন হয়ে আছে যে এমনিও ওগুলোর দিকে তাকাতে এখনই আর ইচ্ছা করে না। আর কি। শীত গেল।

এ বাড়িতে লক্ষ্মীমণি সকলের আগে ছেঁড়া কাঁথা কম্বলগুলো একটা ইঁদুরে খাওয়া চটের মধ্যে পুরে বাঁধতে বসে।

'তোমার সবটাতেই এবার তাড়াহুড়া সাধনার মা, লক্ষণ ভাল না।' বুড়ী প্রমথর দিদিমা জানালায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা খনখনে গলায় হাসছিল।

আর সেই হাসির শব্দে রকে চৌকাঠে সিঁড়ি কুয়াতলার সিমেণ্টের ওপর কালো হয়ে বসে থাকা মাছিগুলো নড়েচড়ে উঠছিল। ঠাণ্ডা কমছে আর মাছির ঝাঁক বড় হচ্ছে, বাড়ছে।

ওদিকে স্নানের ধুম পড়ে গেছে। মেয়েদের। এবাড়িতে এখন মেয়েরা ছাড়া আর এত সকালে স্নান করে কারা। রুচি প্রীতি বীথির সকালে কাজে বেরোতে হয়। তাছাড়া মল্লিকারও সকালে স্নানটি ক'রে তবে রান্নাটি চড়াতে হবে। রমেশ এই বিষয়ে ভীষণ সতর্ক। রাত্রিবাসের পর স্ত্রী ওমনি হেঁসেলে ঢুকবে তা সে কোনমতেই সহ্য করবে না। মল্লিকা হেসে হেসে কুয়াতলায় অন্যান্য স্নানার্থিনীকে প্রত্যেক দিন বেলা সাতটায় স্নান করতে এসেই খবরটা জানিয়ে দেয়। আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। স্নান করতে আসে প্রমথর বুড়ী দিদিমা। অর্থাৎ লক্ষ্মীমণিকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে আসবে ইচ্ছাতেই বুড়ী তার জানালায় উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মীমণি তখন কাঁথাকম্বল গুটাতে ব্যস্ত।

মাছি আর ময়লার গন্ধ। দিনটা ভাপ্‌সা হলে, কোন কারণে রোদ অনুপস্থিত থাকলে আর রক্ষা থাকে না। কাঁচা ড্রেনের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। অবশ্য কুয়াতলায় বীথির দামী সাবানের গন্ধটাও বারো ঘরের উঠোনকে কম আমোদিত করছিল না।

অর্থাৎ বারো ঘরের উঠোন বারান্দা সিঁড়ি চৌকাঠের মাছির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ির পিছনে আমগাছটা ছেয়ে যেমন গুটি এসেছে, তেমনি ময়লার দুর্গন্ধ ছাপিয়ে বীথির দামী মাখনের মত তকতকে নতুন নরম সাবানটা গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

এমন সময় প্রীতি বীথির হাসি বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মীমণির সকাল সকাল হাসপাতালে যাওয়ার গল্প একটু সময়ের জন্য স্থগিত রইল। অর্থাৎ ঠাট্টা থামিয়ে প্রমথর দিদিমাও খবরটি মনোযোগ দিয়ে শুনল।

যেন মাঘের শেষে ফাল্গুন ছুঁই-ছুঁই সকালের এক টুকরো মিষ্টি হাওয়া সংবাদটা সকলের কানে কানে রটিয়ে দিয়ে গেল।

মুখে বলতে হয়নি। হাওয়া মারফত জানাজানি হয়ে গেল।

এমন কি চিকেন্‌ পক্স-এ আক্রান্ত শয্যাশায়ী ও-ঘরের বিমল পর্যন্ত কি ক'রে খবরটা পেয়ে গেছে। মশারীর তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে হিরণকে বলছে, 'যাও না, ভাল ক'রে জেনে এসো, সত্যি কি গুজব।'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হিরণ খুক্‌ খুক্‌ হাসছে।

'গুজব হবে কেন, ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে গেছে পুলিশে খবর দিতে।'

'তা কখন, রাত ক'টায় পালিয়েছে? কার সঙ্গে পালাল, এ্যাঁ, এমনিতে দেখতে ভেজা বেড়ালটি মনে হ'ত।'

এবার মুখের আঁচল সরিয়ে হিরণ খিলখিল করে হাসল। 'মেয়েদের দেখতে আবার শুকনো দেখায় কখন।'

'তা বটে, কারণে অকারণে তোমরা অষ্ট প্রহর ভিজে আছ।' হি-হি হেসে বিমল প্রশ্ন করল, 'কার সঙ্গে সুনীতি পালিয়েছে বললে? কি করে গেল?'

হাসি থামিয়ে হিরণ বলল, 'আর কার সঙ্গে, ওই সুধীর মামা, এটা আবার বলতে হয় নাকি। কি ক'রে গেছে তা জানে কে। সুনীতির মা তো বলছে, দরজায় খিল দিয়ে ডাক্তার আসবার আগে সন্ধ্যাসন্ধিই শুয়ে পড়েছিল। ডাক্তার ফেরে রাত সাড়ে বারোটায়। সুনীতিই দরজা খুলে দেয়। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কি একটা নাকি বই পড়ছিল।'

'কি আবার বই। নাটক নভেল হবে।' বিমল হালদার গলায় একটা শব্দ করল। 'ওই কুমারী বয়সে মেয়েদের নাটক নভেল পড়তে দিলে আর সিনেমা দেখতে দিলে এই অবস্থাই হয়। ছি ছি, শেষ পর্যন্ত বাপ মাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সুনীতি পালাল। বজ্জাত, আজকাল মেয়েগুলো এক একটা যেন বজ্জাতের ধাড়ি। কী বা চলাফেরার রকম, কী বা কথা বলার ঢং। গালার ফ্যাক্টরীতে যেতে-আসতে আমি তো ওদের ভিড়ের ঠেলায় অস্থির, বাসে উঠতে পারি না, বসতে পারি না, বাস থেকে নামতে পারি না। আর তলে তলে এদিকে করছেন এসব কর্ম। উহুঃ। আপিস করছেন যিনি তিনিও যেমন, ঘরে থেকে চালের কাঁকর বাছেন, কি বুড়ো বাপের ছেঁড়া কোটে তালি লাগান, তিনিরাও এখন সেই চরিত্রের হয়েছেন। ফাঁক পেলেই পীরিত, সুবিধে পেলেই পালিয়ে যাওয়া।'

বুড়ী দিদিমা খনখনে গলায় মল্লিকাকে বলল, 'আর একটা প্রাণী এবাড়ির মায়া কাটাল। কাল গেছে কমলা, পরশু গেল কিরণ আর অমল।'

'কমলা শিশিরকে সিবিল ম্যারিজ করছে শুনেই তো প্রভাতকণার মেয়ে মামার সঙ্গে ঝুলে পড়ল। বিয়ের জন্য মুখপুড়ির ক'রাত চোখে ঘুম ছিল না কে জানে। আ কলঙ্ক।'

'বলি সুধীর হারামজাদা কত রাতে ঢুকেছিল, এবাড়ি কে জানে। উঠোনে ঢুকেছিল?'

লক্ষ্মীমণি চোখ বড় ক'রে মল্লিকার কানে কানে কি বলতে মল্লিকা মাথা নাড়ল।

'আমিও চার নম্বর ঘরের দরজায় আঙুলের টোকা শুনলাম। ক'টা তখন রাত? হ্যাঁ, তিনটা হবে।'

'আমিও শুনেছি। একবার ভাবলাম ও-ঘরের দরজায় টিকটিকি ডাকছে। কিন্তু তারপর আর একবার টোকা পড়তে বুঝলাম মানুষ।'

বীথির মা'র দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীমণি বলল, 'তা দিদি এখন শোনা আর দেখা, একই কথা। জানালার পাল্লাটা ফাঁক ক'রে অন্ধকার উঠোন, তবু দেখে বেশ বুঝলাম মানুষ। একটা মানুষের মূর্তি। তারপর দু'টো মানুষের মূর্তি যেন দরজার কাছ থেকে সরে এসে আবার উঠোনে নামল। উঠোন পার হয়ে সদর দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

লক্ষ্মীমণির বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে কুয়াতলার লোকগুলো চুপ ক'রে রইল। তাদেরও চোখ বড় হয়ে গেছে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে।

'তা তখন ডেকে কিছু বলতে যাওয়া বিপদ।' ঢোক গিলে লক্ষ্মীমণি হেসে সকলকে বোঝাল।

'না না দিদি, ভালই করেছেন। কার ঘরে কি হচ্ছে আমরা বলবার কে। থালা ঘটি চুরি গেলে তবু দুটো কথা বলি, কলেরা যক্ষ্মায় গেলে দোরে উঁকি দিয়ে চোখ মুছি কিন্তু এ-ব্যাপার তো ভীষণ গুরুতর ব্যাপার। আমরা কথা বলার কে। চুপ ক'রে থাকা ভাল।'

অর্থাৎ এ-সম্পর্কে আর কোনো আওয়াজ উঠল না। বাতাসে ভর ক'রে একটা চাপা ফিসফিসানি উঠোনের এ-মাথায় ঘুরঘুর করতে থাকল, এ-দরজা থেকে আর এক দরজায়।

চৌত্রিশ

এই নিয়ে শিবনাথ এবং রুচি হাসাহাসি করত। কিন্তু গত রাত্রে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হওয়াতে সকাল থেকে দু'জন খুব গম্ভীর।

স্নান খাওয়া সেরে রুচি স্কুলে বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় ময়নার হাত ধরে হঠাৎ বলাই দরজায় এসে দাঁড়াল।

এই প্রথম বলাই শিবনাথের চৌকাঠের সামনে পা রাখল।

কি ব্যাপার ? না শিবনাথকে চাই না। 'মঞ্জুর মাকে দরকার।'

রুচির সঙ্গে বলাইর কি পরামর্শ থাকতে পারে। ভেবে শিবনাথ পিছনে তার মেয়েকে দেখল। আঁচলে চোখ মুছছে ময়না। হাতে একটা ভাঙা শেলট ও একটা বই। বর্ণবোধ। এত বড় মেয়ের হাতে দু আনা দামের লাল চটি বইটা দেখে ভিতরে ভিতরে শিবনাথ হাসল। কথা বলল না। বলাইর দরকার রুচিকে। তাই রুচিকে চৌকাঠের বাইরে যেতে পথ করে দিয়ে শিবনাথ একপাশে সরে দাঁড়ায়।

'ময়নাকে ইস্কুলে দিতে চাই।'

'ভাল কথা।' রুচি শিক্ষয়িত্রীসুলভ মন্তব্য করল। 'আরো আগেই দেয়া উচিত ছিল।'

বলাই আঙুল দিয়ে নিজের কপাল দেখাল। 'দুর্ভোগ না কাটলে কিছু হয় না দিদি। চোখের ওপর তো দেখছিলেন। সব আমার কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছল।

বড়বাজারের ফলের দোকান দিয়ে আমি অকূল সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলাম।'

ফেরিওয়ালার মুখে এতটা শুদ্ধ ভাষা শিবনাথ আর কোনদিন শোনেনি। চিন্তা করল কিন্তু হাসিটা সে প্রকাশ করল না।

'কোন্ স্কুলে দেবেন ঠিক করেছেন?'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।' বলাই আড়চোখে একবার শিবনাথকে দেখে রুচির দিকে তাকায়। 'না, এসব ধারে-কাছের ইস্কুলে মেয়েকে আমার দেবার ইচ্ছা নেই। তাই তো মেয়ে ঘরে থেকে এ দু' বছরে আরো বড় হয়ে ওঠার কারণ। এখানকার ইস্কুল সব চোর-চামার ইতর হা-ভাতের ছেলেমেয়েদের জন্যে। এগুলো বস্তির ইস্কুল! আমি শহরে পড়াবো মেয়েকে।'

রুচি নীরব।

যেন বলাইর এতটা ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে শিবনাথ চৌকাঠের এপার থেকে মন্তব্য করল, 'এখানকার স্কুলে এখন অনেক ভাল ভাল লোকের ছেলেমেয়ে পড়ছে। চোর-চামার যেমন আছে, ভদ্রলোকও বিস্তর।'

শিবনাথের কথার জবাব দিল না বলাই। পকেট থেকে একটা নতুন কেনা মণিব্যাগ তুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে রুচির দিকে বাড়িয়ে দিল।

'ধরুন। আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গেই যাবে আসবে শহরে। কাজেই আপনার ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিন। আমি কাল রাত্রে এই নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। না, চিংড়িঘাটার বেলেঘাটার বিদ্যা ঢেলে মেয়েকে আমি তৈরী করতে চাই না দিদি। কাজেই আজই ওকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। ভর্তি করে নিন।'

দেখা গেল আবার আঁচলে চোখ-চাপা দিয়েছে ময়না। হাত থেকে লাল চটি বইটা মাটিতে পড়ে গেল। শেলেটটা পড়ল না যদিও।

'বঁটি দিয়ে তোর গলা আমি দু'ফাঁক করে দেব বানর মেয়ে। ইস্কুলের নামে এখন কান্না। এতকাল খরচে কুলোতে পারিনি, ধেই ধেই করে পাড়ায় ঘুরে খুব পেয়ারা জাম খাওয়া হয়েছে। আর না। এই বেলা—'

নুয়ে মাটি থেকে বইটা তুলে মেয়ের হাতে গুঁজে দেয় বলাই। ধমক খেয়ে কান্না থামিয়ে ময়না আবার চোখ মোছে।

টাকাটা হাতে নিয়ে রুচি বলল, 'হয়তো আরো কিছু লাগতে পারে। তা দেখা যাবে। অবশ্য টেস্ট না করলে এখনও আমি বলতে পারছি না কোন্ ক্লাশের অ্যাড-মিশন দেয়া হবে।'

'আমি মেয়ে আপনার হাতে তুলে দিলাম। যা খুশি যেমন খুশি এখন করুন। আমি চাই না দুপুর বেলাটা বাড়িতে থেকে পাড়ায় থেকে আর ও সময় নষ্ট করে। এখানকার হালচাল আপনার তো অজানা নেই খুকির মা।' বলাই গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল।

'আচ্ছা।' রুচি পরে ময়নাকে ডাকল। 'আমার কাছে আয়।' ময়না রুচির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রুচি সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখল।

'ইতর। ইতর ছাড়া এখানে মনিষ্যি বাস করে নাকি।' বলাই হঠাৎ ওপাশের

সবগুলো ঘরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'আপনি বলুন মঞ্জুর মা, বয়সে কি যায় আসে। লেখাপড়া যে-কোন বয়সে আরম্ভ করতে পারে মানুষ। কথাটা মিছা বলছি?'

'না।' রুচি বলল, 'গরিব দেশ। ঠিক সময়ে ছেলেমেয়েকে সবাই স্কুলে দিতে পারছে না। আমি তো দেখছি। আমার স্কুলে ময়নার চেয়েও বড় মেয়ে একেবারে নিচের ক্লাসে পড়তে আসে।'

'তবেই বুঝুন।' বলাই চোখ বড় করল। 'আর কাল নাকি, আমি পরে ঘরে এসে শুনলাম, বিধুমাস্টারের কোন্ মেয়ে মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করছিল—এখন যদি ময়না বর্ণপরিচয় ধরে, তবে আই-এ বি-এ পাশ করতে ঠানদি হয়ে যাবে। আই-এ বি-এ পাশ! ওই যে কথায় বলে, ছাল নেই কুত্তার বাঘা ডাক। বলি বিধুমাস্টারের ঘর তো লেখাপড়ার আওয়াজে আটপহর গমগম করছে। আর খবর পাই ওদিকে তিন দিন ধরে চলছে মাসকলাই সিদ্ধ। পরশু, আপনি বিশ্বাস করবেন, চার গণ্ডা পয়সা ধার চেয়ে বিধুমাস্টার আমার পায়ে ধরা বাকি। এই তো অবস্থা। ঘরে মা মেয়ের বিদ্যার মকমকানি শুনে মরে যাই—'

'থাক, এসব আলোচনায় এখন দরকার নেই।' রুচি গম্ভীরভাবে বলল, 'ময়নাকে আমার ইস্কুলেই ভর্তি করতে চেষ্টা করব। হয়তো আজকেই করানো যাবে না। দেখা যাক, কতদূর কি হয়।'

'তাই দেখুন, আরো টাকা লাগলে আমি দেবে।' বলাই ময়নার দিকে চোখ হেলাল। 'তবে তাই কর্। এনার সঙ্গে চলে যা। দুপুরের জলখাবারের পয়সা নিবি?'

'না।' মুখ না তুলে ময়না জবাব দিল।

'আচ্ছা, আমি চলি। দেখুন আমার যদি এই উপকারটা করতে পারেন।' বলাই আর কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে উঠোন পার হয়ে ঘরে ঢুকল না, সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গায়ে নতুন শার্ট, পায়ে নতুন চটি।

কাপড়-চোপড় পরে রুচিও বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে বলাইয়ের মেয়ে আর মঞ্জু।

শিবনাথ তখন রুচির সঙ্গে খেতে বসেনি। অন্যদিন তা-ই করে। কিন্তু আজ, আজ মাথায় অনেক চিন্তা, মন বিক্ষিপ্ত।

অবশ্য রুচি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেটের ক্ষুধা সে সুন্দরভাবে অনুভব করে।

তার সময়মত ক্ষুধা হয়, স্বাস্থ্য আজ পর্যন্ত অটুট আছে মনে করে শিবনাথ কম খুশি হল না।

শিবনাথ আয়নায় নিজের মুখ দেখল! হাত দিয়ে গাল অনুভব করল।

স্ত্রী রোজগার করে খাওয়াচ্ছে। চাকরি করে সংসার খরচ চালাচ্ছে। এই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে রুচির এই দু'বছরের আত্মম্ভরিতার সামনে দাঁড়িয়ে লড়বার মত যদি কিছু থেকে থাকে শিবনাথের তো তার এই অপরিমিত স্বাস্থ্য এবং প্রায় সবদিক থেকে সুশ্রী এই চেহারা। আয়নায় নিজের মুখ দেখে শিবনাথ আর একবার খুশি

হয়ে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ হাত থেকে আরশি নামিয়ে শিস দিতে দিতে সে কুঁজো থেকে এক প্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ওধার থেকে চট করে একটা থালা তুলে নিয়ে ডেকচির সবটা ভাত ও বাটির সবটুকু ডাল ঢেলে খবরের কাগজ বিছিয়ে বিছানার ওপরই খেতে বসল, যা সে কোনোদিনই করে না। কিন্তু আজ সে অনেকক্ষণ ধরে আধশোয়া হয়ে বসে আরামে খেতে খেতে রুচির চরিত্র সমালোচনা করবে বলেই এটা করল। তাছাড়া পিঁড়িটা একটু অপরিচ্ছন্ন লক্ষ্য করেই শিবনাথ আর সেটা টানল না।

হ্যাঁ, মোক্ষম কথা আজ শুনিয়ে গেছে স্বামীকে কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের টিচার। ভোরবেলা বিছানায় থেকে অন্তরের গুপ্তকথা বেরিয়ে পড়েছে।

না, বড়লোকের বাড়ির ট্যুইশন নিয়ে কাজ নেই। হাতের কাছে আর একটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না? না যায় দেখা যাবে। এমনি তো ক'মাস ঘরেই বসা। কাজেই, এভাবে না হয় আরো কিছুদিন কাটুক। অভাব? নতুন কিছু না। এবাড়ির আর পাঁচটা পরিবার যে ভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে হবে, উপায় কি বল। শিবনাথ ডালমাখা ভাতের গ্রাস হাতে তুলে স্ত্রীর সৎপরামর্শটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু জিনিসটা তার কাছে নতুন ঠেকল। আর পাঁচটা লক্ষ্মীছাড়া পরিবারের মত হাজার অভাব স্বীকার করে এখানে এই বাড়িতে থেকে যাওয়ার সুমতি রুচির কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তা-ই সে অবাক হয়ে ভাবে। কাল রাত্রে কে. গুপ্তর ঘরে গিয়ে রুণুর জন্য বেবির মাকে সহানুভূতি জানানো ও আজ বলাইর প্রস্তাবে রীতিমত খুশি হয়ে ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর সঙ্গে গার্লস স্কুলের টিচারের বস্তি-প্রীতিটা সুন্দরভাবে খাপ খেয়েছে। ভাল ভাল ভাল। রুচির শিক্ষয়িত্রীসুলভ চরিত্রের পরিচয় এতকাল পর পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। ঢক্ ঢক্ করে প্লাসের জলটা গলায় ঢেলে শিবনাথ একটু স্থির হয়ে চিন্তা করল। দি ভেরি আউটলুক। হবেই, হতেই হবে। যে কাজে তার স্ত্রী আজ ক'বছর লেগে আছে, তা বিচার করলে এর চেয়ে উন্নত উদার বা মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছ থেকে আশা করা অন্যায়। দীপ্তির সমিতিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবে শিক্ষয়িত্রীর মন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, দীপ্তির ছেলেমেয়েকে পড়ানোর নামে শিউরে উঠছে। কিন্তু এসব আসে কোথা থেকে, এই মূঢ়তা, পঙ্গু অসহায়ের মত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার প্রবৃত্তি মনের কোন্ সংকীর্ণ ছিদ্র দিয়ে রুচির মধ্যে এসে বাসা বাঁধল, তা কি আর বোঝা যায় না। হ্যাঁ, শিবনাথ হাতমুখ ধুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে একলা ঘরে রীতিমত উচ্চারণ ক'রে বলল, দীপ্তি তোমার চেয়ে বড়লোক এবং রূপসী তো বটেই। সেই হিংসায় আক্রোশে বিধুর মতন বলাইর মতন বিমল হালদারের মতন বস্তির মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে যদি সাধ হয়ে থাকে এবং দরকার হলে বাড়িওয়ালার জুলুম-চলবে-না-দলের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আর একটা পাল্টা সমিতি দাঁড় করিয়ে বস্তি উন্নয়নের কাজে লেগে যাও তো আমি আশ্চর্য হই না। করতে পার।

কবে একবার, শিবনাথের মনে আছে, বেতন বাড়ানো নিয়ে শহরের মাস্টার আর মাস্টারনীরা দল বেঁধে শোভাযাত্রা বার ক'রে লালদীঘির দিকে ছুটেছিল। শিবনাথের তখন চাকরি ছিল। অনেক বলে কয়ে এমন কি শেষটায় রীতিমত ধমক লাগিয়ে

সেদিন স্ত্রীকে দলে যোগ দিতে নিবৃত্ত করে সে। দল ছাড়া হয়ে থাকলে বিপদ। তাই 'অসুখ' বলে মিথ্যে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে রুচিকে স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল শিবনাথ। হাতে নিশান নিয়ে স্ত্রী পথে পথে ঘুরবে, শিবনাথ সেদিন কোনমতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছিল না। তার রুচিতে বাধছিল। অতটা সাধারণ এতখানি নীচ মধ্যবিত্ত হতে সে আজও রাজী না।

'আর পাঁচটা পরিবার কায়ক্লেশে যেমন টিঁকে আছে'—'বড়লোকের বাড়ির ট্যুইশনিতে দরকার নেই' কথার ভিতর দিয়ে উপবাসী ছারপোকার মত বেতনভোগী স্কুল-মিসট্রেসের অভিমান বিক্ষোভ আজ অন্যভাবে ফুটে উঠেছে। ভাল। শিবনাথ আরামে চোখ বুজে বিড়ি টানে। আর দরকার নেই রাতারাতি একটা কিছু করতে হবে বলে ব্যস্ত হয়ে এখানে-ওখানে হাঁটাহাঁটি করার। শিবনাথ ক'দিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে জিরোতে পারে। সহধর্মিণীকে সে আস্তে আস্তে অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে কি। অর্থাৎ বস্তিকে ভালবাসতে? চিন্তা করে শিবনাথ মনে মনে হাসল। হ্যাঁ, পারে সে ভালবাসতে এ-বাড়ির উঠোন, এ-বাড়ির সিঁড়ি-বারান্দা, যদি মাছি ময়লা কাঁচা নর্দমার গন্ধটা না থাকে, বিধুমাস্টারের ঝাঁক কলেরায় লোপাট পায়, পাগল কে. গুপ্ত, মুখ বিমল ও মেটিরিয়া-মেডিকা-পণ্ডিত শেখর সপরিবারে রাতারাতি ঘোলপাড়া কি ধুবিতলার আরো সস্তা ঘরে চলে যায়। রমেশ ক্ষিতীশ চলে গেলেও আপত্তি নেই। প্রমথদের এমন কি অভাব অসুবিধা আছে যে এই উঠোনের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। গোঁয়ার বলাই শিবনাথের চক্ষুশূল, ঠোঁটকাটা পাঁচু তার দোকানঘরের ওপরের কামরা দু'টো দিব্যি নিজের কোয়ার্টার হিসাবে এখন ব্যবহার করতে পারে। তবে আর কে রইল, আর কোন্ কোন্ পরিবার এবাড়িতে থেকে গেলে শিবনাথ খুশি? হ্যাঁ, রুচি ও মঞ্জুকে নিয়ে তার নিরিবিলি ছোট্ট সংসার, আর উল্টোদিকের ঘরের রুগ্ন ভুবনের পরিবার। কিন্তু ওদের তো লোক বেশি, রাতদিন চেঁচামেচি লেগেই আছে, অনেক সন্তান ভুবনের। তা হোক, তা হলেও সে ঘরে এমন কেউ আছে যার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বস্তিজীবনের সব গ্লানি কতক্ষণের জন্য ভুলে থাকবে। বীথি। বলতে কি, যদি এ-বাড়িতে বীথি না থাকে শিবনাথ দরকার হলে রুচি ও মঞ্জুকে ফেলেই হয়তো পরদিন কেঁদে পালিয়ে যাবে। 'হ্যাঁ এই রকম সত্যটা আমি তোমার মুখের ওপর বলতে এখন আর দ্বিধা করছি না।' শিবনাথ জানালায় দাঁড়িয়ে কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের সেকেন্ড টিচারের সঙ্গে কথা বলল ও দুই চোখ মেলে অনেকটা রুচির ওপর আক্রোশ নিয়ে ওঘরের বীথিকে দেখতে লাগল। কাপড় পরেছে, খোঁপায় প্ল্যাস্টিকের একটা ফুলের মালা জড়িয়েছে। আরশি সামনে ধরে ঠোঁটটাকে কামড়ে লাল করেছে। হাত থেকে আরশি নামিয়ে রাখল। ওটা কে? বীথির ছোট ভাই ষষ্ঠী। দিদি স্নান করিয়েছে, খাইয়েছে, এখন ঘুম না পাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ষষ্ঠীচরণ কেঁদে আকুল—চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলছে। ভুবনগিন্নী তাড়াতাড়ি ষষ্ঠীকে কোলে নিয়ে বীথির সামনে এসে দাঁড়ায়। 'দে, আর একটা চুমু দিয়ে যা। সারা দুপুর তো আর তোর কোলে উঠবে না।'

'ওই আমি করি, একটু তাড়াতাড়ি বেরোব, তা-ও তোমাদের জন্যে আর হয় না।

জানো ওদিকে মিহিরবাবু মা-মরা ছেলে নিয়ে কী ভীষণ কষ্ট করছেন।'

এত বিরক্ত হয়ে বীথি কথা বলল যে মা ও ষষ্ঠীচরণ দু'জনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। প্লাষ্টিকের সুন্দর ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে বীথি বারো ঘরের উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে গেল। শিবনাথের বুক থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস উঠে এল। মনে মনে হেসে সে সার্কুলার রোডের ছোট্ট এক গলির মাথায় হলদে দোতলা বাড়ির অর্থাৎ কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের থার্ড ক্লাসের কামরায় হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসা রুচিকে সম্বোধন করে আজ আবার বলল, 'অশান্তি ভুলতে কে. গুপ্ত মদ খায়, মোহিত আর এক নেশায় ডুবে আছে এবং চাকরি যোগাড় করতে না পারার ব্যথা ভুলতে আমি প্রাণভরে অষ্টাদশী বীথিকে দেখছি। ছোট দুঃখের জন্যে ছোট নেশা। তুমি চাকরি করছ, কাজেই আমার কিছু না করাটা তেমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার না। আগে মন খারাপ করলেও এখন আর তুমি তা গায়ে মাখছ না। চারদিকের অভাব দেখে আমাদের অভাবটাও ইদানীং তোমার বেশ সয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয় তোমার পয়সায় কেনা একটা কাচের গ্লাস ভাঙলে, কি তোমার পয়সায় অতিরিক্ত এক প্যাকেট সিগারেট কিনে খেতে চাইলে যখন তুমি মুখ ভার কর, কি ছোটো-খাটো এক আধটা মন্তব্য ক'রে খোঁচা দাও—অথবা—' শিবনাথ হঠাৎ স্ত্রীর সঙ্গে কথা বন্ধ করে বীথির মত ঠোঁট কামড়ে উঠোনময় কালো মাছির ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু সময় কি ভাবল, তারপর ঠোঁটটাকে বিকৃত করে হাসল। 'অথবা অফুরন্ত রূপযৌবনের অধিকারিণী আর এক নারী, হ্যাঁ, রায় সাহেবের পুত্রবধু দীপ্তির মুখখানা দিনে অন্তত একবার দেখব তা তোমার অসহ্য। সেই অখণ্ড বেদনা ভুলতে আমি বীথির দিকে তাকিয়ে থাকি। বীথি কাজে বেরিয়ে গেলে একবার প্রীতিকে দেখব। প্রীতি আজ এমন টকটকে লাল শাড়িটা পরল কেন—'

'শালা কি সব বলে গেল আমার নামে, শুনলেন ?'

শিবনাথ চমকে উঠল। বিধু মাস্টার জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

শিবনাথের রক্ত মাথায় উঠে গেল। জানালার পাল্লা দুটো দড়াম করে বন্ধ করে দেবে কি না একবার ভাবল। মুখ বিকৃত ক'রে বলল, 'কি হয়েছে, কার কথা বলতে এসেছেন আমাকে ?'

'বলাই, শুনলেন না ? ব্ল্যাকমার্কেটে নেমে শালা কাঁচা পয়সার মুখ দেখছে তাই এমন গরব। আমার ঘরে কলাই সিদ্ধ চলছে, আট আনা পয়সা ধার পেতে নাকি ওর পায়ে ধরেছিলাম।'

চেহারাটা একটুও প্রসন্ন না করে শিবনাথ বলল, 'আমি কি করব। আপনাদের বস্তির লোক এ ওর নামে চিরকালই তো বদনাম গেয়ে আসছে। এখানে এসে অবধি শুনছি।'

'হুঁ।' বিধু মাথা নাড়ল। 'আপনার ওয়াইফকে ধরে মেয়েকে শহরের স্কুলে পাঠাল।'

'বেশ করেছে। আপনার পয়সা থাকে আপনিও পাঠান না।' শিবনাথ জানালার একটা পাল্লা বন্ধ করে দিল।

'আপনি রাগ করছেন। আমার পয়েন্ট সেটা না, তাছাড়া কলকাতার স্কুলে কি আর খুব ভাল লেখাপড়া হয়? দেখুন না গত তিন বছরের ম্যাট্রিকুলেশনের রেজাল্ট। তা না। আমি বলছি, তোর মেয়ে কোনদিনই বর্ণপরিচয়ের ধাপ পার হতে পারবে না। বছর বছর ফেল করবে।'

'কেন। খুব পেকে গেছে নাকি?' শিবনাথ সামান্য খুশির ভাব দেখাল। 'আপনি কি করে জানলেন বলাইর মেয়ের মাথায় কি আছে না আছে?'

'গোবর।' বিধু শব্দ করে হাসল। 'মশাই, ফাদার মাদার দু'জনেই যদি অশিক্ষিত হয়. সন্তানকে অক্ষর শেখানো বড় কঠিন।'

'তা কঠিন সহজ বলাই গিয়ে বুঝুক। আপনি এখন যান। আমি শোব।' শিবনাথ জানালার আর একটা পাল্লায় হাত রাখল।

'ও, শোবেন।' মুখে বলল বিধু, কিন্তু জানালা থেকে নড়ল না। 'খবর শুনেছেন বোধ করি?'

'কি খবর।' শিবনাথ ভুরু কুঁচকোয়।

'শেখরের কন্যাকে নিয়ে সুধীর ইলোপ করেছে।'

'বেগতিক দেখলে আপনার কন্যাকে নিয়েও কেউ ইলোপ করবে।' শিবনাথ নিরুপায় হয়ে কথাটা বলে ফেলল। 'যান।'

কিন্তু বিধু মাস্টার তা গায়ে মাখল না।

'আরাম হারাম হ্যায়, বুঝেছেন শিবনাথবাবু। শেখর আর তার বৌ মেয়েকে খুব আরামে রেখেছিল আর জল বিক্রির পয়সায় মাছ দুধ খাইয়েছিল। তার রেজাল্ট! আমার মেয়ে? একটি না। সুনীতির কাছাকাছি বয়সের তিনটি। মমতা সাধনা নীলিমা। উঁহু, এতটা সেক্সকন্সাস হবে তার সময় কই। লেখাপড়া নেই? বাটনা বাট, রান্না কর, কাপড় আছড়াও। হি-হি।' মুখ বিকৃত করে বিধু হাসল। 'শেখর নিজেকে একটা লর্ড মনে করত। হ্যাঁ, ওই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হয়েই। আমাকে তো ও, ইদানীং এতটা বেড়েছিল যে, মানুষ বলেই মনে করত না। এখন? মুখে চুন-কালি পড়ল তো? গড্। আপনাকে বলেছি বোধ হয় আর একদিন। ওপরে একজন আছেন, যিনি সব অন্যায়ের বিচার করেন। একদিন একটা টাকা কর্জ চেয়েছিলাম বলে তুই আমায় ইনসাল্ট করেছিলি। বার্থ কন্ট্রোল কর। মুর্খের মত এত ছেলেমেয়ে হইয়ে তুমি কি সব দিকে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। এখন? তোর তো একটি ইসু। তবে তোর ঘরে এই সর্বনাশ ঢোকে কেন। কি মশাই চুপ করে আছেন কেন?'

শিবনাথ সশব্দে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

'হ্যালো—মিস্টার।'

চারু রায়। চারু রায়কে দেখেই শিবনাথ এক-পা এক-পা করে বনমালীর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু কে. গুপ্ত বসে আছে দেখলে সে রমারম রাস্তায় নেমে যেত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য শিবনাথের, কে. গুপ্ত প্রথম কথা বলল।

'হ্যাঁ, একটা এনগেজমেণ্ট আছে একজনের সঙ্গে।' শিবনাথ কে. গুপ্তর দিকে তাকাল না, চারু রায়ের চোখে চোখ পড়তে বলল, 'নমস্কার, কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই তো।' চারু রায় হাত দু'টো একত্র করল। 'বসুন।'

গুপ্ত মুখে বলল না, হাত বাড়িয়ে শিবনাথের একটা হাত ধরে বলল, 'বসুন, মশাই বসুন। এখানে আসার দিন থেকে তো শুনছি আপনার কাজ আর কাজ। আমরা না হয় অ-কর্মার ঢেঁকি। তা বলে পাঁচ-সাত মিনিট আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করলে আপনার লাখ টাকা কিছু ক্ষতি হবে না, বসুন।' একটু ধমকের সুরে গুপ্ত হাসছিল। শিবনাথ বিরক্তবোধ করল। চারু রায় অল্প হাসল। বনমালী খাতা থেকে মুখ তুলল বলল, 'বসুন স্যার।'

পায়া ভাঙা বেঞ্চের একপাশে শিবনাথকে বসতে হ'ল।

'এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল।'

'তুই থাম গাধা, তুই থাম। আমি বলছি।' কে. গুপ্ত বলল, 'ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোল দেখলাম আপনার স্ত্রী?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'ব্যাপার?'

কে. গুপ্তর প্রশ্ন এবং ঠোঁট-চাপা হাসিটা শিবনাথের মোটেই ভাল লাগল না। দাঁতে দাঁত চেপে গম্ভীর হয়ে বলল, 'বলাই ওর হাতে পায়ে এসে ধরেছে। এখানে মেয়ে স্কুলে যেতে পারে না, সতের বছর বয়সে বর্ণপরিচয় পড়ছে দেখে বিধুর মেয়েরা ঠাট্টা করে। কাজেই শহরের ইস্কুলে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'গুড আইডিয়া।' কে. গুপ্ত নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল। 'মেয়েটা দেখতে মন্দ না। বলাইটা যদিও চাষা। তা হলেও, চেষ্টা থাকলে ময়নাটা লেখাপড়া শিখতে পারবে। বেশ বেশ ভাল। না, আমি কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে আর একটা কথা শুনেছি।'

'কি কথা।' শিবনাথের দুই কান গরম হয়ে উঠল। শিবনাথ বনমালী এবং চারু রায়ের দিকে তাকাল। একটা কুকুর পাশের নর্দমা থেকে কার জুতোর একটা ছেঁড়া শুকতলি মুখে করে এসে শিবনাথের পায়ের কাছে রেখে ছুটে পালাল। 'ননসেন্স' বলে চারু রায় নাকে রুমাল গুঁজল।

'কাল রাত্রে কি নিয়ে নাকি খুব গণ্ডগোল হয়েছে আপনার ঘরে? কি সব জিনিস টিনিস নাকি ভেঙেছে?'

একটা ঢোক গিলল শিবনাথ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম হেসে বলল, 'একটা কাঁচের গ্লাস। অসাবধানে নাড়াচাড়া করতে গেছলেন শ্রীমতী। আপনি তখন ঘরেই ছিলেন?'

'আরে ধেৎ মশাই! ঘরে। আমাকে রাত বেশি হলে ঘরে ঢুকতে দেয় নাকি বেবির মা। তা ছাড়া স্বদেশী মাল টেনে গেলে তো কথাই নেই। শুনলাম, টাকাপয়সা নাকি আরো কি সব কথা নিয়ে খুব ঝাগড়াঝাঁটি করেছেন স্ত্রীর সঙ্গে।' বলে কে. গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে বনমালীর দিকে তাকাতে বনমালী হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলল।

'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গুপ্ত, নিজের চাকা চালু কর। কার ঘরে কি নিয়ে ঝগড়া হ'ল, খোঁজ নিয়ে তোমার কি হবে।'

শিবনাথের মুখটা কালো হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান সে। এক সেকেণ্ড মাটির দিকে চেয়ে থেকে পরে চোখ তুলে হাসল। 'আজ সকালে বুঝি ঘরে গিয়ে স্ত্রীর মুখে সব শুনলেন। হ্যাঁ, রাত্রে আমার ওয়াইফ আপনার স্ত্রীকে দেখতে গেছল। জ্বরটা কমেছে তো, আজ ভাল?'

'আপনি দেখছি খুব সিরিয়সলি এটা নিচ্ছেন?' গুপ্ত অট্টহাস্য করে উঠল। 'আরে না না মশাই, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েদের মুখে শুনে নাচানাচি করা আর তাই নিয়ে আর একজনকে জেরা করা আমার নেচার না। ও কিছুই না। এমনি বললাম। আসলে হয়েছে কি, একটু আগে বিধুর ছোট ছেলেটা কি যেন নাম, হুবুলো এসেছিল বনমালীর দোকানে এক পয়সার নুন কিনতে। পেট-মোটা সরু-ঠ্যাং ঘটির মত ঘাড়-বেঁটে ইঁচড়ে পাকা হুবুলোকে আপনি দেখেন নি? হারামজাদা এসেই এক-গাল হেসে বলছিল, কাল বারো নম্বরের শিবদাদা বৌকে বেজায় মারধর করেছে, রাগ করে থালা-ঘটি ভেঙেছে। আমরা শুনে থ।'

বনমালী বলল, 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, বিধুর ঝাঁক হ'ল গিয়ে মাছি। এখানের ময়লা ওখানে টেনে নেয়, ওঘরের খবর এঘরে আনে। আর মিছা কথা। তিলকে তাল করতে, মরার মুখে কথা বলাতে ওদের জুড়ি নেই।'

'ওইটুকুন বাচ্চা ছেলে, কত বড় এক একটা দাঁত। আর কী পাকা কথা। আমি কথা শুনব কি, ওর বলার ঢং দেখে হেসে বাঁচি না।' চারু রায় শিবনাথের দিকে তাকাল।

'বস্তির ছেলেমেয়ে এর চেয়ে ভাল হবে আপনি আশা করতে পারেন না নিশ্চয়ই, মিস্টার রায়।' শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে হাসল।

'হ্যাঁ, আমি তো চড় মারতে চেয়েছিলাম।' কে. গুপ্ত তার লম্বা শীর্ণ হাতটা শূন্যে তুলে ধরল। 'তারপর আর হারামজাদা এখানে দাঁড়ায়নি। এক দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকল।'

কে. গুপ্তর হাত-নাড়া দেখে বনমালী, চারু রায় এবং শিবনাথ এক সঙ্গে হেসে উঠল।

'থাকগে। কি আর করা যায় এসব ছেলেমেয়েদের, দোষ গার্ডিয়ানদের। একমাত্র পিটি করা ছাড়া উপায় নেই। আমি তো, ঐ যে বসে আছি বটে এখানে, কিন্তু হাঁসের মত। কাদা লাগতে দিই না গায়ে।' শিবনাথ মুখ্যত চারুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিন লাইট-হাউসের সামনে কথায় কথায় আমি এ ধরনের একটা আভাস দিয়েছিলাম আপনাকে মনে আছে?—নরকবাস এখানে থেকে।'

'খুব মনে আছে।' মিহি সুন্দর গলায় চারু রায় মেয়েদের মত হাসল। এবং তারপর কি একটু ভেবে টিন থেকে দুটো সিগারেট তুলে শিবনাথ এবং কে. গুপ্তর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা ব্রাদার, আমি এখন পালাই। ক'টা বাজে? অ গড্।' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চারু অকস্মাৎ উঠে পড়ল। এবং একটা হাত নেড়ে 'বাই বাই'

জানিয়ে কারো দিকে আর না তাকিয়ে রাস্তার ওপাশে সোজা সুপারিগাছের দিকে ছুটল।

ছোট্ট হলুদে গাড়িটা একটু পোড়া তেলের গন্ধ ছড়িয়ে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়।

পঁয়ত্রিশ

'বজ্জাতের ধাড়ি।' কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে তাকায়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি। হুট করে সময় বুঝে চারু কেমন কেটে পড়ল দ্যাখ্।'

বনমালী কথা না বলে হিসাবের খাতায় চোখ রাখল।

'কি মশাই, আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন।'

শিবনাথ কিছু বলতে না পেরে কে. গুপ্তর দিকে তাকিয়ে ছিল, তাই এই প্রশ্ন।

'কি ব্যাপার ?' হাসতে চেষ্টা করল শিবনাথ।

'ব্যাপার তো আপনাকে নিয়েই।' ঝাকড়া চুল সমেত মাথাটা নেড়ে গুপ্ত দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরালে। দেশলাইটা চারু রায় ভুলে ফেলে গেছে।

'সে জন্যেই তো আপনাকে ডাকছিলাম।' এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে কে. গুপ্ত ঘুরে শিবনাথের দিকে সোজা হয়ে বসল। হুবুলোর কথা শুনে ওই-তো এতক্ষণ বেশি নাচানাচি করছিল। চারু।'

'কি রকম ?' শিবনাথ ঢোক গিলল।

'কিরে বনমালী, বল না কি বলছিল। তোর নুন পেঁয়াজের হিসাব এখন রাখ্।'

'আমার কি গরজ। তুমি বল। এক বাড়িতে আছ তোমরা।'

কে. গুপ্ত খুব করে কেশে হাতের সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। কাশল কি হাসল মুখটা নোয়ানো বলে ঠিক বোঝা গেল না। মুখ তুলে বলল, 'হুবুলোর রিপোর্ট শুনে চারু আমায় বলে—দ্যাট্ জেণ্টেলম্যান মাস্ট বি এনাদার বেকার।' ক্রাইসিস পিরিয়ড আরম্ভ হয়েছে। ইস্কুলের চাকরি করে আর কত মাইনে পাবেন মহিলা। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর কথা বলছিল চারু। বলতে বলতে শালা হুট করে বলে কিনা এই বেলা তুমি একটা অ্যাটেম্পট নাও গুপ্ত, হয়তো ভদ্রলোক রাজী হবেন, হ্যাঁ আপনি। বলল, বস্তি লাইফের ইতর ও জঘন্য দিকটা যেমন আছে, তেমনি একটা হোপ, আলোর দিকটাও থাকবে। এভ্রি ক্লাউড হ্যাজ্ ইটস্ সিলভার লাইনিং। মানে অশিক্ষিতা নিপীড়িতা মেয়ে যেমন থাকবে, তেমনি শিক্ষিতা উন্নতমনা, যিনি এদের পথ দেখিয়ে নেবেন, তার জন্য মেয়ে চরিত্রের পার্ট করার স্কোপ তার মায়া-কানন বইতে আছে। তুমি একবার নক্ কর গুপ্ত। বহু ভদ্রঘরের মেয়ে আজ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে এই কনসার্ন সেই কনসার্নের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করে নানা বইয়ে নামছে। এণ্ড দে আর আর্নিং এ লট। বলল, শোভাবাজারের বিখ্যাত নাগ বংশের কে এক নগেন ডাক্তারের স্ত্রী সিনেমায় নেমে দু' মাসের মধ্যে লিনটন স্ট্রীটে বাড়ি কিনল, গাড়ি কিনল এবং স্বামীর জন্যে হ্যারিসন

রোডের ওপর এত বড় ডিসপেন্সারী খুলে দিল। শোভাবাজারের কানাগলির নগেন ডাক্তারের কাছে মাগনা চিকিৎসা করাতেও কেউ ঘেঁষত না। এখন তারই বা কত নামডাক, কী অসাধারণ হাতযশ। তুমি একবার বুঝিয়ে বল গুপ্ত তোমাদের শিবেন্দ্রলালবাবুকে।'

'আমার নাম শিবনাথ।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে বলল।

'অই একই কথা। টার্গেট ঠিক আছে। এতক্ষণ লাফালাফি করছিল চারু। আপনাকে আসতে দেখেই চুপ মেরে গেল। মানে দায়ের কোপ আপনার মাথায় আমাকে বসাতে বলে শালা সুরসুর করে কেটে পড়ল আর কি।' কথা শেষ করে কে গুপ্ত মুখের এমন ভঙ্গি করে হাসল যে, শিবনাথ না হেসে পারল না।

'তা সিনেমায় আজকাল বহু ভদ্রঘরের মেয়েরা নামছেন। নিন্দার কিছু নেই। অবশ্য এতে যোগ দেয়া না দেওয়া ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। আমার স্ত্রী সম্পর্কে প্রস্তাব দিতে বন্ধুকে আপনি কিছু বললেন না?' শিবনাথ একটা চোখ ছোট করে কে. গুপ্তর দিকে তাকায়।

'আমার বয়ে গেছে। তা ছাড়া সময় পেলাম কই। কথাটা তুলেই হারামজাদা আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে পিঠ দেখাল দেখলেন তো।'

এতক্ষণ পর হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে বনমালী হাসল।

'এবার জিজ্ঞেস করুন না শিববাবু, বন্ধুর ওপর আমাদের গুপ্ত আজ এত খাপ্পা কেন।'

'কি ব্যাপার।' শিবনাথ অস্ফুটে বলল এবং একটা কিছু অনুমানও করল। কে. গুপ্ত হঠাৎ কথা বলে না।

বনমালী বলল, 'আজ সকালে গুপ্ত ঘোলপাড়ায় গিয়েছিল। কিরণ নাকি পষ্টা-পুষ্টি বলে দিয়েছে কে. গুপ্ত যেন ওবাড়ি না ঢোকে। অমল রাগ করে।'

'কেন, চারুবাবু কি সেখানে ছিলেন না?' শিবনাথ আড়চোখে কে. গুপ্তকে দেখে পরে বনমালীর দিকে তাকায় ও ঠোঁট টিপে হাসে। 'এটা তো গুপ্তবাবুকে ইনসাল্ট করা হয়েছে।'

'চারু ছিল না মানে? কি হে গুপ্ত বল না। চারু কাল রাত্রেও ওখানে ছিল। সকালে কে. গুপ্ত গিয়ে দেখে বিছানার ওপর গোল হয়ে বসে তিনজন মানে চারু অমল আর কিরণ চা-রুটি ডিমের বড়া খাচ্ছে আরামসে, আর খুব গল্পগুজব করছে।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

কে. গুপ্ত অধোবদন। যেন কি ভাবছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা জ্বলছে।

'খাওয়া-দাওয়া নেই। উপোস থাকে গুপ্ত। তা ওদের কি উচিত ছিল না অন্তত একটা বিস্কুট এক কাপ চা খাইয়ে তারপর ধীরেসুস্থে সেখানে যাতে আর সে না যায় বলে দেওয়া। কিরণটা নাকি বেড়ালের মত চোখ করে গুপ্তকে ধমক দিয়ে উঠেছিল।'

'কিরণের কিচ্ছু দোষ নেই। সব ওই চারুর চালাকি। যেভাবে শিখিয়েছে সে কিরণকে।' কে. গুপ্ত শিবনাথকে বোঝাল, 'বুঝলেন মশাই, কিরণ আমাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ লাইক করে। এবাড়িতে থাকতে আমি ওর চোখ দেখে টের

পেয়েছিলাম। আফটার অল সী ইজ নট এ ব্যাড গার্ল'।'

অল্প হাসল শিবনাথ।

'তা আপনি জিজ্ঞেস করুন না ওর কমিশনের কি হল।' বনমালী হাসল। 'আসল ব্যাপারের কি।'

বনমালীর কথায় শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'তা কিরণের সঙ্গে কিছু কণ্ট্রাক্ট হয়েছে কি চারুবাবুর? লেখাপড়া? প্রথম বইয়ে নামছে, আগাম এত টাকা? অমল রাজী আছে তো?'

'ওই তো চালাকি মশাই, চারু বলছে দেরি হবে। বলছে এখনই সে কথাটা তুলছে না। বলছে, হয়তো সে এভাবে এখন কথা তুলবেই না। এবং এ-দুটি স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ওপর তার কেমন একটা পার্সোন্যাল ইণ্টারেস্ট জন্মে গেছে। শুনুন মশাই শুনুন। মায়া। একটা সফ্‌ট কর্নার সৃষ্টি করছে তার বুকে অমল সেদিন ঘোলপাড়ার ঘরে গিয়ে। কি না! চারুকে ঢিপ করে প্রণাম করে নাকি বলেছে গোঁয়ার অমল, আপনি আমার বড় ভাই, অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে আমাদের রক্ষা করেছেন, কাজেই আপনাকে অবিশ্বাস করব না, আমি কিরণকে আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, যা-খুশি তা করুন।'

'হঠাৎ এত উদার? কেন, চারু কি তখনই পকেট থেকে আর এক গোছা নোট তুলে অমলের হাতে গুঁজে দিয়েছিল নাকি?' শিবনাথ কে. গুপ্তর চোখের দিকে তাকায়।

'আরে মশাই, শেষ করতে দিন। নোট দেবে কেন। এবাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনজন পঞ্চাননতলায় গিয়ে রিক্‌শায় চেপেছিল।'

'একটা রিক্‌শা?' যেন কি প্রশ্ন করতে গিয়ে শিবনাথ আবার খানিকটা হাসল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মশাই, আপনারা তো আর সঙ্গে ছিলেন না কেউ যখন ওরা ঘোলপাড়ায় যায়। আমি ছিলাম। সব তো চোখে দেখা।'

'তারপর?'

'আর কি, রিক্‌শায় উঠেই চারু কিরণের কোলের উপর হাত রাখল।'

'অমল দেখতে পায়নি?'

'মশাই, আপনার মাথায় কিছু নেই। দেখতে পেয়েই তো কিরণের মুখের দিকে অমল তাকিয়েছিল। আর কিরণও তখন এমনভাবে অমলের দিকে তাকায় যে দ্বিতীয়বার অমল চোখ খোলেনি। রুমাল চাপা দিয়েছিল চোখে।'

'এখন?'

'এখন সেই অবস্থায় আছে। কিরণ ধমক দেয় আর অমল কাঁদে। রিক্‌শার সেই ঘটনার পর থেকেই অমলটা বদলে গেছে। হাঁকডাক নেই। হাঁকডাক করবে কি। কিরণের চোখের দিকেই তাকাতে পারে না। ঘোলপাড়ার বাড়িতে নেমেই কিরণ রাত্রে চারুকে আর আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল। দেখুন, কেমন চালাক মেয়ে। এখানে থাকতে এসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।'

শিবনাথ ফ্যালফ্যাল করে কে. গুপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বনমালী হেসে উঠল।

'সাবাস মেয়ে।'

শিবনাথ খুব করে হাসল।

'তা তোমার ওপর কিরণ আজ হঠাৎ অত চটল কেন। কাল বেসামাল কিছু করতে গিয়েছিলে নাকি।'

'তুই থাম্ রাস্কেল, তোর এই মগজে কিরণকে বোঝার দরকার নেই।' বনমালীর দিকে না তাকিয়ে কে. গুপ্ত শিবনাথকে বোঝায়ঃ 'একসঙ্গে তিনটা পুরুষকে হাতে রেখে ঠাণ্ডা মাথায় চলার মেরিট ওই মেয়ে রাখে। আমি স্যাঙ্গুইন। কিরণ আমাকে অপছন্দ করে না।'

'কিন্তু তাড়াল তো শেষ পর্যন্ত।'

কে. গুপ্ত এবারও বনমালীর দিকে তাকায় না। 'এটা চারুর চালাকি। বুঝলেন মশাই। কিরণকে দিয়ে ওই শালা বলিয়েছে স্বামী আর ও নিজে ছাড়া অন্য পুরুষের তার ঘরে ঢোকা নিষেধ।'

'চারু এখন তোমাকে আমল দিতে চাইছে না আর কি।' বনমালী মোটা গলায় হাসল।

'তা না দিক। তার পয়সা আছে আমি হিংসা করবার কে। কিন্তু আমায় ঠকানো কেন। আমার পাওনাটা মিটিয়ে দে, আপদ চুকে যাক।'

'তা কিরণ যদি সিনেমায় না নামে তো আপনার কমিশন পাওয়া যাবে কি?' শিবনাথ আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। যদিও এসব আলোচনায় আর বেশিক্ষণ লেগে থাকা তার ইচ্ছা করছিল না।

'মশাই, চারুই এখন নামতে দিচ্ছে না। বুঝলেন তো হারামজাদার ইন্টারেস্ট কোন্ দিকে। ধর্মের বোন। স্কাউণ্ড্রেলটা আমাকে বুঝিয়ে গেল এভাবে। আর ওদিকে হারামজাদী ওই বুলি ঝেড়ে অমলকে ব্লাফ দিচ্ছে। ধর্মের দাদা।'

'তোমার নসিবই খারাপ গুপ্ত, যেদিকে হাত বাড়াও পয়সা ওঠে না, ওঠে ছাই।'

'যাকগে আমি এখন চলি, কাজ আছে।' শিবনাথ বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করতে গুপ্ত আবার হাত চেপে ধরল।

'তা উঠছেন তো মশাই, কিন্তু সে-কথার কি হল?'

'কোন্ কথা?'

'ঐ যে চারু বলছিল?'

'ননসেন্স।' অস্ফুটে বলল শিবনাথ। কিন্তু এই পাগলের কথায় রাগ প্রকাশ করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা চিন্তা করে সে অগত্যা মুখের হাসি ধরে রাখল। 'তা হুবলার মুখে আমাদের ঝগড়ার খবর পেয়ে চারুবাবু কি আমার স্ত্রী সম্পর্কেই কেবল বললেন। কেন রমেশ রায়ের পরিবার ছাড়া বাড়িতে কি আমার চেয়ে আর সকলের আর্থিক অবস্থাই ভাল যাচ্ছে, না ভালর দিকে? এবং তাদের ঘরেও তো বয়স্থা মেয়ে আছে।'

'কে আছে বলুন? চেহারাটা এখানে একটা বড় ফ্যাক্টার ভুলে যাচ্ছেন নাকি।

আর যদি বলেন যে, চেহারা বা বয়সের দরকার নেই তো আমি দেখছি আপনার কথামতন মাস্টারের স্ত্রী, কি নাম, দ্যাট্ বেলিড-ওয়াম্যান, মাদার অব এইটিন চিলড্রেন লক্ষ্মীমণিকে চারুর বইয়ে নামাতে হয়, কাঁধমোটা ডাক্তারনীকে, প্রমথদের ঘরের আশি বছরের খনখনে বুড়ীকে। আপনি হাসছেন। অথচ এদিকে জানেন আপনি, হাজার রাত জেগেও যার কোমরে ব্যথা নেই, হাজার পাতে খেয়েও যার হাঁড়ি চাটা স্বভাব গেল না, দ্যাট হোর্—কমলা এখান থেকে সরে পড়েছে। সুনীতিটাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল বাইরের একটা ছোকরা। প্রীতি, হ্যাঁ ভুবনের ড্যালৌসী-চষা মেয়ে সিনেমায় নামবে না। জানি না ওটার ছোট বীথিটা সাজগোজ করে হালে কোথায় বেরোতে আরম্ভ করেছে। এই তো হল গিয়ে ইয়াং ফেসেস, মানে যারা নামবে, যাদের নামানো উচিত। অল্প বয়স হলেও বিধু মাস্টারের থ্যাবড়া নাকের মেয়ে দুটো, কি ওঘরের বাচ্চা বৌটা, কি যেন নাম, রং ফর্সা হলে হবে কি, কপালটা উঁচু, খরগোসের কানের মত কান হিরণকে তো আর এ-বইয়ে নামিয়ে চারু লস দিতে পারে না, কাজেই—'

'একবার তো বন্ধু কাঁচকলা দেখিয়েছে, আবার কেন। ভদ্রলোক কাজে বেরোচ্ছেন আর তুমি তাঁকে ধরে রেখে আগরবাগর বকছ।'

'তুই চুপ কর সোয়াইন। তোর সঙ্গে কথা বলছিল না। এ লাইনের তুই বুঝিস কি।' কে. গুপ্ত মাটিতে থুথু ফেলে পরে শিবনাথের দিকে চোখ ফেরায়। 'কাজেই এবাড়ির রকমসকম দেখে এবং এই মাত্তর হুবুলার রিপোর্ট পেয়ে চারু যে আমাকে প্রেস করবে আপনার কানে কথাটা তুলবে খুবই স্বাভাবিক। বলুন?'

'ননসেন্স, ইডিয়েট।' শিবনাথ আর একবার মনে মনে আওড়ে ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ঝুলিয়ে দিলে। 'তা তো বুঝলাম, তা কি আর বুঝিনা। চেহারাটা একটা ফ্যাক্টার। 'তা অবশ্য আমি খুব বেশি দেখিনি তাঁকে, কিন্তু তা হলেও আপনার হয়ে—হ্যাঁ বেবির মা সম্পর্কে চারুবাবু কিছু চিন্তা করছেন না যে বড়? বেশ সুন্দর চেহারা মহিলার। তা ছাড়া অনেক দিন আপনার—'

শিবনাথ থামতে কে. গুপ্ত মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, চুপ করছেন কেন। তাছাড়া আমি অনেকদিন বেকার, আমার স্ত্রী কিচ্ছু করেন না, এই তো? তা বেকারকে বেকার বলতে অত হেসিটেট করছেন কেন। হা-হা।'

হেসে কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে ঘাড় ফেরায়। বনমালীর এদিকে এখন চোখ নেই। শতচ্ছিন্ন ময়লা কুটকুটে কাপড় পরা একটি মেয়ে—মেয়ে না, কাদের ঘরের বৌ। সম্ভবত পাশের কোন বস্তিতে থাকে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বনমালীকে ধারে এক পয়সার গুড় দিতে পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু বনমালী অটল। 'ধারে বিক্রি নেই, ধার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।' বলে সে দ্বিতীয়বার মুখ খোলেনি।

যুবতী বৌটি শেষটায় লজ্জা পেয়ে মাটির দিকে মুখ করে চুপ করে রইল।

'আরে গাধা দিয়ে দে—' কে. গুপ্ত মস্ত বড় একটা ঢোক গিলল। 'এক পয়সার গুড় ওমনি গেলে তোর দোকান কিছু ফেল পড়বে না। কি বলেন?'

শিবনাথ কিছু বলল না।

'আজ আর ধার দেবার ক্ষমতা নেই আমার।' বনমালী হিসাবের খাতায় মন দিতে দিতে বলল, 'বাপরে বাপ, ধারের খদ্দেরের কামড়ানিতে মরলাম। এ কোন্ রাজ্যে আছি।'

'রামরাজ্যে আছিস হারামজাদা।' কে. গুপ্ত ধমকে উঠল। 'আমাদের মত ধারে খাওয়া খদ্দেররা এখানে আছে বলে তুই বেঁচে আছিস। আমরা ছাড়া আর কোন্ রাজা বাদশা তোর দোকানে আসে তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা কিনতে। কি বলেন মশাই।'

শিবনাথ দেখল বৌটি ডাগর চোখ আড় করে কে. গুপ্তকে দেখছে। মন্দ না। রং খুব ফর্সা না হলেও চোয়াল ও চিবুকের গড়নটা অদ্ভুত। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল শিবনাথ।

'আরে দিয়ে দে হারামজাদা। এক পয়সার গুড় গেলে তোর কারবার কিছু লাটে উঠছে না। আপনিও বলুন না মশাই। বনমালী এমন পাষাণ্ড হবে কেন।' কে. গুপ্ত কনুই দিয়ে শিবনাথের হাঁটুতে গুঁতো দেয়। 'লোক বুঝে সময়মত ধারটার না দিলে আমরাই বা তোমাকে ভাল চোখে দেখব কেন।'

বনমালী কথা বলল না বা খাতা থেকে চোখ তুলল না এবং বৌটিও নড়ল না।

'আপনার কাছে একটা পয়সা আছে?' কে. গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকাল।

'আছে।' শিবনাথ পকেট থেকে একটা ফুটো পয়সা তুলে কে. গুপ্তর হাতে দিল।

'এই নে হারামজাদা তোর দাম। আপনি নিয়ে নিন। দে, ওজন করে দিবি।' পয়সাটা বনমালীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কে. গুপ্ত হাত ঝাড়ল।

বনমালী গম্ভীরভাবে এক পয়সার গুড় একটা কাগজে জড়িয়ে বৌটির হাতে তুলে দিয়ে পয়সাটা বাক্সে ফেলল। বৌটি আর একবারও কে. গুপ্তর দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

'কেমন দেখলেন মশাই?'

শিবনাথ কে. গুপ্তর প্রশ্নের উত্তর দিল না। কে. গুপ্তর ঘাড় ঘুরিয়ে আম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকার ধরন দেখে তার হাসি পাচ্ছিল। 'খাসা মেয়েটি, কার বৌ কে জানে।' কে. গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল।

'দশ নম্বর বস্তির সুকুমার নন্দীর স্ত্রী।' বনমালী খাতা থেকে মুখ তুলল। 'আগে তালতলায় ছিল। হুঁ উকিল। ট্রামের তলায় পড়ে ঠ্যাং কেটে এখন এখানে সস্তা ঘরে এসে বাসা বেঁধেছে। ওকালতি করত মানে কাছারির বটগাছের পাতা গুনত।'

'তা কি আর বুঝি না।' কে. গুপ্ত গলা খুলে হাসল। 'যার নেই পুঁজিপাটা সে আসে বেলেঘাটা। যত সব ঘাটের মড়া এসে মাথা গুঁজছে খালধারে। তা, আমি ভাবছি অন্য কথা।' গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকায়। 'কিরকম আনগ্রেটফুল মেয়েটা দেখলেন? আপনার কাছ থেকে পয়সাটা চেয়ে পর গুড়ের দাম মেটালাম। কিন্তু একবার এদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে চেয়েই দেখল না।'

শিবনাথ না হেসে পারল না।

'লজ্জা পেয়েছে আর কি।' বনমালী নরম গলায় বলল, 'হুট করে তুমি শিববাবুর

কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে গুড়ের দাম দেবে সুকুমারের বৌ ভাবতে পারেনি।'

'ভাবতে পারেনি কিন্তু হাত পেতে গুড়টা তো নিয়ে গেল।' ভেংচি কেটে কে. গুপ্ত খিঁচিয়ে উঠল। 'তুই এক বজ্জাত আর ওই মাগি আর এক বজ্জাত। দুনিয়াটাই স্বার্থপর, বুঝেছেন মশাই, হাত বাড়িয়ে আমি আপনার কাছ থেকে নিতে পারলাম, কিন্তু আপনার দিকে তাকাতে আমার লজ্জা। আসলে ওটা হল গিয়ে ওর ভ্যানিটি। চেহারাটা একটু ভাল কিনা।'

যেন কি একটু সময় চিন্তা করল শিবনাথ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার অনুমান হয়তো মিথ্যা না। কি একটা বইয়ে পড়েছিলাম যুবতী নারী যত খারাপ অবস্থায় থাকুক, পরপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমি গরিব, তিনি বিত্তশালী এসব চিন্তা করে না বরং তার আগে সে অন্য কিছু ভাবে।'

'বলুন, থামছেন কেন।'

'পুরুষটি আমার যুগ্যি কি অনুপযুক্ত এই বোধটাই, অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গত চেতনাতেই মেয়েরা আগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমি সেক্স-এর কথাই বলছি।'

'বলুন মশাই, বলুন। নারী-চরিত্র সম্পর্কে এসব ভাল ভাল কথা মানে সেক্সোলজির মারপ্যাঁচগুলো বনমালী হারামজাদাকে একটু বুঝিয়ে দিন! আমিও তো এককালে এসব বইটই পড়তাম। এখন আর শালার কিচ্ছু মনেও নেই। অভাবে অভাবে মাথাটা থেঁতলে গেছে। ভয়ানক দেমাক বৌটার। নিজের ইয়ুথ, অঢেল রূপ সম্পর্কে তিনি ওভার কনশাস। আমি না হয় চুল দাড়ি লম্বা রেখে জামাকাপড় ছিঁড়ে না খেয়ে সুঁটকি লেগে একটা খচ্চরে পরিণত হয়েছি। কিন্তু, কিন্তু আপনার দিকে তো ও একবার তাকাতে পারত। তা ছাড়া পয়সাটা আপনার পকেট থেকেই গেল।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

'কি যেন প্রশ্ন করছিলেন আমাকে?' চিন্তা করতে কে. গুপ্তর তখনি মনে পড়ল। 'অ, বেবির মাকে সিনেমায় নামানোর কথা। অ্যাদ্দিনে তবু আপনি জিজ্ঞেস করলেন। চারু সাহস পায় নি।'

শিবনাথ তৎক্ষণাৎ বলল, 'না, আপনি সেদিন বলছিলেন কিনা। বেবি একটু বড় হলে ওকে কোনো বইয়ে নামাবেন।'

'তা তো বলছিই, আমার সেই প্ল্যান বদলে ফেলেছি আপনি বুঝলেন কি করে। বেবি আমার মেয়ে। ডটারের ওপর ফাদারের রাইট বেশি। কাজেই ওকে দিয়ে আমি যা খুশি করাব। ইউ উইল সি।'

বুদ্ধি করে শিবনাথ প্রশ্ন করল: 'বেবির মা বুঝি রাজী হচ্ছেন না।'

'আলবত রাজী থাকতে হবে।' কে. গুপ্ত চোখ পাকিয়ে উঠল। 'বেবি সম্পর্কে মাই ডিসিশন ইজ ফাইন্যাল।'

লম্বা চুলে শীর্ণ হাত বুলিয়ে কে. গুপ্ত মাথার এক গোছা শুকনো চুল পটপট টেনে তুলে ফেলল। একদলা থুথু ফেলল মাটিতে। 'ইয়ার্কি?'

কে. গুপ্তর মরা মাছের মতো সাদা ফ্যাকাশে চোখে রক্তের ছিটা দেখা গেল।

শিবনাথ নীরব।

'মশাই, তিনি আই-সি-এস-এর বোন হতে পারেন। কিন্তু আমিও আমার সুদিনে, কি বলব, হ্যাঁ, রুপোর থালায় ভাত খাইয়েছি, সিল্ক আর সোনা দিয়ে মুখের হাসি নিভতে দিইনি। আজ দুর্দিনে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ।'

ঠোঁট টিপে হাসল শিবনাথ।

কি একটু চিন্তা করে ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনার শালা, হুঁ, যিনি আই-সি-এস, জীবিত আছেন কি?'

'হ্যাঁ, এখনো সার্ভিসে আছেন। আলিপুরে বাসা।'

শিবনাথ ইতস্তত না করে বলল, 'দিনকতক তিনি, মানে আপনার ওয়াইফ সেখানে গিয়ে থাকলেই পারেন। অন্তত আপনার কিছু একটা সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত। নিশ্চয়ই শ্যালক সরকারী চাকুরে। মোটা পাইনে পান। বোনকে দিনকতক রেখে খাওয়াতে তাঁর কষ্ট নেই।'

'তাই বলি মশাই, ধর্মের বুলি আওড়ে কিরণ অমলকে ঠকাচ্ছে আর ধর্মের বুলি শুনিয়ে আই-সি-এস নবারুণ মিত্তির আমায় জব্দ করল।'

'কি রকম?' শিবনাথ প্রশ্ন না করে পারল না।'

'ভোলাগিরির শিষ্য নবারুণ। সনাতন হিন্দু ধর্ম মেনে চলে। পতিই সতীর গতি। সুতরাং কে. গুপ্ত বস্তিতে কষ্ট করবে আর বোন গিয়ে সেখানে বসে পরম সুখে ভাত খাবে এটা ভাইয়ের পছন্দ না। দুঃখটা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শেয়ার করে নিক।'

'গুড আইডিয়া।' শিবনাথ না হেসে পারল না। 'তা নবারুণ আপনাকে অথবা আপনার ওয়াইফ ও ছেলেমেয়েদের অসুবিধার কথা ভেবে মাঝে মাঝে কিছু পাঠায় তো। পাঠিয়েছে এপর্যন্ত কিছু টাকাপয়সা?'

'নট এ ফার্দিং।' কে. গুপ্ত মাথা নেড়ে হাত পেতে বলল, 'দিন একটা বিড়ি দিন মশাই।'

'আমি বিড়ি খাই না।' শিবনাথ একটা সিগারেট তুলে কে. গুপ্তর হাতে দিল।

'আইডিয়া তো আর নবারুণের মাথায় আসেনি। এসেছিল তার স্ত্রীর মাথায়। এ ডেঞ্জারাস ওয়োম্যান।' সিগারেট ধরানো শেষ করে কে. গুপ্ত বলল, 'আমার সার্ভিস চলে যাওয়ার পর, মানে হ্যাঁ তারও মাস তিনেক পর, যখন ভাড়া চালিয়ে আর পার্ক স্ট্রিটের বাড়ি ধরে রাখতে পারলাম না, সেখান থেকে উঠে গিয়ে আলীপুরে সবাই দিনকতক ছিলাম। হরিবল। কী রকম চেহারা করে রেখেছিল নবারুণের স্ত্রী আমাদের দেখে। মশাই সাত রাত্তও ঘুমোতে পারেনি। পাছে আমরা মাসের পর মাস সেখানে পড়ে খাই এই দুশ্চিন্তায়। তারপর বুঝি একসময় হঠাৎ মাথায় ভোলাগিরির বুদ্ধি এল, অর্থাৎ আমি একলা দিনকতকের জন্য নারকেলডাঙ্গার একটা টিনের ঘরে স্টোভে পাক করে খেয়ে সার্ভিসের চেষ্টা করব শুনেই স্ত্রীর ডিক্‌টেশন অনুযায়ী নবারুণ পরদিন বোনকে, হ্যাঁ আমার স্ত্রী সুপ্রভাকে ডেকে বলে দিল: এটা খারাপ দেখায়। তা ছাড়া আমাদের মনোহরপুকুরের মিত্র পরিবারে এমন দৃষ্টান্ত আজ অবধি কোনো মেয়ে রাখেনি। দেড় হাজার টাকার মাইনে চাকুরে জামাই যেমন

আছে, তেমনি চাকরি হারিয়ে দশ টাকা এর-ওর-তার কাছ থেকে কর্জ করতে বেরিয়ে কোলকাতার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে জামাই-এর সংখ্যাও কম না এ বাজারে। কিন্তু কোনো মেয়েই বাপের বাড়ি এসে পড়ে থেকে স্বামীর হীনতা দীনতার পরিচয় দেয়নি, দিচ্ছে না। বরং হ্যাঁ, রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে লোকের স্ত্রীও যখন মনোহরপুকুর রোডে বেড়াতে আসে, স্বামী এই করছে সেই করছে বড়াই করেই বাপের বাড়ি এবং পাড়া মাত করে রাখে—হ্যাঁ, এরা বুদ্ধিমতী।'

'তাহলে তো আর বেবির মার সেখানে থাকা চলে না।' শিবনাথ মন্তব্য করল।

'মশাই হরিবল্, অনবিলিভেবল, আপনি ইমাজিন করতে পারবেন না নবারুণের ওয়াইফ, হ্যাঁ, ওই পেত্নীর মত রং, খ্যাংরা কাঠির মত খিটখিটে দেখতে লিলিটা কত বড় সেলফিশ, কি ভয়ংকর তার আত্মপরজ্ঞান। গড্।'

'কি করেছিল?'

বড় নখ সমেত শুকনো শিরা বার করা হাতটা শিবনাথের চোখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কে. গুপ্ত বলল, 'একসঙ্গে খেতে বসে দেখতাম আমার ছেলেমেয়েদের এই এত-টুকুন করে, একটুকরো ডিম, ওয়ান এইট্থ অব এন এগ্। আর ওর ছেলে ও মেয়েটাকে দিত আস্ত পুরো একটা করে ডিম। আমরা না বুঝতে পারি তাই আলুর সঙ্গে মিশিয়ে দিত। এমন পাজী বজ্জাত সেলফিশ দ্যাট ডটার অব্ এ বিচ্, মশাই।'

'তা ওর স্বামীর রোজগারের টাকা ওর ছেলেমেয়েকে তো একটু দেবেই।' বনমালী মন্তব্য করল।

বনমালীর কথায় কান না দিয়ে কে. গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই ভাবি। ক'দিন আর আমরা ছিলাম শালার বাসায় আলিপুর। প্রথম দিনই নবারুণের স্ত্রীর এই কাণ্ড দেখে আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলে উঠে বাথরুমে ঢুকে চোখে জল দিয়েছিলাম মনে আছে। আর ভাবলাম তখন, আমার ছেলেমেয়েদের মাই ছাড়াবার পর সাত আট বছর কি শীত কি গ্রীষ্ম এক কাপ দুধে আস্ত এক একটা ডিম ভেঙে খাইয়ে প্রত্যেকটিকে বড় করে তুলেছি। ভীষণ কান্না পেয়েছিল সেদিন।'

'তা আর কি করবেন কষ্ট করে। দিন চিরকাল মানুষের সমান যায় না।' শিবনাথ চট করে বলল, 'এখন কষ্ট যাচ্ছে, আবার হবে। আবার হয়তো ওরা—'

হ্যাঁ ডিম খাবে দুধ খাবে।' কে. গুপ্ত গাছের পাতার দিকে তাকাল। 'রোদ হেলে গেছে, দিন তবে আর একটা বিড়ি।'

শিবনাথ সিগারেটের প্যাকেটটা আর পকেট থেকে বার করল না। একটু চুপ করে থেকে পরে প্রশ্ন করল: 'তা আপনার স্ত্রী তো লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানেন। তিনি যদি—'

'বলুন থামলেন কেন।' কে. গুপ্ত ঘাড় বাঁকা করল। রুক্ষ লম্বা চুলগুলোর নিচে আবার হাতের আঙুল ঢুকিয়ে পটপট চুল ছিঁড়তে লাগল।

'না, পুরুষদের হুট করে চাকরি হচ্ছে না, কিন্তু নানা অফিসে নানা জায়গায় মেয়েরা আজকাল যেন একটু বেশিই চান্স পাচ্ছে। সুতরাং—' শিবনাথ থামল।

'মশাই, সেদিক দিয়েও জব্দ হয়েছে আমার কপাল।' কপালে আঙুল ঠুকল

কে. গুপ্ত।

বনমালী ও শিবনাথ কথা বলল না।

'ইংরেজি চিঠিপত্র আমার চেয়েও ভাল লেখে বেবির মা, তেমনি বাংলার ওপর দখল। কিন্তু হলে হবে কি। ঐ যে বললাম—বংশ। নবারুণের মত ওর মাথার মধ্যেও উঁচু মানী বংশের লম্বা লম্বা পোকা কিলবিল করছে। মশাই, আমি কি আর সাধে ঠেকেছি। বড়বাজারের এক মেড়োর গদিতে চিঠিপত্র লিখে বিশ-পঁচিশ ত্রিশ যাহোক মাসে পাওয়া যাবে ঠিক হতে আমি নারকেলডাঙ্গায় একলা একলা থাকব মনস্থ করে কোঠা নিয়েছিলাম, কিন্তু নবারুণের বদমায়েশ বৌটার জন্যে সেই প্ল্যান যখন ভেস্তে গেল, অগত্যা সবাইকে নিয়ে এখানে এসে উঠলাম। উঁহু, কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। মিত্র বংশের মেয়েরা বাপ ভায়ের সংসারে থাক কি স্বামীর ঘরে যাক, আজ অবধি কেউ চাকরি করতে নামেনি, সুতরাং তিনিও পারবেন না। কি, সিনেমায় নামার কথা? এটম বম্ব ফাটবে মশাই আজ আমার ঘরে, যদি আমি এই প্রস্তাব নিয়ে ওর কাছে যাই।'

'বাস্, তবে আর কি। এখন বসে বসে আঙুল চোষে।' বনমালী হাত নেড়ে গুড়ের মাছি তাড়াতে লাগল।

শিবনাথ কথা বলল না।

কুকুরটা আবার এক ফাঁকে এসে জুতোর পচা সুখতলাটা মুখে তুলে নিয়ে ছুটে পালাল।

'তাই মনে মনে ভাবি, অভাগা যেদিকে চায়, কি জান একটা বাংলা কবিতা আছে, সমুদ্র শুকিয়ে যায়। আমারও মশাই সেই অবস্থা। সুযোগ বুঝে নবারুণ এই কাণ্ডটা করল, সুবিধা পেয়ে চারু ধর্মতত্ত্ব শোনায় আর ঘরের তিনি—বললাম তো সব।' কে. গুপ্ত একটা নিশ্বাস ফেলল।

'আচ্ছা আমি চলি।'

'শুনুন, শুনুন।'

কে. গুপ্ত চেষ্টা করল কিন্তু শিবনাথ হাত ধরতে দিল না। হাত ধরবে বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে দূরে সরে দাঁড়ায়। এতক্ষণ বক্তৃতা করার পর গুপ্ত আসল কথাটা মুখ থেকে ছাড়বে শিবনাথের তা-ও বুঝতে কষ্ট হল না। ঠোঁট টিপে হাসল সে। 'বলুন।'

'হবে আনা দুয়েক? আছে সঙ্গে কিছু খুচরো?' কে. গুপ্ত অক্লেশে বলে ফেলল।

'আজ নেই।' শিবনাথ পরিষ্কার ভাবে মাথা নাড়ল। চলে আসত সে। কিন্তু একটু আগে হুবহু লার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা এবং রুচি ও সিনেমা সম্পর্কে নানারকম আলোচনার প্রতিশোধ নেবার চরম মুহূর্ত উপস্থিত চিন্তা করে শিবনাথ হঠাৎ গলা বড় ক'রে বলল, 'মশাই, রোজ রোজ কি আর দানখয়রাত করা চলে, আমরা তো আর কিছু রাজা জমিদার নই, খেটে খেতে হয়। চলি।'

'আহা সে কি আর বুঝি না।' কে. গুপ্ত অল্প হাসল। সেই জন্যই তো টাকা আধুলি চাইতে পারি না, ঐ দু'এক আনা—দিন।'

'আমার কাছে নেই।' শিবনাথ হাঁটতে আরম্ভ করল।

'দিন দিন।' কে. গুপ্তও উঠে শিবনাথের সঙ্গে চলল। 'চারটে পয়সা আপনার কাছে নেই আমি বিশ্বাস করি না।' বলে হাসল কে. গুপ্ত।

'তা কি আর নেই, কিন্তু আমার তো খরচ আছে, সিগারেট ফুরিয়েছে, চা খেতে হবে।' শিবনাথ জোরে পা চালাতে চেষ্টা করল।

'দিন মশাই দিন।'

শিবনাথ কথা না বলে হাঁটে। কে. গুপ্ত লম্বা পা ফেলে তার সঙ্গে এগোয়। 'বনমালী হারামজাদাকে সেই সকাল থেকে বলে বলে পারলাম না আদায় করতে এক মুঠো মুড়ি দুটো বাতাসা। বলে ফুরিয়ে গেছে। অথচ আমি জানি মসুরডালের ঝাঁকাটার পাশে কালো হাঁড়িটায় কমসে কম অন্তত সের দশেক মুড়ি আছে। এমন কসাই শালা। দিন স্যার।'

শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এভাবে ভিক্ষা করে ক'দিন চলবে? আমার কাছে এখন বিশেষ কিছু নেই। আপনি কাইন্ডলি সরে যান।'

কে. গুপ্ত করুণ ভাবে তাকায়।

'আরে মশাই আপনি দেখছি চারুর মতন বনমালীর মতন শক্ত হয়ে গেছেন। ওরা এমন হতে পারে। এবাড়িতে থাকে না। কিন্তু আপনি তো—দু'জন একটা উঠোনের ওপর আছি, এক পাতকুয়ার জল পেটে পড়ে। আমি স্টার্ভ করছি, আপনার কি একটুও কষ্ট হয় না।' কে. গুপ্ত শিবনাথের হাত ধরল। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে দেয় শিবনাথ।

'কী মুশকিল। আরো দু'দিন আপনাকে আমি পয়সা দিয়েছি। আজ অবধি সেগুলি রিটার্ন করেননি।' শিবনাথ আর না ব'লে পারল না।

'হ্যাঁ, তা করিনি মনে আছে। দ্যাট্ ডু আই অ্যাড্মিট।' ক্ষয়ে যাওয়া নোংরা দাঁতগুলি বার করে কে. গুপ্ত বলল, 'লেট মাই সান ডাই, লেট মাই ডটার বি কিড্ন্যাপড বাই দ্যাট রাসক্যাল—হ্যাঁ, ক্ষিতীশ, লেট মাই ওয়াইফ, দ্যাট্ প্রাউড ওয়োম্যান, কমিট সুইসাইড,—তখন। সব দিক থেকে আমি পরিষ্কার হয়ে গিয়ে, বুঝলেন, দেন আই উইল বি এবল্ টু আর্ন। আর সেদিন আমি আপনাদের সকলের ঋণ শোধ করব, হ্যাঁ, টেক্ ইট ফ্রম মি। দিন স্যার আজ যা হয়।'

'পাগল পাগল।' শিবনাথ বিড়বিড় করে উঠল। 'ইউ গো।'

কিন্তু কে. গুপ্ত নাছোড়বান্দা। আবার হাত বাড়িয়ে শিবনাথের হাত ধরতে চেষ্টা করল। শিবনাথ এক মুহূর্ত চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। কেউ কোথাও নেই। তারপর আর ইতস্তত না করে শক্ত কঠিন হাতে লোকটার হাড় বেরিয়ে পড়া শুকনো ঘাড় ধরে প্রচন্ড ধাক্কা মেরে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে কে. গুপ্ত রাস্তার ওপাশে কাঁটাঝোপের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'উঃ!'

একটা মনকাঁটা ফুটল কে. গুপ্তর বাঁ হাতে। ডান হাত দিয়ে কাঁটাটা টেনে বার ক'রে ফেলল যদিও।

'আপনি দেখছি ভয়ানক ক্রুয়েল মশাই, হার্টলেস।'

'গায়ে হাত দেওয়া কেন?'

'আমি আপনার হাত ধরেছিলাম। আমি কি আপনার হাত ধরতে পারি না?'

'না।'

'আমি আপনার নেক্সট্‌ডোর নেবার।' কে. গুপ্ত রীতিমত চিৎকার করে উঠল।

'তা আমি অস্বীকার করি না।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে উত্তর করল: 'তা' হলেও আপনার এখন যা পজিশন এই অবস্থায় প্রতিবেশীর গায়ে হাত রেখে কথা বলা চলে না।'

'মশাই, তাই বলুন। একটু বেটার পজিশনে আছেন সেই অহংকার। তা আমিও বলি, আমার হরস্কোপ অলরেডি পাঠানো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বেবির মুখে শুনলাম, কাল সুপ্রভা ওটা কাঠের বাক্স থেকে খুঁজে বার করে মিত্রদের গুরুদেব ভোলাগিরির কাছে পাঠিয়েছে। মশাই, আমারও এদিন থাকছে না। এখন উপার্জনের ক্ষেত্রে শনির দশা চলেছে। কিন্তু কাটাব। ঠিক কাটিয়ে উঠে আপনাদের মতন দু'দশটা কেরানীকে দু'পকেটে ঢুকিয়ে আবার নিজের খাসকামরায় বসে আরামসে হুইস্কি টেনে সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে মান্থলি দু'হাজার ড্র করব। দ্যাট্‌ ডে উইল কাম এগেন।'

'ভাল।' মাথাটা নেড়ে শিবনাথ লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

ছত্রিশ

খুব মুশকিলে পড়ল সেদিন রুচি ময়নাকে নিয়ে। বাড়িতে তবু যা-হোক কেঁদেছে, বাপের ধমক খেয়ে আবার চুপ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে ময়নার কান্না থামতে চায় না।

বেশ বড় মেয়ে। রুচির স্কুলে এই বয়সের মেয়েরা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর প্রায় ষোল বছরের একটি মেয়ের হাতে লাল মলাটের বর্ণবোধ আর একটা ভাঙা শ্লেট যেমন বিসদৃশ ঠেকছিল, তেমনি ওর অবুঝ অশ্রান্ত কান্না। খেলনা হারিয়ে শিশু যেমন কাঁদে। ব্যাপার কি?

রুচি প্রথমটায় কিছু বলল না।

বাস্‌-এ উঠে শুঁড়া ফার্স্ট লেনের সাবিত্রী চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় রুচি তার সঙ্গেই বেশি কথা বলছিল। আর একজন টিচার। হাওড়ার কোনো মেয়ে স্কুলের। রোজ এ পথে চলতে ফিরতে এই অঞ্চলের দু'চারজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে রুচির পরিচয় হয়েছে। সাবিত্রী একজন। অবশ্য দেখা হলে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় তাদের সঙ্গে এমন না। বরং একই ধরণের প্রশ্ন, এক বিষয় নিয়ে আলোচনা, যেমন: সাড়ে দশটা বেজে গেছে? না আরো তিন মিনিট বাকি। বাবু বাঃ কী ভিড় আজ বাস্‌-এ দেখছেন! পরশু যেন কিসের ছুটি? পাব্লিক হলিডে তো? কি রান্না করলেন

আজকে ? কপির ডালনা কাঁচা মুগ ডাল। না, মাছ আর সস্তা হবে না। আপনাদের ওধারটায় অসুখ-বিসুখ কমেছে কি ? কমছে বাড়ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রেশনিং উঠে যাচ্ছে কি ? উঠলে বাঁচি। কি আজ আবার মুখ ভার কেন আপনার, কর্তার সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বুঝি ? যতদিন না নিমতলায় যাচ্ছি রাগারাগি বন্ধ হবে না আমাদের মত লোকের সংসারে। অঢেল থাকতো, নাকে মুখে গুঁজে দশটায় বেরিয়ে মেয়ে ঠেঙাতে যেতে না হ'ত, ঘরে থেকে এটা-ওটা রান্না করে ধুয়ে মুছে বিছানাপাটি পরিষ্কার রেখে ছেলেমেয়েকে আদর করে কর্তার ঘরে ফেরা তক সংসার আগলে রাখতে পারতাম তো স্বামীর মেজাজ ভাল থাকত। এখন হয়েছে তার উল্টো। কাজেই ঝগড়া। আপনার বুঝি ওই একটি মেয়ে ? আপনার ? দুটি। আবার কবে ?—রক্ষা করুন মহাশয়। ছটুকুর সময় হাসপাতালে থেকেই অপারেশন করিয়ে এসেছি, আপদ যাক্। আপনার হেলথ এফেক্ট করেনি ? এখন পর্যন্ত তো দেখছি না—হি-হি। আপনি ?—কি করবেন ঠিক করলেন ? সাহস পাচ্ছেন না। ছটুকুর সময় এক দুধের পিছনে আমাকে পনরবিশ টাকা হাতে ধরে গয়লাকে মাস মাস দিতে হয়েছিল। উঃ কী যে লাগত মিসেস রায়—মনে হত আমার এত কষ্ট ক'রে রোজগার করা টাকা জলে ফেলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তবে কি বলবেন মেয়েকে উপোস রেখে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। না, তা করব কেন। ইচ্ছা হ'ত তিন পো'র জায়গায় দু' সের দুধ খাওয়াই রোজ। বলুন কোন্ মার এই ইচ্ছা না। হ্যাঁ, আগে পারত, তাদের বুকেও তখন দুধ জিনিসটার অভাব ছিল না। আজ বলুন মিসেস রায়, আমার আপনার বুকে ক'ছটাক দুধ থাকে। বেলা ন'টায় কাঁচা মুগ ডাল আর ভাত খেয়ে সারাদিন আড়াই শ' মেয়েকে তৈমুরলঙের বাবার জীবনী শিখিয়ে ল. সা. গু., গ. সা. গু. কষিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই দু'খানা ঠাণ্ডা রুটি আর একটু বেগুন পালং খেয়ে যাদের দুধ শুকিয়ে গেছে, তারা তাদের অপারেশন করে রিস্ক্ দূর করা ছাড়া উপায় কি ?

'উপায় কি।' গম্ভীর অস্পষ্ট ভঙ্গিতে রুচি হাওড়ার স্কুলের টিচার সাবিত্রী চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে হাসল। তার সেই হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতে আর একটা স্টপেজে ওঠে ইলা সেন। শুকনো সাদা কব্জিতে একটা কালো ব্যান্ড-পরা ঘড়ি। চোখে রোদ ঠেকাবার কালো চশমা। 'কটা বাজলো, কটা বাজে মিসেস রায়।' বোঝা গেল নিজের ঘড়িটা চলছে না।

রুচির হাতঘড়ি তেল মাখাতে দোকানে দিয়ে রাখা হয়েছে। পয়সার অভাবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না।

সাবিত্রী চ্যাটার্জি তৎক্ষণাৎ নিজের কব্জির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দশটা পনরো মিস সেন।'

ইলা সেন একটু অনুকম্পার চোখে রুচির দিকে তাকাল। কাজেই সেদিনকার মত বৌবাজারের স্কুলের ইলা সেনের সঙ্গে রুচি আর কথাই বলতে পারল না। কিন্তু আলাপ থেমে থাকে না। 'আপনার স্বাস্থ্য কিন্তু এখনি ভেঙে পড়েছে মিস সেন।'

'স্বাস্থ্য দিয়ে কি হবে ?' ইলা সেন কচিপাতা রং এক টুকরো রুমাল দিয়ে মুখ

মুছল। চোখের কালো ঠুলিটা সরালো।

'বাঃ বিয়ে-টিয়ে করবেন না? এইভাবে কাটবে জীবন?'

'বিয়ে করে কি হবে?' ইলা সেন ঠোঁট বাঁকা করল। 'এ-দেশে ইস্কুলের মাস্টারি করে মেয়েদের বিয়ে? তারপর যখন সিকি দু'আনি হতে থাকবে? রক্ষা করুন মহাশয়।' রোগা পাংশুটে গলাটাকে আর একটু ভেঙে ইলা সেন রুচির পাশে বসা মঞ্জু সহ রুচির দিকে তাকিয়ে এমন কুৎসিতভাবে হাসল যে, রুচি সেদিকে তাকাতে সাহস পেল না। এক গাদা পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ইলা রড ধরে ঝুলছিল আর হাসছিল আর বাসের ঝাঁকুনিতে তার হাসি খানখান হয়ে ভেঙে কাচের টুকরোর মত চারধারে ছড়িয়ে পড়ছিল।

'আপনি আমার চেয়ে চালাক। আমার চেয়েও সেয়ানা। আমি এখন ঠেকে শিখে সিকি দু'আনির রাস্তা বন্ধ করেছি। আপনি দেখছি—'

রুচির কপাল ভাল। সাবিত্রী চ্যাটার্জির কথা শেষ হবার আগে বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। শেয়ালদা। এই ধরনের আলোচনা বাড়তে বাড়তে অধিকাংশ দিনই এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে রুচির দু' কান গরম'হয়ে ওঠে তখন। চুপ করে থাকে। চুপ করে থেকে অত্যন্ত সতর্ক চোখে সহযাত্রী পুরুষদের কানে কথাগুলি গেল কি না লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে। আজও করত। কিন্তু আর দরকার পড়ল না। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে ইলার হাসি ও সাবিত্রীর মুখ বন্ধ হল। রুচি তাড়াতাড়ি মঞ্জু ও ময়নার হাত ধরে টুপ করে নেমে পড়ল।

এখন রুচির মেজাজ খানিকটা প্রসন্ন হবার কথা। কিন্তু আজ তা আর কপালে জুটল না। ময়না তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এই বেলা রুচি না বলে পারল না।

'তোমার যদি ইস্কুলে যেতে এত অনিচ্ছা তো বাড়িতে বাবাকে তা ভাল ক'রে বলনি কেন। এত বড় মেয়ে প্রাইমারি ক্লাশে ভর্তি হ'তে যাচ্ছ, যেখানে যাবে, যে ইস্কুলে পড়বে লজ্জা করবেই—আমি বুঝতে পারছি না তুমি এত কাঁদাকাটা করে কেন লেখাপড়া শিখতে এলে।'

জলভরা চোখে ময়না রুচির দিকে তাকায়। কালো স্থির চাউনি। বলতে কি, রুচি যেন একটু চমকে উঠল। সবটাই বর্ণবোধ না। সবটুকু নির্বোধ কান্না নয়।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে ময়না চোখ মুছল। লাল ফোলা-ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে রুচির মনে হ'ল এই কান্না আজ হঠাৎ তৈরী নয়। যেন এর আগেও ও কেঁদেছে। তার চোখের কোলে কালি দেখে রুচি নরম গলায় আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'আপনাকে বলে কি হবে।'

'আহা আমাকে বলতে আপত্তিই বা কেন? আমি তোমার মা'র বয়সী প্রায় হব। অনেক ছোট তুমি আমার চেয়ে। কি হয়েছে বলো।'

'রুণু—।' মুখ নীচু করল ময়না।

রুচি হঠাৎ কথা বলল না। একটু ভাবল। কেননা কাল রাত্রে মুখ্যত তাদের

পাশের ঘরের কে. গুপ্তর ছেলের বিষয় নিয়ে শিবনাথের সঙ্গে তার বেশ খানিকটা ঝগড়া হয়েছে। তারপর আর এটাকে রুচি পাঁচটা কথা চিন্তা করে অবশ্য বাড়তে দেয়নি। কে. গুপ্তর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সবটা ব্যাপারই সে পাশ কেটে দাঁড়ানোর মত হয়ে শুনে এসেছে। সত্য মিথ্যা যাচাই করতে নিজে থেকে একটা প্রশ্নও করেনি।

তাছাড়া ভদ্রমহিলার কথাবার্তা রুচির ভাল লাগেনি। ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তার বাপের বাড়ির মনোহরপুকুর রোডের এক মিত্র বংশের সুনাম গৌরব মর্যাদা ও লক্ষ্মীশ্রীর বর্ণনা সেরে সুপ্রভা কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঘরে ঢোকার পর রুচিকে বসতে বলা হয় নি। বলে বসাবে এমন জায়গাও ছিল না। সুপ্রভার মলিন শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে রুচি কথা শুনছিল।

পিতৃবংশের বর্ণনা শেষ করে বেবির মা চোখ নামাল।

'এত বড় ঘরের মেয়ে এভাবে কেন কষ্ট পাচ্ছে নিশ্চয় তার কোনো কারণ আছে।' বলে বেবির মা সাদা শীর্ণ বাঁ হাতখানা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরে রেখা দেখেন। হাতের রেখা দেখতে রুচি মেয়েদের এই প্রথম দেখল। হাত দেখা হয়ে গেলে সুপ্রভা সেটা নামিয়ে আস্তে আস্তে নিজের চোখের উপর রাখেন। চোখ ঢেকে দেন।

রুচি অস্বস্তি বোধ করছিল।

এভাবে আরো দু'মিনিট কাটে।

তারপর হাত সরিয়ে সুপ্রভা আবার কড়িকাঠের দিকে তাকান। সেদিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, 'কাজেই আমি বিদ্রোহ করব না। এই দুঃখের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে গুরুদেব রুষ্ট হবেন। আমার স্বামী পাগল। আমার মেয়ে চায়ের দোকানে কাজ করছে, আমার ছেলে হাসপাতালে শুয়ে আছে। থাকুক। অদৃষ্টে থাকলে রুণু ফিরে আসবে, না থাকলে আসবে না। শুনছি ওর গাড়ি চাপা পড়া নিয়ে নানারকম গল্প তৈরী হয়ে গেছে। বলাই-এর মেয়েটাকে ডাকিয়ে ছিলাম। আসেনি। সম্ভবত বলাই আসতে দিচ্ছে না। আমি ময়নাকে কাঁদতে শুনেছি।' সুপ্রভা একবার থামলেন।

'কাজেই, হ্যাঁ, আপনাকে ডেকে বললাম, এ বাড়িতে শিক্ষিতা বলতে আর কোনো মেয়ে নেই। অর্থাৎ আমার অক্ষমতা, আমার অসহায়তা, আমার দৈন্য বুঝতে পেরে অন্তত মুখের সহানুভূতি জানাবে এমন কেউ আছে কিনা এখানে জানি না। নেই। সন্ধ্যেবেলা পাশের ঘরের কোন্ বুড়ী খনখনে গলায় বলছিল, মা একবার কি ছেলেটাকে গিয়ে হাসপাতালে দেখে আসতে পারে না? কতটুকুন আর রাস্তা শেয়ালদা। শুনলাম। শুনে চুপ করে রইলাম। হেঁটে যাব সে-ক্ষমতা আমার নেই। এই স্বাস্থ্য নিয়ে হাঁটতে গেলে আমি মাথা ঘুরে যাব ট্রাম-বাসের তলায়।

সুপ্রভা বোধ করি এই প্রথম রুচির দিকে তাকিয়েছিলেন।

'না, কেবল ট্রামে-বাসে চড়তে আজ আমার লজ্জা করে যদি বলি তা হলে হয়তো মিথ্যা বলা হবে। আমার বাইরে মুখ দেখাতেই লজ্জা করে। পারব না। এখানে এসে অবধি আমি এ বাড়ির সদর কোন্‌টা, উঠে গিয়ে একবার চোখ মেলে দেখিনি।

দেখব না। নরকপুরীতে এসেছি। গুরুদেবের ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়তে পারব না। উঠে গিয়ে নিজে থেকে বেরোবার রাস্তা দেখব সেই দম্ভ, সেই স্পর্ধা আমি রাখি না।'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল রুচি।

'আমায় ডেকেছেন কেন?'

এত দুঃখের মধ্যেও সূক্ষ্ম সলজ্জ একটা হাসি সুপ্রভার ঠোঁটে উঁকি দিয়েছিল যেন। সঙ্কোচ।

'আপনাকে বোন একটু কষ্ট করতে অনুরোধ জানাব। লজ্জা করে। আপনার সময়ের অভাব। স্কুলের খাটুনির পর বাড়ি ফিরে আবার সেই রাঁধাবাড়া। কখন যে কাল আপনি—'

রুচির দু'কান গরম হয়ে উঠেছিল।

'বলুন কি করতে হবে।'

'একবার সময় করে হাসপাতালে যদি রুণুকে কাল দেখে এসে আমায় বলতে পারেন ও কেমন আছে।'

রুচি চুপ করে ছিল।

'যদি আপনার সময় হয়। আপনার কাজের ক্ষতি আমি করতে চাই না। এই নিন ভাই।' সুপ্রভার ডান হাতে একটা দু'আনি।

রুচি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল।

'বেবির কাছ থেকে চেয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম। না, এতে আপনার লজ্জার কিছু নেই। তাছাড়া আমি, আমার কানেও এসেছে, খুকির বাবার এখন চাকরি নেই। সামান্য একটা প্রাইভেট স্কুলে আছেন আপনি—'

'পয়সাটা রেখে দিন। আমাকেও শেয়ালদা পর্যন্ত বাস-এ যেতে হয়। তারপর অবশ্য আর বাস লাগে না। হেঁটে একটু এগিয়ে গেলেই আমার স্কুল। কাজেই বাস-এর জন্যে অতিরিক্ত পয়সা আপনাকে দিতে হবে না। কাল স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি যদি সময় পাই—'

'আচ্ছা, এটা রাখুন তো। আমার জন্যে একটা কাজ করছেন। আপনার ছোট্ট মেয়েটাকে কি একটা কমলালেবু খেতে দিতে পারি না আমি। না বোন, রাগ করবেন না, আপনি শিক্ষিতা। আমার হয়ে আপনাকে এই কাজটুকু করার জন্য কিছু মনে করবেন না বলেই আমিও বলতে সাহস পেলাম। আহা, পয়সাটা কোথায় পড়ল দেখুন তো ভাই—'

হাত থেকে পয়সাটা বিছানার ওপর কোথাও পড়ে যেতে সুপ্রভা পাশ ফিরে ঘাড় কাত করে যখন সেটা তালাস করেন, রুচি সেই ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

একটা ভাল কিছু করতে যাওয়ার দম্ভ নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কে. গুপ্তর স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল। সেখানে বিপদের পুরোপুরি সর্বনাশের আগুনের ওপর শুয়ে মনোহরপুকুর রোডের বনেদী মিত্রবংশের মেয়ে সুপ্রভা অনুকম্পার চাপ চাপ বরফপিণ্ড লোকের মাথায় তুলে দেবে বলে অপেক্ষা করছে রুচির আগে জানা

ছিল না।

বাকি রাত রুচি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোল। আজ সকালে উঠেও রুণুর কথা সে ইচ্ছা করেই ভুলে থাকতে চেয়েছে, যেমন শিবনাথ গোড়া থেকেই আছে। অবশ্য রুচির কারণটা স্বতন্ত্র। কেননা, যখনই প্রতিবেশীর দুঃখে মনে মনে সমবেদনা প্রকাশের চেষ্টা করেছে রুচি একটা দু' আনি—ক্ষয় পাওয়া ধারগুলো, ফ্যাকাশে বিবর্ণ, পিতলের মুদ্রাটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আর মহিলার কথাগুলো মনে হয়েছে। 'খুকির বাবার চাকরি নেই শুনছি। প্রাইভেট স্কুলে চাকরি করে যৎসামান্য আয় আপনার। আহা, কাজ সেরে ফিরে এসে বিকেলে আবার সেই হাঁড়ি খুন্তি। কী কষ্টের জীবন, আমি, একলা আপনার কথা বলছি না—আপনাদের, বাংলা দেশের স্কুল টিচারদের কথা বলছি। অত্যন্ত পুয়র মাইনে। অথচ বেচারাদের দিয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে। সত্যি বড্ড মায়া হয়।'

কথা শেষ করে সুপ্রভা কড়িকাঠ দেখছিলেন। আর রুচি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ওধারে হাঁড়ি-খুন্তিতে ধুলোর পলস্তারা পড়েছে। উনুনটা যেন কবে থেকে মাথা-ভাঙা হয়ে এখন পাঁচ-ছ'টি সদ্যোজাত শাবক সমেত মল্লিকার ঘরের ভাজা মাছ চুরি করে খাওয়া ও বাড়িশুদ্ধ লোকের মুখঝামটা খাওয়া সুন্দরী 'করবী'-র আশ্রয়-স্থলে পরিণত হয়েছে।

একটি ঘরের ভাঙা উনুনের ওপর সাতদিন ধরে বিড়াল চরছে দেখলে অন্য সময় রুচির বুক হাহাকার করে উঠত। কিন্তু কাল আর তা হল না। বরং ডানদিকের ঠোঁট দুটো ঈষৎ চেপে সে 'আচ্ছা চলি, রাত বেশি হয়েছে' বলে বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ এভাবে সে অহঙ্কারী প্রতিবেশিনীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

এখন ময়নার মুখে 'রুণু' নাম শুনে রুচি আবার চমকে উঠল।

'ও তো হাসপাতালে।'

'আমি হাসপাতালে যাব। কাছেই।'

কি একটু ভেবে রুচি বলল, 'কিন্তু তোমার বাবা তো তোমাকে তা বলেনি। যাচ্ছ স্কুলে। সত্যি কি না? তাছাড়া—', রুচি থামল। ময়না আবার চোখে আঁচল তুলেছে। হাতের বর্ণবোধটা ছিটকে নিচে মাটিতে পড়ল।

'ছি ছি কী মেয়ে তুমি, বার বার বই ফেলে দিচ্ছ!' রুচি বিরক্ত হয়ে নুয়ে বইটা তুলে আবার ময়নার হাতে গুঁজে দিলে। 'তা ছাড়া এখন তোমাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই, তা তো হয় না। দশটা কুড়ি। এগারোটায় আমার ক্লাশ, এসো।' শেয়ালদা স্টেশনের ঘড়ি দেখা শেষ করে রুচি ময়নার দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেল। টাই-স্যুট পরা বড় বেশি মার্জিত পরিচ্ছন্ন একটি ছেলে। যুবক ঠিক না, কিশোরও নয়। সবে গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে। দিচ্ছিল। কিন্তু নির্মম হয়ে তার ধারগুলোতে এখন থেকেই যেন ও ক্ষুর চালাতে আরম্ভ করেছে, রুচির অনুমান করতে কষ্ট হল না। মাথায় কালো কোঁকড়া চুল। কিন্তু সেখানেও ধারগুলো ওপর থাক ফেলে ফেলে নিয়মিত নানারকম যন্ত্রপাতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে রুচি যেন ভিতরে ভিতরে একটু যন্ত্রণা অনুভব করল।

কিন্তু রুচির চেহারার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে একটুও সময় নষ্ট না করে পার্ক স্ট্রীটের সন্তোষ পকেট থেকে সিগারেট কেস্ তুলে সিগারেট বার করল। সিগারেট ধরিয়ে সে ময়নার দিকে কটমট করে তাকায়।

'কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি। দু'দিন পার করে এসেছ রুণুকে দেখতে ?'

ময়না কথা বলছে না। কান্না থামিয়ে চোখ মুছছে। 'কাল বিকেলের দিকে একবার সেন্স ফিরে এসেছিল। দু'বার 'ময়না' 'ময়না' ডেকেছিল রুণু। আর তুমি বাড়িতে চুপটি ক'রে বসে আছ!'

ময়না এবারও নীরব। অধোবদন।

'বেবি গিয়ে কি তোমায় বলেনি ?' রুচির দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে যেন তাকে রীতিমত উপেক্ষা করে সন্তোষ ময়নার মুখোমুখি দাঁড়ায়। 'কথা বলছ না কেন। কী, রুণু তোমায় ভালবাসত তো,—অথবা যদি বলি তুমি সাংঘাতিকভাবে রুণুর প্রেমে পড়েছিলে, কথাটা কি মিথ্যে বলা হবে ? আমি সব জানি। রুণু আমায় সব বলত। আমার বুজম্ ফ্রেন্ড ও। আমরা এক জায়গায় থেকে বড় হয়েছি। ক'দিন আর ওরা পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে কুলিয়া-টেংরার বস্তিতে গেছে!'

বড় বড় জলের ফোঁটা ময়নার গাল বেয়ে চিবুকের কাছে এসে জমতে লাগল।

সন্তোষ, যেন খুব উত্তেজিত অস্থির হয়ে আছে, একটু চুপ থেকে আরো দু' একটা টান দিয়ে এতবড় সিগারেটটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে সুন্দর একটা রুমাল বার করে ঠোঁট মুছল।

'আমার কথার উত্তর দাও। জান, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। কাল বিকেলেও যখন তুমি এলে না, আমি, রুণুর তো জ্ঞান নেই, এদের—আমার অন্য বন্ধুদের কাছে বলেছি যে, তমি কতবড় ইনসিন্সিয়ার, হ্যাঁ, প্রেমের ব্যাপারে। রুণু পাগলের মত ভালবেসেছিল—কিন্তু তুমি,—তোমার ভালবাসায় ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল —এ্যাম আই নট্ ট্রু ? উত্তর দাও। চুপ ক'রে কেবল কাঁদাব কোন অর্থ হয় না। ময়নার হাত ধরে সন্তোষ জোরে ঝাঁকুনি দিল। সন্তোষের ওপাশে দাঁড়িয়েছিল আর দু'টি ছেলে। সমবয়সী। সন্তোষের মত ওদেরও চকচকে জুতো, রঙিন টাই, দামী কোট প্যান্ট পরনে।

'আহা লাগবে।' দুটি ছেলে এক সঙ্গে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। 'মারধর করিস নে।'

সব শুনে দেখে রুচি হতভম্ব। একটা কথাও সে বলছিল না। কিন্তু এখন আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'তোমরা কে ?'

'আমার নাম সন্তোষ। এরা আমার ফ্রেন্ড। জীবন, অসিত। আমরা পার্ক স্ট্রীটে থাকি।'

'ময়নাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?'

'হাসপাতালে। ক্যাম্বেল হাসপাতালে রুণু আছে। বাড়িয়লা ওকে গাড়ি চাপা দিয়েছে।'

'আমি জানি। শুনেছি।' রুচি আস্তে আস্তে বলল, 'এখন ও কেমন আছে?'

সন্তোষ এ-প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশের আর একটি ছেলে রুচির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে—আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

'ইনি একজন স্কুল মিসট্রেস। কুলিয়া টেংরার সেই বস্তিতেই থাকেন।' রুচির হয়ে সন্তোষ বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দেয় এবং এবারও সে রুচির দিকে তাকায় না' ময়নার সঙ্গে কথা বলে। 'উত্তর দাও। আমি জানতে চাই, তোমার মনে কি আছে।'

'বাবা আসতে দিচ্ছে না।' ময়না এই প্রথম জলভরা বড় বড় চোখ মেলে সন্তোষের দিকে তাকায়।

'আসতে দিচ্ছে না, পালিয়ে আসতে পারনি।' সন্তোষ মুখ খিঁচিয়ে উঠল। 'হি ইজ ডাইং আর বাড়িতে বসে তুমি সুখের ভাত খাচ্ছ!' এত জোরে সন্তোষ কথা বলছিল যে, আশে পাশে রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে পড়ে এখন। রুচির ভীষণ লজ্জা করছিল। দু-একজন এদিকে তাকিয়ে পর্যন্ত গেল।

'তুই বুঝতে পারছিস না সন্তু—বস্তিতে থাকে, লেখাপড়াও তথৈবচ. ফরোয়ার্ড মেয়ে না। হয়তো বাপ ভয় দেখিয়েছে।'

'দেখিয়েছে তা আমি জানি।' বন্ধুর দিকে না চেয়ে সন্তোষ বলল, 'আমি বেবির মুখে সব শুনলাম কাল। বাড়িয়লা গাড়িচাপা দিয়েছে রুণুকে, কিন্তু রটাচ্ছে অন্য রকম।'

'আমার তো মনে হয়, লোকটা টাকা দিয়ে ময়নার বাবার মুখ বন্ধ করেছে। না হলে ময়না তো ঘটনার সময় ছিল। ওই তো একমাত্র উইটনেস।' আর একটি বন্ধু মন্তব্য করল।

'তা করুক টাকা দিয়ে ওর বাবার মুখ বন্ধ।' সন্তোষ মাথা ঝেঁকে উঠল। 'কিন্তু তাই বলে ওর কি উচিত চুপ করে থাকা? লভ্—এণ্ড দিস ইজ হার ফার্স্ট লভ্। অসভ্য মেয়ে, মূর্খ মেয়ে।' যেন সন্তোষ আবার ময়নার হাত ধরতে যায়। বন্ধুরা তাকে বাধা দিলে। ময়না চোখে আঁচল গুঁজল।

রুচি রীতিমত অপ্রস্তুত। অস্থির চোখে আর একবার সে স্টেশনের ঘড়িটা দেখল। বলাই তার সঙ্গে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছে। রাস্তায় এভাবে সন্তোষ ও তার বন্ধুদের উদয় হবে এবং ময়নাকে ধরে তারা হাসপাতালে রুণুর কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, সে ধারণা করতে পারেনি। অবশ্য রুণুকে দেখতেই ময়না অবিশ্রাম কাঁদছিল। এই অবস্থায় এখন তার কি করা উচিত রুচি ভাবতে লাগল।

'কাল থেকে এ অবধি আমি তেত্রিশটা বাস এটেন্ড করেছি। টেংরার, বেলেঘাটার। হ্যাঁ, এই স্টপেজে দাঁড়িয়ে। কত লোক নামল, কত লোক উঠল। কত মুখ দেখলাম। এণ্ড ইউ ডিড নট টার্ন আপ। রাস্কেল মেয়ে।'

'থাক, এসে গেছে যখন, আর গালিগালাজ করিসনে, ও তো এসেছেই ওর লাভারকে দেখতে।'

'না আসেনি।' সন্তোষ উত্তেজিত হয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'তোরা দেখছিস ওর হাতে বই শ্লেট। উনি স্কুলে চলেছেন বাড়ির 'টিচার'টির সঙ্গে। আমি কি মিথ্যা

বলছি। আপনি চুপ করে আছেন কেন?' সন্তোষ রুচির দিকে ঘাড় ফেরায়। 'আমি তো দেখলাম, বাস থেকে নেমেই আপনি ওকে স্কুলে নিয়ে যেতে টানাটানি করছিলেন। বলুন, আপনি ময়নাকে ডাকছিলেন কিনা।'

রুচি লজ্জিত, স্তব্ধ।

'ষড়যন্ত্র করে ওদের সেই বাড়িয়লা সমস্ত ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করেছে অসিত, বুঝলি। কাল একবার আমি ও-পাড়ায় গিয়েছিলাম ময়নার খোঁজে। বাড়ির দরজা আগলে বসে থাকে একটা মুদি। আমি ময়নার কথা জিজ্ঞেস করতেই রাস্কেলটা বলল, এখানে নেই, ময়নার বাবা ময়নাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'তুই বাড়িতে ঢুকলি না কেন?'

'না, রুণু নেই। তাছাড়া রুণুর বাবা হ্যাঁ, কে. গুপ্ত কোন সময়েই আমাকে ভাল চোখে দেখে না। মুদি দোকানের সামনেই তখন বসা ছিল। চোখ লাল করে আমায় বলল—ভাগ্ এখান থেকে। যত সব বখাটে ছেলে। আমি আর করি কি, ফিরে এলাম। ভদ্রলোকের মাথা এখন আর ঠিক নেই, আমি জানি। তারপর বেবির মুখে তো সবই শুনলাম।'

'মুদিটা স্পাই। কে বাড়িতে ঢুকেছে না ঢুকেছে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে, কি বলিস?' অসিত হাসল।

'তা ও নজর রাখুক না-রাখুক, তাতে কিছু আসে যায় না।'

সন্তোষের আর এক বন্ধু জীবন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি শুধু ভাবছি সেই বাড়িঅলার কথা। কত বড় ব্রুট্, কত বড় বদমায়েস। সকলের আগে ওই হারামজাদাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

'শুনছি তো বস্তির ধারেই ওর বাংলো।'

জামার আস্তিন গুটিয়ে অসিত তার ডান হাতটা ঢিল ছোড়ার মতন শূন্যে নেড়ে বলল, 'আমার তো এখুনি ইচ্ছা করছে শালাকে গিয়ে দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে আসি।'

'তা হয়তো বসানো যায়, কিন্তু আমার মাথায় এখন সেই চিন্তা নেই।' সন্তোষ গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আই অ্যাম থিংকিং অব দিস স্টুপিড গার্ল।' সন্তোষ ময়নার দিকে আবার কটমট করে তাকায়। 'হার্টলেস, আমি বলব। রুণু তোমায় ভালবাসত—ভালবাসার এই রিয়োয়ার্ড, কেমন? সত্যি, ও গাড়ি চাপা পড়েছে বলে আমার যত বেশি না দুঃখ হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি লাগছে তোমার ব্যবহারে।' সন্তোষ থামল। ময়না চোখ থেকে কাপড় সরাল। নিথর নিস্পন্দ মূর্তি। এক সেকেন্ড কি তারও একটু বেশি সময় স্থির অপলক চোখে সন্তোষের মুখের দিকে তাকিয়ে পরে তার হাত ধরে ময়না রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল। 'আমি রুণুকে দেখতে এসেছি সন্তোষ, তুমি আমায় ওর কাছে নিয়ে চল। রুণুকে দেখতে না পেয়ে আমি যে কত কেঁদেছি, তুমি জান না। চল এখন চল।' ময়নার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। যেন সন্তোষের চোখের কোণায় জল দাঁড়িয়েছে। সুন্দর রুমালটা দিয়ে সে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'তুমি এদের, আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর,

আজ সারা সকাল আমি কী বলেছি। হ্যাঁ, খুব খারাপ রিমার্ক করেছি তোমার সম্পর্কে।' ময়নার ঘাড়ের ওপর এবার কোমলভাবে হাত রাখল সন্তোষ। 'আমি সব সহ্য করতে পারি ময়না, প্রেমের অপমান সহ্য করতে পারি না। আজ আমাদের পার্ক স্ট্রীটের কোনো মেয়ে হলে আর তার লাভার যদি এভাবে হাসপাতালে শুয়ে থাকত ও তাকে দেখতে না পেত তো পটাসিয়াম সায়নাইড মুখে দিয়ে সুইসাইড করত। অবশ্য তুমি ততটা ফরোয়ার্ড না আমি বেশ বুঝতে পারি। যে পরিবেশে তুমি আছ, তাতে তা না হবারই কথা, তোমাকে খুব দোষও দিচ্ছে না। তুমি মনে রেখো, তোমার ও রুণুর প্রেমের ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই খুব ইণ্টারেস্টেড। রুণুকে জিজ্ঞেস করে দেখো। রাতদিন ও আমার কাছে তোমার গল্প করত; ওকি, বেণীটা খুলে গেল কেন? থাক আর কেঁদো না।'

'আমি যাব, আমায় তুমি নিয়ে চল।'

'ময়না!' রুচি ডাকল।

'আপনি যান, আপনি স্কুলে চলে যান, ময়না আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছে।' সন্তোষ ঘাড় ফেরায়।

'এভাবে এখন ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।' রুচি একটু শক্ত গলায় উত্তর করল। 'ওর বাবা আমার সঙ্গে ওকে স্কুলে পাঠিয়েছে, আজ ওর এ্যাডমিশন নেবার কথা।'

'হেল্ উইথ এ্যাডমিশন, হেল্ উইথ ইউর লেখাপড়া।' নাটকীয় ভঙ্গীতে শরীরে একটা ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে সন্তোষ রুচির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—আপনার,—আপনার জীবনে প্রেমের রক্তকমল কোনদিনই ফোটেনি, তাই বোধ করি আজ এ অবস্থায় এখন এখানে আমাদের সামনে একথা বলতে পারছেন মিসেস। যান, আপনি চলে যান।' বলে আর অপেক্ষা না করে সন্তোষ ময়নার হাত ধরে বাঁ দিকের পেভমেণ্ট ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। সন্তোষের সঙ্গীরাও চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। রুচির দিকে তাকিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে অল্প হেসে অসিত বলল, 'যান, আপনি আপনার স্কুলে চলে যান। পরের চাকরি করছেন, নিজের সংসার আছে, খামোকা এ-ব্যাপারে আমরা আপনাকে টানব না।'

'হয়তো আমরা থানা-পুলিশ করতে পারি। পারিজাতকে শিক্ষা দিতেই হবে। জানি না, শেষ পর্যন্ত সন্তোষের কি ইচ্ছা—তবে—' বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জীবন বলল, 'প্রেমের ব্যাপারে সে অত্যন্ত সিরিয়স, সেণ্টিমেণ্টালও বলতে পারেন—আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। এ জন্যই ওকে এত ভাল লাগে। ম্যাট্রিকে গত বছর ও ফেল করল, কিন্তু পরীক্ষায় পাস করাইতো মানুষের জীবনের বড় কথা নয়। রবি ঠাকুরের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী ছিল না জানেন। তেমনি সন্তোষও এগজামিনের খাতায় পার্টস দেখাতে পারেনি। কিন্তু যেখানে দেখাবার, সেখানে সে দেখিয়েছে। আপনার জানবার কথা নয়। সন্তোষ একটা প্রেমের উপন্যাস লিখেছে। বস্তির মেয়ে ময়না এবং পার্ক স্ট্রীটের ছেলে রুণুকে অবলম্বন করেই অবশ্য গল্প। সিনেমার এক

প্রডিউসারকে বইটা অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে। সম্ভবত এক্‌সেপ্‌টেড হবে। আর কি, তবেই সন্তোষ জীবনের একটা ধারা খুঁজে পেয়ে গেল। পেয়েই গেছে। আমার ত মনে হয়, পরীক্ষায় ফেল করাটাই ওর জীবনে আশীর্বাদ—'

বন্ধুর কথা থেমে গেল। ওধার থেকে সন্তোষ চিৎকার করে ডাকল, 'এই জীবন অসিত! ওখানে দাঁড়িয়ে তোরা কি বকর বকর করছিস। অত্যন্ত একঘেয়ে ষ্টীরিওটাইপ্‌ড শিক্ষয়িত্রী-জীবন যার, তাকে ভালবাসার তত্ত্ব বুঝিয়ে লাভ কি—তোরা আচ্ছা ছেলেমানুষ, চলে আয়, আমাদের অনেক কাজ।'

ওরা চলে গেল।

'মা চল।' মঞ্জু ডাকছিল।

'চল মা।'

মঞ্জুর হাত ধরে রুচি সাবধানে রাস্তা পার হ'ল। উল্টো দিকের ফুটপাথে উঠে বনমালীকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভীষণ চমকে উঠল। মাথায় একটা লাল গামছা জড়ানো। রোদ ঠেকাতে কি? হাতে দুটো বনস্পতির টিন। দু বগলে পাঁচ-ছটা কাগজের বাক্স। দাঁত বের করে বনমালী, রুচির দিকে না যদিও, মঞ্জুর দিকে চেয়ে হাসল। 'খুকি বুঝি মা'র সঙ্গে ইস্কুলে চলেছিস। আমি বড়বাজার থেকে মাল কিনে ফিরছি।' ইত্যাদি সংক্ষেপে দু-একটা কথা সেরে ব্যস্ত হয়ে সে রাস্তার ওপারে বেলেঘাটার ব্যাসস্ট্যাণ্ডের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল।

রুচি সবটা বিষয় তার স্কুলের একজন মিসট্রেস বন্ধুকে বলতে তিনি বললেন, 'আপনি খামকা চিন্তা করছেন। আপনার দোষ কি। আপনাদের বাড়ির বলাইবাবুকে গিয়ে বলবেন, তার মেয়েকে নিয়ে যা যা ঘটেছে। তিন-তিনটে যোয়ান ছেলের সঙ্গে গায়ের জোর বা মুখের তর্ক কোনটাতেই আপনি পারেন না, পারা উচিত না। কাজেই এখানে আপনাকে দোষ দেওয়া মিছা।'

উপদেশ পেয়ে রুচি কিছুটা শান্ত হ'ল।

হল, কিন্তু আজ এই প্রথম বেঞ্চের ওপর চুপচাপ বসে থাকা শান্ত মার্জিত স্নিগ্ধ-চক্ষু বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত শহরের উনিশটি মেয়েকে তৈমুরলঙের জীবনী পড়িয়ে শোনাবার সময় বারো ঘর এক উঠোনের উগ্র উলঙ্গ ছবিটা মনে করে সে বড় বেশি চমকে উঠল। হ্যাঁ, সেই বাড়ির কমলা এক বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে গেছে, সুনীতি পালিয়েছে এক কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত ছেলের সঙ্গে, নিরক্ষরা ময়না কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল হাসপাতালে তার মুমূর্ষু প্রেমিককে দেখতে। সেই বাড়ির বাসিন্দা রুচি। যেন ভাবতে বিস্ময় লাগে। এরা কি জানে, এই কচি নিরীহ নিষ্পাপ মুখগুলি সুন্দর চোখ মেলে অসহায়ের মত যারা তাকিয়ে আছে তাদের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্রী রুচিদির দিকে, তিনি কোথায় কোন্ নরক থেকে বেরিয়ে এসেছেন ওদের লেখাপড়া শেখাতে! অভিমানে রুচির দুচোখ এক সময় ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু ভাবনার সেখানেই শেষ না। আর একটা ভাবনা, আরো কতকগুলি কথা রুচির মনে অনেকক্ষণ ধরে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। টিফিনের ঘণ্টায় লাইব্রেরীর এক কোণায় বসে কৌটা

থেকে মঞ্জুকে খাবার বের করে দিয়ে রুচি পার্ক স্ট্রীটের পরীক্ষায় ফেল-করা সন্তোষ ও তার বন্ধুদের কথা ভাবতে লাগল। আপনার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। প্রেমের রক্ত-কমল কোনদিনই আপনার জীবনে ফুটল না। একঘেয়ে শিক্ষয়িত্রী-জীবন। ময়নাকে বাধা দেবার আপনি কে? ভাবল রুচি, আর ক্লান্ত বিষণ্ন চোখ মেলে জানালার বাইরে কড়ি-গাছটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শিবনাথের অনেকদিন চাকরি নেই। মোক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে আজ কত দিন হয়ে গেল তারা আঠারো টাকা ভাড়ার বস্তির টিনের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আজকের মত এমন মন খারাপ তার কোনদিন হয়নি—দুর্দমনীয় আত্মধিক্কারে তার শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

সাঁইত্রিশ

সন্ধ্যা হব হব করছে। রমেশের চায়ের দোকানে এইমাত্র আলো জ্বালা হয়েছে। রমেশ নিজেই চিমনিটা ঘষে মুছে পরিষ্কার ক'রে এবং আরো খানিকটা তেল লণ্ঠনে পুরে সলতে কেটে পরে তাতে আগুন ধরিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে শিবনাথের পাশে বসল। শিবনাথের সামনে টেবিলের ওপর একটা শূন্য চায়ের বাটি। চা শেষ ক'রে সে সিগারেট ধরিয়েছে। শিবনাথ চিন্তান্বিত, চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায়। এইমাত্র বাইরের একটি লোক বসে চা খাচ্ছিল। এবং সম্ভবত বাইরের লোকের সামনে কথা বলতে ইতস্তত বোধ করছিল বলে লোকটি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রমেশ শিবনাথ দু'জনই চুপ ক'রে ছিল। হাত ধুয়ে রমেশ এসে পাশে বসতে শিবনাথ বলল, 'ইচ্ছে ছিল শালার মাথায় চাটি বসিয়ে দিই। স্ত্রী নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি সহ্য করতে পারি না।'

'ওর মাথার ঠিক নেই বলছি তো। কি বলছিল আপনাকে?' রমেশ বিড়ি ধরায়।

'আমার স্ত্রীর সিনেমায় নামবার ইচ্ছা আছে কিনা। তবে তার ফ্রেন্ড চারু রায়কে বলে এখুনি কণ্ট্রাক্ট সই করিয়ে দেয়।'

শিবনাথের কথা শুনে রমেশ অল্প শব্দ করে হো-হো করে হাসল। 'রসিক বটে। কে. গুপ্ত পাগল হলে কি হবে এমনিতে রসজ্ঞান টনটনে।'

'একেবারে গলায় ধাক্কা দিয়ে কাঁটাঝোপের ওপর ফেলে দিয়েছিলাম, এত রাগ হয়েছিল লোফারটার প্রস্তাব শুনে।'

'বেশ করেছেন। জুতো মারবেন শালাদের। যতসব বেকার বাউণ্ডুলে। ঘাটের মড়ারা এখানে এসে উঠেছে, বাড়িভাড়া দিচ্ছে না, দোকানে বাকি রাখছে, এদিকে কিছু বলতে গেলে বাবুদের অপমান।'

রমেশ আরো কিছুক্ষণ বিড়ি টেনে পরে শিবনাথের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'এটা কে. গুপ্তর ওই শালা বন্ধু সিনেমার লোকটার উস্কানি। বুঝলেন না। কোনরকমে শুনে ফেলেছে আপনি বেকার। তারপর মাছির মত এসে জুটেছে।'

'আমার স্ত্রী এখনো সার্ভিসে আছেন এটা ভদ্রলোকের বোঝা উচিত।'

'সিনেমার লোক কি আর ভদ্রলোক হয় মশাই, টাকার গরমে সব শালা পাজী বদমায়েস দম্‌বাজ বনে যায়।'

'না না, চারুবাবুর দোষ নেই। সব বদমায়েসী কে. গুপ্তর, আমি টের পেয়েছি। এসব বলে খাতির দেখিয়ে আমার কাছে পয়সা ধার চেয়েছিল। ফলে উল্টো ফল হ'ল।'

'একটি পয়সাও ধার দেবেন না।' রমেশ চোখ বুজল। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'সেই জন্যই বলছিলাম, আপনি চান্স নষ্ট করবেন না। অর্থাৎ বেশিদিন ইয়ে থাকাটা পারিবারিক শান্তির দিক থেকেও ভাল না। আপনি ভাববেন না যে, কালকে রাতে আপনারা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করেছেন শুনে আজ আমি একথা বলছি। আমার সঙ্গে মল্লিকার রোজ ঝগড়া খিটিমিটি বেধেই আছে। পারিজাত তার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন মাথা ফাটাফাটি করে সেদিন টের পেয়ে এসেছেন। সেসব কিছু না।' আসল হ'ল এই বুঝেছেন। এই থাকলে স্ত্রী কোনমতেই পুরুষের অবশ থাকে না।' রমেশ দু'আঙুলে টাকা বাজাবার ইঙ্গিত করল।

'তা তো বটেই।' শিবনাথ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'আপনি চলে যান। আপনাকে টুইশনি দিতে যদি পারিজাতের স্ত্রী আপত্তিও করে, আপনাকে অন্যভাবে সুবিধা করে দেবে সে। আপনি আজ তার একটু উপকার করতে পারলে এ তল্লাটে কোনদিন আপনার মার নেই। চাকরি করুন চাই না করুন।'

শিবনাথ আবার চিন্তান্বিত হল।

অর্থাৎ এই ব্যাপার নিয়েই সে বিকেলে রমেশের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছে। পারিজাত তাকে ডেকেছে। ব্যাপারটা ঘটেছে অবশ্য রুচির জন্য। সকালে ও বলাইর মেয়ে ময়নাকে নিয়ে স্কুলে যায়। কিন্তু রাস্তায় শেয়ালদা নেমেই ময়না দু'তিনটে ছেলের সঙ্গে রুণুকে দেখতে হাসপাতালে চলে যায়। ময়না হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেনি। কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারে না। সম্ভবত সেই তিনটি বখাটে ছেলেই ওকে কোথায় আবার নিয়ে গেছে। রুচি কেবল মঞ্জুকে নিয়ে ঘরে ফিরেছে। বলাইর কাছে ঘটনাটা বলতেই সে তিন লাফ দিয়ে বারো ঘরের মস্ত উঠোন পার হয়ে শিবনাথের ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে রুচিকে এবং সেই সঙ্গে শিবনাথকে অপমান করতে চেয়েছিল। অবশ্য তা আর করতে পারেনি কেননা, তার আগেই শিবনাথ দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দেয়। বলাই রাগে ফুলতে ফুলতে এবং শিবনাথ ও তার স্ত্রীকে যাচ্ছে-তাই গালিগালাজ করতে করতে ছুটে বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেছে। ঠিক তখন পারিজাতের সরকার মদন ঘোষ গিয়ে শিবনাথকে খবর দেয়। বাবু তাকে এখান যেতে ডাকছেন।

'কি ব্যাপার ?'

মদন ঘোষ কিছু বলতে পারেনি। কেবল কে. গুপ্তর ঘরের দিকে একবার আড়-চোখে তাকিয়ে চুপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

ব্যাপারটা কে. গুপ্তর ছেলে সম্পর্কে শিবনাথের বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। এবং তাকে এসব কিছুতেই পেত না যদি আজ হাসপাতালে রুণুর সঙ্গে ময়নার দেখা

হওয়ার ব্যাপারে রুচিও অংশত জড়িত না থাকত।

মুর্খ বলাইর ব্যবহারে রুচি ভয় পেয়ে গেছে। যদিও এ-ব্যাপারে ও কিছুই না। এমন সময় মদন ঘোষকে পাঠিয়ে পারিজাতের ডাক। এখনই দেখা করা যুক্তি সঙ্গত কিনা শিবনাথ প্রশ্ন করতে গম্ভীর মুখ করে রমেশ বলেছে, 'না, এ-ব্যাপারে যে আপনার স্ত্রী কিছুই না, পারিজাত একজনের কাছে আগেই খবর পেয়েছে। স্ত্রী সম্পর্কে আপনার ভাবনা নেই।'

'কে লোকটা। কার কাছে খবর পেল?'

'বনমালী।'

'ও তখন কি শেয়ালদায় ছিল?'

রমেশ মাথা নাড়ল।

'দোকানের মাল কিনে ফিরছিল বনমালী।'

শিবনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

ময়না ও রুণুর ব্যাপার নিয়ে বলাই তার স্ত্রীকে অপমান করেছে এবং কাল তাদের একটা সামান্য কাঁচের প্লাস ভাঙা নিয়ে কে. গুপ্ত শিবনাথের স্ত্রী সম্পর্কে বিশ্রী কথাবার্তা বলেছে। অবশ্য তার দরুন সে কে. গুপ্তকে কিভাবে গলাধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, সে ঘটনাও শিবনাথকে পুরোপুরি বলতে হ'ল।

সেই সূত্রেই রমেশ টাকাপয়সা, সঙ্গতি, সহায় সম্বল, নিজের খুঁটির জোর রাখা নিয়ে এতক্ষণ শিবনাথকে বোঝাচ্ছিল।

'ধরুন পারিজাত যদি কোনো ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য চায়, আমি বলব নিশ্চয় আপনার এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

কিসের সাহায্য, কোন্ বিষয়ে শিবনাথ পরিষ্কার বুঝতে না পেরেও খুব বেশি অস্বস্তি বোধ করল না। যেন কিছুটা আন্দাজ করেই চুপ করে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে আরো কি বলে অপেক্ষা করে।

'আপনি কি পারিজাতের ওখানে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' রমেশ বলল, 'এই তো ফিরলাম। ইলেক্শনের ব্যাপারে দুটো শলা-পরামর্শ করতে ডেকেছিল। আপনি যান। আমাকে বলছিল আপনার সঙ্গে দেখা হলেই পাঠিয়ে দিতে!'

শিবনাথ চুপ করে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। রমেশ বলল, 'মান ইজ্জত, সম্ভ্রম সুখ সব থাকে পকেটে দুটি পয়সা থাকলে। ব্ল্যাক মার্কেট, মিছে কথা। আরে মশাই, চারিদিকেই যখন ভেজালের বাজার, আমার মধ্যেও একটু-আধটু ভেজাল রাখতে হবে বৈকি। না হলে বাঁচব কি ক'রে এই দুর্দিনে। চিন্তা করে দেখুন।'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'তাতো বটেই, কে কাকে এখন—' সে থামল।

'সাচ্চা থেকে থেকে অমলটা নিজের স্ত্রীকে বেশ্যা বানাল শুনলেন তো।' রমেশ বলল।

এই গল্প শিবনাথই করেছে একটু আগে রমেশের কাছে। ঘোলপাড়ায় চারু

কেমন আদরে আছে। আর এত করেও কে. গুপ্ত কিরণের হাতে গলাধাক্কা খেল। কারণ বেচারার পয়সা নেই।

'তবে আর কি। সংসারে মানুষের আগে কি দরকার চারদিক দেখে শিখেছেন যখন, চান্স এলেই আগে নিজের খুঁটি জোরদার করতে কারো দিকে তাকাবেন না, এই আমার শেষ পরামর্শ।' হিস হিস করে রমেশ কথা বলছিল। তেমনি হিস হিস শব্দ হচ্ছিল দূরের একটা করাত কলের। তৃপ্তি-নিকেতনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে বেবিকে এবং ক্ষিতীশকে আজ একবারও দেখল না শিবনাথ।

রমেশ বলল, 'রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ পারিজাত কলকাতা থেকে ফিরবে আর একটু অপেক্ষা করুন। আর একটু চা খাবেন?'

তৃপ্তি-নিকেতন।

তেমনি উর্বশী-হেয়ার-কাটিং সেলুন। সন্ধ্যাবাতি লাগানো হয়েছে। এইমাত্র একটি খদ্দেরের মুখ কামিয়ে ক্ষুর ধুয়ে সাফ্ করে পাঁচু তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিল। যতক্ষণ খদ্দের ছিল আর একটা চেয়ারে উপবিষ্ট বিধু মাস্টার কথা বলছিল না।

হাত মোছা শেষ করে পাঁচু দরজায় এসে সিগারেট ধরাল। পাঁচু বাইরে রাস্তার দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে লক্ষ্য করে বিধু মুখ খুলল। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'না, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। তুমি কালই আরম্ভ করে দাও পাঁচু।'

'আমি লুকিয়ে ছাপিয়ে ব্যবসা করব না। আমি চিটিংবাজ নই। তোমায় বললাম মাস্টার লোক জানাজানি হবে। এখন তুমি নিজে ভেবে দ্যাখ। কারবারে নেমে আমি লোক ঠকাতে রাজী নই।'

'না, আমি ঠিক করেছি।' মাস্টার দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে বলল, 'নিত্য অভাব সহ্য হয় না পাঁচু—পেটে খেতে পাই না তো সুনাম ধুয়ে জল খাব নাকি। তুমি আরম্ভ করে দাও। কালই সাইনবোর্ডটা লিখিয়ে ফেল।'

পাঁচু ঘুরে দাঁড়ায়।

কাটা ঠোঁট খুলে হেসে বলে, 'আমায় যখন তুমি মালিশের ব্যবসায় নামতে সাহস দিচ্ছ, আমিও তোমার সুবিধাটা আগে দেখছি। তাই তো বলছি, এই চান্স নষ্ট করো না।'

'না না ঠিক আছে।' মাস্টার ঘাড় নাড়ল। 'একটা আধলা ধার দেয়ার ক্ষমতা নেই তো কোন্ হারামজাদাকে আমি তোয়াক্কা করব। আমার পায়া আমাকে শক্ত করতে হবে, খেয়ে বাঁচতে হবে।'

পাঁচু বোঝাল, 'দরকার হলে তুমি বারো ঘরের আস্তানা গুটিয়ে ফেল। ছেলে-মেয়েরা রোজগার আরম্ভ করলে কী দরকার তোমার ওই পচা বস্তিতে পড়ে থাকবার। একটু ভাল বাড়িতে—'

'তুমি?'

'আহা আমার কথা তো হচ্ছে না। আমি শালা কারবার শুরু করে তো কিছু

আর রাজা হয়ে যাচ্ছি না। এটা আরম্ভ করছি তোমাদের দশজনের সুবিধার কথা ভেবে। গভর্নমেণ্ট যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে কুটির-শিল্প খুলে দেশের বেকার কমাবার প্ল্যান করছে। না হলে আমার শালা কি। কারবার খুলে লাখপতি হব না। আমি ওই শালা দিশিই টানব আর বস্তির ঘরেই থাকব।'

একটু চুপ থেকে মাস্টার হাসল।

'তা আমি জানি। তুমি—তোমার মধ্যে আমি চিরকালই প্লেইন লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং জিনিসটা লক্ষ্য করে আসছি। রমেশের মতন নিত্যনতুন ধুতিজামা জুতো-মোজা পর না। তবে হ্যাঁ খাওয়া—তোমার ঘরে খাওয়াটা অনেকদিনই রমেশের ঘরের চেয়ে ভাল হয়। হুবলো বলছিল কাল আবার কাছিম এনেছিলে। খুব প্রোটিন ফ্যাট্ আছে ওতে। আই লাইক ইট্।'

পাঁচু কথা বলল না।

'সেই কয়লাচোর বলাইও আজ আমাকে ঠাট্টা করে। আমার ঘরের হাঁড়ি তিনদিন চালের মুখ দেখছে না। কেবল মাসকলাই।'

পাঁচু চুপ করে সিগারেট টানে।

মাস্টার জীর্ণ ময়লা খুঁটে দিয়ে একটা চোখের কোণা মুছল।

'লোকের খাওয়া পরা নিয়ে যারা এভাবে ঠাট্টা করে তারা কতখানি পশু নরাধম একবার চিন্তা করে দ্যাখো পাঁচু।'

পাঁচু এবারও কিছু বলল না।

'থাকবে না। এসব ভ্যানিটি থাকে না। মানুষের আত্মম্ভরিতা স্ট্যাণ্ড করতে পারে না, একজন আছে মাথার ওপর। গড্। শেখর ডাক্তার একদিন আমাকে ইন্‌সাল্ট করেছিল আজ তার ঘরের দুরবস্থা দ্যাখো।'

'বললাম তো, আর বক্তৃতায় কি হবে। চান্স যখন এসে গেছে এইবেলা কামড়ে ধরো। নাও, বাড়ি যাও, আমি দোকান বন্ধ করব।'

'হ্যাঁ, তোমার আবার ইয়ের সময় হয়ে পড়ে। না, তোমার আর ইতস্তত করতে হবে না। তুমি সাইনবোর্ড টাইনবোর্ড লিখিয়ে ঠিকঠাক করে নাও। আমি রাজি। আমি আজই গিয়ে ওদের বোঝাব। দারিদ্র্যের সঙ্গে আর মিতালী না।' ব'লে বিধু মাস্টার তখনই চেয়ার ছেড়ে ওঠে না। দোকানের বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে ভাবে। দূরে করাতকলের হিস হিস শব্দ হয়। এত রাত্রেও সেই ঢাউস মাছিটা নর্দমা থেকে উঠে এসে বিধু মাস্টারের দাড়ির এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে। পাঁচু দেরাজ টেনে চাবির গোছা বার করল।

আর সন্ধ্যা ঝুলছে 'সুরমা-লজে'—মিহির ঘোষালের বাড়িতে। তাঁর পরলোকগত স্ত্রীর নামে এ বাড়ীর নামকরণ। মিহিরবাবু কাল বীথিকে বলছিল। না হলে বীথি জানত না সুরমা কে, কি সম্পর্ক ওর এ বাড়ির সঙ্গে।

এইমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে।

কালি-ঝুলি-মাখা লণ্ঠনের লালচে শিখা,—চারদিকে করাতকল, সুরকিকলের

হিসহাস ভুসভোস আওয়াজ, অফুরন্ত মশার গান আর কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ও মোষের গাড়ির ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ নিয়ে এখানে সন্ধ্যা আসে না। বীথি পরশু দেখেছে, কাল দেখেছে, আজও দেখল। দেখল এবং অনুভব করল নিবিড় শান্ত পরিচ্ছন্ন দিবাবসানটি।

বাগানে পায়চারি করছিল বীথি। অদূরে সামনে একটি বেতের টিপয় রেখে দুটো ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে মিহির আর তার এক বন্ধু।

বীথির কোলে টুটুল। ঘুমিয়ে পড়েছে।

যেন এইবেলা ঘরে ঢুকে শিশুকে ঘুম পাড়াতে যাবে বীথি। কিন্তু মিহির কথা বলছিল বলে চট্‌ করে আর সে সরতে পারে নি। মিহির প্রশ্ন করছে, আর পায়চারি করে করে বীথি আস্তে আস্তে কথাগুলোর উত্তর দিচ্ছে।

মিহিরকে এ দু'দিনে যা-হোক সহ্য হয়ে গিয়েছিল বীথির। কিন্তু তার বন্ধুর সামনে আড়ষ্টতা, লজ্জা এবং অপরিচিত একটা ভয় কোনমতেই কাটাতে পারছিল না।

'তোমাদের সেই বাড়িতে কি অনেক লোক?' বন্ধু প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'না তোমার সে-বাড়িতে থাকা সম্ভব না।' মিহির বলল, 'না না আমাদের সমাজ এখনো এ ধরনের কাজকে স্বাভাবিক বলে নিতে পারছে না। সত্যি তো। এখানে আমার বাড়িতে রাত্রে থাকা সেটা—' মিহির থামল।

বীথি ঘাড় হেঁট করে জুতোর ডগা দিয়ে একটা ঘাসের শিষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছিল।

আর প্রায়ান্ধকার সেই মাঠে বীথির পা, ঘাসের শিষ ও জুতোর ডগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে লঘুপক্ষ প্রায় চোখে দেখা যায় না সাদামতন ছোট্ট প্রজাপতিটা তখনো উড়ছিল। সেই বিকেল থেকে উড়ছে।

'তবে কি ঠিক করলে?' মিহিরের বন্ধু এবার প্রশ্ন করল। 'তোমার গার্ডিয়ানদের তরফ থেকে কোন আপত্তি আছে কি না?'

বীথি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

মিহির বলল, 'না, তা নেই।' বলে টিপয়ের ওপর থেকে সিগারেটের টিনটা কাছে টেনে নিল। পাখিরা ডাকছিল। হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ওপর বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে মিহিরের বিরাট বাড়ির পিছনেও বড় বাগান। শেষ সীমানায় সারিবন্ধ বড় বড় কড়ি ও বাঁশ গাছ দাঁড়িয়ে আছে বলে সেদিক থেকে রোজ সন্ধ্যায় এমনি সহস্র পাখির কিচিরমিচির ভেসে আসে। অবশ্য এখনি ওরা চুপ করবে।

'তোমাদের ফ্যামিলিতে ক'জন মেম্বার?' অন্ধকারে মিহিরের বন্ধুর ভ্রূ কুঞ্চন দেখা গেল না।

'অনেক।' মিহির সিগারেটের রাশি রাশি ধোঁয়া ছড়িয়ে শুকনো মোটা গলায় বলল, 'শুনলাম ওর ওপরে তলায় আরো অনেক ভাইবোন।'

তালুর গায়ে জিহ্বা ঠেকিয়ে মিহিরবাবুর বন্ধু অনুচ্চ সহানুভূতিসূচক শব্দ করল।

'ব্লাণ্ডার—দেয়ার লাইজ দি কজ অব অল আনহ্যাপিনেস মিজারিস মিসফরচুনস্ পোভার্টি—ডেস্ট্রাকশন। এমনি তো এখনো এদেশে আর্লি ম্যারেজের সংখ্যা বেশি।'

মিহির আর কথা বলল না।

বীথি আর ঘাসের বুকে পা ঠেকাল না।

'এক কাজ করো—' যেন কি একটা প্রস্তাব দিতে গিয়ে মিহিরের বন্ধু চুপ করল।

'কিছু করতে হবে না।' মোটা খসখসে গলায় মিহির বলল, 'ওবাড়ি ছেড়ে দাও—বারোঘরের বারোভূতের আড্ডায় তোমাদের থাকা উচিত না। তোমরা শহরে চলে এসো। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আমরা আগেও কোলকাতায় ছিলাম।'

'হ্যাঁ, তুমি তো বলছিলে দুপুরবেলা। বাদুড়বাগান না কোথায় ?'

'বৌবাজার।'

'দ্যাট উইল বি গুড। নিজেরা রোজগার করবে, একটু ভালভাবে থাকবে খাবে এতে আবার কার এত কথা শোনার ধৈর্য। তোমার দিদির আজ ক'বছর যেন টেলিফোনে ?'

'তিন।'

'উঁহু—দ্যাট ইজ নট এ গুড জব। এত ভাল চেহারায় এমন ওয়াণ্ডারফুল ফিগারে আরো ভাল সম্ভ্রান্ত কাজের দরকার তোমার বোনের।'

আজ বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময় প্রীতি এখানে হয়ে গেছে। ছোটবোনের নতুন কর্মস্থল ও কাজের রকমটা দিদি হয়ে তার একবার দেখা কর্তব্য-বিবেচনা করেই প্রীতি এসেছিল।

মিহির তাকে যথোচিত সম্বর্ধনা করে চা ও প্লেটভর্তি মিষ্টি খাইয়ে ছেড়েছে। বীথির দিদিকে মিহিরের বন্ধু দেখেনি। সে পরে এসেছে।

'ওর চেয়ে নিশ্চয়ই আরো টল্ হবে ওর দিদি ?' মিহিরের বন্ধু প্রশ্ন করল।

মিহির তাতে কান না দিয়ে বলল, 'ইউ ডু দ্যাট—বুঝলে বীথি, শহরতলি ছেড়ে আবার তোমরা ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করো। আমি তোমাদের বাড়তি বাড়ি ভাড়া সম্পর্কেও কনসিডার করব, আজ ফিরে গিয়ে দিদি ও মাকে বলবে। এইবেলা ঘর খুঁজে নাও।'

বীথি ঘাড় নাড়ল। আর দাঁড়াল না। টুটুলকে নিয়ে ঘরে উঠে গেল। এবং একটু পর যখন বেরিয়ে এল দেখা গেল হাতে ওর ছোট ব্যাগ।

বীথি মাঠে নেমে ফটকের রাস্তাটুকু পার হয়ে বেরিয়ে যেতে মিহির একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। পিছনের বাগানে পাখির কিচিরমিচির থেমেছে।

যেন অনেকটা নিজের মনে কথা বলল মিহির : 'ওর প্রয়োজন টাকার, আমার প্রয়োজন স্নেহের—যত্নের—আন্তরিক সেবার। কী আশ্চর্য অসংলগ্নতা !

মিহিরের বন্ধু অনেকক্ষণ কথা বলল না।

মিহির আবার আশ্চর্যভাবে,—যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল।

'আশ্চর্য সাহস! বাপ মা ভাইবোনের মুখের ভাত জোগাড় করতে খুঁজতে

খংজতে কোথায় এসে কি করে একটা কাজ জোগাড় করল তো !'

যেন আর চুপ থাকতে পারল না, অল্প হেসে বন্ধু এবার ইজিচেয়ার থেকে মাথা তুলল। 'তবে কি বলতে চাও ও নিজে এখানে খংজেপেতে এই পোস্ট ক্রিয়েট করল। তোমার দিক থেকে কোন গরজ ছিল না—তোমার বাচ্চাটিকে দেখাশোনা করবার ?'

'ইয়েস—আই ওয়াণ্টেড এ প্রফেসন্যাল নার্স।' মিহির ভারি গলায় বলল, 'এখন দেখছি একেবারে কাঁচ অসহায়, অদ্ভুত রকমের র'—নভিস। আমার এক ডাক্তার বন্ধু জোগাড় করেছে। মেয়েটির সংসারের অবস্থা শুনলাম, শুনে আর না করি কি করে ?'

বন্ধু আবার একটু সময় কথা বলল না। তারায় ভর্তি আকাশটার দিকে তাকিয়ে কি ভাবে, পরে আস্তে আস্তে বলল, 'উঠি, চলি। বড্ড মিস্ করলাম। বড়টিকে দেখতে পারলাম না।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বন্ধু টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে তাতে অগ্নিসংযোগ ক'রে বিদায় নিল। চলে যাবার সময় বন্ধু ফটকের কাছে গিয়ে খুক্ করে যেন একটু কাশল—কাশল কী হাসল বুঝতে না পেরে মিহির চমকে উঠল। এবং যদি হেসেই থাকে তার কারণ কি, একলা বাগানের অন্ধকারে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে মিহির একটু সময় চিন্তা করল একটুক্ষণ। তারপর আর কিছু ভাবল না। ধীরে গম্ভীর গলায় রঘুনন্দনকে ডাকল। পুরোনো চাকর অর্থাৎ সুরমার আমলের বুড়ো দীনদয়ালকে মিহির ছাড়িয়ে দিয়ে এই নতুন হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে সম্প্রতি বহাল করেছে। রঘুনন্দন এসে সামনে দাঁড়াতে মিহির হিন্দীতে প্রশ্ন করল, 'নীলাঞ্জনবাবু যখন কুঠিতে ঢোকে তুমি বলনি আমি বাথরুমে ছিলাম ?'

'জি হ্যাঁ।' রঘুনন্দন মাথাটি কাঁধে ঠেকাল।

একটু সময় কি ভাবল মিহির। তারপর শক্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'এর পর থেকে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোনো আদমিকে কোনো বাবুলোককে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।'

'বহুৎ আচ্ছা।' রঘুনন্দন আবার কাঁধে মাথা ঠেকাল। ভৃত্য চলে যাবার পরও মিহির বাগানের অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ভাবে।

সন্ধ্যা নেমে রীতিমত রাত হয়ে গেছে আর এক জায়গায়। হ্যাঁ খালধারে। পাগলাডিঙির পারঘাটার কাছে। একটা তেলেভাজার দোকানে। টিম টিম করে কেরোসিনের ডিবি জ্বলছে। দোকানের ভিতর অনেকটা জায়গা জুড়ে বাঁশের মাচা খাটানো। এবেলা আর উনুন ধরানো হয়নি। সকালের ভাজা ঠাণ্ডা ফুলুরী, বেগুনি এবং আরও দু'এক পদ খাবার সাজিয়ে মাচার ওপর দোকানের মালিক হরিপদ দত্ত বসে আছে। ক্ষিতীশের বন্ধু। হরিপদর সঙ্গে ক্ষিতীশের একটু আত্মীয়তার রেশও আছে। ডিগবয়ে ক্ষিতীশের যে মামা চাকরি করে হরিপদ তার শালা। ক্ষিতীশের যেমন মন চাইছে না তার দাদা অর্থাৎ রমেশের চায়ের দোকানে থাকতে, তেমনি হরিপদও ভগ্নিপতির সুপারিশে পাওয়া ডিগবয় অয়েল কোম্পানী চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে স্বাধীন ব্যবসা করতে। এই তেলেভাজার দোকান খোলা ছাড়া এখানে এসে আর বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারল না সে। দোকানের ভিতরে একধারে দু'টো বাঁশ আড়াআড়ি করে পোতা। একবার কয়লার দোকান আরম্ভ করবে

বলে কাঁটা ঝোলাবার জন্য বাঁশ দুটো পোঁতা হয়েছিল। আগাম টাকা দিতে পারেনি বলে গুদাম থেকে কয়লা আর আসেনি।

বাঁশের মাচাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স। বাক্সের উপর ক্ষিতীশ বসে আছে চুপ করে। তার চেহারায় উত্তেজনা, অস্থিরতা এবং কিছুটা বিমর্ষতাও।

বাক্সটার পিছনে একটা ছোট জলচৌকির ওপর চুপ করে বসে আছে বেবি। মাচা থেকে অনেক নিচুতে বসা বলে রাস্তা কি দোকানের চৌকাঠে দাঁড়িয়েও বেবিকে দেখা যায় না। তা ছাড়া ওর মুখটা দরজার বিপরীত দিকে বেড়ার দিকে ঘোরানো। ভিতরে ঢুকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেবির একটা চোখ বোজা। যেন সেই চোখ দিয়ে ও ঘুমোচ্ছে। আর একটা চোখ খোলা। স্থির পলকহীন তার চাউনি। বেড়ার গায়ে চোখটা মেলে ধরে দুটো টিকটিকির শিকার ধরে খাওয়া দেখছিল ও এতক্ষণ। অত্যন্ত বিমর্ষ এবং গম্ভীর ওর মুখখানাও। দু'পা এগোলে প্রকাণ্ড ঝিল। হরিপদর দোকানের সামনে একটা শিশু অশ্বত্থ গাছ। হরিপদর মাচায় বসে তা চোখে পড়ে। পশ্চিম আকাশের শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ঝুলছে। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় খাল ও ঝিলের জল চিকচিক করছিল। আর ছিল দমকা হাওয়া। সেই হাওয়ায় খালধারের ধুলো উড়ছে, গাছের পাতা ঝরছে, হরিপদর দোকানের কিরোসিনের ডিবিটা বার বার নিভে যাচ্ছে। একবার আলো নিভে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ হরিপদ আর আলো জ্বালেনি। ভূতের মত চুপ করে মাচার ওপর বসে বিড়ি টানছিল। ক্ষিতীশ অবশ্য সিগারেট টানছিল। দু'জনের একজনের মুখেও তখন কথা ছিল না। মশার কামড়, নাকি হাওয়ার ঝাপটায় হঠাৎ দরজার বাঁশটা পড়ে যেতে ভয় পেয়ে বেবি অস্ফুট আর্তনাদের মত 'উঃ' ক'রে উঠল।

'ঝাঁপ বন্ধ ক'রে দে হরিপদ।' ক্ষিতীশ বলল, 'রাত হয়েছে তেলেভাজা আর খাবে কে।'

হরিপদ কথা না বলে আলো জ্বালে। তারপর উঠে আধখানা ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে ডিবেটা তার আড়ালে রাখে। বাতির শিখা আর নড়ে না।

'নে এইবেলা ভাল করে বুঝিয়ে বল্, আর বসে থাকবি কত। আমি দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরি, রাত হল।'

'তুই বোঝা হরিপদ, তুই বুঝিয়ে কাঠের পুতুলের মুখে রা ফোটা। আমার সঙ্গে তো উনি ভাসুর সম্পর্ক পাতিয়েছেন।'

'না, আমার বোঝানোয় চলবে কেন।' মিনমিনে গলায় হরিপদ বলল, 'তোমার জিনিস তুমি দেখবে।'

ক্ষিতীশ বেবির দিকে ঘাড় ফেরায়।

কালি জমে সলতের গায়ে ঝুল জমেছিল। আর একবার আলো জ্বালতে হরিপদ আঙুলের টোকা দিয়ে সেটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার পর আলোটা এখন বড় মোটা হয়ে জ্বলছে। মাচার ওদিকটা ভাল দেখা যাচ্ছে। বেবির সামনে একটা শালপাতার ঠোঙা।

তাতে এতগুলি তেলেভাজা। তেমনি পড়ে আছে। একটাও বেবি মুখে তোলেনি ?

ক্ষিতীশ একটু সময় সেদিকে চেয়ে থেকে পরে হরিপদর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে জিহ্বা ভোঁতা করেছি। এখন তোমরা বোঝাও। যদি একটু চৈতন্য হয় নবাবজাদীর।'

'এই বেবি!'

বেবি মুখ নিচু করে ছিল।

হরিপদ মোটা গলায় বলল, 'ক্ষিতীশ কি বলছে শোন্।'

ক্ষিতীশ আর একটা সিগারেট ধরাতে দেশলাইয়ের কাঠির প্রচণ্ড শব্দ করল। বারুদের গা ঠিকরে তার চোখের কাছে আগুন ছুটে যায়। তেমনি প্রচণ্ড শব্দ করে দেশলাইটা হরিপদর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, 'মা'র মাথায় ছিট। বাপটাকে বলা যায় রাস্তার পাগল। আর যে জন্যে তিনির মন নড়ছে না, পা সরছে না,—ভাই। তা ভায়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে পারিজাত। হ্যাঁ, বাড়িওলা। এই ঠ্যাং নিয়ে বেঁচে থাকলেও ঘরে শুয়ে থাকতে হবে, হাঁটতে হবে না। তারপর ?'

হরিপদ বলল, 'পেট চালাতে তোমাকে চাকরি করতেই হবে। চায়ের দোকানে হোক আর দুধের দোকানে হোক।'

'বাড়িউলি মাসীর পাল্লায় পড়তে হবে', ক্ষিতীশ নাকের বিকট শব্দ বার করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। 'এখানে এই হালে রমেশ রায়ের দোকানে থাকলে গোল্লায় যেতে বেশিদিন লাগবে না। আমার কথা ফলে কিনা তুই চেয়ে দ্যাখ হরিপদ।'

একটা ঢোক গিলল হরিপদ। কথা বলল না। ফ্রকের ছেঁড়া অংশে বেবির মেরুদাঁড়ার কাছাকাছি পিঠের চামড়ায় এতবড় একটা মশা হুল ফুটিয়ে বসে আছে, রক্ত টানছে। বেবি নড়ল না। ক্ষিতীশ দেখল, নড়াল না। দূর থেকে হরিপদ আর সেটা দেখে না।

'তোর তো একটা মত দিতে হবে। না হলে—' হরিপদ থামল।

বেবি তেমনি বেড়ার দিকে তাকিয়ে; বোজা চোখটাও এখন খোলা।

'না-ই বা হবে কেন।' ক্ষিতীশ গলা ঈষৎ চড়াল: অর্থাৎ পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। বেশ ক্ষিদে আছে, আমি টের পাই। আজ ক'মাস নেড়েচেড়ে দেখলাম তো।'

'কি কথা বল্ না।' হরিপদ একটা বড় ধমক দিল।

বেবির নাকের পাশটা একটু চিকচিক করে উঠল।

'ঢং।' ক্ষিতীশ নাক দিয়ে ধোঁয়া ছড়াল। মত। মত চাইছি আঠারো বছর হয়নি বলে। পুলিশে গোলমাল করবে রাস্তাঘাটে। নাবালিকা, কিন্তু হিন্দু আইন-মতে সাবালিকা হয়েছে কিনা তুই একবার লাটসাহেবের মেয়েকে গোপনে জিজ্ঞেস কর্ না হরিপদ।'

কথা না কয়ে হরিপদ বিড়ি ধরাল।

'বেশ তো, থাক্। বারো ভূতের সেই বাড়িতে থাকবি আর রমেশের দোকানে চা বানিয়ে পাড়ার লোককে খাওয়াবি। এই যদি তোর সুখের জীবন কামনার হয় বল্। হ্যাঁ, পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দে, আমি সরে যাই। আমার রাস্তা দেখি।'

বেবি ক্ষিতীশের দিকে এই প্রথম মুখ ফেরাল। নাকের ধারটা আর চিকচিক করছে না। 'তুমি ভীষণ মারধর করবে। তুমি যখন রাগ করবে কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না। আমার সাহস হয় না।'

'হবে, হয়। দূরে দেশে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকার স্বাদ আলাদা। তখন কি আর এই ক্ষিতীশ ক্ষিতীশ থাকবে।' হরিপদ পোড়া বিড়িটাতে আর একটা কাঠি জেবলে আগুন ধরায়।

'রমেশ তোর গায়ে হাত দিল বলে, কুত্তি।' ক্ষিতীশ আবার ক্ষেপে উঠল—'বলছি একবার হাওড়া না হয় শেয়ালদার টিকিট কেটে তো আগে ট্রেনে ওঠা যাক। ওই ছেঁড়া ফ্রক প'রে পাঁচজনের চা বানানোর চেয়ে অসম্মানজনক হবে না এটা, তোর মাথায় আসে না? আর নোংরাভাবে জীবন কাটানো ইচ্ছে থাকলে বল অন্য সুরে কথা বলি।'

বেবি নীরব নত-নেত্র।

একটা জলের ফোঁটা এসে নাকের ডগায় ঠেকেছে। হু হু করে ঝিলের হাওয়া ঢুকছিল বলে হরিপদ বাকি আধখানা ঝাঁপও নামিয়ে দিল। পাগলাডিঙির ফাঁড়ি থানায় তখন ন'টার বেল বাজছে।

আটত্রিশ

নিভৃত কক্ষে দু'জনের আলোচনা হচ্ছিল। কি নিয়ে আলোচনা বুঝবার উপায় নেই। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে তারা কথা বলছে। পারিজাতের সুদৃশ্য টেবিলের এক-ধারে রক্ষিত সবুজ টুপিপরা একটা ল্যাম্প জ্বলছে। দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার চোখ তুলে শিবনাথ তাকিয়ে দেখল এগারোটা দশ। কিন্তু রাত গভীর হ'ল বলে সে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা বা চঞ্চলতা প্রকাশ করছে না। বরং আজও স্থির সংযত হয়ে পারিজাতের মুখের দিকে তাকিয়ে তার শেষ প্রস্তাব শুনল। শুনে মাথাটা একটু দুলিয়ে অল্প হেসে সে পারিজাতকে আবার যেন কি বোঝাতে পারিজাতের চোখ দুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'দ্যাট্‌স রাইট। ঠিক আছে। তা' হলে আপনি,—আপনাকে আমি আর ধরে রেখে কষ্ট দিই না। যান এইবেলা ঘরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন—অনেক রাত হ'ল।'

'না, তেমন আর কি রাত।' শিবনাথ আরো দু'মিনিট স্থির হয়ে বসে থেকে কি একটু চিন্তা করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। পারিজাতও চেয়ার ছেড়ে উঠল।

'আপনার সঙ্গে টর্চ নেই? সরকার মহাশয়কে কি বলব আলোটা নিয়ে রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দিক—'

শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, কিছু দরকার হবে না। কতটুকু রাস্তা। তাছাড়া বেশ জ্যোৎস্না আছে।'

বারান্দা এমন কি সিঁড়ি পর্যন্ত পারিজাত শিবনাথের সঙ্গে এল।

'আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।' শিবনাথ বলল।

'আচ্ছা, গুড নাইট।' পারিজাত হেসে উত্তর করল।

'গুড নাইট।'

আজ পারিজাতের ড্রইংরুম ছাড়া আর কোন কামরায় আলো নেই। বাড়িটাও বড় বেশি চুপচাপ। পুরো আড়াই ঘণ্টা শিবনাথ এখানে কাটিয়েছে। একবারও দীপ্তির গলার স্বর বা শিশুদের কলরব শোনা যায়নি। না, ওরা এখানেই নেই। কেন নেই কোথায় গেছে শিবনাথ জানে। পারিজাত সবই তাকে বলেছে। বস্তুত পারিজাত যে এমন অন্তরঙ্গ হতে পারে শিবনাথের আগে ধারণা ছিল না। অবশ্য মাত্র একদিনের আলোচনার পর দীপ্তিও খুব অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন। শিবনাথ তার পরিচয় পেয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বামী পারিজাত লোকের সঙ্গে আরো বেশি আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্ব করতে পারেন। জানেন। শিবনাথ তার একাধিক প্রমাণ পেল। পৃথিবীর সকল লোকের সঙ্গেই পারিজাত তা করে কিনা শিবনাথের মনে প্রশ্ন জাগল এবং যাদের সঙ্গে সেটা সম্ভব হয় না, তাদের মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে বা থাকতে পারে, প্রকাণ্ড কলাপসিবল গেট পার হয়ে রাস্তায় নামতে নামতে শিবনাথ চিন্তা করল। হয়তো অন্যদিন পারিজাতের কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে ঘাড় ফিরিয়ে সে বাংলোর একটা নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। 'কিন্তু আজ আর শিবনাথ তা করল না। করার প্রয়োজন বোধ করল না! বরং ঘরে গিয়ে কতক্ষণে সে রুচির সঙ্গে মিলিত হবে এবং ভয়ঙ্কর জরুরি কথাগুলি তাকে জানাবে, সেই তাগিদে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে রীতিমত ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যার দিকে রমেশের সঙ্গে কথা বলার পর এমনি ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে সে পারিজাতের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু তখনকার ব্যস্ততার মধ্যে উদ্বেগ ছিল, উৎকণ্ঠা ছিল এবং অজানিত একটা ভয়, আশঙ্কা। এখন আর তা না। একটা নিশ্চিন্ততা, তৃপ্তি, সন্তোষ এবং যাকে বলে 'মনের জোর' নিয়ে সে স্ত্রীর কাছে যাচ্ছে। রায়সাহেবের আমবাগানের চৌহদ্দি পার হল শিবনাথ। তাদের পাড়ার খোয়া-ঢালা অসমান পথ এসে গেল। ডান দিকে করাত-কল। বাঁ দিকে রমেশের চায়ের দোকান। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো বনমালীর দোকানও এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। শিবনাথ ভাবল। মাথা-ভাঙা নিষ্পত্র কাফেলা গাছের গুঁড়ির কাছে এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়-করানো এত-গুলো ঠেলাগাড়ি দেখে সে চমকে উঠল। অবশ্য গাড়িগুলি দাঁড় করিয়ে রাখার মধ্যে চমৎকার একটা শৃঙ্খলা ও মিল ছিল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও সবগুলি গাড়ি সমান। ঠেলার দঙ্গল পার হয়ে শিবনাথ বাদাম গাছের তলায় এসে গেল।

'কে?'

'আমি গুপ্ত।'

পদক্ষেপ আরও দ্রুত এবং দীর্ঘ করবার জন্য শিবনাথ প্রস্তুত হয়, কিন্তু কে. গুপ্ত বাধা দিল। শিবনাথের হাত ধরল না, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, 'এক সেকেণ্ড স্যার,—আপনার জন্য একটা ব্রিলিয়ান্ট নিউজ নিয়ে বসে আছি।'

পাগল না, লম্বা চুল দাড়ি এবং ছেঁড়া ঝুল বার হাওয়া সার্টে কে. গুপ্তকে ভূতের মত দেখাচ্ছিল। হাঁটু অবধি সার্টের তলায় আর কোন কাপড়চোপড় আছে বলেও মনে হল না। শীর্ণ শুকনো লম্বা পা দুটোকে দুটো কাঠ বলে মনে হচ্ছিল। জায়গাটা এখন খুবই নির্জন। চাঁদ হেলে পড়াতে জ্যোৎস্নাও মরে এসেছে। দুটো জোনাকি পোকা বাদাম গাছের কাণ্ড ঘিরে নাচানাচি করছিল। শিবনাথের গা-টা কেমন সিরসির করে উঠল। কিন্তু ভীরু সে নয়। দু' হাতে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে গম্ভীর ভাবে বলল, 'রাস্তা ছেড়ে দিন। আমার তাড়াতাড়ি আছে।'

'তা আছে আমি অস্বীকার করছি কি—না আগে কোনদিন করেছি।' অগের মত গলায় ততটা শ্লেষ নেই, বরং স্বরটা করুণ। কারণ বুঝতে পেরে শিবনাথ নিজের মনে হাসল। 'না তা আর অস্বীকার করবেন কি ক'রে। বলুন আপনার ব্রিলিয়াণ্ট খবর।'

ডাক্তার পালিয়েছে। এইমাত্র একটা ঠেলার ওপর লটবহর চাপিয়ে চুপিচুপি পাড়া ছেড়ে সরে গেল।'

'কোন্ ডাক্তার ?'

'শেখর মশায়, শেখর ডাক্তার। দ্যাট মেটিরিয়ামেডিকা—স্পেশালিস্ট—আমাদের সুনীতির বাবা গো।'

'হঠাৎ ?'

কে. গুপ্ত নাকে হাসল।

'মশায় আপনি,—আপনাকে এসব খবর দিয়েও সুখ নেই। কেন পালিয়েছে বুঝতে পারছেন না ? পথেঘাটে মাঠে সবাই এখন শেখরকে আঙুল দেখিয়ে বলছে তার মেয়ে সিফিলিস রুগীর সঙ্গে পালিয়ে গেছে—হা হা, ডাক্তারের মেয়ের ভি-ডি পেসেণ্টের সঙ্গে পালানো, একেবারে সাংঘাতিক ব্যাপার যে ! তার এ-তল্লাটে প্র্যাকটিস করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে এখান থেকে সরে গিয়ে শেখর তো বুদ্ধিমানের কাজই করেছে।'

'মানে বারো ঘরের আর একটি ঘর খালি হ'ল। ভাল। প্রভাতকণার চিৎকারে আপনার আর মাথা ধরবে না।' শিবনাথ এই প্রথম শব্দ করে হাসল। 'শুনলাম আপনার খবর, এই বেলা দয়া করে রাস্তাটা ছাড়ুন।'

কিন্তু কে. গুপ্ত সরে দাঁড়ানো বা হাত গুটাবার কোন লক্ষণ দেখাল না। 'মশাই, হাম্বাগটা রাতদিন এপিডেমিক ইয়ার এপিডেমিক ইয়ার করে খুব লাফাত, হ্যাঁ, বোগাস ওষুধ মানে স্রেফ জল খাইয়ে লোকের পয়সা লুটবার ফিকিরে ছিল, কেমন হল তো,—কন্যারত্নটি তার ঘরেই এপিডেমিক রেখে বেরিয়ে গেল। নসিব। আমরা লম্ফঝম্ফ করলে হবে কি, যা লেখা আছে তা খণ্ডন করা যায় না, অ্যাম আই রং, বলুন ?'

'হ্যাঁ, খুব হয়েছে, সরে দাঁড়ান।'

'রিয়্যালি, আপনি সর্বদাই এমন চটে থাকেন। এখন তো পয়সা চাইছি না বা আপনার গায়ে হাত দিচ্ছি না, তবে কেন —'

'কেন, আরো কোন মজাদার খবর আছে নাকি ? চট করে বলে ফেলুন।' শিবনাথের ইচ্ছা নেই এত রাত্রে আর ওর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে।

মুহূর্তকাল শিবনাথের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে কে. গুপ্ত পরে থুতনি নামায়। 'আচ্ছা, আপনি তো ওদিক দিয়েই এইমাত্র এলেন, মানে রমেশের দোকানের পাশ দিয়ে, দোকান খোলা দেখলেন ?'

'আমি তাকাইনি।' বিরক্ত হয়ে শিবনাথ বলল। তারপর কি ভেবে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ এত রাত্রে চায়ের দোকান ? কি ব্যাপার ?'

'না, বেবির আসবার কথা। এখনো আসছে না। বারোটা প্রায় বাজে, কি বলেন।'

'হবে।' নিস্পৃহ গলায় শিবনাথ উত্তর করল 'আমি ঘড়ি দেখিনি, আপনি কাইন্ডলি একটু পাশ কেটে দাঁড়ান।'

না সরে বরং আর একটু ঘন হয়ে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করল গুপ্ত। শিবনাথ সতর্ক হয়।

'না না, আমি আপনার হাতটাত আর ধরব না। বাপরে বাপ, তখন যা অর্ধচন্দ্রটা দিলেন, মনে আছে।' কে. গুপ্ত মৃদু গলায় হাসল। 'না, বেবির কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম কেন, ও এসে আমায় কিছু পয়সা দিয়ে যাবার কথা। ক্ষিতীশ নাকি আজ ওকে একটা টাকা দেবে বলেছে ! এখন বুঝতে পারছি না টাকাটা পেল কি পেল না। আর আসছেই না বা কেন। সেই কখন থেকে এখানে বসে আছি।'

'দু'পা এগিয়ে দেখুন না দোকান খোলা কি বন্ধ, বেবি সেখানে আছে কি নেই।'

গুপ্ত মাথা নাড়ল।

'আমি শালা ওখানে গিয়ে এখন ঘুরঘুর করলেই ক্ষিতীশ হারামজাদা টের পেয়ে যাবে বেবির কাছে কিছু চাইছি। বুঝলেন না ? তখন আর ওকে পাইটিও ছোঁয়াবে না।'

'তাই নাকি, বেশ মজা তো।' শিবনাথ ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসল। 'আপনার মেয়ে, বাপকে এক আধটু দিয়ে থুয়ে খাক ক্ষিতীশের বুঝি ইচ্ছা না ?'

'আরে মশাই, সেকথাই তো বলছিলাম। অথচ দেখুন, বেবির মা কিছু চেয়েছে, টের পেলে রমেশ ক্ষিতীশ দুই হারামজাদা একেবারে দানসত্র খুলে বসে। এক কাপ চায়ের জায়গায় তিন কাপ চা, একটা বিস্কুট চাইলে চারটে বিস্কুট, এত এত চিনি, বোতল ভর্তি কেরোসিন, কয়লা কাঠ। আমি কি টের পাই না, খুব টের পাই। কিন্তু আমার বেলায়—' কে. গুপ্ত হাতের বুড়ো আঙুলটা নাড়ল।

'কেন আপনার সঙ্গে রমেশ ক্ষিতীশের ঝগড়া আছে নাকি বেবির ওখানে যাওয়া নিয়ে, ইদানীং আপত্তি করেছিলেন কিছু ?'

'নেভার ! আমি এ-সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটা কথাও বলিনি। না মশাই না, সেসব কিছু না। সেই সেক্স, হি-হি।' কে. গুপ্ত ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল। 'বেবির মা যদি টিনের সমস্ত বিস্কুটও খেতে চায়, ক্ষিতীশ আপত্তি করবে না। এক টুকরোর জন্য আমি হাত বাড়ালেই শালা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে। তেমনি ওর

দাদাটি।'

'বুঝলাম, সরুন, রাস্তা দিন।'

'যেমন তখন।' কে. গুপ্তর হাসি ও কথা বন্ধ হল না। 'গুড় কিনতে এসেছিল মাগীটা। চাইতেই হুট করে আপনি পয়সাটা পকেট থেকে বার করে দিলেন, তারপর আমি যখন পয়সা চাইলাম, সুন্দর একটি গলাধাক্কা, হি-হি।'

'ননসেন্স।' শিবনাথ গুপ্তর একটা হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল এবং দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করল।

'রাগ করলেন নাকি, অফেন্স নিলেন? আমি একজাম্পল হিসাবে কথা বললাম শুধু—শুনুন, শুনুন।' গুপ্ত পিছন থেকে ডাকে।

'চুপ রাস্কেল।' শিবনাথ ঘাড় ফিরিয়ে গর্জন করে উঠল। নুয়ে মাটি থেকে কি একটা তুলে নেয়। 'আর এক পা এগোলে এই ইট দিয়ে আমি আমার মাথা ভেঙে দেব। পাগল বদমায়েস।'

ইটের ভয়ে গুপ্ত আর অগ্রসর হয় না।

'বাপরে বাপ। একটুতে এমন ভায়লেন্ট হয়ে ওঠেন। আমি শালা পেনিলেস, কিন্তু আপনি দেখছি একেবারেই হার্টলেস—কুয়েল।'

কে. গুপ্তর কথাগুলো শিবনাথের কানে যায় না। ততক্ষণে সে ফিকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে দূরে মিলিয়ে গেছে। হাওয়ায় একরাশ শুকনো পাতা ঝুরঝুর করে কে গুপ্তর মাথায় পিঠে ঝরে পড়ে।

ঊনচল্লিশ

রুচি ধড়মড় করে উঠে বসল। আলো জ্বালল। দেখা গেল শিবনাথের মুখে হাসি।

'কি ব্যাপার?'

'সেসব কিছুই না।'

'ময়না কোথায়? হাসপাতালে ওরা ওকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে ছোঁড়াগুলো থানায় ডাইরী করতে সাক্ষী হিসাবে ময়নাকে নিয়ে গেছে এরকম কিছু আভাস দিলে কি পারিজাতবাবু? আমি বাড়ি ফিরতে না ফিরতে বলাই যেমন রাগারাগি করল, আর ওদিকে রায় সাহেবের ছেলে সরকারকে পাঠিয়ে তোমায় ডেকে নিয়ে গেল। ভাবলাম—কি জানি।'

'আরে দূর পাগল। হ্যাঁ, কথাটা বলল বটে পারিজাত। সেরকম কিছু হলেও পারিজাত ঘাবড়াতোনা। একসঙ্গে তিনটে থানার ছোট ও বড় দারোগার মুখ বন্ধ করার মত তার টাকা আছে।'

শিবনাথ বিছানার একপাশে বসল। 'শোন বলছি। খুব মজা হয়েছে। এমনভাবে সবটা ঘটনার মোড় ফিরবে পারিজাতও ভাবেনি। আমায় ডেকে নিয়ে ব্যাপার বলল। ওয়াণ্ডার ফুল!' শিবনাথ সিগারেট ধরাতে পকেটে দেশলাই খোঁজে। রুচি এইমাত্র

আলো জেবলে দেশলাই হাতে নিয়ে বসে আছে। শিবনাথের হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলল, 'তা পারিজাতের মামলা ভালর দিকে যাক কি খারাপের দিকে, তাতে আমাদের অবশ্য খুব একটা না ভাবলেও চলে। ওর টাকা আছে যখন সব অবস্থাতেই সে নিরাপদ। আমার ভয় সেই ছেলেগুলোকে নিয়ে। আমি ময়নাকে তখন হাসপাতালে যেতে নিষেধ করেছিলাম, এটার না অন্য অর্থ ধরে নিয়ে ওরা পারিজাতকে জব্দ করার জন্য থানায় আমার নামটাও রিপোর্টে ঢুকিয়ে দেয়। আমি পারিজাতের দলের।'

শিবনাথ সিগারেট টানতে টানতে শব্দ না করে হাসে।

'রুণুর ব্যাপার শুনে আমার প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হয়েছিল। হ্যাঁ, কাল। কিন্তু তারপর, তুমি নিষেধ করেছিলে বলে না, অনেকগুলো কারণে অ্যাক্সিডেণ্টের সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করার দায়িত্ব মাথায় নিতে পারলাম না।'

শিবনাথ তথাপি নিঃশব্দে হাসে।

রুচি সেটা লক্ষ্য করেই যেন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার এবং ছুটোছুটি করার মতন সময় আর আমার একেবারেই নেই। দশটা-পাঁচটা ইস্কুলে পড়াতে হয়। ইস্কুল থেকে এসেও ঘরের এটা-ওটা করতে হয়, দেখতে হয়, পরের দিন বাজার খরচের পয়সা রাখলে আমার ইস্কুলে যাবার পয়সা, মঞ্জুর দুপুরের দুধ-সাজিটুকুন এবং রাত্রে যাহোক তিনটে মুখের অন্তত দু'খানা রুটি ও একটু ডাল-তরকারি যোগাড় রাখার চিন্তা নিয়ে যার ঘুমোতে যেতে হয়, তার পক্ষে আদর্শ টাদর্শ রক্ষা করা হয় না বললেই চলে—অন্তত এই অবস্থায় মানুষ পারে না।'

শিবনাথ এবার শব্দ করে হাসল।

'অর্থাৎ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চাইছ, যার স্বামী বেকার, তার পক্ষে পরোপকার করতে যাওয়াও বিপদ,—হা হা, পরের ভাল করতে এখন আর আমার নিষেধ না, আমাদের আর্থিক অবস্থাটাই বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তো ?'

'যাকগে, এসব কথা দিয়ে কি হবে। রাত হয়েছে। তুমি খাবে না ?'

'না কি মহিলা কাল বাসভাড়া সেধেছিল পর থেকে এ ব্যাপারে তোমার মন খারাপ ?'

রুচি চুপ করে রইল। বিকেলে আজ বলাই যখন গণ্ডগোল করেছিল, কথায় কথায় রুচি শিবনাথকে রুণুর মা'র ব্যবহারের কথাটা বলে ফেলে। যার জন্য রুণুকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে সে খুব বেশি একটা উৎসাহবোধ করছিল না। ভেবেছিল স্কুল থেকে ফেরার পথে সময় পেলে একবার দেখে আসবে এবং ময়নাও তখন তার সঙ্গে হাসপাতালে যাবে।

'কি, কথা বলছ না যে ?' শিবনাথের ঠোঁটে আবার সেই শব্দহীন সূক্ষ্মহাসি।

'কি আর বলব।' রুচি চোখ তুলল। 'আমার কথা হচ্ছে, ভাল করার মধ্যে যেমন থাকতে পারলাম না, তেমনি মন্দ কিছুতে আমি নেই, সেটাই চাইছি। ময়নাকে হাসপাতালে যেতে দেব না, এ ধরনের ইচ্ছা আমার কোন সময়েই ছিল না। সেই

ছেলেগুলো না উল্টো বুঝে আমাকেও ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়ায় সে ভয় করছিলাম।'

'কিসের ষড়যন্ত্র, কোথায় ষড়যন্ত্র।' শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'সেকথাই তো তোমায় বলতে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। বড় মজার ব্যাপার হয়েছে, রুচি।'

'কি?'

'আদর্শের কথা বলছিলে না? হা হা, যার আদর্শ রাখবার কথা, সে-ই সব নড়চড় করে দিলে, আমি তুমি করব কি?'

'কি রকম?' রুচি একটা বড় ঢোক গিলল। 'কার কথা বলছ?'

'তোমার সেই ময়না।' শিবনাথ সিগারেটে টান দিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা জানালার বাইরে অন্ধকার উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল। সারা বাড়ি আজ নীরব। যেন সব ক'টা ঘর ঘুমে থমথম করছে! শিবনাথ নিচু গলায় বলল, 'খবর নিয়েছ কি! ময়না এতক্ষণে ঘরে ফিরেছে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—কেন, শেষ পর্যন্ত কি করেছে ও?' রুচি অস্বস্তি-বোধ করছিল।

'অবশ্য আর একটা আদর্শ রাখতেই ও এমনটি করল। না, ময়নার দোষ নেই। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যা ও করেছে, আমি তো প্রশংসাই করি।'

'পরিষ্কার করে সব খুলে বল তো কি ব্যাপার? তুমি এত কথা কা'র কাছে শুনলে। ময়নার সঙ্গে তোমার দেখা হল কখন—সেই ছেলে তিনটি কি—'

'বলছি, সব বলছি শোন, এত অস্থির হলে চলবে কেন।' শিবনাথ আবার সিগারেট ধরাতে চায়, কিন্তু রুচির চোখে চোখ পড়তে নিবৃত্ত হয়। 'আমার সঙ্গে ময়নার বা রুণুর বন্ধুদের দেখা হয়নি। সব পারিজাতের কাছে শুনলাম। কি যেন নাম ছেলে তিনটির? সন্তোষ, জীবন, অসিত। এরা সব মস্ত বড় বড় লোকের ছেলে। সন্তোষের বাবা ভিয়েনায় পাশকরা প্রকাণ্ড বড় ইঞ্জিনিয়ার, অসিতের বাবা কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টার, জীবন ছোঁড়ার বাবা কেবল এই শহর বলে না, তুমি বলতে পার—ইণ্ডিয়ার মধ্যে ওয়ান অফ দি বেস্ট হার্ট-স্পেশালিস্টস। হ্যাঁ, যেমন নাম, তেমনি তাঁর পয়সা। ডক্টর মধুসূদন নাগ।

'তারপর?'

'এবং তিনি পারিজাতের একজন বিশেষ বন্ধু।'

রুচি হাঁ করে শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। বলল, 'মধুসূদন, নিশ্চয়ই পারিজাতের সমবয়সী নন, যার এত বড় ছেলে জীবন। আমি তো দেখেছি।'

'তাই বলে কি তিনি পারিজাতের বন্ধু হতে পারেন না! তা তুমি ধরেছ ঠিক। সিনিয়র লোক। আসলে মধুসূদনের সঙ্গে পারিজাতের বাবার—হ্যাঁ, আমাদের রায়-সাহেবেরই বন্ধুত্বটা, কিন্তু অন্য দিক থেকে তিনি এখন পারিজাতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বলছি।'

শিবনাথ আর ইতস্তত না করে নতুন সিগারেট ধরাল।

'ডক্টর নাগ তিনজনকে পাকড়াও করলেন সার্কুলার রোডের ওপর। ওরা তখন

ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখন নিজের গাড়িতে করে মধুসূদনও সেদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। আর দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ের সঙ্গে জীবনকে এভাবে হঠাৎ রাস্তায় দেখে তিনি অবাক। গাড়ি থামিয়ে তাদের কাছে ডাকলেন। তাদের লীডার সন্তোষের মুখে সব শুনে মধুসূদন মাথা নাড়লেন—জিহ্বায় কামড় দিলেন ঃ 'তোমরা ছেলেমানুষ। ভেতরের খবর কিছু জান না। জানবার কথাও নয়। পারিজাতের সঙ্গে আমার—আমাদের একটা নতুন সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, আমি পলিটিক্সের কথা বলছি। খুব সামনেই ইলেকশন। আজ পারিজাতবাবু ওঁর এলাকা থেকে রিটার্ন হন, এই আমাদের সকলের ইচ্ছা এবং চেষ্টাও। কেন—আমাকে এখন তোমরা প্রশ্ন করবে না।'

মধুসূদন চোখ বুজে ছেলেদের বুঝিয়েছেন। 'রাজনীতি অত্যন্ত প্যাঁচালো জিনিস।'

'ওরা বুঝি বলছিল, পারিজাত একটি ছেলেকে গাড়ি চাপা দিয়ে, সেটা এখন চেপে যাচ্ছে?' রুচি প্রশ্ন করল।

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'সন্তোষের ইচ্ছা ছিল তখনি থানায় গিয়ে সব ব্যাপার ফাঁস করে দেয় এবং খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠায়।' .

'ডক্টর নাগ বাধা দিলেন?'

'না দিয়ে উপায় ছিল না, কেননা. এভাবে পারিজাতবাবু এখন এক্সপোজড্ হয়ে পড়লে, ইলেকশনে অপজিট পার্টিগুলো এটাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাবে।'

'সন্তোষের দল তাই মেনে নিলে?'

'বলছি, হুট্ করে কি তরুণের দল তা মানতে চায়। সন্তোষ মধুসূদনের প্রস্তাব শুনে মাথা নেড়ে বলছিল—আপনার যুক্তি একদিক থেকে সত্য, জ্যেঠামশাই। আপনাদের পার্টির ইন্টারেস্টে আমরা হয়তো এটাকে ওভারলুক করব। কেননা, অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। ধরে নিলাম, ইচ্ছা করে তিনি রুণুকে গাড়িচাপা দেননি এবং এটা সত্য, কলকাতা শহরে রাতদিন বহুলোক এভাবে চাপা পড়ে কেবল ইনজিওরড না, মারাও যাচ্ছে। সব সময় যে গাড়ি চালায়, তার দোষ না-ও হতে পারে। কিন্তু একে এখন আমরা কি বলে বোঝাই। ও তো রাজনীতি বুঝবে না। দেখুন কেমন কাঁদছে।'

'ময়নার কথা বলছিল বুঝি সন্তোষ।' রুচি অল্প হাসল।

'হ্যাঁ'—শিবনাথও ঠোঁট টিপল। বলছিল, 'জ্যেঠামশাই, রুণুর জন্যে আমি যত না বেশি মুভড্ হয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি লাগছে এর অবস্থা দেখে, আমার চোখে রীতিমত জল আসছে।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সন্তোষ পরে ডক্টর মধুসূদনকে বলে, 'আমি অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল, হাঁ, লভ এফেয়ার্সে, আবার তেমনি কড়া। রুণু হয়তো বাঁচবে না, কিন্তু এই কোমল মেয়েটির প্রেম এভাবে ধূলিসাৎ করে দিলেন আপনাদের পারিজাতবাবু, তার জন্য তিনি কি ক্ষতিপূরণ দেবেন, এটাই আমার এখন জিজ্ঞাস্য —কি বলিস তোরা, জীবন, অসিত?' শুনে জীবন, অসিত মাথা নেড়েছিল।

'কি বললেন ডক্টর নাগ তার উত্তরে?' রুচি সকালে ছেলেটির আরও পরিচয়

পেয়েছিল। শেষে শিবনাথকে বলল, 'দু'-দু'বার তিনি ম্যাট্রিকে ফেল করে এখন সিনেমার জন্যে প্রেমের গল্প লিখছেন।'

'তা, কার কোন্ দিকে প্রতিভা, তুমি বলতে পার না রুচি। এই ছেলেই যে একদিন নামকরা একজন নভেলিস্ট বা নাট্যকার না হবেন, তা তুমি কি করে বল।'

রুচি চুপ করে রইল।

'যাকগে, এখন ডক্টর নাগ—হ্যাঁ, তাই তো বলি রুচি, জিনিয়স যাঁরা, তারা ছোট বড় সব বিষয়ই এমন সুন্দরভাবে টেক্‌ল করতে পারেন, যা হয়তো কোনদিন আমরা কল্পনাও করতে পারি না। যখন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তখন ভাবি কত না সহজ, কত বেশি স্বাভাবিক। পারিজাত আমায় সে কথাই তখন বলছিল। রুণুর কথা শুনেই মধুসূদন ময়নার দিকে তাকান এবং গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার মাথায় তা রেখে একটু চুপ করে থেকে পরে আস্তে আস্তে বুঝিয়েছেন,—প্রেম কখনো মরে না। আকাশ বাতাস ধুলো বালি ঘাস ফুল পশু পাখি পোকামাকড় শরতের রোদ শ্রাবণের ধারা চৈত্রের শুকনো পাতা, এমন কি এখানে শহরের এই রুক্ষ গরম পেভমেণ্টের চলমান কলমুখর জীবনস্রোতের মধ্যে সে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে যদি তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও। তোমার বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছার মধ্যেই তার প্রাণ, তার স্পন্দন। রুণু যদি না-ও বাঁচে।'

'এত সব কঠিন কথা ময়না বুঝল?'

'বোঝালেই বোঝে। তেমন করে তুমি আমি বোঝাতে পারব কি!' শিবনাথ পায়চারি করছিল। রুচির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অত্যন্ত বড়লোক, তাই এত উদার মন আর কি ফ্রি কথাবার্তা। ময়নার হাত ধরে বললেন, এই যে আমাদের সন্তোষ, তোমার ভালবাসার কান্না দেখে এইমাত্র চোখের জল ফেলল, সেই জলের ফোঁটার মধ্যে প্রেম নতুন করে জীবন পেল,—জিজ্ঞেস কর ওকে একবারটি। কেমন হে সন্তোষ?'

'তারপর?' রুচি এবার শব্দ ক'রে হেসে ফেলল।

'না, না, হেসো না। কথা হচ্ছে যে কেমন চমৎকারভাবে তিনি মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলেন সেটা একবার চিন্তা কর।'

'জিজ্ঞেস করেছিল ময়না সন্তোষকে তা?'

'তা আর জিজ্ঞেস করতে হয় না। কোন মেয়েই করে না। বলতে কি সন্তোষের দিকে ওর তাকানো দেখেই তো ডক্টর নাগ বুঝে ফেলেছিলেন।'

'হার্ট-স্পেস্যালিস্ট কি না।' রুচি মন্তব্য করল।

'কাজেই মামলার সেখানেই অর্ধেক নিষ্পত্তি।' শিবনাথ হাসল। 'বাকিটা চুকল হাসপাতালে রুণুর বেড্-এর পাশে। ডক্টর নাগ মুমূর্ষু ছেলেটিকে একবার দেখে আসতে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন যদিও। কিন্তু ময়না সেখানে গিয়ে কি দেখল। তুমিও ইমাজিন করতে পার। এতটুকু মেয়ে। তার কল্পনা কতদূর যেতে পারে, নিজের মনের ওপর কণ্ট্রোলই বা কতটা, হাঁ ধৈর্য সাহস বিচারবুদ্ধির প্রশ্নও আছে। অক্সিজেনের চোঙ লাগানো ফুলে ওঠা রুণুর বিকৃত চেহারা দেখে ময়না ভয়

পেয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠেছিল। সন্তোষ জীবন ওরা ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে বাইরে নিয়ে আসে।'

'ও বুঝি ভেবেছিল বারো ঘরের উঠোনে পাড়ার রাস্তায় কপি ক্ষেতে রুণু যেমনটি ছিল এখনও তার সেই চেহারা আছে, অবিকল সেরকমই গিয়ে দেখতে পাবে।'

'এক্‌জ্যাক্টলি সো।' শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'এবং হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে ময়না বলছিল সেখানে ওষুধের গন্ধটাই তার অসহ্য লাগছিল, না হলে আরো কিছুক্ষণ সে থাকতে পারত। শুনে সন্তোষ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বৌবাজারের মোড় থেকে একটা গোলাপের তোড়া কিনে নিয়ে যায়। সেটা ময়নার হাতে তুলে দিয়ে বলছিল, এটা কতক্ষণ শুঁকতে থাক হাসপাতালের বিশ্রী অষুধবিষুধের-গন্ধগুলো নাক থেকে সরে যাক।'

রুচির হাসি ঘরের সিলিং পর্যন্ত পৌঁছত, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তা দমন করল।

'হ্যাঁ,' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি একবার ভেবে দেখ, জীবন ও মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে যখন হাত বাড়িয়ে একটি মেয়েকে ডাকে তখন কার দিকে ছুটে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক,—আর ওই বয়সে, যখন প্রথম ফুল ফোটার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে, পাখির গান শুনে চমকে ওঠে।'

রুচি কিছুক্ষণ কথা বলল না। চুপ করে জানালার অন্ধকার দেখে। যেন হঠাৎ কি ভাবছিল সে।

'কথা বলছ না কেন। ময়না কি ভুল করেছে? তাকে তুমি দোষ দিতে পার না।' শিবনাথ রুচির শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'যাকগে, গল্প তো শেষ হল। গণ্ডগোল যখন মিটেছে আপদ গেছে। জামা কাপড় ছাড়, হাত মুখ ধুয়ে নাও।' রুচি শিবনাথের জন্যে ঠাঁই ক'রে দিতে উঠে দাঁড়ায়।

শিবনাথ অবাক হবার ভান করে বলল, 'গল্প শেষ মানে? অর্ধেক তো হ'ল। বাকি আধখানা শুনবে না? গল্পের যেখানে ক্লাইম্যাক্স, কাহিনীর মধ্যমণি হয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর কথাই যে এখনো বলা বাকি।' বলে শিবনাথ মিটি মিটি হাসে।

'কার কথা, কে আবার এ গল্পের মধ্যমণি হয়ে আছে?' রুচি ফ্যালফ্যাল্ করে স্বামীর দিকে তাকায়।

'তুমি।'

'তার মানে?' রুচি প্রথমটায় স্তম্ভিত। তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'তুমি কি এতক্ষণ পারিজাতের বাংলোয় ছিলে? কিছু খেয়েটেয়ে আসনি তো! ও বুঝেছি, দীপ্তি খুব ঘটা করে চা-টা খাইয়ে দিয়েছে, তাই মাথা খারাপ করে এখানে এসে আবোলতাবোল বকছ, কেমন?'

'তাই।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'এই বেলা তুমি খেতে দাও। আস্তে আস্তে সব বলছি।'

এ-ঘরের খাওয়া শেষ হতে রাত একটা বাজল। কেরোসিন ফুরিয়েছে। তাই আর হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু তা বলে দু'জনের আলাপ বন্ধ নেই। অত্যন্ত জরুরি বিষয়। মশারির অন্ধকারের মধ্যে বসে দু'জন কথা বলছিল।

'ডক্টর নাগ বিকেলে চা খেতে নেমন্তন্ন করলেন এদিকে সন্তোষের দলকে আর ওদিকে পারিজাতকে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সেটা দূর না হওয়া পর্যন্ত বুড়ো নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। কখনো জীবনের দিকে কখনো অসিতের দিকে এবং বেশির ভাগ সময় ময়না ও সন্তোষের দিকে তাকিয়ে টাকপড়া পাকা মাথা নেড়ে তিনি বোঝালেন: পারিজাত একটা ভুল করেছে। কিন্তু সেই তুলনায় সে কতটা ভাল করেছে তা কি দেখতে হবে না। ফুলিয়া-টেংরার জঙ্গল ময়লা মশা-মাছির মধ্যে নিজে বাস করে সে জায়গাটা ডেভলাপ করার জন্যে চেষ্টা করছে। রাস্তা, পাকা ড্রেন, ইলেকট্রিক—সব হবে। স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, এমনকি ও-পাড়ায় একটা হাসপাতাল খোলার স্কীমও সে নিয়েছে। এখন কোন্ এক কে. গুপ্তর ছেলে অন্ধকার রাস্তায় অসাবধানে চলতে গিয়ে তার গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে বলে যদি তোমরা হইচই আরম্ভ ক'রে দিতে তো বাস্তবিক সেটা অত্যন্ত দুঃখের হ'ত। হ্যাঁ ব্যাপারটা হাশ্ আপ্ করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য জেল-জরিমানা এড়ানো নয়, একটা বড় প্রজেক্ট, কতগুলো সুন্দর স্কীম নষ্ট না হয় সেটাই আসল কথা। দুষ্ট লোক বিরোধী দল এর সুযোগ নিয়ে কী না করতে পারে।'

কি বললে ওরা, ছেলেরা?'

'ছেলেরা তখন চুপ ছিল। অসাবধানে চায়ের বাটি ঠোঁটের কাছে তুলতে গিয়ে ময়না এতটা চা নিজের শাড়িতে ফেলে দিতে সন্তোষ পকেট থেকে রুমাল বার করে তাড়াতাড়ি তা মুছে দিতে ব্যস্ত ছিল। পারিজাত বলছিল, যদি জখম হওয়ার ফলে রুণু সারাজীবনের জন্যে ক্রিপ্‌লড্ হয়ে থাকে বা মারা যায় তো সে যে-কোন এমাউণ্ট, হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ হিসাবে কে. গুপ্ত বা তার স্ত্রীকে দিতে প্রস্তুত আছে।'

'এটা ভাল প্রস্তাব।' রুচি বলল, 'যাকগে, তা এর মধ্যে আমার প্রসঙ্গ আবার কখন উঠল বলছ না তো?'

'বলছি,' শিবনাথ মৃদু হাসল। ক্ষতিপূরণের কথা উঠতে সন্তোষ মুখ তোলে। স্মার্ট ছেলে। হেসে পারিজাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তা আপনি এ-ব্যাপার নিয়ে যা খুশি তা করুন, আমাদের আর এখন অন্য কোন ডিমাণ্ড নেই কেবল একটি ছাড়া।' শুনে পারিজাত হেসে বলছিল, 'বেশতো সেটা কি বল, আমি এখনই পূরণ করি।' ডক্টর নাগ হাসছিলেন। কেননা, সন্তোষ এর আগেই তার দাবির কথা তাঁকে জানিয়ে রেখেছিল। এবার ডক্টর নাগ পারিজাতের কাছে সন্তোষের আসল পরিচয় দেন। সাহিত্যিক। গল্প উপন্যাস লিখছে। রাজনীতিটিতির চেয়ে শিল্প-সংস্কৃতির দিকে ঝোঁক বেশি। সেই চাইছে পারিজাতের পাড়ায় মেয়েদের যে সমিতিটা আছে, সেটা অর্গানাইজ্ করার ভার তাকে দেয়া হোক। কেবল মেয়েদের জন্যে না, ছেলেরাও তাতে থাকবে। ওটাকে সে আরো বড় করবে সুন্দর করবে। কেবল ক্যারম, লুডো খেলা, খানকয়েক বই ও সেলাই রান্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক অর্থে

কালচার‍্যাল এসোসিয়েশন বলতে যা বোঝায়, দীপালি-সঙ্ঘকে সেরকম একটা কিছুতে রূপ দেয়া তার ইচ্ছা।'

'ভারি তো উৎসাহ সঙ্ঘের জন্যে!' রুচি খুক করে হাসল। 'পার্ক স্ট্রীটের ছেলেরা কুলিয়া-টেংরার বস্তি পাড়ায় এসে সমিতি করবে?'

শিবনাথ রুচির হাতে চাপ দেয়।

'উৎসাহের মূলে কে বুঝতে পারছ না?'

'কে?' প্রশ্ন করে পরক্ষণে রুচি বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল এবং রীতিমত শব্দ ক'রে হাসল। 'খুব স্বাভাবিক, অষ্টপ্রহর ময়নার সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ না হলে পাওয়া যাচ্ছে না যে।'

শিবনাথের গলায় চাপা হাসি।

'ওই তো বয়স প্রেম করার, প্রেমের জন্যে যে-কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে এতবড় লোকের ছেলের আটকাচ্ছে না।' একটু থেমে শিবনাথ বলল, 'তা হলেও আমি,—আমার খুব ভাল লাগছে ছেলেটিকে পারিজাতের মুখে শুনছি পর থেকে।'

'পারিজাত রাজী আছে?'

'নিশ্চয়। এই সমিতি মারফত নাইট স্কুল হবে, ফ্রি রিডিং রুম হবে, চেরিটেবল ডিসপেন্সারী খোলা হবে, কুড়িটা চরকা আসছে; শাকসব্জি এবং ফুলের চাষের মডেল, বাগান করার জন্যে সন্তোষ পারিজাতের কাছে তিন বিঘা নিষ্কর জমি পর্যন্ত অলরেডি চেয়ে ফেলেছে।'

'আর? কৃষি-সংস্কৃতি সমাজ-সেবা সব রকমের কাজে হাত দেবে দেখছি।'

'নিশ্চয়।' শিবনাথ রুচির হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'গান্ধী-জয়ন্তী, রবীন্দ্রজয়ন্তী ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে বছরের একেবারে সবচেয়ে ছোট ফাংশানটাও সে এসে গেলে পর আর বাদ দিতে দেবে না, ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা, ডিসিপ্লিন নার্সিং, সেফটি ফার্স্ট, সিভিক সেন্স ইত্যাদি নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় পাড়ার লোককে বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা থাকবে, হাতে লিখে কাগজ বার করা হবে, ছবি আঁকার, নাচের গানের গল্প কবিতা লেখার কম্পিটিশন, ডিবেটিং ক্লাব—অতটুকুন ছেলে কী না করতে চাইছে!'

রুচি মুখ থেকে আঁচল সরায়। অন্ধকারে শিবনাথ দেখল না, অনুভব করল।

'তুমি সবটাই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিতে চাইছ। ডক্টর নাগ সিরিয়স, পারিজাত সিরিয়স।'

'আহা, ঠাট্টার কি শুনলে।' গম্ভীর হয়ে গেল রুচি। 'তা ময়নার তো এই সবে বর্ণবোধ আরম্ভ হয়েছে, ছেলেদের দিকটা সন্তোষ চালিয়ে নিতে পারবে মেয়েদের দিকটা চালাবার মতন তেমন উপযুক্ত কেউ আছে কিনা, ভাবছিলাম,—ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন সমিতি।'

'কেন, তুমি?' রুচির হাতে হাত রাখল শিবনাথ।

'ঠাট্টা রাখ।' হাত সরিয়ে নিলে রুচি।

'মোটেই ঠাট্টা না।' শিবনাথ আর স্ত্রীর হাত ধরতে চেষ্টা করল না। 'পারিজাত বলছিল ডক্টর নাগের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তোষ রীতিমত বক্তৃতা করছিল তখন। শেয়ালদা স্টেশনে ময়নাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে একদিকে যেমন ঝগড়া করেছে, তেমনি অন্যদিকে দেখেছে সে তোমার শান্ত শ্রী কল্যাণী মূর্তি। তখনই আইডিয়াটা তার মাথায় এসেছিল। আর্টিস্ট ছেলে। বলছিল ময়না ও রুণুর প্রেম থেকে সে আবেগ উন্মাদনা পাচ্ছে, আর তোমাকে সকালবেলা এতটা সামনাসামনি দেখেছে পর থেকে সে পেল প্রেরণা শক্তি। এ-পাড়ায় এসে তোমাদের মধ্যে একটা কিছু না করা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। পারিজাতকে সন্তোষ বলছিল ঃ রুণুর ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে বারো-ঘরের বাড়ির সেই টিচারটিকে আমি হঠাৎ দুটো কটুকথা বলে ফেলেছি, তখন আমার মাথায় আর এক ঝোঁক ছিল, ময়নাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম পর একটু একটু করে সেই সুন্দর শান্ত পরিচ্ছন্ন মুখখানা আবার ভীষণ মনে পড়তে লাগল। আমার অনুতাপ হচ্ছিল।'

একটু থেমে শিবনাথ বলল, 'এবং ময়নাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমার সম্পর্কে আরো নানারকম প্রশ্ন করল সে, কোন্ ইস্কুলে এখন তুমি আছ, কি রকম মাইনে-টাইনে পাও আর কোন কাজ কর কিনা, বাড়িতে পুষ্যি ক'টি। ভয়ঙ্কর শ্রদ্ধা হচ্ছিল তোমাকে দেখে এবং—'

'তারপর?' হঠাৎ রাগটা প্রকাশ করল না রুচি। যেন দাঁতে দাঁতে ঠেকিয়ে হাসছে, তেমনি গলার সুর বার ক'রে বলল, 'পারিজাত কিছু বলেছে তার উত্তরে?'

'আমি অলরেডি ঠিক করে রেখেছি। তাঁকে সমিতির সেক্রেটারি করা হবে। বললেই রাজী হবেন। আমার বাড়ির একজন রেস্‌পেক্টেবল ভাড়াটে। তা ছাড়া তাঁর স্বামী শিবনাথবাবুর সঙ্গে আমার ইদানীং আলাপ পরিচয় হয়েছে। সুতরাং তাঁকে খুব সহজেই পাওয়া যাবে আশা করছি।' ডক্টর নাগকে এই এসিওরেন্সই দিলে পারিজাত।

রুচি কথা বলল না।

মশারির ভিতরটা থমথম করছিল। বাইরের মশককুলের ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না।

'সন্তোষ বলছিল ইদানীং একটা ইংরেজি ফিল্মে একজন স্কুল মিস্‌ট্রেসকে নাকি সে দেখেছে। তিনি অবশ্য খুব বড় লোকের মেয়ে ছিলেন। কোনরকম টাকা পয়সা না নিয়ে গরিব ছেলেমেয়েদের কেবল ইস্কুল নয়, বাড়িতে গিয়েও পড়াতেন। চিরকুমারী ছিলেন। তাঁর প্রেমিক যুদ্ধে মারা যান। পরে তিনিও যুদ্ধে চলে যান। সেখানে তাঁর কাজ ছিল আহত মুমূর্ষু সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করা। সন্তোষ অভিভূত হয়েছিল মেয়েটির একদিকে স্নেহ মমতা প্রেম আর একদিকে ত্যাগ তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা মাখা স্নিগ্ধ চোখ দু'টি দেখে। তার খুব ইচ্ছা, ডক্টর নাগকে বলছিল, এরপর সে যে বইয়ে হাত দেবে এরকম একটা চরিত্র থাকবে। বলতে কি, কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের টিচারকে দেখেছে পর থেকে, এখন আর কল্পনা মিশিয়ে মূর্তি তৈরী না, পারিজাত যদি এলাও করে, তবে তাঁকে নিয়ে সে আরো বড় কাজ,

ভাল কাজে হাত দিতে পারে, হ্যাঁ এতক্ষণ যেসব কাজের কথা বললাম। মোটের ওপর তোমাকে দেখে সন্তোষ খুব ইনস্‌পিরেশন পাচ্ছে।'

'বখাটে ছেলে।' রুচি রাগ করেও রাগ করতে পারল না! 'ও এসব বলল পারিজাত তোমায় বলল বুঝি? রাত বারোটা পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে এলে, রাজী হয়ে এসেছ?'

'সব নিয়ে সব সময় রাগারাগি করলে তো আর দুনিয়া চলে না।' শিবনাথ অল্প হাসল। 'বলতে কি টুইশনির জন্যে সেদিন যখন প্রার্থী হয়ে পারিজাতের বাংলোয় গিয়েছিলাম, করুণা, অনুকম্পা ছিল তার চোখে, কথায়। আজ দেখলাম পারিজাত সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কত ইন্টিমেট, কী ভীষণ ইন্টারেস্ট তার আমাদের সম্পর্কে।—হ্যাঁ, রাত বারোটা পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে আমি কেবল বাজে গল্প করে এসেছি। শোন, তুমি যে সেই নতুন স্কুলের চাকরির জন্যে পিটিশন পাঠিয়েছিলে, পারিজাত কাল সেখানে চিঠি দিচ্ছে। কুড়ি টাকা না। আরো দশ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ টাকা বেশি মাইনে। সে স্কুলের সেক্রেটারি পারিজাতের হাতের লোক। কেমন, গল্পের ক্লাইম্যাক্সে এসে গেছি তো?'

'তোমার? তোমার একটা কিছু সুবিধাটুবিধার কথা বলেছে তো?' রুচি আবার দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে হাসল।

'আমার সম্পর্কে ভাবতে হবে না।' গম্ভীর গলায় শিবনাথ বলল, 'তোমাকে নিয়েই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল, তোমার জন্যে—'

শিবনাথ থামল।

'কি বল। চুপ ক'রে গেলে কেন?' রুচি চাপা নিশ্বাস ফেলল। 'শোন, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, তোমার পারিজাতবাবুকে বলবে আমার চাকরির ব্যাপারে তিনি যেন কোনরকম রেকমণ্ডেশন লেটার-টেটার না পাঠান। তুমি কি শোবে না?'

'এত রাগ করছ তুমি।'

'নিশ্চয়ই। আমাকে দিয়ে দীপ্তিরাণীর পদসেবা করাতে তোমার চোখে ঘুম নেই। তাই বলছিলাম ক' বাটি চা আজ খেয়ে এসেছ তাঁর হাতে। খুব কড়া চা ছিল, কেমন না! গরম হয়ে এসে আমাকে জ্বালাতন করছ। সমিতির সেক্রেটারি হবে। যদি ফের আর কোন দিন—'

'এই, শোন।' শিবনাথ স্ত্রীর হাত ধরল।

উত্তেজনায় রুচি কাঁপছিল।

'চিরকাল কি তুমি আমাকে এমন উপেক্ষা করবে, আমার কথার কোনো দাম নেই?' শিবনাথ শক্ত স্থির গলায় বলল, 'দীপ্তি ছিল না। ও-বাড়িতে সে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'তা জানা যায়নি। তবে সেই ব্যারিস্টার প্রাইভেট টিউটার মণ্টু ব্যানার্জির সঙ্গে যে যাচ্ছে একথা দীপ্তি স্বীকার করে গেছে। আজ সকালে উঠে পারিজাত বিছানায় রেখে যাওয়া দীপ্তির লেখা একখানা চিঠি পেল।'

'বাচ্চাগুলো ?' রুচির গলা দিয়ে হঠাৎ স্বর ফুটছিল না। 'শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা পালিয়ে গেল!'

'তাতে পারিজাত একটুও বিচলিত না। হ্যাঁ, সেকথাও আমায় বলছিল। অত্যন্ত শক্ত নার্ভ। ছেলেমেয়েগুলোকে বালিগঞ্জে আজ দুপুরে পারিজাত তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে! এখানে থাকলে কাঁদাকাটি করবে বলে। ওখানে দাদুর কাছে নাকি ওরা ঠাণ্ডা থাকবে!'

'আর কি বলছিল? তা হলে পারিজাতবাবু আজ নানাভাবে ডিস্টার্বড্! ছি ছি দীপ্তি--'

'কিচ্ছু না। বললাম তো, অন্যরকম ছেলে সে। একটু দুঃখ করা, দীর্ঘশ্বাস ফেলা, কি স্ত্রীর এই কাজের জন্যে কোন রকম আক্রোশ পোষণ করা, উঁহু আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও তার মধ্যে দেখলাম না। বরং হেসে বলল, সে স্বাভাবিকভাবেই এটাকে নিয়েছে, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে, সামনে ইলেকশন আসছে, এখন কাজ করার জন্যে অফুরন্ত সময় পাবে, এনার্জি পাবে। স্ত্রী যতদিন কাছে ছিল সে ভীষণ অসুখী ছিল, বিরক্তবোধ করত পদে পদে।'

রুচি চুপ।

'কাজেই দীপ্তির উৎসাহে আমার উৎসাহ আর সেই লোভে তোমাকে সমিতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি,—নিশ্চয় এ ধারণা এই ভুল বিশ্বাস এখন তোমার ভাঙল।'

'আমি কি জানি, আমি কি জানতাম যে রায়সাহেবের ছেলের বৌ আর ওখানে নেই। তোমার তো আগেই বলা উচিত ছিল। এত বড় ঘটনা।'

'এটা একটা ঘটনাই না। হ্যাঁ পারিজাতের চোখে। কাজেই আমরাও এটার কোনরকম ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি না। এখানে কাজ বড়। পুরো তিন ঘণ্টা আলাপের মধ্যে পাঁচমিনিটও নিজের স্ত্রীর কথা অর্থাৎ এই ব্যাপার নিয়ে পারিজাত আমার সঙ্গে কথা বলেনি। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে? সবটাই ছিল ময়না রুণু ডক্টর নাগ সন্তোষ সমিতি এবং তোমার কথা,—'

রুচি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

'বলো।' একটু অসহিষ্ণু গলায় শিবনাথ বলল, 'সন্তোষ অবশ্য প্রস্তাব দিয়েছে যে, যদি রুণু মারা যায়, তবে তার নামেই সমিতির নামকরণ হবে। এখন না। পরে। পারিজাত রাজী হয়েছে। কাল পরশু একটা ফর্ম্যাল সেরিমনি ক'রে তোমাকে সমিতির সেক্রেটারিশিপ দেওয়া হচ্ছে। বলো, কথা বলছ না যে। উত্তর দাও। কাল সকালে পারিজাতকে গিয়ে আমার কথা দিয়ে আসতে হবে।'

যদি ঘরে আলো থাকত তো শিবনাথ দেখতো রুচির ঠোঁটে এই প্রথম সূক্ষ্ম হাসি উঁকি দিয়েছে। আস্তে আস্তে বলল, 'নিছক শো যখন হচ্ছে না, রিয়েলি ওরা কিছু করতে চান, আমি কনস্ট্রাকটিভ কাজের কথা বলছি, তো আমার আপত্তি নেই। তবু আমাকে আর একটু চিন্তা করতে দাও।'

'আমায় বাঁচালে, আঃ।' শিবনাথ স্ত্রীকে বেষ্টন করে তার কপালে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলে। দূরে কোথাও একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল। বাইরে নিঝুম

নিঃসাড় উঠোনে সম্ভবত রমেশ রায়ের কুকুরটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। আর শোনা যায় প্রমথদের ঘরে খনখনে বুড়ির গলাঃ 'হরি হরি! মেয়ের দুঃখে বারোঘরের ভিটে ছেড়ে দিয়ে প্রভাতের হাত ধরে ডাক্তার কোথায় গিয়ে উঠবে কে জানে।'

'দেশান্তরী হয়েছে দিদি, দেশ ছেড়ে গেল—হি হি।' পাশের ঘরে মল্লিকা হেসে জবাব দেয়। 'কুচুটে কুলোকের জায়গা এবাড়িতে নেই, তোমায় কি আমি আগেই বলিনি।'

শিবনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে রুচি বলল, 'হাসপাতালে রুণুকে দেখতে গিয়ে ওষুধের গন্ধ ময়নার সহ্য হ'ল না, শেষটায় সন্তোষের কিনে দেওয়া গোলাপ শুঁকে—'

'একেবারে ছেলেমানুষ। ওকে দোষ দেওয়া যায় কি। সবুজ কচি লতা অন্ধকারে নরা ডাল ছেড়ে আলোর দিকে নতুন শাখাটা পেলে জড়িয়ে ধরে, তুমি কি দেখনি। তা ছাড়া এমন একটা আর্টিস্ট ছেলের পাল্লায় পড়েছে।'

'তাও বটে।' রুচি আর হাসল না। 'কিন্তু সন্তোষের সব কথা শুনে সত্যি এখন আমার মন্দ লাগছে না। সুন্দর আইডিয়া। কত আর বয়স! তখন তো কথাবার্তা শুনে চালচলন দেখে মনে হয়েছিল বুঝি গুন্ডা, একেবারে বাজে ছেলে। প্রগ্রেসিভ আউটলুক আছে, কাজের ছেলে হবে মনে হচ্ছে।'

'তোমার সঙ্গে থাকলে আরো ভাল হবে। তাই তো বার বার বলছিল আমাকে পারিজাত।'

চল্লিশ

বেলা দশটা। না আরো বেশি। রোদ কড়কড়ে হয়ে গেছে। উঠোনের মাটি গরম হয়ে উঠল বলে। বাড়ির লোকজন কিছু কমেছে। তাই শাড়ি সায়া লুঙি চাদর বাইরের দড়িতে কম ঝুলছে। বেশ ফাঁকা ঠেকেছে উঠোনটা। যেন অনেকটা জায়গা পেয়ে মাস্টারের ঘরের হাবুলো, হাবুলের ছোট নেপুলো, প্রমথদের ঘরের গোপুলো, ভুবনের ঘরের শম্ভুচরণ, বিষ্ণুচরণ এবং এ-বাড়ি ছাড়াও পাড়ার সমবয়সী গুর্খা চন্দন পল্টু ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় দশ-বারোটি ছেলে হাতে একটা করে মানকচুর ডগা নিয়ে নিশানের মত সেগুলো শূন্যে নেড়ে হই-হই চিৎকার ক'রে বারো ঘরের উঠোনের চার-দিক ঘুরে ঘুরে খেলছে। আর সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে ঘুরছে মাছির ঝাঁক। এবং সকলের পিছনে লেজ নেড়ে নেড়ে, যেন ছেলেদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঘুরছে রমেশের ঘাড়-মোটা কালো ভুশভুশে রঙের কুকুর ভোম্বল। ভোম্বলের পিঠে এতবড় একটা ঘা। দু'তিন ডজন মাছি সেই ঘা কামড়ে থেকে ভোম্বলের পিঠে চড়ে শোভা-যাত্রার সঙ্গে ঘুরছে। এমন সময় কে একজন বারো ঘরের উঠোনে ঢুকে রমেশের ঘরের দরজার সামনে কি একটা ভারি মতন জিনিস ধুপ্ করে মাটিতে ফেলল। ছেলের দল চমকে উঠল, মাছির ঝাঁক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, লেজ নাড়া বন্ধ রেখে এক সেকেন্ড স্থির-ভাবে তাকিয়ে ভোম্বল বড় কচ্ছপটাকে দেখল। চার পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। গলা বার

করে পিটপিট চোখে বারো ঘরের উঠোন দেখছে। পিঠে হলুদ সবুজ চাকা চাকা দাগ। কিন্তু কচ্ছপটাকে সবচেয়ে বেশি চমকে দিল তেমনি হলুদে সবুজে ছোপ দেওয়া ও তার ওপর ফিকে লাল ডোরাকাটা চমৎকার শাড়ি-পরা মল্লিকা। ঘামছে। এইমাত্র উনুন থেকে কি যেন ভাজা শেষ করে বেরিয়ে এসে ওর টকটকে লাল রঙের চারহাত গামছাখানা দিয়ে মুখ মুছছে। কচ্ছপ দেখে মল্লিকার চোখ কপালে উঠল। 'কে পাঠাল।'

'কর্তাবাবু।'

বত্রিশটা দাঁত বের করে বাজারের আলুর গুদামের গোমস্তা শশী মল্লিকার নরম-লাল মুখখানা দেখছিল। 'আরো দু'জন বাবুর খাবার নেমন্তন্ন করেছেন এই বেলা। আমি গিয়ে আলু আর আদা পেঁয়াজ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তুমি ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও শশী। আর কর্তাবাবুকে গিয়ে বল আর কোথাও ভোট-বাবুদের রেঁধে নিয়ে নিমন্তন্ন খাওয়াক। আমার কোমরে এত তেল নেই, হাতে জোর নেই, বেলা বারোটার সময় কচ্ছপ কেটে মাংস রাঁধতে বসি। ওমা মা, আমি কোথায় যাব গো।' তীব্রস্বরে মল্লিকা আর্তনাদ করে উঠল। 'আমার মরণ নেই, আমার কলেরা হয় না, আমার গলায় ডাকাতের দল দা বসায় না!'

ছেলেরা তো বটেই, শশী, ভোম্বল, মাছিগুলো এবং নবাগত কচ্ছপটাও মল্লিকার সুন্দর চোখের দিকে, নরম ঘেমে-ওঠা মুখের দিকে কতক্ষণ ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে।

পারিজাতের ইলেকশনের ব্যাপারেও তার আর পাঁচটা কাজের মত রমেশ কাল থেকে পরিশ্রম করছে ভোটার যোগাড়ের চেষ্টায়, লোকের সঙ্গে মেলামেশা, বন্ধুত্ব এবং নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। কাল দুপুরেও কে কে জানি রমেশের ঘরে খেয়ে গেল। মল্লিকা আলু-কড়াইশুঁটি দিয়ে ইলিশের ঝোল আর বেগুন সিম দিয়ে কই মাছ, কফির ডালনা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে লাউমুগ রেঁধেছিল। আপত্তি করেছিল এতসব পদ করতে। আজ এখন এই ভরদুপুরে এসেছে কাছিম।

'তা আমার কি হবে ভোটার বাবুদের রেঁধে খাইয়ে। পারিজাত জিতলে দু'শো পাঁচশো ঘরে আসবে, না দু'চার বিঘা জমি বাড়বে? অই খাটুনিই সার। আঙুল ছোঁয়াবে তোমাদের রমেশ দাদাকে। উঁহু। রোজ রোজ আমি বেলা তিনটে অবধি উনুন গুঁতিয়ে শরীর অঙ্গার করতে পারব না। যাও বলে দাওগে। কোথায় গেছেন বাবু বাজার সেরে? চায়ের দোকানে? এই তো আজ পেট ব্যথা কাল পিট ব্যথা। তবু খাওয়া আর খাওয়ানো কমছে না। পেত্নী দৃষ্টি না ফেললে, শনি ঘাড়ে না চাপলে কারো এমনধারা মতিগতি হয়? অ্যাঁ! আমার মরণ নেই কেন গো, আমার কপালে এই সুখ!'

মল্লিকা ফরসা লাল গামছা দিয়ে চোখ ঢাকল। হাতের ষোলটা সোনার চুড়ি রিনঠিন ক'রে উঠল।

প্রমথর দিদিমাকে শেষ রাত থেকে কফে কাবু করে ফেলেছে। তেমন গলা বাড়িয়ে কথা বলতে পারল না। জানালার একটা পাল্লা খুলে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইল। বিধু

মাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণিরও শরীরের অবস্থা ভাল না। শেষ রাত থেকে আজ আবার তলপেটের দিকটা টন্‌টন করছে টাটাচ্ছে। একরকম বেদনাই বলা যায়। তাই ঘরে চুপচাপ শুয়ে। ভুবনের স্ত্রী এক ছেলেকে নিয়ে প্রীতি-বীথি অফিসে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় একটা বাড়ির খোঁজ করতে বেরিয়ে গেছে। রুচি বেরিয়ে গেছে স্কুলে। প্রভাতকণা. কিরণ কমলা তো নেইই।

কাজেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একলা হিরণকে মল্লিকার কান্না শুনতে হ'ল এবং দু'টো একটা সহানুভূতির বাক্যও ছাড়তে হল শেষ পর্যন্ত।

'লক্ষ্মীর সংসারে দিদি রান্না খাওয়ার বেলা-অবেলা কি। কড়াই-খুন্তি, ডেকচি-হাতা, থালা-ঘটি আর তোমার সোনার চুড়ির বাদ্যি-বাজনা যদি অষ্টপ্রহর বাজে, ঈশ্বর থামতে না দেয় তো করবে কি। এত বড় কাছিম এদিনে ক'জনের ঘরে আসে। নেমন্তন্ন করে চার পদ রেঁধে বাইরের লোককে খাওয়াবার ক্ষমতা ক'টা লোকের আছে? বড় যে মরণ চাইছ।'

শুনে মল্লিকা চোখ থেকে গামছা সরাল। হিরণের দিকে তো তাকালই, পরে চোখ দুটো তেরছা করে পাঁচু ভাদুড়ীর ঘরের দিকে তাকাল। যশোদাকে দেখা যাচ্ছে না। রমেশ রায়ের দরজায় দশ সের ওজনের কচ্ছপ দেখে তাড়াতাড়ি সামনের পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়েছে যশোদাও চুপ করে আছে বাড়ির বাকি ঘরগুলো টের পায়।

'এখন গলা কাটি কী দিয়ে? তুমি তো বৌ বলে খালাস, চুড়ির বাজনা, হাতা-খুন্তি, থালা-গেলাসের বাজনা বাজাও। কাটারি দিয়ে এত বড় জন্তুর গলা পিঠ আমি মেয়েমানুষ আলগা করতে পারি!' মল্লিকা এবার অল্প হেসে হিরণের দিকে তাকায়।

প্রমথর দিদিমা খনখনে গলার কফ অতি কষ্টে সরিয়ে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, 'কাটারি দিয়ে সুবিধা হবে না বৌ, কুড়ুল দিয়ে কচ্ছপ মহারাজের পিঠের শক্ত চারাটি খুলে ফেল।'

বুঝি কুড়ুল আনতে মল্লিকা ঘরে ঢুকেছিল, শশী গোমস্তা ফাঁক বুঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চরম সময় উপস্থিত দেখে ছেলের দল, মাছির ঝাঁক ও ভোম্বল কচ্ছপটার কাছে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে জলের জীবটির সবুজ-হলুদে মেশানো পিঠের চমৎকার চক্রগুলো দেখছিল।

এমন সময় কে এসে সংবাদ দিল জানা গেল না। অবশ্য দরকারও নেই তাকে জানবার। খবরটাই এখানে বড়। যেমন আগুনের হলকা ছড়িয়ে দিতে দমকা হাওয়া বয়, গাছপালা ভেঙে দিতে অরণ্যে ঝড় ওঠে, ভূমিকম্পে জগৎসংসার দুলে ওঠে, তেমনি সেই ভীষণ সংবাদ শুনে মস্ত উঠোন কেঁপে উঠল, রোয়াক দরজা জানালা টিন টালি কড়িকাঠ সমেত বারো কামরার জাহাজ টলমল করতে লাগল। শোরগোল উঠল। আর্তনাদ শোনা গেল। ভয়। বিস্ময়। একটু সময়।

তারপর সমস্ত বাড়ির শোরগোল, আতঙ্ক ও কান্না একজায়গায় একটা দরজায় কেন্দ্রীভূত হয়। খবর শুনে মল্লিকা কেঁদে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল, তারপর মূর্ছা গেল।

রমেশ রায়কে কেটে ফেলেছে। ক্ষিতীশের দায়ের কোপে তার দাদা রমেশের

ইহলীলা শেষ। হ্যাঁ, তাদের চায়ের দোকানে। এইমাত্র। তৃপ্তিনিকেতনের মেজেয় রক্তগঙ্গা বইছে।

না, মল্লিকাকে শুশ্রূষা করতে মাছিটাও যেন আর উঠানে রইল না। সব রাস্তায়। মেহেদির বেড়া ঘেঁষে বড় কাঁঠাল গাছটার গুঁড়িতে যেখানে বাড়ির সব জঞ্জাল জমে ও কিছু বেওয়ারিশ ইট ফেলে রাখার দরুন উঁচু টিলার মতন হয়েছে তার ওপর উঠে দাঁড়ায় হিরণ, যশোদা, ময়না, ময়নার মা, প্রমথর মা, প্রমথর ছোট মাসি, পাশের বস্তির সুকুমার নন্দীর স্ত্রী এবং আরো পাঁচ-সাতটি বৌ-ঝি। গাছের নিচে সমান জায়গাটায় পেটের বেদনা নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে গিয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্মীমণি, কথাশ্রিত খনখনে বুড়ী, লাঠি ভর দিয়ে দু'বার আছাড় খেয়ে কোনরকমে ভুবনও গিয়ে দাঁড়াল, এমন কি যার ঘরের বার হওয়া নিষেধ, বসন্ত-রোগী বিমল হালদার বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে না গিয়ে পারল না। সকলের দৃষ্টি সামনের দিকে। ওখান থেকে দেখা যায় কি রমেশের চায়ের দোকান? বাদামতলার ওদিকটায় খোলা-ঢালা সরু রাস্তাটা একটু বেশি বেঁকে গেছে। তিন নম্বর বস্তির টিনের চালটা অতটা ঝুলে না পড়লে পরিষ্কার দেখা যেত কাফেলা গাছের ওধারে তৃপ্তি-নিকেতন। তিন মিনিটের পথ। কিন্তু সেই সাংঘাতিক জায়গায় যেতে কারো সাহস হচ্ছে না। কিছুদূর এগিয়ে বড় নর্দমার মুখের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে-ছোকরার দল। রমেশ রায়ের ঘেয়ো কুকুরটাও সেই অবধি দাঁড়িয়ে আছে, লেজ নাড়া বন্ধ রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

অবশ্য ভয়টা এ বাড়ির লোকের বেশি। বারো ঘরের একজন বাসিন্দা খুন হয়েছে। রমেশের চেহারাটা সকলের চোখের সামনে ভাসছিল। এখন খুন হবার পর না-জানি লোকটার চোখ-মুখ কেমন হয়ে আছে চিন্তা করে তাদের হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! যশোদার হাত ধরে আছে হিরণ, লক্ষ্মীমণির কাপড়ের খুঁট ধরে প্রমথদের ঘরের বুড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত কাঁপছিল। ভুবন লাঠি ভর দিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে এখন ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। বিমলের গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। একটা কথা সরছে না কারুর মুখ দিয়ে। হতভম্ব। স্থির সব।

কিন্তু তাই বলে কি আর মানুষ চায়ের দোকানের দিকে যাচ্ছে না। অন্য বাড়ির মানুষ। ভিন্ন পাড়ার মানুষ। ঊর্ধ্বশ্বাসে সব ছুটছে। কি ক'রে যে খবরটা এর মধ্যে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল সেটাই আশ্চর্য। এধার থেকে যেমন যাচ্ছে তেমনি খালের ওধার থেকে লোক আসছে। রমেশ রায় খুন হয়েছে। ছোট ভাই ক্ষিতীশ রমেশকে খুন করেছে। বলছিল সব। বলতে বলতে নারকেলডাঙ্গা, কাদাপাড়া, বিবিবাগান, পামারবাজার রোড, মুন্সিবাজার, ওধারে পাগলাডিঙ্গি, বাঁধা-তলা, চিনাবাজার থেকে পর্যন্ত লোক আসতে লাগল কুলিয়া ট্যাংরার 'তৃপ্তি-নিকেতনে'র দিকে।

ভিড় থেকে সরে গিয়ে কাফেলা গাছের ওপাশটায়, রাত্রে যেখানে ঠেলা গাড়িগুলো জড়ো ক'রে রাখা হয়, একটা সিগারেট ধরিয়ে পাঁচু ভাদুড়ী বিধু মাস্টারের কানের

কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'এই মাত্তর বাক্সের কারখানার সাধনের মুখে শুনলাম, ও নাকি বেলা ন'টা পর্যন্ত দোকানে ছিল। কে. গুপ্তর মেয়েটাকে দোকানে রেখে রমেশ রায় বাজার করতে বেরিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজার থেকে ফিরে আসার পরই তো এ-ব্যাপার।' বিধু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'কাল দুপুর থেকে ক্ষিতীশ দোকানে ছিল না এবং বাড়িতেও আসেনি।'

'না। ক'দিন থেকেই খুব রাগারাগি চলছিল দাদার সঙ্গে। শুনলাম লোকের মুখে। এখন শুনছি। শালার দোকানে তো আমি পেচ্ছাব করতেও যাই না।' বলে পাঁচু চুপ করল। বিধুও চুপ করে রইল। ভিড় দেখতে লাগল। দোকানের দরজার কাছে দু'জন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই সেখান পর্যন্ত কেউ যেতে পারছে না। আবার যেন গাড়ি এল। দোকানের সামনে থেকে পুলিস লোকজন হটিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা পুলিসের গাড়ি। এবার আর শুধু লাল পাগড়ি না, সাদা টুপি, সাদা পোশাক পরা সার্জেণ্ট এসে গেছে।

'সব আসবে, সার্জেণ্ট, দারোগা, ইন্সপেক্টর—একটা তাজা মানুষ খুন হয়েছে, এ কি আর—' প্রায় দম বন্ধ করে বিধু বলল, 'কত এনকোয়ারি কত স্টেটমেণ্ট জবানবন্দী নেয়া হবে একবার দ্যাখো না।'

'তা নিক না। তোমার আমার কি।' যেন একটু বিরক্ত হয়ে পাঁচু ফিসফিসিয়ে বলল, 'যেমন শালা চিটিংবাজ ছিল—আক্কেল হয়েছে, বেশ করেছে ক্ষিতীশ। একটা কাজের মত কাজ করেছে!'

'কিন্তু লোককে চিট্ করতো বলে তো আর ক্ষিতীশ ভাইকে খুন করেনি। কারণটা যে গুরুতর।'

ভিন্ন পাড়ার লোক এসে হঠাৎ পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল ব'লে পাঁচু কথা বলল না। বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। কেননা, এর মধ্যে সবাই জেনে গেছে। কি ক'রে এর মধ্যেই এত সব জানাজানি হয়ে গেল তা দিয়ে দরকার নেই। রমেশের গলায় ক্ষিতীশ কেন দা বসাল সেটাই বড় কথা। হ্যাঁ, খুনের কারণ। বাজার সেরে রমেশ যখন দোকানে ঢোকে তখন দোকানে খদ্দের কেউ ছিল না। একটু অবসর বুঝেই পর্দার ওদিকটায় বসে বেবি এক কাপ চা তৈরি করে খাচ্ছিল। রমেশ সরাসরি সেখানে চলে যায়। বাজার থেকে ফেরার পর রমেশকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। যেন কোথায় সে কি শুনে এসেছে। দোকানে ঢুকেই সে চোখ লাল করে বেবিকে নানারকম জেরা করতে আরম্ভ করে। তারপর মেয়েটার গায়ে হাত দেয়। এমন সময় পাগলের মত কোথা থেকে ছুটে এসে দোকানে ঢুকে ক্ষিতীশ পিছন থেকে এক কোপে রমেশের গলা আলগা করে দেয়। না, ক্ষিতীশ পালিয়ে যায়নি। সেই রক্তমাখা দা হাতে করে সে তৎক্ষণাৎ থানায় চলে গেছে। খুন দেখে ভয়ে চিৎকার করতে করতে বেবি দোকান থেকে বেরিয়ে সামনের কারখানায় গিয়ে ঢুকেছিল।

'পাপ বাপকেও ছাড়ে না।' ভিন্ন পাড়ার লোকটা সরে যেতে বিধু বলল, 'রমেশটা যে তলে তলে কে. গুপ্তর মেয়েটার সঙ্গে এসব মতলবে ছিল মাঝে মাঝে আমার ডাউট

হত। কেননা, ইদানীং ও একটু বেশি সময় দোকানে থাকত, তুমি কি লক্ষ্য করনি পাঁচু?'

'বেশ হয়েছে। হারামজাদার খুব বাড় হয়েছিল।' সিগারেটের টুকরোটায় শেষ টান দিয়ে পাঁচু সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 'আরে আমরা শালা ওপেনলি বেশ্যাপাড়ায় যাই। কিন্তু এ যে,—শুনলাম ক্ষিতীশ নাকি থানায় গিয়ে বড় দারোগাকে তাই বলেছে। পাশবিক অত্যাচার করতে চেয়েছিল রমেশ কে. গুপ্তর নাবালিকা মেয়ের ওপর। তাই তাকে সংসার থেকে সরিয়ে দিল।'

'গড্। বুঝলে পাঁচু। মাথার ওপর একজন আছে. সে সব অন্যায়ের বিচার করে সব পাপের শাস্তিবিধান করে। আমরা তো অবে এটা সব সময় মনে রাখি না। বেবিকেও কি অ্যারেস্ট করা রয়েছে? শুনলাম কে যেন বলল?'

মাথা নেড়ে পাঁচু বলল, 'জানি না।'

মিনমিনে গলায় বিধু বলল, 'ওর স্টেটমেণ্টের ওপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। ক্ষিতীশ থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করেছে যদিও। এটা—' কথা বন্ধ হ'ল। ভিন্ন পাড়ার মানুষ পিছনে।

আর একটু দূরে, যেখানে খোয়াঢালা রাস্তাটা একটা পড়ো জমির গা ঘেঁষে সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, করিগাছের নিচে দেখা গেল পারিজাতের চকচকে সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে। পারিজাত ভিতরে বসে কথা বলছে। গাড়ির দরজার সামনে বারো ঘরের দু'জনকে দেখা গেল। বলাই ও শিবনাথ।

সেখান থেকে রমেশ রায়ের চায়ের দোকানের দরজা দেখা যাচ্ছে।

শিবনাথ একটু সময় সেদিকে চোখ রেখে পরে ঘাড় ফিরিয়ে পারিজাতের দিকে তাকায়।

'ডেড্-বডি কি এখনি মর্গে নিয়ে যাবে?'

'দেরি হবে।' পারিজাত শিবনাথের দিকে তাকায় না। জানালার বাইরে রৌদ্র-খচিত আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'অনেকের স্টেটমেণ্ট নিতে হচ্ছে, এখন আবার একটা পুলিসের গাড়ি এল না?'

বলাই মাথা নাড়ল।

'পুলিস কারখানায় ঢুকেছে। শুনলাম ওখানে দারোয়ান ম্যানেজার সবাইকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে।'

'তা তো করবেই।' পারিজাত এবার শিবনাথের দিকে তাকাল। 'বাড়িতেও যাবে, মানে আমি আট নম্বর বস্তির কথা বলছি।'

'আমাদের কারোর কোনরকম স্টেটমেণ্ট নেবে কি?' চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল শিবনাথকে।

'না।' পারিজাত মৃদু হাসল। 'মনে তো হয় না'—সম্ভবত বাড়িতে রমেশ রায়ের ওয়াইফের স্টেটমেণ্ট নেবে।'

'বেবি যখন এর মধ্যে আছে কে. গুপ্তর পরিবারকেও তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, কি বলেন স্যার?'

পারিজাত বলাইর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'তা পারে।'

শিবনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'রমেশ রায়ের মুখটা চোখের ওপর ভাসছে।'

পারিজাতও একটা নিশ্বাস ফেলল।

'ব্রাইট কেরিয়ার ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য এটা-ওটা সবই সুন্দর বুঝত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা ন্যাস্টি ব্যাপারে—কষ্ট হয়!' কথা শেষ করে পারিজাত আবার আকাশ দেখে।

'আপনার কাজকর্মের খুব ক্ষতি হ'ল?' শিবনাথ প্রশ্ন করল। একবার চোখ বুজে কি যেন একটা চিন্তা করল পারিজাত, তারপর শিবনাথের চোখে চোখ রেখে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'খুব বেশি না। ইলেকশন সম্পর্কে বলছেন তো। ও অবশ্য নিজে থেকেই খাটছিল। বাবার সময়ও খুব খেটেছিল। না এসব ব্যাপারে সব সময় তার হেল্প পেয়েছি, পাচ্ছিলাম আমরা। ধাপার বাজার টেংরার ওদিকটায় বেশ ইনফ্লুয়েন্স ছিল রমেশের। তা অ্যাক্সিডেন্ট তো আছেই, করা কি'—থেমে চোখ বুজে আবার একটু কি ভেবে নিয়ে পরে পারিজাত শিবনাথ এবং বলাই দু'জনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে স্বচ্ছ গলায় হাসল। 'এখন আপনাদের হেল্প নেব। আপনাকে বলাইচরণকে পেয়ে গেছি যখন আমি, চিন্তা করি না।'

শিবনাথ এবং বলাই দু'জনের চেহারাই উজ্জ্বল হয়। বলাই মাথা নেড়ে বলল, 'লোকটার সব ভাল ছিল, ওই একটু চরিত্তির দোষে সব গেল। কে. গুপ্তর ডবকা মেয়েটা যেদিন চায়ের দোকানে ঢুকেছিল, সেদিনই আমি মনে মনে বলছিলাম এর ইহ-পরিণাম অতি সাংঘাতিক।'

বলাইর বাঙলা শব্দ-প্রয়োগ শুনে শিবনাথের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল।

অল্প হেসে পারিজাত বলল, 'তোমাকে কিন্তু রমেশ যথেষ্ট সাহায্য করত।'

'তা করত, তা কিছুটা করেছে, আমি অস্বীকার করব না স্যার। রমেশ এখন পরলোকগামী, তার নিন্দা করা পাপ। কিন্তু ক্ষিতীশ হালে বেবিটাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে এমন খিটিমিটি করত, পরশু থেকে তো ও একরকম দোকান ছাড়া, ভাগের টাকা পয়সা দিয়ে দাও আমি ভিগবয় চলে যাই, কেবল এই বুলি। তা আমি রমেশকে বলছিলাম ওই হারামজাদী ছুঁড়িটাকে বিদায় কর দোকান থেকে। গণ্ডগোলের মূলে তিনি। ওই পাপ দোকানে না থাকলে কি আজ রমেশের এমন অপমৃত্যু হত, কি বলেন শিবনাথবাবু?'

গম্ভীরভাবে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'আরো গণ্ডগোল হবে, আমি বলছি। সমর্থ কন্যা তো আমারও আছে। আমি কি মেয়েকে ছাড়া-ছাগল গাইয়ের মত বাড়ির বাইরে ছেড়ে দিই! বেবিটা কোথায় না যায়। রাতবেরাতে বাজারে-দোকানে মাঠে-ঘাটে ঘুরছে আমি দেখি। মেয়ে জাত, তার ওপর সর্বনাশা বয়েস। ও এ-তল্লাটে থাকলে আরো আগুন লাগবে। ভাই ভাইকে কেটেছে, ছেলে বাপকে কাটবে, আপনারা দেখুন না। আমি বলছিলাম কি

স্যার—' বলাই উত্তেজিত চাপা গলায় পারিজাতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই পাপ বাড়ি থেকে কালই তুলে দিন। বাপ তো রাস্তার পাগল, ঘরে থাকে না। কে. গুপ্তর পরিবারকে আপনি সরকার মশাইকে দিয়ে একবার ভাল করে বলান। শুনেছি তিনির ভাই আলীপুরের হাকিম। বুঝিয়ে বললে চলে যাবে।'

'কোথায় আর যাচ্ছে, অনেক বলা হয়েছে, সবাই ভদ্রলোক, জোরজুলুম করতেও কেমন লাগে।' পারিজাত গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমিও এ-বাড়ি সম্পর্কে প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। এমনিও তো তিন-চার ঘর চলে গেছে। রমেশের ফ্যামিলিও এর পর নিশ্চয় আর থাকছে না। কাল বনমালীর কাছে ইনফরমেশন পেলাম ভুবনের মেয়েরাও নাকি শহরে ঘর খোঁজাখুঁজি করছে। সরকারকে আমার বলা আছে, নতুন ভাড়াটে কেউ আট নম্বর বস্তিতে এসে উঠতে চাইলে যেন না করে দেয়। ঘর খালি নেই।'

শিবনাথ অল্প হাসল।

'আমি তাই লক্ষ্য করছি। নার্স চলে গেল, অমল চলে গেল, ডাক্তার উঠে গেল, অথচ আর ভাড়াটে আসছে না। মদন ঘোষ সব কটা ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে।'

'তাই।' পারিজাত বলল, 'আরো দু'চার ঘর উঠে যাবে ঠিকই।' আপনারা দু'চার জন যাঁরা থাকবেন তাদের জন্য টেম্পোরারী একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি ওখানে পাকা বাড়ি তুলব। একটা দুটো করে আমার সব কটা বস্তি সম্পর্কে এই প্ল্যান করা আছে। কেন, আপনাকে কাল আমি কিছুটা আইডিয়া তো দিয়েছি শিবনাথবাবু?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

বলাইর চেহারা হাসি-হাসি হয়ে গেল। 'খুব ভাল হয় স্যার। আমার স্ত্রী তো পরশু থেকে এমন বায়না ধরেছে। পাকা বাড়ি দেখ, পাকা বাড়ি খোঁজ। আমি অবশ্য বলেছি রায় সাহেব কি পারিজাতবাবু এখানে বস্তি রাখবে না। ভাড়া দিতে পারে না অনেকেই, খামকা লোকসান। লাভ নেই বাণিজ্যের চেঁচামেচি সার। মিছা বললাম?'

পারিজাত বলাইর দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসল এবং সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করল। পারিজাত কেন হাসছে শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না। বলতে কি, একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতেই সে বলাইর গায়ে নতুন সিল্কের জামাটার দিকে আড়চোখে তাকাল। যেন কাল রাত্রে জামাটা তৈরী করিয়ে এনেছে। কি আজ সকালেও হতে পারে। পারিজাত বলল, 'যাকগে, আপনাদের দু'চারটা ফ্যামিলিকে একটা সুবিধামতন জায়গায় সিফট্ করিয়ে টিনের বাড়ি আমি খুব শিগগির ডিমোলিশ করে দিচ্ছি।'

'তাই করুন।' আমারও মনে হয় এসব বস্তি না রাখা ভাল। যত সব আনডিজায়া-রেবল এলিমেণ্ট এসে বাসা বাঁধছিল। জায়গাটার ইমপ্রুভমেণ্টের জন্যে ওই যে বলাই বলছিল, এসব পাপ তুলে দেওয়া উচিত।' শিবনাথ একটু টেনে হাসল।

'বিধু মাস্টারটার চুল, চেহারা, কাপড়-চোপড়ের যা জঘন্য অবস্থা হয়েছে, আমার তো ওকে দেখলেই মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। আমার স্ত্রী কাল রাত্রে বলছিল, আরো

ঘরের বাড়িতে যদি এ বৎসর ব্যাধিট্যাধি লাগে তো ওই পরিবারটার জন্যেই লাগবে। মাস্টারের মেজ ছেলেটা, কি যেন নাম শিবুবাবু, হুবুলা। কাল ধাপার বাজারে মেছুনিরা কুঁচো চিংড়ির ডালা থেকে এইটুকুন এইটুকুন কাঁকড়া বেছে ফেলছিল। পচা ভুশভুশে গন্ধ ছাড়ছিল। কাকগুলো পর্যন্ত ছোঁয়নি। হারামজাদা দিব্যি সব ক'টা তুলে নিয়ে এল। পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে রাত্রে কলাই সিদ্ধর সঙ্গে চালিয়েছে। কলেরা হবে না কেন আপনি বলুন স্যার।'

পারিজাত মৃদু হাসল। 'মরুক গে। কলেরা ভ্যাক্সিন নিয়ে ফেল। আপনি নিয়েছেন তো?'

শিবনাথ ঘাড় কাত করল। 'আমি এসব বিষয়ে অত্যন্ত পার্টিকুলার। অনেক দিন আগেই কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে নিজে গরজ করে ওয়াইফ এবং মেয়েটা সহ ওই কাজটা সেরে এসেছি। সাবধানের মার নেই।'

'একজ্যাক্টলি সো।' পারিজাত স্টিয়ারিং-এ হাত রাখল। রমেশের দোকানের ওদিকটায় চোখ বুলিয়ে ছোট্ট হাই তুলে বলল, 'যাকগে, আপনারা রেডি হন। আমি কাল-পরশুর মধ্যেই প্রিলিমিনারী মিটিংটা ডাকছি। সন্তোষ ওরা কালকের কথা বলছিল। আমি একদিন সময় চেয়েছি। কিছু ইনভিটেশন কার্ড ছাপানো দরকার। আমার হলঘরটা একটু পরিষ্কার করতে হয়। সরকার মশায়কে অবশ্য বলে রেখেছি, —আর হ্যাঁ', পারিজাত বলাইর চোখের দিকে তাকাল। 'পরশুর ফাংশনে তোমার ময়নাকে কিন্তু গান গাইতে হবে। ও তো আগে সুন্দর গানটান গাইত দীপ্তির সমিতিতে যখন আসতো, চর্চা রেখেছে কি?'

চোখমুখ উজ্জ্বল ক'রে বলাই বলল, 'দেখি বলে। ক'টা মাস তো আমি আর ওদিকটায় নজর দিতে পারছিলাম না স্যার। এবার ভেবেছি একটা হার্মোনিয়াম কিনে দেব।'

'গুড্।' অস্ফুট উচ্চারণ করে পারিজাত গাড়িটাকে একবার একটু পিছনের দিকে নিয়ে তারপর মোচড় দিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে সুপারী ও জলপাই গাছের নিচে দিয়ে সরু রাস্তাটা ধরে সোজা বাংলোর দিকে ছুটল। বলাই ও শিবনাথ ফ্যালফ্যাল করে কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা হয় না।

তাদের পিছনে রাস্তা ধরে দু'টি লোক রমেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে ফিরে যাচ্ছে।

'এক রমেশ গেছে, আর এক রমেশ গজিয়েছে।' লম্বা লোকটি এক গাল হেসে বেঁটে লোকটিকে বলছিল, 'এ তল্লাটে রমেশদের অভাব হয় না।' বেঁটে লোকটি মাথা নাড়ে। তারপর দু'জনে বলাই ও শিবনাথের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে একসঙ্গে নাকের অনুচ্চ শব্দ ক'রে উঠে দ্রুত পায়ে বড়রাস্তার দিকে সরে গেল।

শিবনাথ বলাইর দিকে তাকায়।

'কার কথা বলছে, কিছু বোঝা গেল?'

'কি ক'রে বলি বলুন।' বলাই, যেন শিবনাথের কথা উপেক্ষা করতেই ক্যাপস্টানের

প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজল। 'পেটের ধান্দায় চোরাবাজারে নামলাম, আবার ওদিকে জমিদারের ছেলের সঙ্গে বড় বড় বিষয় নিয়ে দহরম-মহরম করছি। এই তো দাঁড়িয়ে পারিজাতের সঙ্গে হাজারটা কাজের কথা বললাম। খুন দেখতে এসে তাই দেখে গেল ওরা, আর অমনি আমাকে রমেশ বলে ঠাট্টা করে গেল আর কি।'

লোকটার নির্লজ্জ উক্তি শুনে শিবনাথ রাগ করবে কি খুশি হবে ঠিক করতে না পেরে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে একটা চোখ বোঁজা রেখে বলাই বলে, 'অথবা আপনিও হ'তে পারেন কর্তা। রমেশ,—হি-হি।' বলাই হাসল। 'পারিজাতের হয়ে ওর ভোটের যুদ্ধে খাটবেন আর মুঠ মুঠ টাকা পকেটে ঢোকাবেন। ওরা টের পেয়ে গেছে আর কি। তাই খোঁচাটা আপনাকেই দিয়ে গেল। রমেশও নানারকম সুবিধা আদায় করতে পারিজাতের ভোটাভুটির ব্যাপারে খাটতে শুরু করেছিল।'

'মূর্খ মূর্খ!' শিবনাথ রাগে মনে মনে হিস্‌হিস্‌ ক'রে উঠল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। রক্তাভ চেহারা। 'কি ব্যাপার নিয়ে আমি,—আমাকে পারিজাতের সঙ্গে একটু গভীরভাবে মেলামেশা করতে হচ্ছে জানলে, অথবা জানতে পারার মত ব্রেইন থাকলে ঈশ্বর তোমাকে বলাইচরণ ক'রে পাঠাত না। তাহলে আমার মত তোমাকেও গ্র্যাজুয়েট ক'রে পাঠাত!' নতুন সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে ওঠা সত্ত্বেও যে কতখানি 'ফেরিওয়ালা, ফেরিওয়ালা' দেখাচ্ছিল ওকে বুঝিয়ে বলতে পারলে শিবনাথের ভাল লাগত। চিন্তা ক'রে দাঁতে দাঁত চেপে কোনোমতে রাগ সংবরণ ক'রে আর বলাইর দিকে না তাকিয়ে শিবনাথ বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগল। সুবিধা আদায়ের জন্যে আমি পারিজাতের সঙ্গে একটু বেশি ভিড়েছি বলে তোমার চোখ টাটাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি। তাতে আমি গ্রাহ্য করি না। হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনো সুবিধাই আদায় করতে পারব না। হয়তো আলেয়ার পেছনে ঘুরে পায়ের চামড়া ক্ষয় করছি। হাতে পায়ে ধরে কোনরকমে রুচিকে যেমন দীপালী সংঘের সেক্রেটারীর "অনারারী" পোস্টটা নিতে ও একটু কাজটাজ করতে প্রায় রাজী করিয়ে এনেছি নিতান্ত সংস্কৃতির নামে, তেমনি ভদ্রতা,—সৌজন্যতার খাতিরে বলা যায়, আমাকেও পারিজাতের ইলেকশনের জন্যে খাটতে হবে, হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারব না, এবং চাওয়া হলো না বলে একটি আধলাও পকেটে আসবে না। কিন্তু তা হলেও আমার,—আমার মেয়ে মঞ্জু ষোল বছর বয়সে পা দিয়ে বর্ণবোধ বগলে নিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে যাবে না। ইডিয়েট।'

বস্তুত মনে মনে শিবনাথ বলাইকে যে কতটা ঘৃণা ও অনুকম্পা করল, তা সে ছোট ভাইয়ের হাতে রমেশের খুন হওয়ার কারণটি জানার পরও বুঝি রমেশ রায়কে মনে মনে এতখানি ঘৃণা ও অনুকম্পা করছিল না। তুলনাটা শিবনাথই চিন্তা ক'রে বার করল। বলাই যদি টাকার গরমে হাতে এখন থেকে 'গোল্ড-ফ্লেকের' টিন নিয়েও হাঁটে তাতে শিবনাথ চঞ্চল হবে না। কেননা এক জায়গায় তাকে মাথা হেঁট করতেই হবে। করতে হয়েছে। মেয়ের লেখাপড়ার আর্জি নিয়ে বলাইকে রুচির সাহায্য ও

দয়া ভিক্ষা করতে হয়েছিল শিবনাথের স্ত্রীর। শিবনাথের এখানেই জিত। 'রাতারাতি বড় হলেও তুই আমার চেয়ে বড় হবি না।' শিবনাথ মনে মনে বলল।

একচল্লিশ

না, শিবনাথের আশংকা অমূলক। মুখ ফুটে তাকে কিছু চাইতে হয়নি।

বস্তুত পারিজাত যে কতখানি ভদ্র, সুবিবেচক ও সরল সেদিন সন্ধ্যায় শিবনাথ আরো বেশি টের পেল। হ্যাঁ, পারিজাতের এই সুন্দর ড্রয়িং-রুমে ব'সে।

কালকের ছোট ল্যাম্প না। সবুজ ডোমের পরিবর্তে গোলাপী ঢাকনা পরানো একটা বড় বাতি টেবিলে জ্বলছিল। ফুলদানীতে মোটা ক'রে গুঁজে দেওয়া হয়েছে রজনীগন্ধার ঝাড়। ধূপকাঠি জ্বলছে।

হ্যাঁ, আজ প্রাথমিক পরিচয়। সোজাসুজি আলাপ হয়ে গেল পারিজাতের সঙ্গে রুচির। একলা পারিজাত না। সেই পার্কসার্কাসের সন্তোষ এবং তার বন্ধুদের সঙ্গেও। আর বৃদ্ধ ডক্টর নাগের সঙ্গে। এঁরা কালকের কথাটা পাকা করতে এবং রুচির সঙ্গে পরিচিত হ'তে দুপুরের পর থেকেই পারিজাতের বাংলোয় এসে অপেক্ষা করছেন।

রুচি ও শিবনাথের আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রুচি স্কুল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত শিবনাথ (রমেশের খুনের পর তার দুপুরবেলা একলা বাড়িতে থাকতে ইচ্ছা হয় না) কিছুক্ষণ বনমালীর দোকানে এবং অধিকাংশ সময়টা ওদিকে বড় রাস্তায় কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে বসে কাটিয়ে একটু আগে রুচিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে। সেক্রেটারিশিপ না নিক, কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকতে দোষ কি। শিবনাথ এখানে আসার সময় রাস্তায় রুচিকে বুঝিয়েছিল এবং আজ সারাদিন স্কুলে চিন্তা করে ও কিছু ঠিক করতে পেরেছে কি না খুব ব্যস্ত হয়ে শিবনাথ রুচিকে প্রশ্ন করতে রুচি আর বাড়ি ফিরে যায় নি। শিবনাথের সঙ্গে বড় রাস্তার মোড়ে তার দেখা হয়। সেখান থেকেই মঞ্জুর হাত ধরে সে শিবনাথের পিছে পিছে পারিজাতের সাজানো বৈঠকখানায় চলে আসে। তা ছাড়া বাড়ির একটা লোক খুন হয়েছে পর থেকে তারও কেমন ভয় ভয় করছিল। আজ স্কুল থেকে বেরিয়ে শিয়ালদায় বাসে ওঠার পর কুলিয়া-টেংরার সেই বাস্তটাই নানারকম বীভৎস চেহারা নিয়ে রুচির চোখের সামনে ভাসছিল। তাই যতক্ষণ পারা যায় সেই বাড়িতে না ঢুকে বরং কালকের সন্তোষ ও তার বন্ধুদের এবং শিবনাথের উপাস্য দেবতা পারিজাতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগটাই সে চট্ ক'রে গ্রহণ করল। বাধ্য হ'ল গ্রহণ করতে। এবং কিছুক্ষণ এখানে কাটাবার পর রুচি বুঝতে পারল এখানকার পরিবেশ কত শান্ত, মার্জিত, উন্নত এবং—সুরক্ষিত।

কেবল পরিচয় না, সকলেই এমন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলল যে তাকে অভিভূত হয়ে যেতে হল। সবচেয়ে বেশি অভিভূত হ'ল সরল উদার আনন্দময় ছেলেমানুষের মত ডক্টর নাগের ব্যবহারে। মঞ্জুকে কোলে বসিয়ে তিনি পর পর তিন চারটি ছানার

সন্দেশ খাওয়ালেন। কথা বললেন ওর সঙ্গে হাজারটা। আজ বাড়িতে কি খেয়ে এসেছে, বাবা বেশি ভালবাসেন কি মা, খরগোস দেখতে সুন্দর কি হরিণ, আলীপুর চিড়িয়াখানায় যে নতুন এক ঝাঁক পাখি এসেছে মঞ্জু কি দেখেছে না ইত্যাদি।

আর মঞ্জুকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করল সন্তোষ ও তার বন্ধুরা। একজন এতবড় একটা গোলাপের তোড়া গুঁজে দিল ওর হাতে। একজন দিল এতবড় একটা পুতুল। প্লাস্টিক ? দু'টাকা আড়াই টাকা দাম হবে (যদি রবারের হয়) রুচি অনুমান করল। এতবড় পুতুল মঞ্জুকে সে কোনদিন কিনে দিতে পেরেছে মনে করতে পারে না।

আর মুগ্ধ হ'ল রুচি পারিজাতের ব্যবহারে। বস্তুতঃ শিবনাথের মুখে শুনে রুচি যে লোকটির অর্ধেকও পরিচয় পায়নি, এখন পারিজাতের মুখোমুখি হয়ে ব'সে তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার পরই রুচি টের পেল। টের পেল পারিজাত অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ভদ্র। শিবনাথের সঙ্গে পারিজাত কাজের কথা বলছিল। চায়ের পর সন্তোষের এক বন্ধু, আর্টিস্ট হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটা কাগজ ও পেন্সিল হাতে ক'রে রুচির থেকে তিনচার হাত দূরে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'মিনিটে রুচির প্রফাইলটা এঁকে ফেলল। আঁকা হয়ে যেতে সন্তোষ আর আর অন্য বন্ধুরা কাগজটা আর্টিস্টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্কেচ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ব্রিলিয়্যাণ্ট'।

'এঞ্জেল।' আর্টিস্ট বলল, 'এ ছাড়া এই মুখের অন্য কোন ডেফিনিশান নেই।'

'দেবী।' সন্তোষ বলল, 'এই কল্যাণীকে আমাদের মধ্যে পেলে আমরা পৃথিবী জয় করতে পারব, কি বলিস জীবন ?'

জীবন মাথা নাড়ল। অসিত মাথা নাড়ল। 'অদ্ভুত, সুন্দর।'

রুচির ছবি হাতে নিয়ে এত আস্তে তারা তার সমালোচনা করছিল যে পারিজাত. শিবনাথ বা ডক্টর নাগ কিছু টের পেলেন না। রুচি ঠিক টের না পেলেও একটা কিছু অনুভব করল। শিবনাথ ইলেক্‌শনের ব্যাপারে পারিজাতের সঙ্গে কথা বলছিল। পারিজাত বোঝাচ্ছিল, শহর ও শহরতলিতে তার যেসব বন্ধু আছেন, তাঁদের কা'র সঙ্গে কবে শিবনাথ দেখা করবে, প্রেসে দু'টো খবর পাঠাতে হবে. রিপোর্ট কি ক'রে লিখতে হবে, একটা প্যামফ্লেট ছাপতে শিবনাথকে কোন্ দোকানে কাগজ কিনে কোন্ প্রেসে দিতে হবে ইত্যাদি।

যেন সে-সব কথাই বুঝি বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। পারিজাতের সঙ্গে তার দুবার চোখাচোখি হয়। শেষবার সুন্দর হেসে পারিজাত বলল. 'আপনি নিশ্চয়ই ধৈর্যহারা হচ্ছেন মিসেস দত্ত। বড্ড বেশি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করছি, নিজের কথা বলছি। এইবেলা আপনার সমিতির প্রসঙ্গে চলে আসব। কই হে. সন্তোষ, তোমরা এঁর সঙ্গে কথা বলো। আমি এঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।'

সন্তোষ ও তার বন্ধুরা দেয়ালের ধার থেকে সরে আসতে রুচি উঠে দাঁড়ায়। কেননা পারিজাত তখন শিবনাথের শহর ও শহরতলিতে ঘোরাঘুরি, ট্রাম-বাস ও দরকার হলে ট্যাক্সি রিক্সা ভাড়া বাবদ বেশ একটা মোটা অঙ্ক ধরে এক টুকরো সাদা কাগজে রাহাখরচের টোটেল ধরছিল চেক্ বই সামনে রেখে। অঙ্কটা এখনো বসানো

হয়নি। শিবনাথ শ্যেনদৃষ্টিতে পারিজাতের কলমের ডগাটা লক্ষ্য করছিল। এ-অবস্থায় বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকা অশোভন চিন্তা করে রুচি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। মঞ্জুর হাত ধরে সন্তোষ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে বারান্দায় এবং পরে পারিজাতের সুন্দর ফুলবাগানে নেমে এল। ফিকে জ্যোৎস্না।

বেল ও হাস্নুহানার গন্ধে জায়গাটা ভুর্‌ভুর্ করছিল। রুমাল বিছিয়ে সবাই ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে গোল হয়ে বসল। ছেলেদের মত পা না ছড়িয়ে একটু ভেঙে ঈষৎ বাঁকা হয়ে বসে রুচি কথা বলতে লাগল। গল্প করতে লাগল।

'আমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এমন এঞ্জেলের মত যিনি দেখতে তিনি কেন পারিজাতবাবুর টিনের শেড্-এর তলায় এসে মাথা গুঁজবেন। নিশ্চয় এর অন্য কারণ আছে। নিতান্তই অভাব না। কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে এখানে টেনে এনেছেন আমরা বলব।'

সন্তোষের সুন্দর কথাগুলি শুনে রুচি হাসল।

শিবনাথের চাকরি নেই, কি রুচি কম বেতনে একটা ছোট স্কুলে মাস্টারী করে এই যুক্তি তারা, সন্তোষ ও তার বন্ধুরা গ্রহণ করত না। তারা সেই লাইনেই কথা বলছে না।

'আমরা জানি যে, আপনার মত এমনি সব উচ্চশিক্ষিতা এবং বেশ উঁচু উঁচু ঘরের মেয়েরাও আজকাল অফিসেই বেশি চাকরি করছে, আর্টিস্টের স্টুডিওতে গিয়ে বসছে এবং দরকার হলে সিনেমায় নামছে। তাদের চোখে পয়সাটাই বড়। মহৎ উদ্দেশ্য বলতে কিছু নেই!'

'আমি কি আদর্শ রক্ষা করতে এখানে কাঁচা বস্তিতে বাস করছি, তোমরা বলছ?' অল্প হেসে রুচি প্রশ্ন করল। 'কি দেখে তা বুঝলে, আমার কি দেখে তোমরা তা বিচার করছ?'

'আপনার ক্ষমাসুন্দর এক জোড়া চোখ, বুদ্ধিউজ্জ্বল কপাল, শান্ত ভ্রূযুগল ও প্রতিভামণ্ডিত নাক। সবাই তা দেখছে কিনা রুচিদি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে,—ইচ্ছা করে এই টিচারি করা আর কষ্ট ক'রে বস্তিতে থাকার মধ্যে একটা ভীষণ মমতাবোধ, একটা ভয়ঙ্কর দরদ, অসীম ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম আপনি আপনার ওই নরম বুকে লুকিয়ে রেখেছেন। যাকে বলা যায় সত্যিকারের নারীহৃদয়।'

সাহিত্যিকের ভাষা শুনে রুচি মুগ্ধ হল।

'না দেখুন, টাকা আনা পাই দিয়ে জীবনকে বিচার করা যায় না। করা চলে না। আমি করি না। টু স্পীক দি ট্রুথ। একটু সময় কথা ব'লে দু' একবার দেখেই বুঝেছি আপনার চেয়ে শিবনাথবাবু একটু বেশি প্র্যাক্‌টিক্যাল, মনি মাইণ্ডেড বলা চলে, সাদা কথায় বলতে গেলে কবিতার একটা লাইন শোনার চেয়ে লোহা কি সিমেণ্টের দর কত, আগে তা জেনে নিতে তাঁর উৎসাহ বেশি।' কথা শেষ ক'রে সন্তোষ হাসল।

অন্ধকারে বোঝা গেল না। কিন্তু রুচির মুখ আরক্ত হ'ল। 'হ্যাঁ, না, ইলেক্‌-শনের ব্যাপার নিয়ে পারিজাতবাবুর সঙ্গে ওকে প্রায় সবটা সময়ই কাজের কথা বলতে

হয়েছে।'

'হ্যাঁ, না।' সন্তোষও নিজেকে সংশোধন করল। 'একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে কেবল কবিতা আর লোহা সিমেন্টের কথা বললাম। আমার মনে হয়েছে। হয়তো শিবনাথ-বাবু ততটা-না-ও। কিন্তু তুলনা করলে, আপনাদের দু'জনের মধ্যে আমার তো মনে হয় আপনি আইডিয়ার পূজারিণী। তখন একটা কথা থেকে আমি টের পেলাম। সমিতি সম্পর্কে আপনি খুব বেশি কথা তো আর বলেন নি। পারিজাত-বাবুকে যখন বললেন যে, রুণু মারা গেলে তার নামেই সমিতির নামকরণ করা হবে এবং এই শর্তেই শুধু আপনি সেক্রেটারিশিপ নিতে পারেন, শুনে আমরা অভিভূত হয়ে গেছি। এ দ্বারা আমরা কি বুঝলাম, কি দেখলাম? দেখলাম আপনার মন, হৃদয়। বস্তির একটা সাধারণ ছেলে সম্পর্কেও যে আপনি কী ভীষণ ফীল্ করছেন তা।'

রুচি চুপ ক'রে রইল।

'সেকথাই বলছিলাম, ভাবছিলাম।' সন্তোষ আবার বলল, 'সিনেমায় যাঁরা নামছেন, কি আর্টিস্টের মডেল হচ্ছেন, তাঁরা যে সকলেই সমাজের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তা না, বেশ সম্মানের সঙ্গে আছেন এমন মেয়ের সংখ্যাও কম না। ইচ্ছা করলে আপনি সেই সুখ, তাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে ভোগ করতে পারতেন, কিন্তু—'

'ওরে বাপ্, সিনেমায় নামব, আর্টিস্টের মডেল হব, সেই চেহারা আমার কোথায়?' সন্তোষের কথা শুনে রুচি ছোট্ট ক'রে হাসল। আদর্শ-টাদর্শ কিছু না। অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই আর কোথাও সুবিধা হবে না, তাই স্কুলটিচার।'

'তা আপনি বলতে পারেন, এটা আপনার মনগড়া কথা। কিন্তু চোখ দেখলে বোঝা যায়, আমি সেদিন প্রথম শেয়ালদায় আপনার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি কি, আপনি কে।' একটু থেমে সন্তোষ বলল 'চেহারার কথা বলছেন। পর্দার কোন্ চেহারাটি দেখতে কত ভাল আর এক একটি মডেলের সৌন্দর্যের স্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ মান কি দিয়ে আজ বিচার করা হচ্ছে, তা আমরা জানি, জানা হয়ে গেছে।' সন্তোষ নাকের অল্প শব্দ করল। 'দে ওয়াণ্ট সেক্স এণ্ড সেক্স এণ্ড সেক্স, চেহারা যত বেশী ভলাপচুয়াস হবে, চোখে যার যত বেশি প্যাশন জেগে থাকবে, লাস্টি ফীগার হবে, সেই মেয়ে তত বেশি সুন্দর, সেই মুখের সেই শরীরের তত জয়জয়কার। কিন্তু আমরা তো তা চাই না। আমরা সুন্দরকে যেমন চাই তেমনি চাই কল্যাণকে, শ্রীকে,—তাই বলছিলাম আমাদের চাওয়া, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ইচ্ছা আপনার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে। এর বেশি আজ কিছু বলতে পারছি না।' আপনাকে সমিতির মধ্যে পেয়ে আমরা যে কতটা ইন্সপিরেশান পাচ্ছি তা ভাষায় বর্ণনা করব কি করে।'

সন্তোষ থামল।

ইতিমধ্যে আর্টিস্ট উঠে গিয়ে এক মুঠো বেলফুল তুলে এনে কিছু রুচির কোলের ওপর, কিছু তার পায়ের কাছে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিলে।

'তোমরা কনস্ট্রাক্টিভ কিছু করছ, পারিজাতবাবুও সমিতির মধ্যদিয়ে জায়গাটাকে উন্নত করবেন, আগে তাঁর মনে যা-ই থাক, অন্তত এখন তিনি এ-বিষয়ে খুব সিরিয়াস হয়েছেন যখন শুনলাম, কাল রাত্রে ও আমাকে সেক্রেটারিশিপ নেবার কথা বলতে তাই আর না করতে পারলাম না।'

'আপনি রাজী না হ'লে আমরাও এখানে ভিড়তুম না।' জীবন বলল।

রুচি সন্তোষের দিকে তাকাল এবং চট্ ক'রে তার ময়নাকে মনে পড়ল।

'ময়না আজ আসেনি?'

'এসেছিল সন্ধ্যার দিকে। একটু আগে বাড়ি চলে গেছে।' অসিত বলল।

'আমার আসতে একটু রাত হ'ল। তা না হলে দেখা হ'ত।' রুচির হাসিটাকে কথা দিয়ে চাপা দিলে।

সন্তোষ বলল, 'সম্ভবত কালই আমাদের নতুন সমিতির ওপেনিং সেরিমনি হবে। আমি পারিজাতবাবুর কাছে পাকা কথা চেয়েছি। এ-সব কাজ আমি ফেলে রাখতে দিই না। তা ছাড়া—'

সন্তোষের কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। তিনজনেই বাগানে এসে ঢোকেন। ডক্টর নাগ, পারিজাত, শিবনাথ।

'তোমরা যে অতটা সময় ঘরে না ব'সে থেকে ওপেন এয়ারে এসে ব'সে গল্প করছ দেখে আমার সত্যি খুব আনন্দ হ'ল।' হার্ট স্পেশ্যালিস্ট বুড়ো নাগ, সন্তোষ, অসিত, জীবন প্রত্যেকের দিকে একবার তাকিয়ে পরে রুচির দিকে তাকান। 'কেমন পারিজাতের বাগানটি আপনার ভাল লাগছে মিসেস দত্ত?'

'অসম্ভব সুন্দর! এখানে এসে প্রথম বুঝলাম বসন্ত এসেছে।' রুচি যথাসম্ভব সুন্দর ও সুশ্রী গলায় ডক্টর নাগের কথার উত্তর দিলে।

'পারিজাত জানে, পারিজাতের মেজাজ আছে আমি তো ওকে বলি। সত্যি বাগানটি ওর চমৎকার।'

'আপনাদের কালকেই ওপেনিং সেরিমনি ঠিক হ'ল মিসেস দত্ত।' পারিজাত রুচির দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় স্টার্ট দেয়া ভাল।' রুচি ডক্টর নাগের দিকে তাকাল। ডক্টর নাগ মাথা নাড়লেন। 'শুভস্য শীঘ্রম্। দি আর্লিয়ার দি বেটার।'

এসব আলাপের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিবনাথ মাথা গুঁজে চুপ ক'রে মাঠের অন্ধকার ঘাসের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। রুচির চোখ এড়াল না।

বাড়িতে।

'তা ওটা দেখাতে দোষ কি, কী মুশকিল!'

'না এখন না, খেয়ে উঠে।' শিবনাথ গলার কাছে হাসিটা চেপে রেখে মাথা নাড়ছিল।'

মঞ্জুকে শুইয়ে রেখে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেন হাতে রুচি।

কাপড়-চোপড় ছাড়া হয়েছে, মুখ হাত ধোওয়া হয়নি। বলল আর আলোটা

একটু তুলে ধরে শিবনাথের হাসি দেখতে চেষ্টা করল। 'খুব তো সেখান থেকে বেরিয়েছি পর থেকে খুক্ খুক্ করে কেবল হাসছ। রাস্তায় বেরোবার আগেই যে তুমি হুট্ করে রাহাখরচের কথা তুলবে আমি ভাবতে পারিনি। কত টাকার চেক্ ?'

'তোমার খুব লজ্জা করছিল ?'

'তা একটু করছিল বৈকি।' রুচি না-হাসতে চেষ্টা করল।

'তা তখনই তো তুমি চট্ ক'রে উঠে বেরিয়ে গেলে সন্তোষদের সঙ্গে দেখলাম।' শিবনাথ চোখ গোল ক'রে হাসল। 'বেশ ইন্টেলিজেন্ট তুমি।'

'কত টাকা দেখি না ?'

শিবনাথ নিঃশব্দে ঘড়ির পকেট থেকে চেক্‌টা বের ক'রে রুচির হাতে দিতে রুচি সেটা আলোর সামনে ধরল ও অঙ্কটা পড়ল, তারপর ভাঁজ ক'রে কাগজটা শিবনাথকে ফিরিয়ে দিলে।

'ধন্যি লোক তুমি, বাবা, আমি পারতাম না। ঘর থেকে পা না বাড়িয়ে পথ খরচের টাকা।'

শিবনাথ এবার একটু বাঁকা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং কোনরকম মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে জামা খুলে সেটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখল। চেক্‌টা গুঁজল ট্যাঁকে। ওটা বালিশের নিচে রেখে শোয়া হবে অনুমান করতে রুচির কষ্ট হ'ল না।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শোবার পর শিবনাথ বলল, 'পারিজাতের মেজাজ আজ খুব ভাল। একটু বলেছি কি অমনি পথ খরচ স্যাংশন হয়ে গেল বেলেঘাটা টু শ্যামবাজার। শুধু তার জন্য কুড়ি টাকা।'

'ট্যাক্সি-ভাড়া ?' রুচি বলল।

'তবে কি ট্রাম বাসের জন্য!' শিবনাথ বলল, 'বড় ঘরের ছেলে ইলেক্‌শনে নামছে। অনেক ঘোরাঘুরি, প্রচুর পয়সা খরচের ব্যাপার। গোড়া থেকেই এখন এর সঙ্গে ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা, চিঠি-পত্র পৌঁছে দেওয়া, অনুরোধ উপরোধ জানানো হচ্ছে। তার জন্য টুয়েন্টি-ফোর আওয়ার্স একজন লোকের দরকার। আমায় তো আর হুট করে কর্মচারী রাখার কথা বলতে পারছে না, বলছিল এই ব্যাপারে তাকে যেন হেল্প করি। বলছিল, বিশেষ তুমি যখন তার সমিতির সেক্রেটারিশিপ নিচ্ছ, তখন আমার ওপর পারিজাতের রাইট জন্মেছে, আমাকে তার এই কাজে একটু খাটিয়ে নেবে। কাজেই উচিত পথখরচ, রেস্টুরেন্ট খরচ, দরকার হলে শহরের বড় বড় হোটেলে নিয়ে গিয়ে এঁকে ওঁকে দলে ভেড়াবার জন্যে ডিনার খাওয়ার খরচ পারিজাত আমাকে ধরে দেবে বলছিল। সবই অবশ্য চেক্ মারফত হবে। আমি খুশিমত দরকারমত ভাঙিয়ে নেব আর খরচ করব।'

'তা হলে এই তিন মাসে তো অনেক টাকাই পাবে।' রুচি বলল, 'টেম্পোরারী হলেও চাকরিটা ভালই। বেশ, আরও উন্নতি হবে, লেগে থাকো।'

'কেন, তোমার কি বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না কাজটা ?' শিবনাথ শুকনো গলায় প্রশ্ন করল।

'আমার পছন্দে অপছন্দে কি এসে যায় ? আমি তো আর তুমি একাজ পাবে

বলে সেখানে যাই নি। সন্তোষ তো পরিষ্কার বলল, ইলেক্‌শনের সঙ্গে সমিতির কোনো বিভাগেরই সম্পর্ক রাখা হবে না।'

'আহা, তা কি আমি জানি না। তোমাদের সঙ্গে আমার এই কাজের সম্বন্ধ থাকবে না। তোমাদের হচ্ছে সম্পূর্ণ আইডিয়ার ব্যাপার—তোমরা একটা বড় আদর্শের, সংস্কৃতির, সৌভ্রাত্রের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছ। আমি পারিজাতের দরকারী কাজে ঘুরছি, কাজেই আমাকে ট্রামবাস ভাড়া—'

'তাই বলছিল সন্তোষ ওরা।' রুচি পাশ ফিরে শোয়। 'সমিতি সম্পর্কে তোমার ইণ্টারেস্ট যে খুব বেশি নেই তা ওরা ধরে ফেলেছে।'

'তাতে আমি ঘামি না।' শিবনাথও পাশ ফিরে শোয়। 'আমি বেকার মানুষ। স্রেফ্ সংস্কৃতি আদর্শ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সুযোগ বুঝে সুবিধা বুঝে কিছু টাকাকড়ি পারিজাতের কাছ থেকে খসাতেই হবে।'

রুচি কথা বলল না।

'বাগানে তোমরা অনেকক্ষণ ছিলে। আর কি কথা হ'ল? সন্তোষের এক বন্ধু তো তোমার ছবি এঁকে ফেললে।'

'তুমি দেখেছিলে নাকি?'

'না।' শিবনাথ গম্ভীর গলায় বলল, 'ডক্তর নাগ পরে আমায় বললেন। তোমাকে পেয়ে ওদের বেজায় ফুর্তি হয়েছে।' একটু থেমে থেকে পরে শিবনাথ যেন অনেকটা নিজের মনে আস্তে বলল, 'স্বাভাবিক।'

রুচি কথা বলল না।

'একেবারে দেবীর আসনে বসাতে চাইছে ওরা তোমাকে, শুনলাম।' কথা শেষ করে শিবনাথ মৃদু হাসল।

এবার রুচি মুখ খুলল।

'তোমার খুব খারাপ লাগছে নাকি?'

'আমার? কেন?' শিবনাথ এ-পাশ ফিরল। 'বাস্তবিক, তুমি আমাকে এমন ভুল বোঝ।'

রুচি আবার গম্ভীর।

'যাকগে', শিবনাথ রুচির কোমরের ওপর হাত রাখল: 'সব তো আর ট্যাক্সি রিক্সার খরচ করছি না। মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে ট্রাম বাসেই চড়ব। হ্যাঁ, এই থেকে আমাকে কিছু কিছু বাঁচাতে হবে। মনে করেছি কাল চেক্‌টা ভাঙিয়েই তোমার একটা ভাল শাড়ি কিনে আনব। মিটিং-ফিটিং-এ যাবে। তেমন ভাল কাপড়ও তো নেই।'

বেশ বিরক্ত হয়ে রুচি কোমর থেকে হাত সরিয়ে দিলে।

'আমার কাপড়ের দরকার নেই। পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাতের কাজ, এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি, নিজের জন্যে একজোড়া জুতো ও দু'টো পাঞ্জাবি করিয়ে নাও।'

'আহা, তা তো করতেই হবে।' শিবনাথ বলল, 'সেটা সামনের সপ্তাহে হচ্ছে। কাল তোমার—'

রুচি বাধা দেয়।

'আমার কাপড় পরে হলে চলবে। একটা মাদ্রাজী তোলা আছে। সেটা আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। কাল মিটিং-এর জন্য ওটা খারাপ হবে না—বরং।' যেন কি একটু ভাবল রুচি, তারপর : 'ভাল কথা, তুমি কাল কি পরশু একবার মঞ্জুকে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা কর তো।'

'কেন ?' শিবনাথ অবাক। 'মঞ্জুর তো কোনো অসুখ নেই।'

'তা তুমি সাদা চোখে কি ক'রে জানবে।' রুচি বিরক্ত হ'ল। 'তুমি পারিজাতের সঙ্গে তখন ইলেক্‌সনের কথা নিয়ে মত্ত। আর কারো কথা শুনবার কথা নয়। ডক্টর নাগ আমাকে দু'বার বলেছেন : 'আপনার মেয়ে ভীষণ রোগা মিসেস দত্ত। এখন থেকে একটু ওর দিকে মনোযোগ না দিলে সারাজীবন বেচারা কষ্ট পাবে, ভুগবে।'

'ওর জেনারেল হেল্‌থ খারাপ।' শিবনাথ হৃষ্ট গলায় বলল, 'তা একটু দুধ-টুধ খাক। আমি তো ভাবছি কাল মঞ্জুর জন্যে আধ সের ক'রে দুধ রেখে দিতে তোমায় বলব। এটা আমার গোড়া থেকেই ঠিক করা আছে মনে মনে।'

'কেবল দুধ খাওয়ালে হবে না। ক'টা ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকশন, একটা ভাল জেনারেল টনিক ওকে না দিলে চলবে না।'

'তাই হোক, তাই দেওয়াবার ব্যবস্থা করব। প্রথম টাকাটা সন্তানের জন্যেই খরচ করি, কি বলো! তাতে একটা স্যাটিশফ্যাক্‌সন থাকে।' শিবনাথ আবার অল্প শব্দ ক'রে হাসে।

রুচি এ-পাশ ফিরে শোয়।

'আর কে কি বলছিল আমার সম্পর্কে ডক্টর নাগের কাছে ছেলেরা ?'

'আরে বাপ্‌রে! সেকি প্রশংসা! এঞ্জেল, গডেস, কেবল এই সব।'

'ভীষণ ছেলেমানুষ সব।'

শিবনাথ স্ত্রীর কথার উত্তর দিল না। বেশ একটু সময় চুপ করে থাকার পর সে সিগারেট ধরায়। ওদিকে ঘুমের ঢল নেমেছে রুচির চোখে, চোখের পাতায়, শরীরে। ছোট্ট একটা হাই তুলে সে ঘুমটাকে তাড়াতে চেষ্টা ক'রে বলল, 'যাক্‌গে, একটা কথা তোমায় বলে রাখছি মনে রাখতে হবে।'

'কি কথা ?'

'কাজের কথা বলতে আপত্তি নেই, হ্যাঁ—আমি যখন ওখানে থাকি আমার সামনে পারিজাতের সঙ্গে তোমার পাওনা-টাওনার কথাটা কিন্তু মোটেই বলবে না।'

'আরে পাগল!' শিবনাথ সিগারেটে লম্বা টান দিল। 'তোমার সেখানে হ'ল গিয়ে অন্যরকম স্টেটাস, মান মর্যাদা। না না, সে বিষয়ে আমি সাবধান আছি।'

'এবং সন্তোষদের সামনেও না।'

'না।' বুক থেকে অনেকটা ধোঁয়া ঠেলে বার করে দিয়ে শিবনাথ বলল, 'সে-বিষয়ে আমি খুব এলার্ট। সমিতির সেক্রেটারিশিপ নিয়ে, একটা সেক্রিফাইসিং স্পিরিট নিয়ে সেখানে তুমি কাজ করছ। তোমার প্রেস্টিজ কত সে-বাড়িতে! আলাদা সম্মান।'

রুচি কথা বলল না।

'কেমন বুঝলে পারিজাতকে?'

প্রশ্নটা অস্পষ্ট হওয়াতে রুচি চুপ করে রইল।

'স্ত্রী পালিয়ে যাওয়াতে এতটুকু দুঃখিত নয়, বুঝতে পারিনি? কেবল কাজ আর কাজের কথা, আর তোমাদের সমিতির!' বলে শিবনাথ রুচির বুকের ওপর হাত রাখতে রুচি ওপাশে ফিরে শোয়।

'প্রকৃত যে পুরুষ দুষ্ট স্ত্রীর জন্যে সে দুঃখিত হয় না।'

'বুঝলাম।' শিবনাথ চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে হাসে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে গলার ধোঁয়াটা চেপে রেখে তারপর সেটা বার করে দিয়ে বলল, 'আমি হলে পারতাম না। মানে তুমি যদি কোনদিন খারাপ হয়ে এভাবে পালিয়ে টালিয়ে যেতে কারোর সঙ্গে, আমি শালা কাজ টাজ ফেলে নিজের গলায় ছুরি লাগাতাম, নয়তো তোমাকে আনতে তোমাকে শিক্ষা দিতে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে ছুটে যেতাম।'

রুচি রাগ করল না। একটা উপেক্ষার হাসি হেসে বলল, 'তোমার চিন্তাধারাই ওরকম! সৎ-বুদ্ধি সৎ-চিন্তা তো আর মাথায় নেই। কোনোদিনই নেই—'

গাল খেয়ে রাগ না ক'রে শিবনাথ হাসে, হাসিটাকে যথাসম্ভব গলার কাছে ধরে রাখতে চেষ্টা করে পরে বলে, 'আরে পাগল, একটা তুলনা দেখাচ্ছিলাম শুধু—তুমি কি আর—'

'না, ছাড়ো, লাগে।' বিরক্ত হয়ে রুচি শিবনাথের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। 'পৃথিবীতে আর ভাল তুলনা নেই।'

নিশুতি রাত। তেমনি একটা চেক্ নিয়ে বারো ঘরের আর এক ঘরের কথা হচ্ছিল বেশ মোটা অঙ্কের চেক্। এক সঙ্গে অনেক টাকা।

মিহির আগেই বীথিকে টাকাটা দিয়ে রেখেছে। শহরে বাড়ি পাওয়া গেছে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সেলামি অ্যাড্ভান্স দিয়ে তারা ওটা বুক করে রাখতে পারে।

সবটা টাকা লাগবে না এটা বীথি ও প্রীতি দুজনেই জানে। বাড়ি ভাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে সিফ্ট ক'রে যে-টাকাটা বাঁচবে আন্দাজে তার সংখ্যাটা ঠিক ক'রে যেন খুশি হয়ে বীথি আজ দুপুরে মিহির কখন চেক্টা লিখে দিয়েছিল দিদির কাছে পুরোপুরি তার বর্ণনা দিচ্ছিল। দুপুরে টুটুল ঘুমোচ্ছিল খাটে। বীথিও এক পাশে শুয়ে মিহিরের আলমারী থেকে একটা বাংলা নভেল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ছিল। এমন সময় মিহির হঠাৎ বাইরে থেকে বাড়ি ফেরে এবং সরাসরি বীথির কামরায় ঢুকে একটা খবরের কাগজের কাটিং পকেট থেকে বার ক'রে সেটা বীথির হাতে দেয়। একটা বাড়ির ঠিকানা। সকালে কাগজ পড়তে পড়তে মিহিরের চোখে পড়েছে। আজই বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে বীথি যাতে একবার রামকানাই দত্ত লেন ঘুরে যায় এবং বাড়িটা সম্বন্ধে পাকাপাকি কথা ব'লে অন্তত কিছু টাকা দিয়ে যায়। মিহির পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করতে বীথি চোখ কপালে তোলে।

এত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে রাস্তায় বেরোতে পারবে না, তার ভয় করে। শুনে মিহির হেসে দু'টো মাত্র নোট বীথির হাতে দিয়ে তৎক্ষণাৎ চেক্ বই নিয়ে এসে বীথির খাটের ওপর বসেই একটা চেক্ লিখে দেয়। কথার যাতে নড়চড় না হয় সেজন্য বীথি কুড়িটা টাকা আজ বাড়িওয়ালাকে দিয়ে যাক—কাল চেক্ ভাঙিয়ে সেলামি অ্যাড্ভান্স বাবদ বাড়িওয়ালা যা চায় যেন সে দিয়ে দেয়। মোটের ওপর বারো ঘরের আস্তানা ছেড়ে যে ক'রে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীথি তার বাবা মা ভাই বোনদের নিয়ে শহরে চলে আসুক। মিহিরের ইচ্ছা।

'তারপর কি তিনি আবার বেরিয়ে গেলেন ? হ্যাঁ, বাড়ি থেকে ?'

'কই না তো ! তখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছল।'

'বসে বসে গল্প করলেন বুঝি তোর সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ, কেন, গল্প করলেন মানে আমাকে একটু চা করতে বললেন। ইলেক্ট্রিক কেটলী থাকাতে চট্ করে গরম জল হয়ে যায়।'

প্রীতি আর কিছু বলল না।

বীথি বলল, 'টুটুলও আজ সন্ধ্যা অবধি ঘুমিয়েছিল।'

'তবে তো অনেকক্ষণ বসে গল্প করার সুযোগ পেয়েছিলি তোরা ?' প্রীতি না বলে পারল না।

'হ্যাঁ, তা তো পেয়েছিলাম।' যেন প্রীতির কথা বীথির কানে লাগল। 'অনেকক্ষণ বসে গল্প করলেন আমার সঙ্গে বলতে তুই কি বলতে চাস তিনি সারাক্ষণই আমার খাটের উপর ব'সেছিলেন ? কি চুপ ক'রে আছিস কেন ?'

'আরে !' প্রীতি অসুবিধায় পড়ল। 'আমি কি তাই জিজ্ঞেস করছি নাকি তোকে। আমি তো তা বলিনি বোকা।'

'বুঝতে পেরেছি।' বীথি পাশ ফিরে শোয়। 'এতগুলি টাকা আজ আমায় দিয়েছেন তাতে তোর মনে একশ রকমের প্রশ্ন জাগবে তা কি আমি জানি না, দিদি, আমি তোর পিঠের বোন।'

'কী মুশকিল ! আমি তো—'

'থাক হয়েছে—তোকে আমি চিনি।'

আদর করতে গায়ে হাত দিতে চেয়েছে প্রীতি, বীথি হাতটা সরিয়ে দেয়।

'আমি কি জানি না, সন্দেহ করতে তুই-ই আগে করবি। আমি অবশ্য—' একটু চুপ থেকে তারপর হঠাৎ যেন ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল বীথি। প্রীতি ধমক দেয়।

'কি আরম্ভ করলি তুই দুপুর রাতে !'

'কি হয়েছে !' প্রীতি বীথির মা জেগে ওঠে।

'বীথি কাঁদছে।'

'কেন তুই কিছু বলেছিলি নাকি ?' বড় মেয়েকে প্রশ্ন করতে ভুবনগিন্নী বালিশ থেকে মাথা তুলল।

'কি বলেছি তুমিই ওকে জিজ্ঞেস কর না। এত বড় মেয়েকে কিছু বলার আমার

কী অধিকার আছে। আমি আবার কি বলতে যাব।' প্রীতির গলায় ঝাঁজ।

ভুবনগিন্নী কিছু বলল না। প্রীতি চুপ। বীথি এমন জোরে কাঁদছিল যেন মনে হল ওর মাথার বালিশ ভিজে যাচ্ছে।

'হরি হরি!' ভুবন হাই তুলল, 'রাত দু'টো বেজেছে। তুমি কি বেল্ শুনতে পেয়েছ গিন্নী?'

'না।' বীথির মার গলায় অস্পষ্ট ঝাঁজ। 'কেন তুমি কি এখনো ঘুমোও নি নাকি। আর কতই বা ঘুমোবে। মেয়েদের রোজগারে দুধ আফিং খেয়ে খেয়ে সাধ পুরিয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছ।'

ভুবন নীরব।

'এই বীথি!' প্রীতির মা উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বীথির শিয়রের ধারে চলে গেল। 'কি হয়েছে শুনি?'

'কিছু না।'

'তো ওরকম কান্নাকাটি করছিস কেন হঠাৎ দুপুর রাতে?'

'আমার ইচ্ছা। তুমি যাও, তুমি এখান থেকে সরে যাও মা।'

'কি যে তোদের রকম! প্রীতি তোকে তো কিছু বলেনি। আমি তো এতক্ষণ জেগেছিলাম। দেখি বালিশের তলায় চেক্‌টা ঠিক্ আছে তো?'

'হ্যাঁ, মা, আছে, তুমি যাও, তোমার পায়ে ধরি, তুমি নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।' ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিয়ে বীথি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকার। তা হলেও বোঝা যায় নিজের কাপড় মানে শায়া ও কাঁচুলি ছাড়া বীথির গায়ে আর কিছু নেই, যেমন কাঁচুলির বাঁধনও ঢিলে হয়ে একটা পাশে ঝুলে পড়েছে। বীথি তা গ্রাহ্য করল না। করে না। অনেক সময় গায়ে কাপড় না থাকলেও তারা অন্ধকার ঘরে হাঁটাহাঁটি করে। ঘরে বয়স্ক পুরুষ বলতে এক ভুবন। ভায়েরা প্রীতি বীথির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। অসুখে ভুগে ভুগে ভুবন রাতকাণা হয়ে গেছে। রাত্রে উঠে হাওয়ার জন্য এক আধ বার জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কি ছারপোকা মারতে কি পিপাসা পেলে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে কাপড়চোপড় সম্পর্কে প্রীতি বীথির বিন্দুমাত্র সতর্ক হবার প্রয়োজন হয় না। বোঝা গেল বীথিও এখন জল খেতে উঠে ওধারে কুঁজোর কাছে গেল। যেন এক সঙ্গে অনেকটা জল ঢক্ ঢক্ ক'রে গিলে আবার সে বিছানায় ফিরে এল! বেণী খুলে গেছে। বসে বীথি হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করল। তারপর আস্তে আস্তে ধরা গলায় মাকে বলল, 'হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে আমার চাকরি যত দিন আছে অনেক চেক্ পাওয়া যাবে। তার জন্যে ভেবো না। কিন্তু তোমরা,—তোমাদের চোখে যদি কোনদিন আমি এতটুকু সন্দেহ দেখি আমি চেক্ ছিঁড়ে ফেলব। ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে যাব ঠিক ক'রে রেখেছি। তুমি প্রীতিকেও বলে দাও, আর যাই করুক, ও যেন মিহিরবাবুর সঙ্গে আমার অন্য কোনরকম একটা সম্পর্ক দাঁড়াতে পারে এই দুশ্চিন্তা সকলের আগে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। তারপর আমি ওখানে কাজ করতে যাব।'

'না' কেন এসব কথা ওর মনে আসবে, আসেনি তো, কেমন রে প্রীতি, তুই কি—'

মার কথা শেষ হতে না দিয়ে প্রীতি মৃদু-মন্দ হাসল। 'আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। বললাম অনেকক্ষণ গল্প করছিলি, তাতেই ও—'

'যাক গে, ওর বুঝতে ভুল হয়েছে, এই বীথি, এবার শুয়ে পড়। লক্ষ্মী মা আমার, বাজে কথায় রাগারাগি না করে এই বেলা ঘুমিয়ে পড়, রাত বেশি নেই।'

বারো ঘরের বাকি সবগুলো ঘর ঘুমে অচৈতন্য। তাই কি? আজ আর একটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। মদন ঘোষ সন্ধ্যার পর দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে এসে রমেশের ঘরের দরজায় তালা পরিয়ে গেল। মল্লিকা নেই। মল্লিকা ও রমেশের ছেলেমেয়েরা রমেশের খুড়া সম্পর্কিত কে এক অন্নদা নাগের সঙ্গে তার উল্টোডাঙ্গার বাসায় চলে গেছে। ওয়েলিংটন স্ট্রীটে এক লোহা-লক্কড়ের দোকানে খাতা লেখে অন্নদা। খবরটা সেখানেও পৌঁছেছিল।

এখন রমেশের দরজার সামনে তার ঘেয়ো কুকুরটা একলা চুপচাপ শুয়ে আছে। শুয়ে আছে আর থেকে থেকে বাতাসে যখনই দরজার তালাটা নড়ে উঠছে মাথা তুলে কান খাড়া রেখে তালাটার দিকে একদৃষ্টে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর একসময় মাথাটি নামিয়ে বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে ভীষণ কান্নাকাটি করছে। রমেশ খুন হয়েছে শুনে মল্লিকা মূর্ছা গিয়েছিল। ভয়ে ছেলেমেয়েদের গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়নি। একমাত্র রমেশের প্রিয় কুকুর 'ভোম্বলই' মনিবের জন্য শোক প্রকাশ করতে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে কাঁইকুঁই কান্নার শব্দে রাত্রির অন্ধকার ভারাক্রান্ত করে তুলছিল।

প্রমথদের ঘরে বুড়ীর বুকের কফ বেড়ে যাওয়ার দরুন রাত সাড়ে বারোটার পর থেকে তার গলা দিয়ে কেমন বিশ্রী ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছিল।

ওদিকে বিধুমাস্টারের ঘরে লক্ষ্মীমণি পেটের ব্যথায় ছটফট করছে। এতক্ষণ খুবই ছটফট্ করছে। যেন এইবার ব্যথাটা কমে আসাতে লক্ষ্মীমণি নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে। বেদনার বাড়াবাড়ি দেখে বিধুর বুঝতে বাকি থাকে না চরম সময় উপস্থিত। অম্বলের ব্যথা ব'লে আর উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ে মাস্টার রগ দুটো দু' আঙুলে টিপে ধরে ভাবে। মমতা সাধনা বোতলে গরম জল পুরে মার হাতে পায়ে সেঁক দিচ্ছে। কোন রকমে রাত ভোর পর্যন্ত টেনে নিতে পারা যায় কি না সকলেরই এই চিন্তা। গভীর রাতে এম্বুলেন্স ডাকার হাঙ্গামা কত!

আর ঘুম নেই চোখে সুপ্রভার। অন্ধকারে শুয়ে ভাবে। যেন চিন্তা ক'রে সে ঠিক করতে পারছিল না ক্ষিতীশ রমেশের সঙ্গে,—রমেশের পাপ ইচ্ছার সঙ্গে বেবি কতখানি জড়িত ছিল। হ্যাঁ, তার মেয়ে! তার গর্ভের সন্তান। চৌদ্দ বছরের বেবি কতটা যৌবন শরীরে ধরতে পেরেছিল যার জন্য চায়ের দোকানে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। আশ্চর্য, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, খবরটা শুনে সুপ্রভা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল প্রথম, একটা পাশবিক উল্লাস। কিন্তু শরীর নিস্তেজ বলে সেই উল্লাস সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। শ্রান্ত অবসন্ন চোখ মেলে অন্ধকারে কড়িকাঠ দেখছিল। বেবি ঘরে ফিরল কিনা ভুলেও আজ একবার দরজার দিকে চোখ ফেরাল না। বেবি ফিরে এলে সুপ্রভা তাকে কি প্রশ্ন করত, কি বলত বলা কঠিন।

বিয়াল্লিশ

রমেশ খুন হওয়ার পর বারো ঘরের বস্তি তো বটেই, সমস্ত পাড়াটা যেন কেমন ঝিম মেরে ছিল। একটা থমথমে বিষণ্ণতা, চাপা-চাপা ভাব। এ ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে, ভিন্ন বাড়ির দরজায় যেতে, এমন কি পাশের ঘরের রকে বসে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলতেও যেন লোকে কেমন আটকা বোধ করছিল। সবাই কেমন সঙ্কুচিত সন্ত্রস্ত হয়ে চলাফেরা করছিল। ক্ষিতীশের কি ফাঁসি হবে? না বেবির জবানবন্দীতে পুলিসের 'বিশ্বাস' হচ্ছে না। আরো 'ইনকোয়ারী' হবে। খুনের পিছনে কি আরো 'মানুষ' আছে? 'ঠাণ্ডা রক্তে' খুন না কি 'গরম রক্তে' খুন! ক্ষিতীশ এত বড় 'দা' কোথায় হুট করে পেল। কে 'সাপ্লাই' করেছিল? বেবিকে হাজত থেকে কবে ছাড়া হবে। না দা-টা বেবিই 'ফ্রকের' তলায় করে দোকানে কয়লার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। আগে-ভাগে? এই অস্ত্র ক্ষিতীশের হাতে না উঠে রমেশের হাতে উঠতে পারত না কি ইত্যাদি চাপা গলার ফিসফিস আওয়াজে কুলিয়া-টেংরার বাতাস দূষিত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই পারিজাত আবহাওয়া সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সংস্কৃতি-সম্মেলন। পাড়ার ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ, বিদ্বান-মূর্খ সকলেই সেদিন পারিজাতের প্রশস্ত লনে সামিয়ানার তলায় এক একটি আসন দখল করে বসতে পেরেছিল। হল-ঘরে এত লোকের জায়গা হবে না চিন্তা করে বাইরে সামনের সবুজ মাঠে চাঁদোয়া খাটিয়ে প্রত্যেকটা খুঁটি দেবদারু পাতা ও খেজুর পাতায় মুড়ে নিশান গুঁজে ও প্রবেশদ্বারে লাল সালুর গায়ে সাদা কাপড় দিয়ে 'কুলিয়া-টেংরা কৃষ্টি-বাসর' লিখে পারিজাত, সন্তোষের দল, ময়না এবং রুচি সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে বসালো।

এ পাড়ার নিমন্ত্রিতরা তো ছিলেনই, ওদিক থেকে পারিজাতের আরামবাগের সেই জার্মানি রাশিয়া ফেরত বন্ধু বিশিষ্ট জননেতা শশাঙ্ক বাগচী, ডক্টর মধুসূদন নাগ, সন্তোষের বাবা মা, এদিক থেকে রুচির স্কুলের কয়েকজন টিচার, সন্তোষের পার্ক স্ট্রীট, বালিগঞ্জ এবং এণ্টালির বন্ধুরা, সন্তোষের বোন, বোনের সখীরা, অসিতের বোন ও বোনের সখীরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সুন্দর সফল করে তুললেন। ডক্টর নাগ মঙ্গলাচরণ করলেন, অসিতের বোন উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইল, সভাপতি শশাঙ্ক বাগচী 'সংস্কৃতি' বলতে কি বুঝায় তা তাঁর ভাষণে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করে সমবেত সকলকে মুগ্ধ করলেন। 'অশিবকে অসুন্দরকে অকল্যাণকে অবিদ্যার পাপকে দারিদ্র্যের গ্লানিকে চিরতরে বিদায় দেবার মহতী ব্রত নিয়ে এই সংস্কৃতি বাসর আপনাদের মধ্যে জন্ম নিল। অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ অপরিসীম প্রেম অপরিমেয় নিষ্ঠা অমিত উদ্যম এবং অশেষ সাহস নিয়ে আপনারা সমিতির প্রচেষ্টাকে সার্থক জয়যুক্ত করে তুলবেন এবং সমাজকে, জাতিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন আমার এই কামনা।' ভাষণ শেষ হবার পর করতালি-ধ্বনিতে আসর মুখরিত হ'ল। মৃদু গুঞ্জন ক'রে অনেকেই বলাবলি করলেন কণ্টিনেণ্ট ঘুরে আসা এত বড় লোকটার এই দীর্ঘ বক্তৃতায় একটা 'ইংরেজী' শব্দ নেই। কী অদ্ভুত দখল বাঙলা

ভাষার ওপর। কী চমৎকার বলার ভঙ্গী!

এরপর অনুষ্ঠানের যেটা সবচেয়ে প্রধান অংশ অর্থাৎ রুচিকে সম্পাদিকার পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করা—সুন্দর সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা ক'রে পারিজাত তা আরম্ভ করল। আজ আর টাই স্যুট না, পাঞ্জাবি ধুতি চাদরে পারিজাতকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। রুচি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে তার প্রত্যুত্তরে ছোট কয়েকটি কথায় এবং তা'তে অসতর্কতাবশত দুটো ইংরেজী শব্দ মিশিয়ে ফেলে কাঁপা গলায় বক্তৃতা করল। এই সীমিত শক্তি নিয়ে এতবড় আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা সহজ না বলে আজ আমিও আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করছি।' শেষদিকে আর ইংরেজী শব্দ ছিল না, তাই শিবনাথের চেহারা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বস্তুত আনন্দে গর্বে আজ তার বুক ফুলে উঠেছিল। মালার স্তূপ জমল রুচির সামনে কোলের ওপর। সন্তোষ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে রুচি বসেছিল। মালাগুলো পরে সে একটা একটা করে সবাইকে বিলিয়ে দিয়েছিল অবশ্য। অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে অর্থাৎ সকলের শেষে সাহিত্যিক সন্তোষ সমিতির পক্ষ থেকে কর্মীদের সকলের হয়ে তার চমৎকার ভাষায় বক্তৃতা করল। 'আমরা দল বুঝিনা, আমরা রাজনীতি জানি না,—মুক্ত আকাশের নিচে নতুন দিনের সূর্যের কিরণসম্পাত ললাটে নিয়ে তরুণের দল তরুণীর দল হাত ধরাধরি করে আজ যে অভিযান শুরু করলাম তার শেষ কোথায়, সমাপ্তি কোথায় জানি না। নদীর তরঙ্গের মত লাভ-ক্ষতির হিসাব না নিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে অর্থাৎ জাতিগঠনের বিরাট সাধনার দিকে কেবল অগ্রসর হতে থাকব। আমাদের এই গতি, এই বেগ এই উচ্ছলতা আজ এক কল্যাণীকে এক দেবীকে পেয়ে স্ফীততর হয়ে উঠলো। রুচিদির প্রেরণায় নির্দেশনায় আমরা যে কত কাজ করতে পারব, তা এখনি বলে মাননীয় অতিথিদের, বন্ধুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না,—ফলেন পরিচীয়তে।' আবার করতালিধ্বনি। ময়না সমাপ্তি সঙ্গীত গাইল। সন্তোষের দেবী কল্যাণী কথাগুলির সময় রুচির চেহারার পরিবর্তনটা শিবনাথের চোখে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ল। বস্তুত সবাই রুচিকে ওপর থেকে দেখছিল, দেখছিল তার বাইরের রূপ। এ-কাজে সে-কাজে বার বার শিবনাথকে ছুটতে হচ্ছে; পারিজাতের সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে পরামর্শ করতে হচ্ছে; কিন্তু তা হলেও থেকে থেকে এক এক সময় চুপ করে সে স্ত্রীর দৃষ্টি, হাসি, তার কথা বলার প্রত্যেকটি ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হচ্ছিল। কমলাক্ষি গার্লস স্কুলের একটি সেকেণ্ড টিচার উপযুক্ত সময়ে উপযোগী পরিবেশে যে কতখানি বদলে যেতে পারে, তা সে আজ রুচিকে দেখে বুঝল। অথচ আজ সকালেও ওর সঙ্গে শিবনাথের হাল্কামতন ঝগড়া হয়ে গেছে। শিবনাথ অবশ্য ঠাট্টা করে বলেছিল, জাতে স্ত্রীলোক—তাই রুচির মনের ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে গেছে। দীপ্তি নেই, কাজেই স্বামীর কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবার আশঙ্কা নেই নিশ্চিন্ত হবার পর সে কাজ করতে পা বাড়াল। তার কর্মের আদর্শটা নিতান্তই শর্তসাপেক্ষ। এখন সেই ঝগড়ার কথা তার মনে আছে কিনা, পত্রপুষ্পশোভিত প্যাণ্ডেলের একটা কোণায় বসে কাজের স্কীম নিয়ে রুচি আলোচনায় মগ্ন ছিল, একবার ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করতে শিবনাথের ভয়ঙ্কর ইচ্ছা হচ্ছিল। যদিও তার সুযোগ

এবং সময় পেল না শিবনাথ। আমের মুকুলের গন্ধ ও মিষ্টি হাওয়া নিয়ে পারিজাতের লনে ফাল্গুনের সুন্দর অপরাহ্ন শেষ হয়ে যখন সন্ধ্যা নামল, তখন অনুষ্ঠানও শেষ হ'ল।'

তখনও পারিজাত ভীষণ ব্যস্ত। শিবনাথ ব্যস্ত। শশাঙ্ক বাগচী ডক্টর নাগ এঁরা একে একে বিদায় হচ্ছেন। সঙ্গে শিবনাথও রাস্তায় দাঁড় করান তাঁদের এক একটা গাড়ির দরজা পর্যন্ত যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছিল, এখনি সে অবসর হবে, সবাই তো প্রায় বিদায় হলেন, রুচি অবশ্য তখনও খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে সন্তোষ ও সন্তোষের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি পরিচিত মুখ দেখে শিবনাথ চমকে উঠল।

'আপনি ?'

চারু রায় হাসল।

'আমি তো প্রথম থেকেই আছি।' তার হাতে ক্যামেরা। 'ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করেন নি। একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। বোধকরি পারিজাতবাবুর জমিদারী এলাকায় আমার স্থায়ী কর্মকেন্দ্র বলে আমিও এখানকার একজন সেই সুবাদে নিমন্ত্রণ পেলাম। কথার শেষে চারু মেয়েদের মত হাসল। চারুর কথা বলার ভঙ্গিতে শিবনাথ মুগ্ধ হ'ল। গর্বিত ভঙ্গিতে সে প্যাণ্ডেলের দরজায় সন্তোষের বোন, অসিতের বোন এবং আরো দু-একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়ানো রুচির দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে হেসে চারুর দিকে তাকায়। 'কেমন লাগল ?'

'অদ্ভুত। চলুন ওধারে গিয়ে একটু গল্প করি।'

চারু শিবনাথের হাত ধরল।

বস্তুত শিবনাথও পরিচিত, বলতে গেলে বন্ধুস্থানীয় এমন একটি লোককে এতক্ষণ পর পেয়ে হাল্কা নিশ্বাস ফেলল। পারিজাত এবং বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে থেকে তেমন মন খুলে কথা বলতে না পারার দরুণ সে অস্বস্তিবোধ করছিল বৈকি। 'চলুন—ও এখন ফিরবে কিনা কে জানে।' আর একবার রুচির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে শিবনাথ বলল, তার পর আর অপেক্ষা না করে চারুর হাত ধরে রাস্তায় নামল। পারিজাত তখন ডক্টর নাগের সঙ্গে ইলেকশন সম্পর্কে জরুরি কথা বলতে বলতে মন্থরগতি গাড়িটার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে অনেকদূর চলে গেছে। তাতে শিবনাথ একটু অন্যদিকে সরবার সুযোগ পেল। সবচেয়ে বড় কথা এত সব সম্ভ্রান্ত লোকের সামনে সে মোটেই সিগারেট খেতে পারেনি।

'আপনি দেখছি মশাই সর্বঘটেই আছেন।' চারুর প্রসারিত প্যাকেট থেকে একটা সিগরেট তুলে শিবনাথ হাসল।

'ভাল-মন্দ নিয়ে আমার মায়াকানন। আপনাকে অনেকদিন আগেই বলেছি। বস্তিজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতির অন্ধকার যথেষ্ট ঢোকানো হয়েছে বইয়ে। কিন্তু আলোর ইঙ্গিত, সভ্যতা-সংস্কৃতি আশার কোন আভাস যদি পাই, তবে সেই চিত্র কি গ্রহণ করব না ? সেই ছবি তো আজ পেয়ে গেলাম, হা—হা।'

শিবনাথ চারুর লাইটার থেকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে কথাগুলি রীতিমত

উপভোগ করল। 'গুড্। সেই লোভেই বুঝি চুপটি করে লুকিয়ে বসে থেকে এতক্ষণ সব শুনছিলেন?' বলে সে শব্দ করে হাসল।

'ওয়াণ্ডারফুল! কি যেন নাম সেই ছেলেটির। সন্তোষ। সুন্দর বক্তৃতা দিল। কী চমৎকার আইডিয়া! অতটুকুন ছেলে!'

'খুব ভাল লাগল কথাগুলো?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'খুব।'

যেন আর একটা কি প্রশ্ন করবার জন্য শিবনাথের জিহ্বা নড়ে উঠেছিল। কিন্তু নিবৃত্ত হ'ল। মুখের ধোঁয়া বার করে দিয়ে বলল, 'কনস্ট্রাকটিভ কাজের প্ল্যান শুনলেন সন্তোষের। ওর আবার অন্য গুণও আছে। হ্যাঁ, সাহিত্যিক, আর্টিস্ট। সিনেমার জন্যে অলরেডি একখানা বই লিখে ফেলেছে।'

'তাই নাকি?' চারু রীতিমত লাফ দিয়ে উঠল। 'তবে তো ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া দরকার।'

'হবে হবে।'—শিবনাথ হাসি হাসি চেহারা করে বলল, 'ওর সঙ্গে, ওদের সকলের সঙ্গে, আই মিন কৃষ্টি-বাসরের সমস্ত সভ্য-সভ্যার সঙ্গে আমি আপনাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। ভিড়টা কমুক।'

রমেশের তালাবন্ধ চায়ের দোকান ডাইনে রেখে সুপারি ও জলপাইতলার সরু পথ ধরে দু'জনে অগ্রসর হয়।

'আপনার গাড়ি কোথায়?'

'ভিড়ের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। বড় রাস্তায়। চলুন সেদিকে যাচ্ছি।

গাড়িটা ঠিক জায়গায় আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চারু শিবনাথের হাত ধরে আবার হাঁটতে লাগল। 'অনগ্রসর অঞ্চল এটা। এখানে এরা—' শিবনাথ এবার রুচির কথা উল্লেখ করতে ইতস্তত করল না। 'এখানে এরা ক'জন তরুণ-তরুণী শিল্প-সংস্কৃতি এবং সমাজসেবার আদর্শ নিয়ে কাজ করবে শুনে পারিজাত রাজি হ'ল। তৎক্ষণাৎ আমাকেও রিকোয়েস্ট করে পাঠাল রুচি দেবীকে এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি-শিপ নিতে হবে। আমি দেখলাম, ওটা এখন আর নিছক শো না, দেখলাম যে এরকম একটা কিছু হওয়া দরকার। বুঝতেই পারছেন, প্রগ্রেসিভ আউটলুক আছে এমন সব লোক যদি এগিয়ে না যায়—' শিবনাথের কথা থেমে গেল। গল্প করতে করতে ক্যানাল সাউথ রোডের এক জায়গায় এসে দু'জন থমকে দাঁড়ায়।

উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুনের আজ অপরূপ সজ্জা। দরজার দু'দিকে কলাগাছ ও মঙ্গলঘট বসানো, দেবদারুর পাতায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে চৌকাঠ। ঝালর ঝুলছে, নিশান উড়ছে, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেকট্রিক বালবের মালা প'রে পাঁচু ভাদুড়ীর দোকান পথচারীদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'কি ব্যাপার?' শিবনাথ অস্ফুটে বলল।

'দেখতে পাচ্ছেন না?' চারুর চোখে আগে পড়েছে সেলুনের মাথায় দোতালার বারান্দায় ঝোলানো চকচকে নতুন প্রকাণ্ড একটা সাইনবোর্ড। চারু আঙুল তুলে

দেখাতে শিবনাথ ঘাড় তুলল। তারপর শব্দ করে হেসে উঠল। আই সি।'

'ভাদ্দুড়ী তা হ'লে আজই ম্যাসেজ ক্লিনিক স্টার্ট দিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার, আজ দিনটা ভাল। আমি পাঁজি দেখে দিয়েছি। অত্যন্ত অস্‌পিশাস ডে। আসুন আসুন।'

চমকে উঠল শিবনাথ। বিধু মাস্টার দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে ফেলেছে। একটু বিরক্ত হয়ে শিবনাথ হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রে চারুর দিকে তাকাল। বিধু এবার চারু রায়ের হাত ধরল। 'আসুন স্যার। পাঁচু ভায়া একটা নতুন কনসার্ন ওপেন করল, একবারটি এসে দেখুন। আপনাদের কো-অপারেশন সিম্পেথি সে আশা করে বৈকি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে পাঁচু শিবনাথকে ডাকল।

'আসুন স্যার, সিগারেট খেয়ে যান।'

অগত্যা চারুর হাত ধরে শিবনাথ ভিতরে ঢুকল। দু'জনকে দুটো চেয়ারে বসতে দিয়ে বিধু মাস্টার বলল, 'সে কথাই এতক্ষণ পাঁচুকে বলছিলাম। ওদিকে পারিজাত সংস্কৃতি কালচার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক'রে লাফাচ্ছে। কিন্তু আসলে কাজ কতটুকু হচ্ছে বা হবে। আসলে এটা হ'ল, মানে আমি আজকের ফাংশনের কথাই বলছিলাম, পারিজাতের ওটা একটা ইলেক্‌শন-স্টাণ্ট ছাড়া আর কিছু না। কি বলেন আপনি?' বিধু চারুর মুখের দিকে তাকাল। চারু হাসল, কথা বলল না। শিবনাথ গম্ভীর হয়ে থেকে পাঁচুর প্রসারিত হাত থেকে সিগারেট তুলে নিল। সিগারেট ধরানো শেষ করে তেমনি গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা,—যার যেমন চিন্তাধারা। কি আর বলব। আমি তো মনে করি ভাল কাজ সব সময়েই ভাল। ইলেকশনের নামেও যদি কিছু কাজ হয়ে যায় আপত্তি কি।'

যেন বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ল না শিবনাথের কথা শুনে। বিধু মাস্টার চুপ ক'রে দরজার বাইরে তাকায়। এবার পাঁচুর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে পরে শিবনাথ এক চোখ ছোট করে মাস্টারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: 'কানুকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তো ম্যাসেজ ক্লিনিকে?'

বিধু মাস্টার মাথা নাড়ল।

'কানু মানে? আমি মমতা সাধনাকেও ঢুকিয়ে দিলাম।'

হতভম্ব হয়ে শিবনাথ বিধুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'কি, আপনি খুব অবাক হলেন। কেন আপনাকে কি অনেকদিন বলিনি আমার এসব প্রেজুডিস নেই। ডিগনিটি অব্ লেবার কথাটার মূল্য আমি খুব বেশি দিই। হ্যাঁ, সে কথাই এতক্ষণ পাঁচু ভায়াকে বলছিলাম। সংস্কৃতি ওয়েলফেয়ার করে পারিজাতের দল খুব লাফাচ্ছে, কিন্তু রিয়েলি একটা কাজের মত কাজ করল আজ আমাদের ভাদুড়ীই। দু'টো গরিবের ছেলেমেয়েদের প্রভিশনের ব্যবস্থা হয়ে গেল এখানে। ইজ্ দ্যাট নট্ সো?'

'তা মমতা সাধনাকে ম্যাসেজ ক্লিনিকে ঢোকালেন। ওদের মা মানে আপনার স্ত্রী আপত্তি করেন নি তো? তিনি তো আবার—'

'ও, আপনি ওদিকে ব্যস্ত ছিলেন বলে খবর জানেন না, শেষ রাতে ভীষণ পেইন ওঠে সাধনার মা'র। তাড়াতাড়ি পাঁচুর কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে রিকশায় করে সকালে হাসপাতালে রেখে এলাম। এম্বুলেন্স ডাকার সময় ছিল না। আপত্তি? হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে যখন শুনবেন তখন একটু মুখভার—তা আপত্তি আর শোনে কে। বৎসরান্তে একটি নতুন মুখ নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তিনি অনেক ঝগড়াই আমার সঙ্গে করেছেন এ পর্যন্ত। এবার সেরকম কিছু করলে আমি ঠিক মাথা ফাটিয়ে দেব।' দাড়ির জঙ্গলের কাছে ঢাউস মাছিটা উড়ু-উড়ু করছিল। বিধু হাত তুলে সেটাকে তাড়িয়ে দেবার একটুও চেষ্টা করল না। এমন সময়, বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, ওপর থেকে খটখট শব্দ ক'রে একটি লোক নিচে নেমে এল। চারু এবং শিবনাথ কে. গুপ্তকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আজ আর বেশভূষা তেমন নোংরা না। বরং সুন্দর সার্ট গায়ে রংদার লুঙি কে. গুপ্তর পরনে, পায়ে নতুন চটি এবং হাতে বাঁধানো একখানা খাতা। কে. গুপ্তর দাড়িগোঁফ কামানো।

'হ্যালো, কি ব্যাপার।' কে. গুপ্ত চারুকে দেখে সামান্য হাসল। কিন্তু চারু বা শিবনাথের তরফ থেকে তেমন সাড়াশব্দ না পেয়ে সোজা পাঁচুর সামনে চলে গেল এবং খাতা খুলে কি যেন তাকে বোঝালে। পাঁচু মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, আপনাদের বিলিতি অফিসের হিসাব আমাদের দিশি দোকান অফিসের হিসাব সবই একরকম—মূলে সব এক। হা-হা।' কথা শেষ ক'রে পাঁচু হাসল। পাঁচুর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে কে. গুপ্ত চারু বা শিবনাথের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে আবার বাঁ-দিকে বারান্দার ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে খট্‌খট্ ক'রে ওপরে উঠে গেল।

বিধুমাস্টার শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী রকম দুরবস্থায় পড়েছিল লোকটা জানেন তো। তাই বলছিলাম, এই সমাজের জন্য কিছুই করবে না পারিজাত।' হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিধু মুখটাকে বিকৃত করল। 'কেবল কথার ফুলঝুরি। রিয়্যালি যদি কারো হার্ট থেকে থাকে দু'টো লোকের উপকার করার, দু'টো লোককে বাঁচাবার ইচ্ছা যদি কারো থাকে তো এ-তল্লাটে আমি পাঁচু ছাড়া আর কাউকে দেখি না। ড্রিঙ্ক করে ভাদুড়ী হয়ে বাড়ি যায়, কিন্তু তার অন্তঃকরণ যে কত উদার আমি প্রত্যেক স্টেপে তার পরিচয় পাচ্ছি। না খেয়ে লোকটা মরে যাবে দেখে পাঁচু ডেকে কে. গুপ্তকে এখানে প্রভাইড করল। তাছাড়া হিসাবপত্র দেখারও একজন লোক চাই। এবং ক্লিনিক যখন চালু হবে বেবিকেও এখানে নিয়ে আসা হবে। কে. গুপ্তরও তাই ইচ্ছা। পুলিসের হাঙ্গামাটাও তদ্দিনে মিটে যাবে। ক্ষিতীশ রমেশকে খুন করেছে, তার জন্যে তো আর বেবিকে দায়ী করতে পারবে না।'

শিবনাথ বলল, 'কে. গুপ্তর স্ত্রী কি বেবিকে এ কাজে এলাউ করবে?'

'আলবত করবে।' বিধুমাস্টার রীতিমত ধমক দিয়ে উঠল। 'না করলে গুপ্ত স্ত্রীকে বলেছে, সে যেখানে খুশি চলে যাক। ডটারের ওপর ফাদারের রাইট বেশি। গুপ্ত নিজে এই কনসার্নে আছে। এখন এখানে বেবি চাকরি করলে ওকে চোখে চোখে রাখতে পারবে। এবং দুটো পয়সাও উপায় করা হবে, বলছিল কে. গুপ্ত একটু আগে আমাকে। আমি তার স্পিরিটের প্রশংসা করি।'

এমন সময় ওপরে হঠাৎ কে. গ্রুপ্তর গলা শোনা গেল। কবিতা আওড়াচ্ছে বোঝা যায় ঃ

Are women wise ? Not wise, but they be witty,
Are women witty ? Yes, the more the pity ;
They are so witty, and in wit fo wily,
That ye be ne'r so wise, the will beguile ye.

'ভায়ার আমার আজ আনন্দ হয়েছে, কবিতা আবৃত্তি করছে।' বিধুমাস্টার চারুর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'খুব স্বাভাবিক। আমার মনটা আজ সবদিক থেকে ভাল, পাঁচু, হা-হা। ওপেনিং ডে। একটা মাইক্ ফিট্ করলে মন্দ হ'ত না।'

পাঁচু নীরব।

'তা আমি অবশ্য কে. গুপ্তর মত সাহেব মানুষ না। ইংরেজী কবিতা রিসাইট না ক'রে বরং একটা বাংলা ছড়া বলছি, ভারি সুন্দর। কাল রাতে পেইন ওঠার আগে গিন্নী বাচ্চাগুলোকে শেখাচ্ছিল মনে আছে, হা-হা।' ব'লে আনন্দের আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'বাহু শুন্যে নেড়ে বিধুমাস্টার চেঁচিয়ে আরম্ভ করল ঃ

বাঁশবনের কাছে,
ভুঁড়োশিয়ালী নাচে ;
তার গোঁফজোড়াটি পাকা,
মাথায় কনক-চাঁপা !

ছড়া শেষ করে মাস্টার জোরে হাসতে লাগল। পাঁচু হাসল। শিবনাথ হাসে। চারু হাসে কিন্তু শব্দ হয় না।

'আচ্ছা উঠি আমরা এখন।' চারু উঠে দাঁড়াল।

'চলি, দেখা হবে মাঝে মাঝে।' শিবনাথ বিধু এবং পাঁচুর দিকে তাকিয়ে আসল ছেড়ে উঠল।

রাস্তায় নেমে শিবনাথ বলল, 'আপনার মায়াকানন ছবির আরো কিছু মালমশলা পেয়ে গেলেন, হা-হা।'

চারু সেই হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'না মশাই, এসব যথেষ্ট হয়েছে। দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র বেশী দিতে গেলে ছবি অনাবশ্যক দীর্ঘ একঘেয়ে হয়ে পড়বে। লোকের ধৈর্য থাকবে না। তা ছাড়া আজকের ফাংশন বিশেষ করে রুচি দেবীর অমন সুন্দর স্পীচটার জন্যে আমাকে অতিরিক্ত কয়েক শ' ফুট রীল স্পেয়ার করতে হবে।' শিবনাথ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে। অদূরে অনেক লটবহর নিয়ে একটা ঠেলাগাড়ি চলেছে। পিছনে একটা রিক্‌শায় দুটি মেয়ে। শিবনাথ দু'জনের খিলখিল হাসির শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফেরায়। বারো ঘরের বাড়ির প্রীতি-বীথি। চারু রায়কে দেখে না কি তাকে দেখে দু'বোন এমনভাবে হাসছে, ঠিক বুঝতে পারে না।

রিক্‌শাটা একটু দূরে সরে যেতে শিবনাথ চারুর দিকে মুখ ফেরায়। 'চিনতে

পারলেন ?'

'আপনাদের বস্তিতে থাকে, তাই না ?, হ্যাঁ, আমি দেখেছি—তা বাড়ি ছেড়ে দিলে নাকি ?'

'তাই তো দেখতে পাচ্ছি।' শিবনাথ খুক্ ক'রে হাসল। 'বড়টা টেলিফোনে চাকরি করে জানেন বোধ হয়, আর ছোটটা, হাঁ বীথি, যার গলায় রুমাল বাঁধা দেখলেন, ভারী মজার এক চাকরি জুটিয়েছে।'

'কি রকম ?' চারুর খুব যে একটা কৌতূহল হ'ল তা না, তথাপি প্রশ্ন করল, 'কি কাজ ?'

শিবনাথ গলা পরিষ্কার ক'রে সংক্ষেপে বীথির কাজের ধরনটা চারুকে বলল। শুনে চারু রায় চুপ ক'রে রইল।

'নাও ইউ ক্যান ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড মিঃ রায়।' এক গাল হেসে শিবনাথ বোঝায়ঃ 'মানে পাব্লিক ইয়ে আপনি বলতে পারবেন না বীথিকে, প্রাইভেট হয়ে রইলেন আর কি। সাদা কথায় যাকে কেপ্ট্ বলে, মানে ভদ্দরলোকের রক্ষিতার মত থাকবেন আর কি, কি বলেন। ছেলে দেখাশোনা করা না কচুপোড়া। ওটা শো। তত যার বাচ্চার জন্যে চিন্তা ভাবনা সে পাস করা নার্স রাখবে, নয়তো বিয়ে করবে। বীথির মত এমন একটা কাঁচা কচি মেয়েকে অন্তঃপুরে টেনে নেওয়া কেন ?'

চারু এবারও কোন কথা বলল না।

যেন একটু অস্বস্তিবোধ করছিল শিবনাথ।

'দিন মশাই এসব দিন আপনার মায়াকাননে। এখানে বীথি একটা এগ্‌জাম্পল। ইকনমিক ক্রাইসিস গেরস্থ ঘরের মেয়েদের আজ কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে—'

শিবনাথের কথা শেষ হবার আগে চারু মুখ খুলল ঃ 'নাঃ, বলেছি তো আপনাকে এসব চিত্র বেশি দেবার আর আমার ইচ্ছা নেই। এখন ভাল জিনিস, সুন্দর ছবি—' কথার শেষ না ক'রে চারু থামল, কি একটু ভেবে পরে আস্তে প্রশ্ন করল, 'তিনি কোথায়, তিনি কি এই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবেন ?'

'কে ? অ।' মুহূর্তে বুঝতে পারল শিবনাথ। 'রুচির কথা বলছেন ? ঠিক এখুনি কি ফিরবে, মনে তো হয় না। সমিতি নিয়ে সন্তোষের সঙ্গে যেমন আলাপে মেতে গেছেন দেখলাম।'

বড় রাস্তা ছেড়ে দু'জন বাঁ দিকের গলিতে ঢুকল।

শিবনাথ বলল, 'টু স্পীক দি ট্রুথ, বুঝলেন মিঃ রায়, আমি ভাবতে পারিনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের কথা শুনে ও হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কথা বলছি, এমন মেতে উঠবে, কী ইন্টারেস্ট, শুনলেন তো বক্তৃতা, বাবা, এত কথা ওর মধ্যে লুকিয়ে ছিল আমি কোনদিন ধারণা করতে পারিনি।'

'হয়।' চারু বলল, 'এক একটা সময় আসে সুযোগ এসে ধরা দেয় যখন মানুষের ভিতরের ইচ্ছা-শক্তি, হ্যাঁ, প্রতিভাও বলতে পারেন, আপনা থেকে ফুটে ওঠে। আপনার স্ত্রীরও তাই হয়েছে আর কি। সুন্দর তাঁর বলার ভঙ্গি। আমি বলেছি তো আপনাকে। চার্মিং।'

চারুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ বড় রকমের একটা আলো দেখা গেল। দুধারের গাছপালা সাদা হয়ে গেল।

'কে ওরা ?' চারু বিড়বিড় ক'রে উঠল।

'মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী, হ্যাঁ, ওই তো সন্তোষের দল।'

শিবনাথের অনুমান সত্য। এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে বাঁক ঘুরে রুচি, সন্তোষ, জীবন, অসিত, দু'টি মেয়ে এবং আরো দু'একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের পিছনে মদন ঘোষ। হাতে একটা হ্যাজাক্ জ্বলছে।

'কি ব্যাপার ?' শিবনাথ বড় ক'রে হাসল।

'দাদাবাবু দিদিমণিরা ঘুরে ফিরে জায়গাটা দেখছেন।' মদন ঘোষও হাসল। 'অন্ধকার, বাবু আমাকে আলোটা সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন।'

'পারিজাতবাবু কি বাংলোয় ফিরে এসেছেন ? ওঁরা সব চলে গেছেন ?' শিবনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাকে ডেকেছিলেন কি ?'

'না।' মদন ঘোষ মাথা নাড়ল। 'কাল খুব সকালে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। আরো কি কাজের কথা যেন আছে। আজ,—আজ পারিজাত একটু ক্লান্ত, বললেন।'

'না না, আজ আর আমি তাঁকে ডিস্টার্ব করতে চাই না, বিশ্রাম করুন।' শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'টায়ার্ড তো হবেই, এত বড় একটা ফাংশনের ধকল কি আর কম গেছে। কাল আর্লি মর্নিং-এ মানে চা খেয়েই আমি পারিজাতের সঙ্গে দেখা করতে যাব।' কথা শেষ ক'রে শিবনাথ আড়চোখে রুচির দিকে তাকাল। রুচি মুখ ফিরিয়ে সন্তোষের সঙ্গে সমিতির কথা বলছে।

'কাল, কাল আর্লি মর্নিং-এ তোমরা কি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। লাইব্রেরীর চাবি আমি নিয়ে নিয়েছি। আমার ইচ্ছা পুরানো কি কি বই আছে তার একটা লিস্ট তৈরী ক'রে নতুন বইয়ের—তা নতুন লিস্ট অবশ্য আমি স্কুলে বসেই তৈরি ক'রে রাখব।'

'তাই করবেন।' সন্তোষ ঘাড় নাড়ল। 'আপনাকে আর একটা কথা ব'লে রাখছি রুচিদি, আসতে পারব কি পারব না এভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। যেন আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি কাজের কথা বলছেন। হুকুম করবেন, আদেশ করবেন। আর্লি মর্ণিং মানে, রাত দু'টোর সময় দরকার হলে আমাদের ডাকবেন, অবশ্য দু'দিন পরে ডাকাতেই হবে। নার্সিং-এর কাজ আছে, পাড়ার কারো অসুখ হলে হাসপাতালে পাঠাবার প্রশ্ন আছে, তা ছাড়া—'

'এটা আপনি মনে রাখবেন রুচিদি। আপনার হুকুম পেলে আমরা আগুনে ঝাঁপ দেব, পাহাড়ের চূড়ায় উঠব, ঝড়ের মুখে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে যে-কাজটি করবার তা ক'রে শেষ করব। দেবীর আদেশ মনে ক'রে আমাদের তা করতে হবে।'

রুচি সুন্দর ক'রে হাসল। খুব সম্ভব এই ছেলেটিই আর্টিস্ট, শিবনাথ অনুমান করল। লম্বা চুল। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি গায়ে। পরনে ঢিলে স্যালোয়ার।

'তোমার সঙ্গে এদের পরিচয় হয়েছে কি ?' রুচি শিবনাথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'তুমি তখন ডক্টর নাগের সঙ্গে মঞ্জুর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছিলে, পারিজাত আমার সঙ্গে এদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বরং এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।' শিবনাথ হাত দিয়ে চারু রায়কে দেখাল।

রুচি এবার যখন হাসল, সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল। 'নমস্কার, আমি আপনাকে মিটিং-এ লক্ষ্য করেছি। মিঃ গুপ্তর সঙ্গে আপনাকে এপাড়ায় দেখেছি।'

কে. গুপ্তর বন্ধু চারু রায় স্বভাবসুলভ মেয়েলি হাসি হেসে রুচিকে প্রত্যাভিবাদন জানাল।

শিবনাথ সন্তোষদের দিকে তাকিয়ে পরে চারু রায়ের দিকে তাকায়ঃ সাহিত্যিক সন্তোষকুমার, আর্টিস্ট ইনি, ইনিও, তাদের এক গুণী শিল্পী বন্ধু, অসিতকুমার, এর নাম জীবনকুমার। সবাই কৃষ্টি-বাসরের সভ্য। এঁরা এদের বোন,—সভ্যা।'

চারু রায় হাত জোড় করল।

'আর ইনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক চারু রায়।' শিবনাথ জানিয়ে দিল।

শিবনাথের কথা শেষ হ'তে না হ'তে সন্তোষদের মহলে একটা আনন্দগুঞ্জন উঠল। 'ভাল, খুব সুখী হলাম, আপনার মত শিল্পীর আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হবে।' আর একজন বলল,—'এই সমিতির কাজকর্ম নিয়ে ডকুমেণ্টারী ছবি তোলা হবে।' একজন বলল, 'উই আর ভেরি গ্লাড টু মিট্ ইউ। আপনিও আমাদের মধ্যে থাকবেন।'

চারু রায় স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে ছেলেদের অভিনন্দনের উত্তর জানাল।

রুচি বলল, 'এত গুণ আপনার আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি।'

'তুমি কি ভেবেছিলে কে. গুপ্তর সঙ্গে আমার সঙ্গে মুদি দোকানে বসে আড্ডা দেন ব'লে খুব অর্ডিনারী কেউ ?'

শিবনাথের কথাটা মোটাধরনের হ'ল ব'লে রুচি ভিতরে আহত হ'ল। এবং লজ্জিত।

'যাকগে, খুশি হলাম।' বলে সে তৎক্ষণাৎ সুন্দর হাসি দিয়ে মুখের ভাব গোপন করল। 'হ্যাঁ, আপনার কো-অপারেশন চাই।'

'একশ'বার হাজারবার।' চারু রায় দু'বার মাথা নাড়ল।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের একটা পর্যায় শেষ হয়েছে টের পেয়ে ওদিক থেকে সন্তোষের বোন দময়ন্তী চট ক'রে হাতঘড়ি দেখে নিয়ে রুচির দিকে তাকায়।

'চলি বৌদি, রাত হয়েছে। আবার কাল আসব, এসে আপনাকে অত্যাচার করব।'

'হ্যাঁ অনেকদূরে যেতে হবে আমাদের।' আর একটি মেয়ে, সম্ভবত জীবনের বোন হাতঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, 'কোথায় পার্ক স্ট্রীট, কোথায় কুলিয়া-টেংরা। যেতে বেশ রাত হবে—'

বাধা দিয়ে সন্তোষ বলল, 'মোটেই না, কতটুকুন পথ। তা ছাড়া আমরা তো

আর ট্রামে বাসে যাচ্ছি না। ট্যাক্সি ডাকব।'

শিবনাথ বলল, 'এখানে তো ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, একটু এগিয়ে গিয়ে—'

মদন ঘোষ বলল, 'ট্যাক্সির জন্যে আগেই লোক পাঠানো হয়েছে। হয়তো এসে গেছে, চলুন বড় রাস্তায়।'

এবার বিদায়ের পালা।

'আচ্ছা চলি বৌদি!'

'রুচিদি আজকের মত বিদায়।'

'উইশ ইউ হ্যাপি গুড্ নাইট।'

'আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

আলো দেখিয়ে মদন ঘোষ সঙ্গে চলছিল। সন্তোষ বাধা দিলে। 'না সরকার, আমাদের সঙ্গে আর আসতে হবে না। তুমি বরং এঁদের বাড়ি পৌঁছে দাও। রাস্তাটা খারাপ।'

মদন ঘোষ নিবৃত্ত হ'ল। নিবৃত্ত হল কিন্তু অইটুকুন একটা ছেলের মুখে 'তুমি' সম্বোধনটা যেন মদনের ভাল লাগল না। কিছু বলল না যদিও। এক হাতে আলো ঝুলিয়ে আর এক হাতে জামার বোতাম ঠিক করতে করতে হাঁ ক'রে ওদের চলে যাওয়া দেখতে লাগল। হাঁ করে আর একজনও ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। শিবনাথ। ওদের সকলের দিকে না। দেখছিল উগ্র আধুনিক সাজে সজ্জিতা সুশ্রী তন্বী পার্ক স্ট্রীটের তিনটি কুমারীকে। শিবনাথ গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এদিকে রুচি ও চারুর মধ্যে বাক্য-বিনিময় হচ্ছিল।

'আপনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল কথা' নতুন কোনো বইয়ে হাত দিয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করা তো হ'ল না।' কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে রুচি আবার হাসল এবং তার সুন্দর দাঁত ক'টি দেখা গেল।

'হ্যাঁ, অনেকদূর কাজ এগিয়েছে। মায়াকানন।'

'এণ্ড দ্যাট্ উইল বি এ গ্রেট পিক্চার। তোমায় বলিনি রুচি।' শিবনাথ এদিকে ঘাড় ফেরায়। 'মিঃ রায় প্রথম শ্রেণীর একটি চিত্র তৈরি করছেন!'

'ভাল, আমরা দেখব।' রুচি বলল।

চারু রায় কিছু বলল না, চোখ বুজে হাসল। চারু রায় কেন হাসছে বুঝতে পেরে শিবনাথও হাসল। রুচির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, রিলিজড্ হোক, দেখবে,—দেখিয়ে তোমাদের বিস্মিত অভিভূত ক'রে দিতেই তো রায় এমন প্রাণপণে খাটছেন।'

মাথার ওপর গাছের পাতার খসখস শব্দ হয়। মৃদুমন্দ হাওয়া দিয়েছে। আলো হাতে নির্বাক মদন ঘোষ এবার গলার একটু শব্দ করে।

'আচ্ছ—' দু'হাত একত্র ক'রে রুচি বিদায় সম্ভাষণ করতে যাচ্ছিল। শিবনাথ

ব্যস্ত হয়ে চারুর দিকে তাকায়।

'ও কি, মিঃ রায়, আপনি কি এখুনি চললেন ?'

'হ্যাঁ, তা—' ইতস্তত করে চারু রায় কি একটা বললে।

'কেন, রাত এগারোটা বারোটাও তো কোনদিন হয়ে যায় আপনার এ-পাড়ায়। না, তেমন কিছু রাত হয়নি। চলুন হাঁটতে হাঁটতে গল্প করব। আবার না হয় আপনাকে আমি বড় রাস্তায় তুলে দিতে সঙ্গে আসব। চলুন ওদিকে।' শিবনাথ চারুর হাত ধরল। আর এক সেকেন্ড ইতস্তত না ক'রে চারু তাদের সঙ্গে চলল, 'হ্যাঁ, এদিকে তো আর দোকান টোকান নেই,—দেখা যাক আমাদের বনমালীর দোকান খোলা আছে কিনা।'

'সিগারেট ফুরিয়েছে বুঝি ?'

শিবনাথের দিকে না তাকিয়ে চারু মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি সামনের দিকে। মদন ঘোষ আলো দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছে, তার পিছনে রুচি, রুচির পাশে পারিজাতের একটা চাকরের কোলে মঞ্জু। ঘুমিয়ে পড়েছে।

চারু ও শিবনাথ হাত ধরাধরি ক'রে তাদের পিছে পিছে হাঁটে।

এত রাত্রে দোকান খোলা রাখার কারণ শুনে চারু চুপ ক'রে রইল। শিবনাথ বনমালীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আর ক'দিন সবুর কর বনমালী, মাসে আটটা দশটা ক'রে পাড়ায় মিটিং সম্মেলন হবে। তখন আরো বেশি রাত অবধি লোকের আনাগোনা থাকবে, আর তোমার দোকানের সিগারেটটা দেশলাইটা চকোলেটটা কাটবে। এবং তার সঙ্গে কিছু টয়লেট-ফয়লেটও।' কথা শেষ করেও শিবনাথ হাসে।

রুচি আবার বিরক্ত হয়।

এবং দেখা যায় বনমালীও শিবনাথের রসিকতায় যোগ দিচ্ছে না।

'কি, মুখখানা তোমার ভার-ভার দেখছি ?'

'হ্যাঁ মশাই, হাসব আর কি দিয়ে। রকম সকম দেখে ক্রমশই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'আরে খুলেই বল না কি হয়েছে।' এবার চারু রায় প্রশ্ন করল। এক প্যাকেট সিগারেট ও একটা দেশলাইয়ের দাম দিতে চারু একটা নোট বাড়িয়ে দেয়। কথা না বলে বনমালী সেটা ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়।—এমন সময় দেখা যায় বিধু মাস্টারের সেই ইঁচড়ে পাকা ছেলে হুবুলা এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় দাঁত বার ক'রে নিঃশব্দে হাসছে, আর, একবার শিবনাথ একবার চারুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'ভাগ হারামজাদা এখান থেকে।' বনমালী গর্জন ক'রে উঠল ঃ 'রাতে বেরাতে শুয়োরগুলোর ঘুর ঘুর আর কমে না।'

ভয় পেয়ে হুবুলা বাড়ির ভিতর পালিয়ে গেল।

শিবনাথ শব্দ ক'রে হাসল।

মদন ঘোষ আলোটা মাটিতে রাখল। কাল সে এসে বাতিটা নিয়ে যাবে। আজ

থাক। বৌদিমণির অন্ধকারে তালা খুলতে অসুবিধা হবে। পারিজাতের সরকারের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে রুচি ঘাড় কাত করল। মদন চলে গেল।

ঘুমন্ত মঞ্জুকে নিজের কোলে নিয়ে শিবনাথ চাকরটাকেও বিদায় দিলে। 'যা বাবা যা, সারাদিন খেটেছিস। এখন গিয়ে খাওয়া দাওয়া কর, বিশ্রাম কর।'

পারিজাতের চাকরটা সরে যেতে বনমালী খবরটা বলল। হাসপাতালে রুণু মারা গেছে। বিকেলে বাড়িতে সংবাদ এসেছে।

রুচি এবং চারু হঠাৎ কথা বলল না।

শিবনাথ কি প্রশ্ন করতে গিয়ে থামল।

বনমালী বলল, আমিও ছিলাম না পাড়ায়। এই তো একটু আগে দোকান খুললাম। ওই শালা বিধুর মাছি ছেলেটা, কি যেন নাম, হুবুলা এসে আমায় বলে গেল।'

'আমাদেরও সেই খবর দিতে এসেছিল বোধহয় হুবুলা?' রুচি হাসল না। আকাশের দিকে চোখ তুলে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। 'সমিতির নামটা কালই পাল্টাতে হবে।'

'হ্যাঁ, তোমরা তাই করো।' শিবনাথ উৎসাহের সঙ্গে বলল. 'রুণুর নামে সমিতির নামকরণ হচ্ছে তোমরা তো আগেই বলেছিলে। তাই না?'

রুচি কথা বলল না।

'মহিলা খুব কাঁদাকাটা করছেন বুঝি? আমি কে. গুপ্তর ওয়াইফের কথা বলছি।'

শিবনাথের প্রশ্ন সঠিক জবাব দিতে পারল না বনমালী। হুবুলাকে সে অত কথা জিজ্ঞেসা করেনি। তা ছাড়া সে বাইরের লোক। বাড়ির লোক কেউ যখন এ-ব্যাপার নিয়ে ভাবে না তখন সে খামকা কেন—বনমালী তাই চুপ করে আছে।

কিন্তু শিবনাথ বনমালীর চেয়েও চতুর. যেন এটা প্রতিপন্ন করতেই সে চারুর দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল ঃ বাড়ির লোকের আর দোষ কি। ছেলের ফাদার, মানে আমি আপনার ফ্রেন্ড কে. গুপ্তর কথা বলছি, পাঁচুর ম্যাসেজ-ক্লিনিকে দিব্যি চাকরিটি বাগিয়ে কেমন ইংরেজি কবিতা আওড়াচ্ছিল তখন শুনলেন তো। মানে সেখানে আর যাই হোক, ওয়াইন উয়োম্যানের অভাব হবে না—গুপ্ত এটা খুব ভাল বুঝতে পেরেছে। ছেলে মরেছে শুনলেও যে খুব একটা শোক-আফসোস করবে মনে হয় না, হা-হা, আপনি চুপ ক'রে আছেন মিঃ রায়?'

চারু রায় কথা বলল না।

বন্ধু সম্পর্কে শিবনাথের উক্তিগুলি তাঁর মনঃপুত না-ও হ'তে পারে বুঝতে পেরে বুদ্ধিমতী রুচি তাড়াতাড়ি বলল, 'না, আমি মহিলাকেই বেশি দোষ দিচ্ছি, মিঃ রায়, ভীষণ অহংকারী এবং আনসোশ্যাল। তিনি,—তাঁরই তো উচিত ছিল সংসারটাকে সামলানো। ইচ্ছা করলে পারতেন। ভদ্রলোক,—হ্যাঁ, কে. গুপ্তর কথা বলছি, না হয় অবুঝ পাগল মানুষ।'

'বদমায়েস' স্কাউন্ড্রেল!' যেন শিবনাথ ধমক দিয়ে উঠল। 'এত যার মদ মেয়েমানুষের দিকে ঝোঁক, তার পরিবার তার ছেলেমেয়ে সাফার করবে না তো কি। ঠিকই

হয়েছে। অ্যাম আই রং মিঃ রায় ?'

মিঃ রায় এবারও কিছু বলল না।

যেন খাতায় কি একটা হিসাব টুকছিল বনমালী। লেখা শেষ ক'রে যখন মুখ তুলল দেখা গেল তার ঠোঁটের কণায় একটা সূক্ষ্ম হাসি উঁকি দিয়েছে। চারুর দিকে তাকিয়ে অবশ্য সে তৎক্ষণাৎ হাসির ধারটা মজিয়ে নেয়। বরং চেহারাটা একটু গম্ভীর ক'রে আস্তে আস্তে বলল, 'না, কেবল লেখাপড়া শিখলে কি হয়। সাংসারিক জ্ঞান বলতে আমাদের গুপ্ত সাহেবের একেবারে কিছু নেই। মদ মেয়েমানুষে করবে কি, পাঁচু ভাদুড়ীর কি ওদিকে ঝোঁক কম, না টাকাপয়সা কম উপায় করছে। পয়সা, পয়সা রোজগার করা, পয়সা চিনতে পারার চোখ না থাকলে এবাজারে খড়কুটোর মত ভেসে যেতেই হবে।'

'হ্যাঁ, ওদিক থেকে গুপ্ত—' মাথা নেড়ে চারু বনমালীকে সমর্থন করতে যাচ্ছিল, শিবনাথ তাচ্ছিল্যের সুর বার ক'রে হাসল। 'একেবারে হোপ্‌লেস, সাদা কথায় লোকটাকে অপদার্থ বলা চলে।'

বনমালীর ঠোঁটে আবার সূক্ষ্ম হাসি উঁকি দেয়। শিবনাথের দিকে বা চারুর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ ছোট ক'রে সে হাসল কি কাশল বোঝা গেল না, বলল, 'এ বাড়ির সকলকে টেক্কা দিয়েছেন আমাদের এই শিববাবু। এসেই দু'দিনের মধ্যে পারিজাতকে হাত ক'রে ভোটের কাজখানা বাগিয়ে রোজগারের বেশ ভাল রাস্তাটা বেছে নিয়েছেন, হা-হা।'

হাসিটাকে শেষ দিকে উচ্চগ্রামে তুলে নিজের সারল্য প্রতিপন্ন করতে বনমালী চেষ্টা করল বটে, কিন্তু শিবনাথ তাতে সন্তুষ্ট হ'ল না এবং শিবনাথের চেয়েও বেশি ক্ষুব্ধ আহত ক্রুদ্ধ হ'ল রুচি। কিন্তু চেহারায় তার আভাসমাত্র ছিল না। দু'পা অগ্রসর হয়ে রুচি চারুকে বলল, 'সিগারেট কিনতে এসে মুদিদোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করার ফল আপনিই শেষটায় ভুগবেন, মিঃ রায়। বেশ দূরে যেতে হবে। এদিকে আমিও এখন একেবারে ঘরের দরজা থেকে একটু চা না খাইয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারছি না, সুতরাং—?'

চারু এই প্রথম এবাড়ির একটি মেয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হ'ল। চট ক'রে হাত-ঘড়ি দেখল। তারপর প্রফুল্ল হয়ে হেসে ঘাড় কাত ক'রে বলল, 'চলুন। সত্যি আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে! অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে একটু চা-ও খুঁজছিলাম।'

তারা অগ্রসর হয়।

পিছনে শিবনাথ।

বস্তুত যথাসময়ে ধূর্ত মুদীর বিদ্রূপের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে রুচি। চারু রায়কে আজ উপযুক্ত ক্ষণে স্ত্রী বাড়িতে ডাকছে দেখে শিবনাথ উল্লসিত হয়।

ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার সে বনমালীকে দেখল। বাংলা পাঁচের মত মুখখানা ক'রে পেন্সিলটা থুঁতনিতে ঠেকিয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে। 'তুই মুদী, তুই চুপ ক'রে থাক শালা।'

কে. গুপ্তর উক্তিটা শিবনাথের মনে পড়ে। মনে মনে সে হাসে। বনমালীও পারিজাতের দল ছাড়া না। ঈর্ষা। ঈর্ষার বশে চারুর সামনে সে শিবনাথকে এভাবে এখন হুল ফোটাল। কিন্তু তা হলে হবে কি। চারুও পাকা ব্যবসায়ী। ভাল ছবি তুলে নিছক পয়সা উপায় করবে বলে সেও ছুটোছুটি কিছু কম করছে না। নানা কারণে মান অপমানবোধের চামড়াটাকে সে হয়তো শিবনাথের চেয়েও বেশি পুরু ক'রে ফেলেছে। ইলেক্‌শনের কাজ ভাল। কিরণকে ফিল্মে নামাবে ব'লে চারু যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, তাতে তার গলাধাক্কা খাবার ভয় ছিল, মাথা ফাটতে পারত অমলের লাঠির বাড়ি খেয়ে। কিন্তু চারু কিছু গ্রাহ্য করে কি?

এক হাতে চারুর হাত ধরে ও অন্য হাতে পারিজাতের হ্যাজাক্ ঝুলিয়ে লম্বা পা ফেলে শিবনাথ রুচিকে নিয়ে বারো ঘরের উঠোনে ঢুকল। এত বড় আলো দেখে রমেশের কুকুরটা হঠাৎ ভীষণ চীৎকার ক'রে ওঠে, তারপর চেনা লোক দেখে চুপ ক'রে যায়।

সেই রাত্রে চা খেতে খেতে অনেকক্ষণ গল্প করল চারু রুচির সঙ্গে। বস্তুত শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে এমন অনর্গল কথা বলতে পারে তার স্ত্রী শিবনাথের আগে ধারণা ছিল না। সে অবশ্য চুপ ক'রে রইল। আলোচনায় রুচিকেই সবটা অংশ গ্রহণ করতে দিয়ে শিবনাথ বসে বসে চারুর প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে ধ্বংস করতে লাগল। 'আমার এইটেই লাভ মিঃ রায়।' এক একটা সিগারেট ধরায় আর চারুর দিকে তাকিয়ে শিবনাথ হাসে। চারু শুধু স্মিত হেসে আড়চোখে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে এবং তারপর আবার রুচির দিকে চোখ ফেরায়ঃ 'মিটিং-এ আপনার স্পীচ শুনে আমি তখন অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, মিসেস দত্ত। এখন এখানে সামনা-সামনি ব'সে কথা ব'লে, আমার মনে প্রথমেই যে ধারণা জন্মেছিল তা, যাকে বলে ইয়ে, আরো দৃঢ়মূল হল। আপনার চোখ, আপনার হাসি, আপনার কথা বলার মধ্যেই এমন একটা মাধুর্য, কমনীয়তা, শক্তি, সেবা ও কল্যাণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা দেখে মনে হয় সংস্কৃতি মানে কাল্‌চার বলতে আমরা যা বুঝি বা বলি, আপনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তা প্রচুরভাবে বিদ্যমান। বিদ্যমান কথাটা কারেক্ট হ'ল কি মিসেস দত্ত? আমি আবার বাংলা শব্দটব্দগুলো সবসময়—'

একটি মেয়ের মত হাসছিল চারু।

'না না, ঠিক আছে।' রুচিও দু'চোখ আধবোজা ক'রে দুই ঠোঁট ঈষৎ বিস্তৃত করল। 'কিন্তু আপনি ভীষণ বাড়িয়ে বলছেন মিঃ রায়, অতটা প্রশংসা পাবার যুগ্যি সত্যি কি আমি?'

'কেন।' শিবনাথ সোজা হয়ে বসল। তখন সন্তোষের সেই আর্টিস্ট বন্ধু কী বলেছিল। 'দেবীর আদেশে ওরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে—'

'নিশ্চয়ই, কারো কারো চেহারায় এমন একটা আকর্ষণ থাকে, গলার স্বরে এমন একটা কমান্ডিং টোন্ থাকে যে—' চারু পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে রুচিকে দেখল। 'একটুও মিথ্যে বলেনি পার্কস্ট্রীটের ছেলের দল, সেণ্ট পার্সেণ্ট কারেক্ট। আমি তো, আমি—' এবার শিবনাথের দিকে ঘাড় ফেরায় চারু! 'আপনি তো জানেন আমার

পেশা মিঃ দত্ত। আজ অবধি ক'শ নারী-মুখ আমি স্টাডি করেছি বলুন দিকিনি?'
চারু মৃদু হাসছিল।

'ওকে বোঝান।' প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে শিবনাথ বলল, 'চিরকাল ওর মধ্যে ভয়ংকর একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স বাসা বেঁধে আছে। এটা অবশ্য ওর দোষ না। কেবল স্কুলে টিচারি করলে কি আর—'

'না না এখন থাকবে না, এখন যথেষ্ট সোশ্যাল হবার সুযোগ পেয়েছেন মিসেস দত্ত, তাঁর শক্তির তাঁর প্রতিভার ফুল্‌ফ্লেজেড্‌ বিকাশ আমার তো মনে হয় অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে।'

কোন কথা বলল না রুচি। অধোবদন হয়ে নখ দিয়ে বিছানার চাদরটা খুঁটতে লাগল।

তেতাল্লিশ

আর একটা দিন। পরদিন। এ-দিনের ইতিহাস ব'লে বারো ঘরের কাহিনী শেষ করব।

শেষ রাত্রের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হ'ল। প্রথম ফাল্গুনের বৃষ্টি। জোর কম। মাটি ভিজল কি ভিজল না। কিন্তু তা হ'লে হ'বে কি। গাছের পাতার ধুলো ক'মল, বারো ঘরের পিছনের ঘাসবনে সবুজ লাবণ্য জাগল, ঘরের চালের টালিগুলোর লাল রং দেখা দিল। সকালের রৌদ্রে চারদিক ঝিক্‌মিক্‌ করছিল। আর নরম কোমল সুন্দর একটা হাওয়া বইছিল। হলুদের ওপর কালো ফুট্‌কি পরা এতবড় একটা প্রজাপতিকে অনেকক্ষণ উড়তে দেখা গেল উঠোনের ওপর। এবং বলা নেই কওয়া নেই, যা কোনদিনই চোখে পড়ে না, দু'টো সাদা পায়রা, যেন কাদের ঘরের চাল ও উঠোনের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে এই প্রথম এবাড়ির উঠোনে নেমে বারান্দায় উঠে তালাবন্ধ কমলার ঘরের দরজায় কিছুক্ষণ খুঁটে খুঁটে কি খেয়ে পরে শেখর ডাক্তারের তালাবন্ধ দরজার কাছে গেল, তারপর বীথিদের ঘরের সামনে, সেখানে কিছু না পেয়ে কিরণের দরজায়, তারপর আবার একটু এগোয়, কিন্তু তারপর আর যেতে সাহস পায় না। মল্লিকার তালাবন্ধ দরজাটা আগলে ব'সে আছে রমেশের 'ভোম্বল' সর্দার। পায়রা দুটো বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে এবং সেখান থেকে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে রুচির ঘরের চালের ওপর বসে। তারপর আর তাদের দেখা যায় না।

এই মনোরম সকালটা রুচির খুব ভাল কেটেছে। সন্তোষ ও তার বন্ধুরা এসেছিল। শিবনাথ সব সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি যদিও। দু'বার দু'টো কাজে পারিজাতের কাছে তাকে ছুটে যেতে হয়েছে। শেষবার সে যখন ফিরে এল, সন্তোষের দল চলে গেছে। সমিতির বিষয় নিয়ে রুচি একদিকে ওদের সঙ্গে কথা কলেছে, আর একদিকে রান্না নামিয়েছে। সন্তোষ নাকি রুচির মসুর ডালের কড়ায়ে কাঁটা দিতে এগিয়ে এসেছিল। 'আপনাকে একটু হেল্প্‌ করছি, রুচিদি।' হেসে, রুচি সন্তোষকে নিবৃত্ত করেছে। এঁটো বাসন ছুঁতে দেয়নি।

'এমন বড়লোকের ছেলে, কিন্তু অহংকার নেই। এত মিশুক!'

'না হলে সমিতি করবে কি ক'রে।' শিবনাথ রুচির কথার জবাব দিয়েছে হেসে।

রুচি আর অবশ্য কিছু বলতে পারল না। কথায় কথায় বেলা হয়ে গেছে বলে চট ক'রে খেয়ে মঞ্জুকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

রুচি ওরা চলে যাবার পর বাড়িটা যেন আরো বেশি খালি খালি ঠেকছিল। তা বাড়িতে আর তেমন লোকজনই বা তখন কই। পাঁচু দোকানে গেছে। মাস্টারের বড় ছেলে ও মেয়ে দু'টো গেছে পাঁচুর দোকানে। মাস্টার হয়তো ম্যাসেজ ক্লিনিক স্টার্ট করা হয়েছে দেখে আজ আর কামাই না করে নিশ্চিন্ত মনে স্কুলে পড়াতে গেছে। ওদিকে প্রমথর বাবা বেরিয়েছে কাজে। বলাই নেই। ময়না স্কুলে গেছে রুচির সঙ্গে। আর কে? বিমলের শুধুই 'ছোট' না, গায়ে মুখে 'বড়গুটি'ও দেখা গেছে। কাল তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। হিরণ ঘরে একলা থাকবে বলে খিদিরপুর পিসতুতো ভায়ের কাছে গেছে। থাকবে সেখানে কিছুদিন। আর কে? কিরণ নেই, বীথিরা চলে গেছে। রমেশ মৃত। ছেলেমেয়ে নিয়ে মল্লিকা স্থানান্তরিত। ক্ষিতীশ হাজতে। ওঘরে আছে প্রমথর দিদিমা। কাল থেকে বুড়ীরও জবাব বন্ধ হয়ে গেছে। নিউমোনিয়ার লক্ষণ। প্রমথর মা বুড়ীকে নিয়ে আর পারছে না। একলা কত খাটুনি গায়ে সয়, কাল থেকে সে-ও জ্বরে পড়েছে। উঠোনটা একেবারে ফাঁকা। এক ফালি কাপড় পর্যন্ত চোখে পড়ে না বাইরে দড়িতে কেউ শুকোতে দিয়েছে। লোকজন কমে গেছে বলে বাকি মানুষেরা এখন ঘরেই ভেজা শাড়ি কাপড় সায়া ঘুঙি বেড়ার গায়ে শুকোতে দেয়।

ফাঁকা উঠোন বলে এঘর থেকে ওঘরের চৌকাঠ দেখা যায়। শিবনাথের ঘরের ভিতর থেকে ওধারে প্রায় সবগুলো ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছিল। ঘুমোয়নি সে। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করছিল। একটা সিগারেট শেষ ক'রে আর একটা ধরায়। এখনি তাকে আবার কাজে বেরোতে হবে। পারিজাতের দল ভারী করতে আজ থেকেই সে লেগে গেছে। এখন বেরিয়ে কমসে কম আট জায়গায় তাকে যেতে হবে। আটটা ঠিকানা দিয়েছে পারিজাত। অবশ্য, শিবনাথ যদি পেরে না ওঠে, টায়ার্ড ফীল করে, তবে অন্তত পাঁচ জায়গায় দেখা করে বাকি তিন জায়গা কালকের জন্যে ফেলে রাখার স্বাধীনতা না পেলে এ-কাজে সে লাগত না। ভাবছিল শিবনাথ। প্রায় তন্দ্রা এসেছিল তার। হঠাৎ রমেশের কুকুরটা তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল। যেন অপরিচিত লোক দেখেছে। অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে। একটু চমকে উঠে শিবনাথ তাড়াতাড়ি দরজায় উঁকি দেয়। উঁকি দিয়ে দেখতে পায় কে. গুপ্তর ঘরের সামনে বিধুর ছেলে হাবুলা দাঁড়িয়ে। রমেশের কুকুরটাও সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

শিবনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। শিবনাথকে দেখে হাবুলা বত্রিশটা দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসে ও হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে। যেন শিবনাথ তার সমবয়সী। ছেলেটার পাকামি দেখে তার খুব রাগ হয়। কিন্তু কুকুরটা পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করছে। কেমন একটু সন্দেহ হল

শিবনাথের। আস্তে আস্তে সে দু'পা অগ্রসর হয়। দরজার একটা পাল্লা খোলা। সকাল থেকে দরজাটা বন্ধ ছিল। যেন বাতাসে এখন খুলে গেছে। শিবনাথ কাছে যেতে হুবুলা আঙুল দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখিয়ে দেয়।

'তুই কখন দেখলি? ফিস্‌ফিসে গলায় শিবনাথ প্রশ্ন করে। 'ঘরে ঢুকেছিলি নাকি?'

মাতব্বরের মত মাথা নাড়ে হুবুলা।

'ভোম্বলের চিৎকার শুনে তো আমি এই মাত্তর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ছোট ভাইটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। দিদিরা কাজে বিরিয়েছে, মা গেছে হাসপাতালে।'

'তা জানি। তোর আর একটা ভাই হবে।' সংক্ষেপে হুবুলার কথার উত্তর দিয়ে শিবনাথ আবার কে· গুপ্তর ঘরের ভিতরে তাকায়। হুবুলাও কথা বন্ধ ক'রে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। যেন বাড়ির দু দু'টো লোক জিনিসটা লক্ষ্য করছে বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে ভোম্বল একটু সময়ের জন্য চুপ করে।

কেরোসিন কাঠের বাক্স দু'টো ঘরের মেঝেয় চিত হয়ে পড়ে আছে। দু'টো বাক্সের ওপর উঠে বেবির মা কড়িকাঠ নাগাল পেয়েছিল অনুমান করতে শিবনাথের কষ্ট হ'ল না। কিন্তু ওটা কি? যেন একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে ওধারে।

ঘাড় ফিরিয়ে বাকি ঘরগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে শিবনাথ মুখ নিচু করে হুবুলার কানে কানে বলল, 'তুই ভিতরে ঢুকে ওই কাগজটা নিয়ে আয়। ভয় করে?'

মাতব্বর হুবুলা মাথা নেড়ে ফিক্ করে হাসল। 'না ভয়ের কি। সেবার প্রমথদের বিধবা শৈল মাসি এমনি ফাঁস লাগিয়ে মরল। গত ভাদ্দর মাসে ছ'নম্বর বস্তির যমুনা ফাঁস লাগিয়ে মরল। যমুনার পেট হয়েছিল, হি-হি।'

'তা হোকগে। তুই গিয়ে কাগজটা নিয়ে আয়।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে হুবুলা সরাসরি ঘরে ঢুকে মেঝে থেকে ভাঁজ করা কাগজটা কুড়িয়ে এনে শিবনাথের হাতে দেয়। সুন্দর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর সুপ্রভার: বেবির জন্য দুঃখ করি না। হয়তো ওর মধ্যে পাপ ছিল। আমার রুণুর কোনো দোষ ছিল না। পারিজাত ওকে গাড়ি চাপা দিয়ে ওকে জন্মের মত পঙ্গু করে দিলে অথচ তার কোনো প্রতিকার হ'ল না? এমনকি ঘটনাটা যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টার ত্রুটি দেখছি না। গুরুদেব, জানি না আপনি আমাকে এখন কি করতে উপদেশ দেবেন। আমার নিজের কোনো হাত-পা নেই। আপনার উপদেশ ছাড়া আমি এক পা-ও নড়তে পারি না। রুণু ক্যাম্বেল হাসপাতালে আছে। ওকে একদিন গিয়ে দেখুন আর আপনার পাদোদক খাইয়ে আসুন। যাতে তাড়াতাড়ি ও ভাল হয়ে ওঠে। ইতি—সুপ্রভা।

শিবনাথ চিঠিটা ভাঁজ করে তাড়াতাড়ি হাতের মুঠোয় লুকোল। সন্দিগ্ধ চোখে হুবুলার চেহারা দেখতে চোখ ফেরাতে দেখে সে আবার গিয়ে কে· গুপ্তর ঘরে ঢুকছে। সুপ্রভার কোমর বেয়ে আঁচলটা নিচে সিমেন্টের ওপর লুটোচ্ছিল। যেন আবার কিছু একটা আবিষ্কার করছে হুবুলা। হামাগুড়ি দিয়ে সেই লুটানো

আঁচলের গিঁঠ, এমনি পারছে না, বড় বড় দাঁত দিয়ে খুলে কি একটা উদ্ধার ক'রে বাইরে চলে এল।

একটা ঘষা দু' আনি।

'নে তুই রেখে দে।' শিবনাথ অভয়বাণী দিয়ে বলল, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে আয়, তোকে আমি আর একটা দু'আনি দেব।'

শিবনাথ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গায়ের জামা জুতো ও দরজার চাবি নিয়ে বেরিয়ে এল।

'চিঠি পাওয়া গেছে কাউকে বলিস না। নে ধর্।'

আরো একটা দু' আনি হাতে পেয়ে হুবুলার চোখ দুটো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছিল।

'না আমার কোন্ গরজ। আমি শালা গলায় দড়ি মামলায় নাক ঢোকাতে যাই কেন। বাবাকেও বলছি না। ওই পয়সা দিয়ে স্রেফ ডবল ডিমের মামলেট খেয়ে আসব রাসমণির বাজারে রাধুর রেস্টুরেণ্টে।'

'তাই খাস্।'

শিবনাথ স্বল্প হেসে হুবুলার থুতনি ধরে একটু আদর করে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিবনাথ প্রথমে পারিজাতের কুঠিতে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারে পারিজাত আরামবাগ চলে গেছে। ফিরতে রাত হবে। অগত্যা শিবনাথ কাজে বেরোয়। একটা অস্থিরতা দুশ্চিন্তা নিয়ে সে ছুটোছুটি করল, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল, কথা বলল আর হাজারবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করল গুরুদেবের কাছে লেখা সুপ্রভার চিঠিটা ঠিক আছে কিনা। রুণু মারা যাবার আগে এই চিঠি লেখা হয়েছিল বোঝা যায়, কিন্তু সেটা আর ডাকে ফেলা হয়নি, তার আগেই—

সারাদিন শিবনাথ এই চিঠি, সুপ্রভার আত্মহত্যা, পুলিশ, রুণুর গাড়ি চাপা-পড়া, পারিজাত, ময়না, রুচি, সমিতি, ইলেক্‌শনের কাজ ইত্যাদি হাজার কথা চিন্তা করতে করতে যখন রিক্সায় চড়ে ক্যানেল সাউথ রোডে ফিরে এল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

প্রায় সব ক'টা দোকানের আলো নিভে গেছে।

পাঁচুর সেলুন কাম্ ম্যাসেজ ক্লিনিকটার ওপরের ঘরে একটিমাত্র আলো জ্বলছে; তাও টিম্ টিম্ করে। সবুজ হয়ে গেছে পর্দা খাটানো তেল মালিশের ঘরটা।

সেটাকে বাঁদিকে ফেলে শিবনাথের রিক্সা সুপুরি গাছ ও জলপাই গাছের তলা দিয়ে মাঠ পার হয়ে সোজা পারিজাতের কুঠির দিকে ছুটল।

আগে সেখানে, তারপর বাড়ি। শিবনাথ মনে মনে বলল। এবং রিক্সাওয়ালাকে সেইভাবে রাস্তার বাঁক ঘুরতে বলল।

কিন্তু পারিজাতের কামরায় ঢুকে শিবনাথ খুব উৎসাহবোধ করল না।

সেখানে শশাঙ্ক বাগচী উপস্থিত। সামনে টেবিলে মদের বোতল। গ্লাস ভর্তি মদ। এবং আনুষঙ্গিক প্লেট ডিশ।

শিবনাথকে দেখে পারিজাত মুখ থেকে শূন্য গ্লাস নামাল।

'এই যে প্রিন্স, খবর কি ?'

অবশ্য পারিজাতের লাল চোখ দেখেই শিবনাথ এই সম্বোধন শুনে ততটা কাতর হল না।

অল্প হেসে ঘাড় কাত ক'রে বলল, 'ওঁদের সকলের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। আমি বলে এসেছি স্যার।'

শশাঙ্ক বাগচী মদে ফোলা লাল লাল চোখ তুলে শিবনাথকে দেখল এবং হাত বাড়িয়ে একটা ভাজা গলদা চিংড়ি তুলে বেশ রকমের কামড় বসাল।

যেন একটা প্রাইভেট কথা আছে হঠাৎ মুখটা পারিজাতের কানের কাছে নামিয়ে শিবনাথ পকেটের সেই চিঠিটা বার করল। কাগজের ভাঁজ খুলে পারিজাতির চোখের সামনে মেলে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের পাশাপাশি ঘর, দেখুন চিঠিটা উড়ে এসে আমার চৌকাঠের কাছে পড়েছিল। কী সাংঘাতিক জিনিস রেখে গেছে কে. গুপ্তর ওয়াইফ! এটা হাতে পড়লে পুলিশ—'

'আমায় বাঁধত, তাই বলতে চান তো ?' পারিজাত কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে দু'-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। যত বাজে চিন্তা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামান। সেই কখন পুলিশ এসে ডেড্ বডি নামিয়ে নিয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা হিসাবে ওরা আমার একটা স্টেটমেণ্ট নিয়ে গেল। বললাম ঃ 'পুয়র, একবেলা খেতো তো আর একবেলা জুটত না। হাজব্যাণ্ড আন্এম্প্লয়েড। বাস্, চুকে গেল। ছোট দারোগা আমায় নিজের মুখে বলে গেল ঃ হামেসা এইরকম কেস্ তারা পাচ্ছে। ও এখন জলভাতের সামিল হয়ে গেছে। কেমন হ'ল তো ?'

শিবনাথ ঘাড় কাত করল।

'তোমার কর্মচারী বুঝি ?'

লাল চোখ তুলে শশাঙ্ক পারিজাতের দিকে তাকাল। পারিজাত মাথা নাড়ল।

'ওসব ভাবনা ভেবে আমার বিপদ হবে ভেবে মিছিমিছি আপনারা ব্যস্ত না হলেই আমি সুখী হব। বলুন, আর কি কাজের কথা আছে।'

শিবনাথ কথা বলল না।

পারিজাত এবার এক চুমুকে প্রায় অর্ধেকটা গ্লাস সাবাড় করল। যখন মুখ সোজা করল, দেখা গেল রক্তাক্ত চোখ দু'টো হঠাৎ হাসছে। চেহারায় এক ফোঁটা গাম্ভীর্য নেই।

'বাই বাই, আপনাকে দেখেই মশাই আর একটা চিঠির কথা মনে পড়ল, হা-হা।' ড্রয়ার টেনে পারিজাত একটা নীল্চে রঙের সুদৃশ্য খাম বার করল। 'হুঁ, অবনী মুখজ্যের বড়লোক মেয়ে, যিনি এখন মন্টু ব্যানার্জীকে নিয়ে রাত কাটাচ্ছেন, দ্যাট্ ডটার অফ এ বীচ্, দীপ্তির কাছে একটা চিঠি দিচ্ছি। হ্যাঁ, যাবার সময় আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে ও। এটা তার উত্তর। দেখুন না পড়ে কি লিখেছি। পড়ুন।'

খোলা খাম থেকে চিঠি বার ক'রে পারিজাত শিবনাথের দিকে বাড়িয়ে দেয়। শিবনাথ কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। চিঠিটা ছুঁতে সাহস পায় না। জড়সড় হয়ে টেবিলের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওধারে শশাঙ্ক বাগচী একটা ঢেকুর তুলে আবার বড় বড় চোখে শিবনাথের দিকে তাকায়। কথা বলে না।

'আরে মশাই, আপনিও দেখছি একটা নাম্বার ওয়ান ইডিয়েট। চিঠিটা পড়তে দোষ কি, আমিই তো পড়তে দিচ্ছি।' পারিজাত বিরক্ত হয়ে শিবনাথকে ধমক লাগায়। অগত্যা শিবনাথ চিঠি হাতে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলোয়। দাগ দেওয়া অংশটা দু'বার পড়ল। সেখানে রুচির উল্লেখ আছে।

পড়া শেষ করে শিবনাথ চিঠি ফিরিয়ে দেয়।

পারিজাতের লাল চোখ আবার হাসিতে টলটল করছিল। আপনি কিন্তু আবার মশাই রাগ করবেন না। আসলে আপনার ওয়াইফের সঙ্গে কাল দু'টো এবং আজ সকালে একটির বেশি কথা আমি বলিনি। ওই চিঠিতেই কেবল এসব লেখা হয়েছে। হা-হা। দ্যাট্ লাটসাহেব অবনী মুখুজ্যের বখাটে মেয়ে স্টুপিড দীপ্তিকে শুধু জানিয়ে রাখলাম মণ্টু ব্যারিস্টারকে নিয়ে তুমি সুখে আছ, আমিও এখানে কিছু দুঃখে নেই! বরং ভালই আছি। স্কুল টিচার বস্তিতে থাকে বটে কিন্তু মেয়েটি দেখতে ভাল, বুদ্ধিমতী। আমি তার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছি। হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, আমি সাম্যবাদী হওয়াই পছন্দ করি। হি-হি, কেমন, দ্যাট্ বীচ্ একটু জ্বলেপুড়ে মরুক এ চিঠি পেয়ে, আমার খসড়া খারাপ?'

পারিজাতের হাত কাঁপছিল ব'লে গ্লাস থেকে কিছুটা পানীয় টেবিলে ছিটকে পড়ল।

'তাকে আমি সমিতির সেক্রেটারী করেছি আমার সিঁড়ি বারান্দা বাগান প্রত্যেক দিন ছ'সাত ঘণ্টা আলো করে রাখবে বলে,—খারাপ?'

'এই পারিজাত!' মোটা খসখসে গলায় শশাঙ্ক বাগচী পারিজাতকে সাবধান ক'রে দেয়। 'ইনি তোমার কর্মচারী। তোমাদের পারিবারিক জীবনের এসব দুর্ঘটনা এঁর কাছে এ-ভাবে বলা ঠিক না। আপনি তা' হলে এখন চলে যান। কাল সকালে একবারটি আসুন।'

শিবনাথ এতক্ষণ পর লজ্জা পেল।

তার আগেই উচিত ছিল দীপ্তির নাম লেখা সবুজ খামটা দেখেই সেখান থেকে সরে পড়া। সেটাই ভাল হ'ত। পিছনের দেয়ালে ঘড়িতে দেখলো বারোটা বাজে।

'আমি আজ চলি।' শিবনাথ হাত দু'টো একত্র ক'রে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বিদায় নিতে চেয়েছিল। পারিজাত অট্টহাস্যে টেবিল গ্লাস কাঁপিয়ে শিবনাথের আস্তিন চেপে ধরল। 'এই যা! তুমি একেবারে ভদ্রলোককে না চিনেই এসব ওপিনিয়ন ঝাড়ছ। তুমি চেন ইনি কে? শিক্ষিত উদারমন বাংলাদেশের যুবক যদি দেখতে চাও তো এঁদের দ্যাখো। এঁদের দিকে তাকাও। গ্রাজুয়েট ভদ্র বংশের ছেলে, চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য ভাল। অথচ কী সেক্রিফাইস! হ্যাঁ, ফ্যামিলীর জন্যে। তিনি জানেন তাঁর স্ত্রীকে প্রতিদিন ট্রামবাসে চেপে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। সহস্র পুরুষ তাকে স্পর্শ

করে, সহস্র কামুক তাকে দেখে! কিন্তু জিজ্ঞেস করো হি বিয়িং হার হাজবেন্ড, একদিন, ভ্রমেও তিনি স্ত্রীকে সন্দেহ করেছেন কিনা। করেন না। কেননা তিনি পরিপূর্ণভাবে স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন। তেমনি তাঁর স্ত্রী করেন তাঁকে। চাকরি নেই ভদ্রলোকের। উপায় ক'রে যা পারছেন স্ত্রী টেনে টেনে আনছেন আর স্বামীকে খাওয়াচ্ছেন। এর জন্যে গ্রাম্বল করে না, অভিমান নেই। কেননা তিনি মানে তাঁর স্ত্রী জানেন বেকার থাকাটা আজ সমাজের ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর স্বামীর দোষ না। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি আছে বলেই তাঁদের জীবনে সন্দেহ ঈর্ষা রাইভেলরি, তোমাদের বড়লোকদের সমাজে বা কথায় কথায় উঁকি দেয় তা এদের মধ্যে এসে সুবিধে করতে পারে না। বুঝলে বাগচী? দ্যাট্ ফিলিং-এর অভাবে পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে আজ এই ভঙ্গুরতা, এত হাহাকার।'

'হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম, এঁকে ছেড়ে দাও, কাজের কথা কাল সকালে বললে ভাল হবে। আজ রাত হয়ে গেছে।'

যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়েই শশাঙ্ক বাগচী ভুরু কুঁচকোয়। অত্যধিক মদ খেয়েও ইনি পারিজাতের চেয়ে ঢের বেশি সুস্থ আছেন দেখে শিবনাথ একটু স্বস্তিবোধ করে।

'চিঠিতে তাঁর স্ত্রীর কথা একটু রেফার করেছি বলেই যে বাড়ি গিয়ে তিনি ওয়াইফকে মারধর করবেন এতটা ছুঁচিবাই এঁদের নেই। উপমা হিসেবে রুচি দেবীর কথা টেনে এনে দ্যাট বীচ দীপ্তিকে আমি ঘায়েল করতে চাইছি. হা-হা, কি বলেন শিবনাথবাবু। ডু ইউ মাইন্ড?' পারিজাত একটু নরম গলায় কথা বলল।

শিবনাথ মেঝের দিকে চোখ রেখে আস্তে মাথা নাড়ে।

'বুঝেলে বাগচী, লোয়ার মিডল ক্লাশ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটা জিনিস আমাকে মুগ্ধ করে। টলারেশন। আর এর জন্যে ওদের কনজুগ্যাল লাইভ চিরকাল হ্যাপি থেকে যায়। ক্লেদ জমতে পারে না,—কামড়াকামড়ি নেই, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।'

পারিজাতের কথা শেষ হ'তে শিবনাথ মুখ তুলল।

'আজ আমি চলি, স্যার।'

'দাঁড়ান মশাই, সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু সকালে আমি থাকছি না।' পারিজাত হাই তুলল। 'ওদিকটা তো শেষ হয়ে গেছে, সকলের সঙ্গে দেখা করেছেন, বাস, সারা গেছে। মোস্ট্ ইম্পর্টেন্ট এরিয়া ধাপার বাজার। ঐ এলাকাটা যে ক'রে হোক আপনাকে হাত করতেই হবে। কাল ওখানে যান।'

'আপনি মনে রাখবেন পারিজাতের সাক্‌সেস ওই বাজারটার ওপর নির্ভর করছে।' শশাঙ্ক বাগচী তার হাতের সাদা মোটা আঙুল তুলে শিবনাথকে বোঝায়। 'প্রত্যেকটা আড়তদার দোকানদার ওখানকার বস্তির লোকগুলোকে যেভাবে হোক আমাদের হাত করতেই হবে। হ্যাঁ, যদি দরকার হয়, দরকার হবেই, টাকা না খেয়ে কোন শালা ভোট দিতে আসে না এখন। দশ বিশ পঞ্চাশ যে যা চায় দিয়ে দিন। তুমি এখনি বরং এঁকে একটা চেক্ দিয়ে দাও, পারিজাত।'

হাত থেকে গ্লাস নামিয়ে পারিজাত চিৎকার করে ডাকল, 'সরকার, সরকার।'

মদন ঘোষ এক কামরায় ঢুকতে পারিজাত বলল, 'একটা চেক্ বই বার করে দাও। ওই ড্রয়ারে আছে,—এই যে চাবি।'

মদন চেক্ বই বার করে নিয়ে এল।

শিবনাথের বুকের ভিতর দুরদুর করছিল।

লেখা শেষ করে চেক্‌টা শিবনাথের হাতে দিয়ে পারিজাত বলল, 'চলে যান কাল আর্লি আওয়ারে ব্যাঙ্কে। ওটা ভাঙিয়ে নিন।'

রুদ্ধশ্বাসে ত্রস্ত আঙুলে কাগজটা ভাঁজ ক'রে শিবনাথ পকেটে পুরল। একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'টাকা দিয়ে কি ওদের কাছ থেকে রসিদ লিখিয়ে আনতে হবে?'

শশাঙ্ক বাগচী বড় করে হাসল।

'রসিদ ওরা কেউ আপনাকে দেবে না মশাই। আমাদের দলে টানতে ঘুষ হিসাবে আপনি ওদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।'

'সবটা না লাগলে বাকি টাকাটা কি কালই আপনাকে এনে ফিরিয়ে দেব? এখানে জমা দেব?' শিবনাথ পারিজাতের দিকে তাকায়।

'লাগবে লাগবে।' মোটা খসখসে গলায় শশাঙ্ক বাগচী বলল, 'আরো লাগতে পারে। কাল আবার দরকার হলে পারিজাতের কাছ থেকে এসে চেক্ লিখিয়ে নিয়ে যাবেন।'

'বেশতো, দুহাজার টাকা এখন দিচ্ছি। যদি কিছু এর থেকে বাঁচে, মানে আপনি হাতে রাখতে পারেন, বৌদিকে হ্যাঁ, আপনার ওয়াইফ রুচিদেবীকে দিন না কাল বেশ ভাল একখানা কি দু'খানা মুর্শিদাবাদী কিনে; এখানে কিছু এনে জমা দিতে হবে না।'

পারিজাত বোতল উপুড় করে গ্লাসে ঢালল।

'দ্যাটস্ গুড্।' শশাঙ্কও মাথা নাড়ল। 'মোটের ওপর আমাদের কাজ হাসিল করা চাই। কত টাকা বাঁচল, কত আরো বেশি লাগল অত এখন হিসাব করার সময় নেই, বুঝেছেন?'

শিবনাথ ঘাড় কাত করল।

'আচ্ছা, চলি স্যার।' দু'জনকেই সে নমস্কার জানাতে চাইছিল। শশাঙ্ক বাধা দিল।

'হ্যাঁ, কালকে আমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। মিটিং-এ। এ চার্মিং লেডী।' শশাঙ্ক বাগচী শিবনাথের চোখে চোখে তাকিয়ে এই প্রথম হাসল। 'আমার তো মনে হ'ল খুব অ্যাক্টিভ গার্ল। সুযোগ পাচ্ছিল না একটু সোশ্যাল হবার, সুযোগ না পেয়ে এদেশের অনেক মেয়ের প্রতিভার অপচয় ঘটছে। যাকে আমি ক্রাইম বলি। আমরা যে এখনো কনজার্ভেটিভ আছি বা মেয়েদের সম্পর্কে উদাসীন তা না, বরং একটা গোপন ঈর্ষা জাগছে, হ্যাঁ, আমাদের পুরুষদের মনে। প্রথম ধাক্কায় এটা হবেই, সকলেরই হয়েছিল। কিন্তু আমি বলি লাভ নেই ওদের আটকে রেখে। কেবল সমাজহিতকর কাজ কেন, যদি রাজ্য চালাতে পারে পুরুষদের সাহায্য না নিয়ে তো ওটা তাদের হাতেই এখন ছেড়ে দিতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন। এরাই তো সৃষ্টির, সৃষ্ট

সৃষ্টিরই আদিমূলে। এদের স্বাধীনতা আগে দিতে হবে। আসছে হিন্দুকোড্ বিল, আপনাদের পুরুষদের আচ্ছা করে বংশদণ্ডটি দেবে, তখন বুঝবেন মেয়েদের কেবল চাকরি বাকরি করার যৎসামান্য স্বাধীনতা দিয়ে আর তাদের ওপর ছেলেমেয়ে গর্ভে ধরানো, মানুষ করানোর দায়িত্ব, রান্নাবান্না মিলিয়ে হাজারটা ঘরের কাজের বোঝা চাপিয়ে আপনাদের সভা-সমিতি, সাহিত্য-ইলেক্শন-এসেম্বলী করা। অন্যসব যথেচ্ছাচারিতার কথা চেপেই গেলাম।'

'না, আমিও আপনাকে সাপোর্ট করছি, স্যার।' নম্র হেসে শিবনাথ বাগচীর কথার উত্তর দিল।

'না, উনি পারবেন। শশাঙ্ক দেয়ালের দিকে চোখ রেখে গ্লাসে চুমুক দিয়ে গদগদ গলায় বলল, 'ভারি মিষ্টি মেয়ে, চমৎকার লেডী। ইয়েস সী ক্যান ওয়েল ম্যানেজ অ্যান অর্গেনাইজেশান। আপনি দেখবেন আপনাকে তাক্ করে দেবে। আই লাইক দ্যাট্ টাইপ অব উয়োম্যান।'

'আপনি এখন যান।'

পারিজাত গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। মাছ-মাংস-ডিম-ফল সব ছেড়ে দিয়ে একটা নির্জলা আলুসেদ্ধ তুলে ছোট্ট একটা কামড় বসিয়ে বলল, 'কাল খাপার বাজার আবার ভুলে যাবেন না যেন, আপনার চেহারা দেখলে তো মনে হয় সকালে চা খেতে বসে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে পারলে জীবনে কিছু চাইবেন না।'

শিবনাথকে সলজ্জ হেসে উত্তর দিতে হ'ল, 'না না—কাজের সময় মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্পটল্প করা আমি ঘৃণা করি, স্যার।'

'যাকগে, বাজে কথা।' শশাঙ্ক বাগচী দেয়াল থেকে চোখ ফেরায়। 'আপনার কি ঐ একটি ইস্যু?'

শিবনাথ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

পারিজাত বলল, 'না না, এদিক থেকে তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুখী। পাঁচটা বাচ্চা দেবার পর দীপ্তির আর একটি পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কতবড় সর্বনাশা কামনা পাপ-ক্ষুধা লুকিয়ে আছে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না বাগচী!'

'তুমি তোমার দীপ্তির কথা কিছুদিনের জন্যে এখন ভুলে যাও।' আর একটা ধমক দিয়ে উঠল শশাঙ্ক। 'আশ্চর্য! এর সঙ্গে আমি কথা বলছি।'

পারিজাত চুপ ক'রে গ্লাস তুলল।

শশাঙ্ক হেসে প্রশ্ন করল, 'আপনার মেয়ের বয়স?'

শিবনাথ মঞ্জুর বয়েস বলল।

'তা'লে আপনার স্ত্রীর বোধ হয়—?' শশাঙ্ক একটা অনুমানে এসে অপেক্ষা করছিল।

রুচির প্রকৃত বয়সটা বলতে হঠাৎ যেন বাধল শিবনাথের, কমিয়ে বলল, তেইশ।'

'তা'লে তো এখনো একেবারে বাচ্চা।' পারিজাত মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ, একটু কম বয়সেই আপনাদের বিয়ে হয়েছিল আর কি। কেমন তাই না?'

শশাঙ্ক মন্থর হাসল। 'কম বয়স মানে আজকাল মেয়েদের যে-বয়সে জেনারেলি বিয়ে হচ্ছে আমি তার তুলনায় বলছি।'

শিবনাথ নীরব থেকে মাথা নাড়ল।

'তাই বলুন।' পারিজাত চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে জড়িত গলায় বলল, 'কেমন কোমল টেন্ডার মনে হচ্ছিল বৌদিকে, আই মিন্ আপনার ওয়াইফকে। আমার তো ধারণা ছিল উনি দীপ্তির সমবয়সী বুঝি। মাই গড্। দীপ্তির টুয়েন্টি নাইন, হ্যাঁ নিয়ারলি থার্টি। বুড়ী হতে চলল। আর এই দেখুন স্টুপিড কি কাণ্ড ক'রে বসল। মণ্টুর সঙ্গে—'

আবার বিরক্তিব্যঞ্জক চাপা গুঞ্জন শোনা গেল শশাঙ্কর গলায়।

'যাকগে, কথাবার্তা হ'ল, রাত বাড়ছে, এই বেলা আপনি বাড়ি যান শিবনাথবাবু।' শশাঙ্ক সিগারেট ধরায়। 'বেশ ভাল করে বাজারের ওদের বুঝিয়ে বলুন। গুড্ নাইট।

সোৎসাহে মাথা নেড়ে শিবনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে হ্যারিকেনটা কপালের কাছে তুলে দাঁত বার ক'রে মদন হাসছিল।

সরকারের হাসিটা শিবনাথের ভালো লাগল না।

যেন হাসি দেখাতেই মদন আলোটা এত উঁচোয় তুলে ধরেছে। শিবনাথ গম্ভীর গলায় বলল, 'আলো দেখাতে হবে না। এমনি যেতে পারব, বেশ জোছ্না আছে।'

'আহা চলুন না, একসঙ্গে একটু হাঁটা যাক।' এবার নাকের শব্দ ক'রে মদন হাসল। 'তা কত টাকার চেক্ লিখিয়ে আনলেন?'

'টু থাউজেন্ড।' স্বরটাকে আরো বেশি গম্ভীর ক'রে ফেলল শিবনাথ। 'কেন, এ-সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে নাকি?'

'আরে না না।' শিবনাথ না অন্য কিছু ভেবে চিন্তা ক'রে মদন ঘোষ এবার মুখে হাসল। 'অই রমেশ হলে পাঁচ শ টাকা দিয়েই বাবু ওকে ধাপার বাজারে পাঠাত। ওর মুখটা ছিল কিনা। কথা দিয়েই চিঁড়ে ভেজাতো, টাকাপয়সা বেশি খরচ করত না।'

শিবনাথ হাসল না।

মদন বলল, 'পাঁচ শ টাকা থেকেই সে খাবলা মারত, ওই টাকা রেস্টুরেণ্টে ঢালত কি অন্য কোন কারবারে।'

'আমি অনেস্টলি কাজ ক'রে যাব। যদি কিছু ব্যালেন্স রাখতে পারি, পারিজাতকে ফেরত দেবো বলে এসেছি।'

'রমেশটা একটা ছোটলোক ছিল।' মদন বলল।

'তা আর আমি কি করে বলব। ওসব বাজে লোকের সঙ্গে আমি বেশি মিশিনি।'

'না, তা কেন মিশবেন, আপনারা শিক্ষিত, ওটা ছিল গজমূর্খ।' চতুর মদন প্রসঙ্গটাকে সেখানেই চাপা দিতে চেষ্টা করে আবার দাঁত বার ক'রে হাসল এবং হ্যারি-

কেনটা কপালের কাছে তুলে ধরল। 'তা কর্তারা কি রকম চালাচ্ছেন দেখে এলেন?'

এবার হাসিটা তত খারাপ লাগল না সরকারের। চট ক'রে প্যাকেট থেকে একটা নিজের জন্যে এবং সরকারের জন্যে আর একটা সিগারেট তুলে মদনের হাতে সেটা দিয়ে শিবনাথ বলল, 'তা চালাচ্ছেন মন্দ না' দু'টো বোতল তো খালি হয়েছে দেখলাম। সারারাতই চলবে নাকি?'

'অনেকটা সেরকম।' হাত থেকে হ্যারিকেন নামিয়ে মদন সিগারেট ধরাল।

'ওটির সঙ্গে আর কিছু চলবে বোধ হয়?'। শিবনাথ ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করল, 'না কি এ পাড়ায় সে সুবিধা হবে না?'

'এই তো সবে শুরু, সমিতি গড়া হ'ল, ইলেক্‌শন শুরু হ'ল। ফাল্গুনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। এখন এখানে ঘন ঘন মিটিং হবে, বক্তৃতা হবে, চিলড্রেনস-এগজিবিশন হবে, ছুঁচ সুতোর কাজের প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। আসবেন না মানে? পাবে না মানে? শশাঙ্ক যার কাণ্ডারী, তার আবার মেয়েছেলের অভাব হয় নাকি? রাতারাতি পেয়ে যাবে দেখুন না।'

শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'আমাদের কি, আপনি যেমন তার কর্মচারী তেমনি আমাকেও অনেকটা, হ্যাঁ, কাজ যখন করছি এবং পারিজাত ইলেক্‌শনে সাক্‌শেসফুল হলে কাজের রিওয়ার্ড হিসাবে কিছু প্রত্যাশাও করি যখন,—তখন আমাদের এসব ব্যাপারে চোখমুখ বুজে থাকাই ভাল। কি বলেন সরকার মশাই।'

'আরে মশাই সে কথা বলতেই তো অন্ধকারে অদ্দুর হাঁটতে হাঁটতে আপনার সঙ্গে আসা, হি-হি।' মদন ঘোষ অন্তরঙ্গ গলায় বলল, 'দুজনে মিলে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করা।'

'হ্যা, তা ছাড়া আর কি।'

দু'জন একে সঙ্গে আরো কিছুটা অগ্রসর হ'ল।

'ওবাড়িতে সবাই আপনার স্ত্রীর প্রশংসা করছে কেবল!'

'কেবল প্রশংসায় আর কি হয় ঘোষ।' শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'প্রশংসায় চিঁড়ে ভেজে না।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' মদন সোৎসাহে থুঁতনি নাড়ল। শিবনাথ এখন কেবল অর্থকরী চিন্তায় মগ্ন সরকারের বুঝতে কষ্ট হয় না।

'কেবল সমিতি করলে তো আর', একটু ইতস্তত 'ক'রে মদন পরে বলল, 'তা বৌদিমণি যখন এখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মিশতেই আরম্ভ করেছেন, বিকেলটা সমিতির জন্যে হাতে রেখে সকালের দিকে এক-আধটা টুইশানি করলেও মন্দ হ'ত না, কি বলেন?'

শিবনাথ উপেক্ষার হাসি হাসল।

'আপনি দেখছি সরকারি ক'রে ক'রে বুদ্ধিটাও সেরকম ক'রে ফেলেছেন। বৌয়ের রোজগার বাড়ুক, স্ত্রী আরো বেশি টাকা উপায় ক'রে এনে আমাকে খাওয়াক, আমি মোটেই সে লাইনে চিন্তা করি না। বরং আরো একটা মাস গেলে, আমি ঠিক করেছি ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনব। দেশের কাজ দশের কাজ নিয়ে যদি ও থাকতে চায়

আমি বাধা দেব না। আমি আমার কথা বলছি। কাজ তো ক'রে যাচ্ছি। পারিজাত ভোটে জিতবে বলে রাত দিন এই খাটুনি। কাজের প্রশংসাও করছেন কর্তারা। কিন্তু কেবল,—একটু চুপ থেকে শিবনাথ নাকের শব্দ করে হাসল। 'কেবল মুখের ওই প্রশংসা দিয়েই শেষ অবধি তুষ্ট রাখতে চাইবেন কিনা কে জানে। এখন তো একটি আধলাও নিচ্ছি না।'

যেন মদন জব্দ হয়ে গেল। আর একটা কথা বলতে পারল না। হাসির রেশটা ধরে শিবনাথ বলল, 'যান, আর আলো দেখাতে হবে না। ঐ তো এসে গেছে, বনমালীর দোকান দেখা যাচ্ছে। নিন, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে টানবেন।' অতিরিক্ত দু'টো সিগারেট মদনের হাতে গুঁজে দিয়ে ও নিজে আর একটা ধরিয়ে শিবনাথ এক লাফে জলপাইতলার নর্দমা ডিঙিয়ে বনমালীর দোকানের সামনে উঁচু জমিতে উঠে এল।

'কে?'

'আমি।'

শিবনাথের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল গলার স্বর শুনে।

'এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আপনি করছেন কি?'

'মশাই, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

'রাস্তা ছেড়ে দিন।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখন আড্ডা দেবার সময় না।'

কে. গুপ্ত অন্ধকারে মাথা নেড়ে বলল, 'ব্রিলিয়াণ্ট্ খবরটা আপনাকে শোনাতে রাত জেগে বসে আছি, শুনবেন না?'

দাঁতে দাঁত চেপে শিবনাথ ক্রোধ সংবরণ করল।

'তা খবর তো এ-বাড়িতে নিত্যই লেগে আছে,—কি আবার এমন নতুন খবর হল।'

ইচ্ছা করেই শিবনাথ তার ছেলের হাসপাতালে মরা, কি তার স্ত্রীর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকার ভীষণ খবর দু'টোর উল্লেখ করলে না। এবং লোকটাকে একটু অনুকম্পাই করল। 'পাগল পাগল।' অনেকটা নিজের মনে ফিসফিসিয়ে শিবনাথ নতুন প্যাকেটের মোড়ক ছিঁড়ে দু'টো টাটকা সিগারেট বার ক'রে বলল, 'নিন, স্মোক করুন। তা কখন ছুটি হ'ল আপনার?' পাঁচুর ম্যাসেজ ক্লিনিক রাত কটায় বন্ধ হয়?'

'আরে মশাই, সে সারারাত চালালেও চলে। ও ছেড়ে দিন। কাল থেকে আর আমি ওখানে যাচ্ছি না। দেশলাই দিন।'

'কি হ'ল, ছেড়ে দিলেন নাকি চাকরি?'

'আরে মশাই, আপনিও দেখছি এমন একটা রসের খবরের মুখে পাঁচু, ক্লিনিক, চাকরি আগরবাগর পাঁচ কথা টেনে আনছেন। দিন দেশলাই, দিন।' কথা শেষ ক'রে গুপ্ত, মনে হ'ল যেন খুব জোরেই হাসল, কিন্তু তা না, একটু কান পেতে থেকে শিবনাথ বুঝল নাকের তলায় গলার কাছে হাসিটাকে চেপে ধরে একটা বিশ্রী ঘিনঘিনে আওয়াজ বার করল মাত্র।

হাসির ধরন দেখে শিবনাথের মেজাজ আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। 'আপনার

সঙ্গে রাত দুপুরে আমি হাতাহাতি করতে চাই না। কাইণ্ডলি রাস্তাটা ছেড়ে দিন।'

বারো ঘরের উঠোনে ঢুকবার সরু পথ আগলে কে. গুপ্ত দাঁড়িয়ে। সাত ও এক নম্বর ঘরের মাঝখান দিয়ে পথ। কমলার ঘরের বেড়ার গায়ে একটা হাত ও রমেশের ঘরের বেড়ার গায়ে আর একটা হাত রেখে কে. গুপ্ত ফের সোজা হয়ে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাতে হাত দু'টো সে এইমাত্র একত্র ক'রেছিল। জ্বলন্ত সিগারেট মুখে নিয়ে বলল, 'খবরটা শুনলে আপনার একটু উপকার হ'ত স্যার।'

'পাগল!' উপেক্ষার হাসি হাসল শিবনাথ। ইচ্ছা করলে লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে ওপারে যেতে পারে তার ঘরে, কিন্তু তার আগে সে চেম্‌টি কাটল।

'স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে, ছেলে হাসপাতালে মরেছে, মেয়ে হাজতে. ইণ্টারেস্টিং খবর বলার সময়টা বেছে নিয়েছেন ভাল, পথ দিন!'

'আপনি রাত দেড়টায় এখন ফিরছেন কোথা থেকে?'

'কাজ থেকে। বেড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মেরে। কেন, তার কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে নাকি। ইডিয়েট রাস্তা ছাড়ো।'

'মশাই, একটুতেই এমন চটে যান।'

'আপনি আমায় যেতে দিন।' শিবনাথের রক্ত মাথায় উঠল। ঘাড়ে হাত রাখতে যাচ্ছিল সে কে. গুপ্তর। গুপ্ত আবার সেই ঘিনঘিনে গলায় হেসে উঠল। হাত সরিয়ে নিয়ে শিরনাথ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'অপদার্থ, পাপ, শিক্ষিত বাঙালী সমাজের কলঙ্ক। পটাসিয়াম সায়নাইড গিলে মরতে পার না নচ্ছার।'

'মরব, মরলে তো সবই শেষ হয়ে যাবে। আমি মরলে আপনাদের মজার মজার খবর শোনাবে কে, বলুন, হি-হি।'

'রাস্কেল।'

'চারু এসেছিল।' রাগ না ক'রে কে. গুপ্ত বলল। 'চারু রায়।'

'কোথায়?'

'আপনার ঘরে।'

শিবনাথ একটা বড় ঢোঁক গিলল।

'হ্যাঁ, এসেছিল কাল রাত্রে, সমিতির কাজকর্ম নিয়ে ডকুমেণ্টারী ছবি তোলা হবে, তার জন্যে রুচির সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিল। তাতে হয়েছে কি? সমিতির সেক্রেটারী হয়েছে ও।'

'আরে মশাই, আজ বিকেলেও চারু এসেছিল।'

'হ্যাঁ, যদি এসেই থাকে তো দোষেরটা কি শুনি? এই নিয়ে হাসছ কেন স্টুপিড।'

'আঃ গায়ে হাত দেবেন না, লাগছে।'

কে. গুপ্ত ঘাড় থেকে শিবনাথের হাতটা সরাতে চেষ্টা করল। আপনি মশাই আবার ভায়লেণ্ট হঠে উঠছেন।'

'তো ওসব বাজে বকছ কেন কুকুর, খেতে পাওনা, রাস্তায় গাছতলায় আশ্রয় নিচ্ছ —আমার সময়ের মূল্য আছে, কাল সকালে কাজে বেরোতে হবে, পথ দাও ঘরে যাই।'

'বেশ তো, এভাবে কথা বলুন।' শিবনাথ ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নিতে কে. গুপ্ত অনেকটা স্বাস্তিবোধ করল। 'কথা আরম্ভ করতেই আপনি ঘাড়ে ধাক্কা দেবেন, মারধর করবেন, এটা মশাই টু স্পীক দি ট্রুথ মনে লাগে, আফটার অল্ আমি আপনার নেক্সড ডোর নেবার।'

'হ্যাঁ, বলুন কি হয়েছে, এক সেকেণ্ডে ব'লে শেষ করুন।' শিবনাথ অস্থির গলায় বলল, 'আমার সময়ের দাম আছে।'

চট্ ক'রে কথা বলল না কে. গুপ্ত। ঘিনঘিনে গলায় আবার হাসল। হাত দু'টো বাড়িয়ে দু'দিকের বেড়ার গায়ে ঠেকাল। যেন বাড়িটা এধার এবং ওধার দু'দিক থেকে আরম্ভ হয়েছিল। সেভাবেই ঘরের নম্বর বসানো। তাই কমলা ও রমেশের ঘরের মাঝখান দিয়ে ভিতরে ঢোকার পথ।

ঘামছিল শিবনাথ। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপাল মুছল।

'তা আমি অতটা খেয়াল করিনি চারু যখন বাড়িতে ঢুকেছিল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আজ অনেকদিন পর খালি ঘর পেয়ে মশাই একটু ফ্লোরে শুয়েছিলাম। হ্যাঁ, পুলিশের হাঙ্গামাটা মিটবার পর। ডেড্ বডি সরিয়ে নিতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল কিনা।'

'হ্যাঁ, তাতো হবেই। সী কমিটেড সুইসাইড, এ মামলার অনেক তথ্য, অনেক তল্লাসী। তারপর, খালি ঘরে একলা শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিলেন ? অদৃষ্ট, জীবন ? আপনাদের গুরু ভোলাগিরি কি বলেন ?'

'মশাই, আবার আপনি বাঁকা রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলেন, শুনুনই না ইণ্টারেস্টিং বলতে আমি এখানে কি মিন্ করছি। হি-হি।'

'তাড়াতাড়ি শেষ কর, কুকুর।' শিবনাথ গর্জে উঠল।

কিন্তু কে. গুপ্ত তা গায়ে মাখল না।

'শুয়ে শুয়ে বেবিটার কথা ভাবছিলাম। হাজত থেকে ফিরে এলে ব'লে কয়ে ওটাকে আবার স্কুলে পাঠানো যায় কিনা, এমন সময়, বুঝেছেন ? যেন মনে হ'ল চারু আপনার ঘরে 'দেবি' 'দেবি' বলে হঠাৎ গদ্‌গদ্ সুরে মন্ত্র পাঠ করছে। শুনে মশাই আমার এমন হাসি পেল! শালা ভূতের মুখে হরিনাম—হাড়বদমায়েস রায় পুজোআচ্চা আরম্ভ করল কি ভর সন্ধেবেলা ? ভীষণ কিউরিয়সিটি হ'ল।'

'তারপর ?' রুদ্ধশ্বাসে শিবনাথ গর্জন করতে গিয়ে থেমে গেল। যেন রমেশের কুকুরটা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। গাছের পাতার সর্‌সর্ শব্দ হয়। সারা বাড়ি ঘুমে নিঃসাড়।

'আর সিগারেট আছে ?'

'না।'

'হি-হি। থাক্‌গে। শুনুন গল্পটাই তা হ'লে বলে শেষ করি। আমার ও আপনার ঘরের মাঝে, হুঃ এগারো ও বারো নম্বর ঘরের মাঝখানে টিনের বেড়াটার একজায়গায় একটা বড় ফুটো আছে লক্ষ্য করেছেন ?'

'না না আমি করিনি, আমি করি না স্টুপিড। অপরের ঘর দেখতে নিজের

ঘরের ফটো তল্লাস করা আমার নেচার না। ফটো দিয়ে তুমি কি দেখছিলে হারামজাদা আমায় বল।'

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ পায়ের জুতো খুলে কে. গুপ্তর মুখে দু'ঘা বসিয়ে দিল।

ফ্যালফ্যাল করে একটু সময় তাকিয়ে থেকে পরে গুপ্ত আস্তে আস্তে বলল, 'মশাই আপনি এত চট্ করে মারামারি করেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ার্কি করার জায়গা পাওনা, রাস্কেল!' শিবনাথ জুতোটা ফের পায়ে পরল।

'আমি তো বলছি, গোড়ায় বলে রেখেছি আপনার ঘরে চারু কি করছিল না করছিল আমার দেখার কোন ইনটেনশন ছিল না। অন্ গড্।'

'তো তুমি হাসছ কেন, শয়তান!'

কে. গুপ্তর মুখে তখন হাসি ছিল না।

'মশাই আমার দেখার ভুল হ'তে পারে,—আমি হয়তো ভুলও দেখতে পারি, বিশ্বাস করা না-করা দ্যাট্ ইজ আপ্ টু ইউ। কিন্তু তাই ব'লে—'

'আমি তোমাকে মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেব যদি আমার ঘর আমার পরিবার আমার স্ত্রী সম্পর্কে কোনরকম খারাপ ইঙ্গিত শুনি বজ্জাত!'

'মুশকিল! কোথায় একটু স্ত্রী-চরিত্র, মানে সেক্স-সাইকলজি নিয়ে এরপর আলোচনা করব, সবটা ঘটনা ব'লে শেষ ক'রে, মানে আমার স্ত্রী এই অবস্থায় কি করত, আপনার স্ত্রী কেন এটা করল—না, তা না, আপনি শুরুতেই—' কে. গুপ্ত ঘিনঘিনে সুরে আবার একটুখানি হাসল।

'আমার স্ত্রী কি করেছে?' উন্মাদের মত শিবনাথ লোকটার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু চট্ করে ধৈর্যধারণ করল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছে কাঁপা গলায় বলল, 'বলুন, কি ঘটনা?'

শিবনাথ নতুন সিগারেট ধরালে।

কিন্তু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে কে. গুপ্ত ঘিনঘিনে হাসিটাকে ক্রমশ বড় করতে লাগল।

'ইন্টারেস্টিং বলছিলাম মশাই এই জন্যে যে, চারু গদ্‌গদ্ সুরে 'দেবি দেবি' ডাকার সঙ্গে সঙ্গে উনি, হ্যাঁ, আপনাদের ঘরের খুকির মা এমন অদ্ভুত গলায় হেসে উঠল! কী বলব,—ইয়েস, সী গিগ্‌সড লাইক এ বেবী। একেবারে কচি খুকির মত। তাই না ব্যাপারটা কেমন স্ট্রেঞ্জ মনে হ'ল। আর তখনই আমি মেঝে থেকে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে সেই ফুটোর গায়ে চোখ রাখলাম।'

'ফুটোর গায়ে চোখ রেখে তুই কি দেখেছিলি আমায় বল্, বলে শেষ কর্, স্কাউণ্ড্রেল, না হ'লে আজ তোকে আমি—উঃ, গিগ্‌লড লাইক এ বেবি! তোমার বিলাতী বাটখারা নিয়ে এসেছ আমার ঘরের হাসির ওজন করতে, আমাদের গেরস্থ ঘরে! এই বলা, বলে শেষ কর্, না হলে—'

'ইস!' কে. গুপ্ত যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। মারবেন না, এভাবে মারধর—'

শিবনাথ প্রবল শক্ত হাতে কে. গুপ্তর গলা টিপে ধরেছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে সাপের মত হিস্‌হিস্‌ শব্দ ক'রে বলল, 'আমি জানতে চাই তুই শেষ পর্যন্ত কি দেখেছিলি পশু—'

'বলছি বলছি।' প্রাণপণে শিবনাথের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে করতে কে. গুপ্তও সাপের মত হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ বার করল মুখ দিয়ে, দম বন্ধ হয়ে কথা আটকে গিয়ে এই অবস্থা হচ্ছিল। 'আমি, আমি ভুল দেখতে পারি, কিন্তু আমি তো পরিষ্কার দেখলাম মশাই, দ্যাট বাগার, হুঁ চারু—হি কিস্‌ড রাইট অন হার—'

একটা আলো জ্বলল সামনে। শিবনাথ চোখ তুলল। হ্যারিকেন হাতে রুচি।

'আশ্চর্য! এত রাত্রে কি নিয়ে তুমি চেঁচামেচি করছ ওর সঙ্গে, ছেড়ে দাও, বদ্ধ উন্মাদ, তুমি কি জান না?' রুচি ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।

শিবনাথ কে. গুপ্তর গলা ছেড়ে দেয়।

কে. গুপ্ত চুপ ক'রে একটু দাঁড়ায়। একবার রুচির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে তারপর নিজের মনে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে শিবনাথের গায়ে না লাগে এভাবে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি অন্ধকারে বাইরে রাস্তায় নেমে যায়।

'পাগল, তাই না?' অন্ধকার থেকে চোখ ফিরিয়ে শিবনাথ রুচির দিকে তাকায়। রাতের আধখানা ঘুমিয়ে উঠে চোখ মন্দ ফুলে ওঠেনি স্ত্রীর, হ্যারিকেনের আলোয় শিবনাথ চট ক'রে লক্ষ্য করল।

'আমি তো তোমার গলার আওয়াজ শুনেই টের পেলাম পাগলাটার সঙ্গে ঝগড়া করছ। রাত দুপুরে।'

'কী যা তা বকছিল!' শিবনাথ গলা পরিষ্কার করল।

'ও তো আর নিজের মধ্যে নেই। সব শেষ করেছে। ছেলে গেছে, বৌটাকে মেরেছে, মেয়েটা হাজতে। আর এদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন যা-তা করছে। কে এক ভদ্রলোক এসেছিল সন্ধ্যাবেলা পাঁচুর ম্যাসেজ ক্লিনিকে তেল মাখাতে। শুনলাম ভদ্রলোক পোশাক ছেড়ে প্রাইভেট কামরায় ঢুকতে কে. গুপ্ত তার শার্ট পেন্টুলন টাই জুতো পরে পাশের ঘরে টেবিলে উঠে লাফালাফি তো করছিলই, তারপর হঠাৎ অশ্লীলভাবে শিস দিতে দিতে ছুটে গিয়ে বিধুমাস্টারের ছোট মেয়ে মমতার গায়ের ওপর পড়েছিল। মমতা তখন একজন কাস্টমারকে বিদায় ক'রে দিয়ে রেস্ট নিচ্ছিল।'

'তারপর?' শিবনাথ একটা ছোট ঢোক গিলল। 'তুমি কার কাছে শুনলে? ছি ছি, কী অসভ্য!'

'এই তো একটু আগে পাঁচু এসে বলাবলি করছিল। পাঁচু কে. গুপ্তকে তখনই দোকান থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিধু মাস্টার বেবির বাবার নামে কেস করবে।'

'তাই বলো! তাই তো ও—'

অন্ধকারের দিকে চোখ ফিরিয়ে শিবনাথ আবার কি ভাবল।

'কি ভাবছ তুমি?'

শিবনাথ অল্প হাসল। রুচির দিকে তাকায়।

'ডুবতে আর কিছু বাকি নেই, কিন্তু এখনো কেমন রসিক গুপ্ত তাই ভাবছিলাম।'

'বেরিয়ে যাবে রস জেলখানায় গেলে।' রুচি বলল, 'এদিকে থানা থেকে লোক এসেছিল খবর দিতে। মর্গে কাল রাত থেকে রুণুর ডেড বডি পচছে, পোড়াতে হবে।'

'কি বলছে গুপ্ত ?'

'ওরাই যেন পুড়িয়ে ফেলে, তার সময়, অর্থ এবং লোকজন কোনোটাই নেই। বলছে সৎকার সমিতিকে খবর দেওয়া হোক। ওরা সব করবে।'

'বৌয়ের বেলায়ও তাই বলবে হারামজাদা।' শিবনাথ ক্ষীণ গলায় হাসল। 'স্যুইসাইড। এরও পোস্ট মর্টম হবে।'

বলে সে আবার অন্ধকার দেখতে লাগল। জোনাকি পোকারা নাচানাচি করছিল। হুঁ, বাড়ির বাইরে যাবার রাস্তার মুখ ওটা। এইমাত্র ওখান দিয়ে কে. গুপ্ত বেরিয়ে গেল।

শিবনাথ ভাবে এই রাস্তা দিয়ে কিরণ গেছে কমলা গেছে সুনীতি গেছে।

বেবি গেছে প্রীতি বীথি দুই বোন গেল।

সুপ্রভা গেছে, মল্লিকা নেই।

বিধুমাস্টারের মেয়ে মমতা সাধনা ম্যাসেজ ক্লিনিকে চাকরি করতে বেরিয়ে গেছে ওখান দিয়ে।

এক সঙ্গে অনেকগুলি বিবাহিত অবিবাহিত মেয়ের মুখ শিবনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল। এমন কি এবাড়ির মালিক পারিজাতের স্ত্রী দীপ্তির চেহারাও মনে পড়ল তার। আর একটু সময়। তারপর অন্ধকারকে সম্পূর্ণ পিছনে রেখে শিবনাথ আলোর দিকে, রুচি যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'কি বলছিল তোমায় ?' রুচি প্রশ্ন করল ঃ 'পাগলটার সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করছিলে ?'

'পয়সা চাইছিল। অনেক পয়সা দিয়েছি ওকে। আজ আবার।' শিবনাথ স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে সুন্দর করে হাসল। 'রাস্কেলটা আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখতে এসেছিল পয়সা আছে কি না।'

'দাওনি তো ?'

'না, আমার এত মায়াদয়া নেই।' স্বরটাকে কঠিন করল শিবনাথ। 'বলে কিনা এই পয়সা রোজগার করতে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে আমাকে।'

'এসো, ঘরে এসো।' রুচির হাতের আলো নড়ে উঠল।

শিবনাথ স্ত্রীকে অনুসরণ করল।

'সন্তোষ ওরা তো বলছেই, আজ চারুবাবু পর্যন্ত বলছিলেন ঠাট্টা ক'রে, টাকা-পয়সার গন্ধ পেয়ে পারিজাতের ইলেকশনের কাজে খাওয়া ঘুম বন্ধ রেখে তুমি খাটতে আরম্ভ করেছ।' ঘাড় ফিরিয়ে রুচি হাসল।

'চারু এসেছিল বুঝি ? কখন এসেছিল ?' একটুও অবাক হবার ভান করল না শিবনাথ।

'বিকেলে। রাত ন'টা পর্যন্ত তো ব'সে অপেক্ষা ক'রে গেল তোমার জন্যে। একটু চা ক'রে দিলাম। বাবা! কত জানে লোকটা। আর্ট, কালচার, এদেশের বিউটি

ওদেশের বিউটি। ব'সে থেকে থেকে কত গল্প ক'রে গেল।'

'আর সেই সঙ্গে আমার একটু বদনাম।' শিবনাথ না ব'লে পারল না।

'আহা, বদনাম আর কি, ঠাট্টা ক'রে তো কথাটা বলছিল।' যেন একটু ঝাঁজ ফুটল রুচির গলায়। 'তা যেমন বদনাম ক'রে গেছে, তেমনি তার দাম দিয়ে গেছে। আস্ত এক টিন সিগারেট রেখে গেছে তোমার জন্যে, বলছিল বার বার শিবনাথবাবুকে দেবেন, ভাল জিনিস নিউ মার্কেট থেকে জোগাড় ক'রে—'

রুচির কথা অসমাপ্ত থেকে গেল।

'এ্যাঁ, তাই নাকি, তাই বলো!' প্রবল উচ্ছ্বসিত গলায় শিবনাথ, বারো ঘরের উঠোন কাঁপিয়ে হেসে উঠল। 'বেশ বেশ, ভাল ভাল, পেটে খেলে পিঠে সয়, একটু বদনাম করেছে তাতে কি, কি বলো?' বলে সে এমন অদ্ভুতভাবে স্ত্রীর দিকে তাকাল যে রুচি রীতিমত ভয় পেল।

'কি, তুমি অন্য কিছু ভাবছ নাকি,—এমনভাবে তাকিয়ে দেখছ কি আমার মুখের দিকে?'

হাসল না এবার আর, জোরে মাথা নেড়ে যেন হাজার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিবনাথ বলল, 'পাগল, কিচ্ছু না, কি আবার ভাবব আমি, আমার অত শত ভাবলে চলে? এসো, ঘরে এসো।' ব'লে সহজ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর হাতে হাত রেখে উঠোন পার হয়ে সে বারান্দায় উঠে গেল।

— — —